প্রচার

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৪র্থ খণ্ড। ১২৯৫ সাল।

শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

Calcutta

PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
23/1, BECHU CHATTERJEE'S STREET.
PUBLISHED BY UMA CHARAN BANERJI,
PRATAP CHANDRA CHATTERJEE'S LANE.

সূচী।

প্রচার

৪র্থ খণ্ড] ১২৯৫ [১ম সংখ্যা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

যাহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহই বিনাশ করিতে পারে না।

(টীকা)

"যাহার দ্বারা" অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা। এই "সকলই" অর্থাৎ জগৎ। এই সমস্ত জগৎ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত—শঙ্কর বলেন, যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই রূপ ব্যাপ্ত।

যাহা সর্ব্বব্যাপী তাহার বিনাশ হইতে পারে না; কেন না, যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্ব্বব্যাপী সত্বাও থাকিবে। যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্ব্বব্যাপী সত্বা সর্ব্বব্যাপীই থাকিবে। অতএব তাহা অব্যয়। আকাশ সর্ব্বব্যাপী, আকাশের বিনাশ বা ক্ষয় আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না। আকাশ অবিনাশী এবং অব্যয়। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আকাশও

যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত, তিনিও অবিনাশী ও অব্যয়। কাজেই কেহই ইঁহার বিনাশ সাধন করিতে পারে না।

এক্ষণে, এই কথার দ্বারা আর কয়েকটি কথা সূচিত হইতেছে। সেই সকল কথা হিন্দুধর্ম্মের স্থূল কথা, এজন্য এখানে তাহার উত্থাপন করা উচিত।

প্রথমতঃ, এই শ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে, যে ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে পারেন না। যাহা সাকার, তাহা সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না। সাকার ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য। আমরা জানি যে ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য সাকার সর্ব্বব্যাপী কোন পদার্থ নাই। অতএব ঈশ্বর যদি সর্ব্বব্যাপী হয়েন, তবে তিনি সাকার নহেন।

ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্দু শাস্ত্রের এবং হিন্দুধর্ম্মের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষদ্ এবং দর্শনশাস্ত্রের এই মত। সে সকলে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেক স্থলে ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানের এস্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়া কথিত হইলেও, পুরাণ ও ইতিহাসকারেরা ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না, ঈশ্বর যে নিরাকার তাহা কখনই ভুলেন না। পুরাণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার।

একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। বিষ্ণুপুরাণের প্রহ্লাদচরিত্র ইহার উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। তথায় বিষ্ণুই ঈশ্বর। প্রহ্লাদ তাঁহাকে "নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ" বলিয়া স্তব করিতেছেন। অন্য স্থলে স্পষ্টতঃ সাকারতা স্বীকার করিতেছেন। যথা—

ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে।

এবং পরিশেষে পীতাম্বর হরি সশরীরে প্রহ্লাদকে দর্শন দিলেন। কিন্তু তথাপি, এই প্রহ্লাদচরিত্রে বিষ্ণু নিরাকার; তাঁহার নাম "অনন্ত", তিনি

"সর্ব্বব্যাপী"। যিনি অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না। এবং তিনি যে নির্গুণ ও নিরাকার তাহা পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে। যথা—

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে।

ইত্যাদি। ১।১৯।৭৯

পুনশ্চ, বিষ্ণু "অনাদিমধ্যান্তঃ" সুতরাং নিরাকার।

এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে। অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই যে হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত।

তবে কি হিন্দুধর্ম্মে সাকারের উপাসনা নাই? গ্রামে গ্রামে ত প্রত্যহ প্রতিমা পূজা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমার্চ্চনায় পরিপূর্ণ। তবে হিন্দু ধর্ম্মে সাকারবাদ নাই কি প্রকারে বলিব?

ইহার উত্তর এই যে, অন্যদেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রতিমার্চ্চনা সাকারের উপাসনা নয়। এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চ্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে না, যে এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। যে একখানা মাটির কালী গড়িয়া পূজা করে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার কিছু মাত্র বুঝে, তবে সে জানে, এই চিত্রিত মৃৎপিণ্ড, ঈশ্বর নহে, বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, এবং সে জানে তাহা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে না।

তবে সে এ মাটির তালের পূজা করে কেন? সে যাঁহার পূজা করিবে তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। কাজেই সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলে, "হে বিশ্বব্যাপিনি সর্ব্বময়ি আদ্যাশক্তি! তুমি সর্ব্বত্রই আছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্ব্বত্রই আবির্ভূত হইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই এমন কিছুতে আবির্ভূত হও। আমি তোমার যে রূপ কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবির্ভূত হও, আমি তোমার উপাসনা করি। নহিলে কোথায় পুষ্পচন্দন দিব তদ্বিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারি না।"

এই প্রতিমা পূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং তাহাদিগের শিষ্য নব্য ভারতবর্ষীয়েরও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ, বাইবেলে ইহার নিষেধ আছে। শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়ের রাগ, কেন না ইংরেজের ইহার উপর রাগ। যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহা "আমাদের" অবশ্য নিন্দনীয়। প্রতিমা পূজা ইংরেজের নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রতিমা পূজা অবশ্য "আমাদের" নিন্দনীয়, তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে যে এই প্রতিমা পূজার জন্য ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস না হইলে একেবারে উৎসন্ন যাইবে, সুতরাং আমরাও তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য; তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। সত্য বটে, রোম গ্রীস্ প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রতিমা পূজা করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ বলে যে ভারতবর্ষ প্রতিমাপূজায় উৎসন্ন যাইবে, অতএব ভারতবর্ষ নিশ্চয় প্রতিমাপূজায় উৎসন্ন যাইবে; তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভাবিয়া থাকেন। অন্যমত বিবেচনা করা কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি, এবং নীচাশয়তার কারণ মনে করেন।

আমরা এরূপ উক্তির অনুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্য্যামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন। কি নিরাকারের উপাসক কি সাকারোপাসক, কেহই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্তনীয়। অতএব তাঁহার চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য; কেহই তাঁহাকে জানে না। যদি ইহা সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং ভক্তিশূন্য উপাসনা যদি তাঁহার অগ্রাহ্যই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য; ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট পৌঁছিবে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষীয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না; আর ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে, তদ্বিষয়ের কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই

নিষ্ফল নহে; এবং এতদুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। সুতরাং উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিষ্প্রয়োজনীয়।

সাকারোপাসকেরা বলিয়া থাকেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না। অনন্তকে আমরা মনে ধরিতে পারি না, সুতরাং তাঁহার ধ্যান বা চিন্তা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে। এ কথারও বিচার নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ হয়। কেন না এমন যদি কেহ থাকেন, যে তিনি আপনার সান্তচিন্তাশক্তির দ্বারা অনন্তের ধ্যান বা চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে পারেন, তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন, তাঁহাকে কাজেই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে। অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসকের মধ্যে, বিচার, বিবাদ ও পরস্পরের বিদ্বেষের কোন কারণ দেখা যায় না।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, যে আমি "সাকারের উপাসনা," এবং "সাকারোপাসক" ভিন্ন "সাকারবাদ" বা "সাকারবাদী" শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। কেন না, সাকারবাদ অবশ্য পরিহার্য্য। ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।

কথাটা উঠিতে পারে যে ঈশ্বর যদি সাকার নহেন, তবে হিন্দুধর্ম্মের অবতারবাদের কি হইবে? এই গীতার বক্তা কৃষ্ণকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু কৃষ্ণ সাকার। ইঁহাকে তবে কি প্রকারে ঈশ্বরাবতার বলা যাইবে? এই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর আমি কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে দিয়াছি, সুতরাং এখানে সে সকল কথা পুনর্ব্বার বলিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ সুতরাং ইচ্ছানুসারে তিনি যে আকার ধারণ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা হয়।

"যেন সর্ব্বমিদং ততম্" ইত্যাদি বাক্যে অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে, যে বিলাতী Pantheism এবং হিন্দুধর্ম্মের ঈশ্বরবাদ বুঝি একই। স্থানান্তরে এই ভ্রমের নিরাস করা যাইবে।

ব্রহ্ম নিরূপণ।—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। *

শান্তি, উল্লাস, সুখ, স্বচ্ছন্দ, বিলাস, তৃপ্তি ইত্যাদি মনুষ্যের চিত্তগত নানা প্রকার ভাবের কথা "আনন্দ" শব্দের সঙ্গে মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্‌টি ব্রহ্মানন্দের অনুরূপ, অথবা যদি একটিও অনুরূপ না হয়, তবে কোন্‌টি কত দূর উহার সন্নিহিত, তাহা স্থির করা সহজ নহে। বিশেষতঃ যদিও তদ্বিষয়ে কোন প্রকার বুদ্ধি স্থির করিতে পারা যায়, তথাপি আর একটি কারণ বশতঃ সেই বুদ্ধি অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। ব্রহ্মের আনন্দ নিত্য এবং তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, পরিমাণের ন্যূনাতিরেক হয় না, কাল সহকারেও তাহা অন্ত পায় না। মনুষ্যের মনে যদি ব্রহ্মানন্দের অনুরূপ ভাব কখনও উদয় হয়, তথাচ তাহার আদি অন্ত, হ্রাস বৃদ্ধি অন্তর্হিত করিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এই সকল লক্ষণ অভাবে তাহার অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা এক প্রকার বুদ্ধির অগম্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এতদ্ভিন্ন মনুষ্যের আনন্দ কখনও ইষ্টলাভ দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কখনও বা ইষ্টসাধনের চেষ্টাই আনন্দের উপাদান হয়। এরূপ চেষ্টাতে যত আনন্দ হয়, ইষ্টসাধন হইলে তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং সেই চেষ্টা অসিদ্ধ হইলে যে দুঃখ হইয়া থাকে তাহাও, পরিমাণ লক্ষ্য করিলে, কোনও মতেই উক্ত চেষ্টাসংসৃষ্ট আনন্দের বিপরীত বলিয়া তুলনা করা যায় না। ফলতঃ মনুষ্যের আনন্দ ক্রিয়াসংসৃষ্ট, ব্রহ্মের আনন্দ ক্রিয়াবিচ্ছিন্ন। মনুষ্যের আনন্দ কখন ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জন্মে এবং কখনও বা ক্রিয়াবিশেষ সমাপ্ত না হইলে উদয় হয় না। সুতরাং এরূপ আনন্দ কালসাপেক্ষ। কিন্তু যে আনন্দ নিত্য এবং হ্রাসবৃদ্ধিবিহীন, তাহা ভাবনা করিতে হইলে দুই একটি লক্ষণ কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা ক্রিয়াবিশেষ সমাপ্তির পরে যে ভাব মনুষ্যের মনে বিকশিত হয়, মনে করিতে হইবে যে তাহার অনুরূপ আনন্দ যেন ক্রিয়ার পূর্ব্বেও বিদ্যমান আছে, এবং কখনই তাহার ক্ষয় হয় না।

* লেখকের "সনাতন ধর্ম্মশিক্ষা" নামক অসম্পূর্ণ হস্তলিপি হইতে উদ্ধৃত।

তাহা হইলেই আদি-অন্ত-বিহীন আনন্দ লক্ষিত হইবে, এবং এতাদৃশ আনন্দের সহিত ক্রিয়ার সংস্রব বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রিয়াকে এতাদৃশ আনন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ বলা যাইতে পারে না। কেন না, ক্রিয়ার পূর্ব্ব হইতেই তাহার অবস্থিতি এবং যেরূপ কল্পনা করা গিয়াছে, তাহাতে ক্রিয়ার সময়েও তাহার কোনও বিভিন্ন রূপ প্রকাশ হয় না। এইরূপে ক্রিয়ার সংস্রব ত্যাগ করিলে, আনন্দের হ্রাসবৃদ্ধিও গণনীয় হইবে না। হ্রাস না থাকিলেই অক্ষয় বলিয়া মানিতে হইবে। অতএব নিত্য আনন্দ এই প্রণালীতে চিন্তা করা অসম্ভাবিত নহে।

এই প্রণালীতে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে ক্রিয়াবিহীন বলা হইল। অর্থাৎ ব্রহ্মের ক্রিয়া নাই অথবা তাঁহার ক্রিয়াতে হ্রাস-বৃদ্ধি আরম্ভ-সমাপ্তি আদি-অন্ত কিছুই নাই। ব্রহ্মের আনন্দ নিত্য সনাতন, একথা বলিলে তাঁহার ক্রিয়া ও বিশ্রাম এবং ক্রিয়াপরম্পরায় ভেদ সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হয়। পরন্তু এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিলে ক্রমশঃ আর একটি কথাও ব্যক্ত হইবে। অর্থাৎ যাঁহার ক্রিয়া নাই অথবা ক্রিয়ার ভেদাভেদ নাই তাঁহার দোষগুণও থাকিতে পারে না। তাঁহার বিষয়ে পাপপুণ্যের আলোচনা করাও বৃথা। সর্ব্বভূতব্যাপী ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; কিন্তু তাঁহার আনন্দে ক্রিয়ার সংস্রব নাই, পাপপুণ্যের ভেদ নাই। তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ। তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলিলেই সেই সঙ্গে প্রাগুক্ত লক্ষণ দুইটি বর্ত্তে, তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হয় না। যাঁহারা তাঁহাকে ঐ নামে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা এ সকল বিষয় ভাবিয়াই এমন সংক্ষিপ্ত আখ্যা প্রয়োগ করিয়াছেন।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বিচার করিলে আর একটি অভিনব কথার উদয় হইবে। স্বয়ং ব্রহ্মই যদি পাপ পুণ্যকে অভেদ করেন, তবে মনুষ্যগণই বা তাহার বিষয়ে বিধান করিবার জন্য এত ব্যগ্র কেন এবং ধর্ম্মশিক্ষাতেই বা কি ফলোদয় হইবে? আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয়ের জন্য বিশেষ আড়ম্বর দেখা যায় না। এবং শাস্ত্রকারেরা যে কৌশলের দ্বারা এই তর্ক হইতে অব্যাহতি পান, তাহার প্রসঙ্গে কোন লাভও নাই; কেবল এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে, সে কৌশল বর্ত্তমানকালে অচল হইয়াছে।

এখন দেশের রাজা খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টানি মত হইতে যে সংশয় হয় পাপ ও পুণ্য বিষয়ে অভিনব বিচার ব্যতীত সে সংশয়ের মীমাংসা হইবে না। খ্রীষ্টা-

নেরা দ্বৈতবাদী, তাঁহারা ঈশ্বরকে সর্ব্বভূতময় সৃষ্টি হইতে বিভিন্ন গণ্য করেন এবং তাঁহাদিগের দ্বৈতবাদ এমন বিচিত্র যে, প্রাগুক্ত ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ অথবা পাপের অস্তিত্বকেও দ্বিতীয় অনাদি বস্তু বলিয়া লক্ষ্যই করেন না। বরং এগুলি অলক্ষিত রাখিয়া ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় বলিয়া ব্যক্ত করেন। কেবল তাহাই নহে। অনীশ্বর বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার-পূর্ব্বক তাহার দ্বিত্ব সংখ্যা করিতে বিরত থাকেন। আবার সেই অনীশ্বর বস্তুর অন্তর্গত পাপকে লক্ষ্য করিয়া তর্ক করেন যে, তাঁহাদিগের ঈশ্বর নিষ্পাপ এবং আমাদিগের অদ্বৈত ব্রহ্ম পুণ্যময় নহেন। ফলতঃ খ্রীষ্টানেরা প্রকারান্তরে রটনা করেন যে, সনাতন ধর্ম্মে পাপপুণ্যের বিচার এবং পাপমোচনের উপায় নাই। এ কথাগুলি অগত্যা বলিতে হইল। দ্বৈতবাদী খ্রীষ্টানদিগের মতে ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থ হইতে বিভিন্ন। পাপ মনুষ্যের স্বধর্ম্ম, স্বয়ং উদ্ভূত হয়। আমরা যাহাকে পুরুষকার বলি, খ্রীষ্টানেরা সেইরূপ একটি কারণ হইতে পাপের উদয় করেন এবং পুণ্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরানুগ্রহ-জনিত বলিয়া আপত্তি করেন। ঈশ্বর পুণ্যময় এবং পাপী মনুষ্যের শাসনকারী। অন্য সৃষ্ট পদার্থ মনুষ্যের অধীন এবং পাপপুণ্যের বিষয়ে দায়ী নহে। ঈশ্বর দয়াময়, অথচ যমরাজের ন্যায় পাপিগণের প্রতি সমান বিচারী। ফলতঃ খ্রীষ্টানী মতে একাধারে দয়া এবং বিচার, দণ্ড এবং পুরস্কার কিরূপে সমাহিত হইতে পারে, কেবল সেই তর্কেরই বাহুল্য দেখা যায়। সুতরাং তাঁহাদিগের মত অদ্বৈতবাদ হইতে পারে না, এবং তাঁহাদিগের দ্বৈতবাদ যে আমাদিগের অদ্বৈতবাদ অপেক্ষা বিশদ, তাহাও বলা যায় না।

যাহা পাপ বলিয়া গণ্য হয়, অদ্বৈতবাদীর মতে তাহা ব্রহ্মবহির্ভূত হইতে পারে না।

ব্রহ্ম সর্ব্বভূতব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের প্রতি সমদর্শী। ব্রহ্মের দোষ গুণ নাই; তিনি বিধান কিম্বা বিচার করেন না। একমাত্র সমদর্শিতা গুণ হেতু তিনি আনন্দস্বরূপ অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম। সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষাতে এই সমদর্শিতা লক্ষণটিই ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। ইহার মধ্যে সমস্ত গূঢ় কথা সমাহিত আছে।

সর্ব্বভূতব্যাপী ব্রহ্মের সমদর্শিতা বুঝিবার জন্য ভূতপর্য্যায়ের প্রতি লক্ষ্য

করিতে হইবে। ভূতসমগ্র দুই প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছি। যে পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের বিচার আছে তাহা মুদ্রিত হয় নাই। পাশ্চাত্য তর্কপ্রণালীর অনুরোধে ইন্দ্রিয়ের গোচর এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর এই দুই শ্রেণীতে একবার সর্ব্বভূত লক্ষিত হইয়াছে। আবার মর্ত্ত্য এবং অমর বলিয়া সেই সমস্ত বস্তু অন্য শ্রেণীদ্বয়ে বিভক্ত হইয়াছে। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ইন্দ্রিয়ের অগোচর অনেক বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহা পৃথক্ রাখিলেও শাস্ত্রের যুক্তি ব্যর্থ হইবে না। বরং একত্রিত করিলে নিধর্ম্মিগণ কথায় কথায় কুতর্ক উত্থাপন করিবার পথ পান। কিন্তু মৃত্যু বিষয়ে মতামত নাই। মৃত্যু এবং জীবিত অবস্থা সকলেরই পরিচিত। আর ব্রহ্মই বল বা ঈশ্বরই বল, তিনি যে কালবিহীন ইহাও সকলেরই স্বীকৃত। অতএব মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য করিলেই প্রাচীন ও পাশ্চাত্য মতের সামঞ্জস্য হইতে পারিবে। এই জন্য মর্ত্ত্য ও অমর নামে দুই শ্রেণী করিয়াছি। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি কথার প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম উভয়েই অমর, কিন্তু ঈশ্বর ব্যষ্টিভাবে উপাসিত হন, ব্রহ্ম সমষ্টিভাবে লক্ষিত হন। অতএব ভূতপর্য্যায় মধ্যে ইন্দ্রিয়গোচর ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং মর্ত্ত্য ও অমর বলিয়া যে শ্রেণীভেদ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে ব্যষ্টি সমষ্টির লক্ষণ ও গুণাগুণ বুঝিতে হইবে।

সমষ্টি শব্দ বঙ্গভাষাতে প্রচলিত। ব্যষ্টি শব্দ নৈয়ায়িকের মুখে শুনা যায়। বেদান্তশাস্ত্রে ইহার প্রয়োগ আছে। ব্যষ্টি শব্দ সমষ্টির ঠিক বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, সুতরাং শব্দদ্বয় অত্যন্ত সংস্পৃষ্ট। বন, বৃক্ষের সমষ্টি; বৃক্ষ, বনের ব্যষ্টি। কোন বস্তুর সমষ্টি মনে করিলে, তাহার ব্যষ্টি অগত্যা স্বীকার করিতে হয়। এবং সেই বস্তুর ব্যষ্টি লক্ষ্য করিলে অন্ততঃ অলক্ষিত ভাবে তাহার সমষ্টি স্বীকার করিতে হয়। ন্যায়শাস্ত্রমতে শ্রেণীনির্ব্বাচন করিলেই এক দিকে সমষ্টি আর এক দিকে ব্যষ্টির প্রসঙ্গ থাকিবে। *

* পাশ্চাত্য তর্কপ্রণালী মতে সমষ্টি Synthesis এবং ব্যষ্টি analysis হইতে উৎপন্ন হয়। এক দিকে genus, অন্যদিকে species এবং individual ব্যক্ত হয়। আর ব্যষ্টিও পরস্পরের সাপেক্ষ বা সমষ্টি correlative বলিয়া গণ্য হইবে, অথচ সমষ্টিকে absolute truth বলিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।

ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের সমষ্টিভাব ব্যক্ত করেন, ভূতপরম্পরা তাঁহার ব্যষ্টিভাব প্রকাশ করে।

সর্ব্বভূতব্যাপী ব্রহ্ম সমষ্টিধর্ম্মাক্রান্ত এবং তাঁহার সমষ্টিভাবহেতু ভূতগণ ব্যষ্টিভাববিশিষ্ট এবং পরস্পর সমান। ব্রহ্মকে সমদর্শী বলাতে তাঁহার সম্বন্ধে ভূত-পরম্পরাকে সমান বলিয়া মানিতে হইবে। "বৃক্ষসমষ্টি—বন" বলিলে সকল বৃক্ষেরই সমান বনত্ব স্বীকার করিতে হয়। বৃক্ষে বৃক্ষে অনেক ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু বন সম্বন্ধে সকলই বৃক্ষ, এক বৃক্ষত্বই সকলের স্বধর্ম্ম। বনত্ব এবং বৃক্ষত্ব মধ্যে কেবল ব্যষ্টি-সমষ্টি-ভেদ ভিন্ন আর কিছুই নাই। সমদর্শী ব্রহ্মে পাপপুণ্য নাই। কেন না, ব্রহ্ম ভূতসমগ্রের সমষ্টি। পাপপুণ্য তাঁহার ব্যষ্টিভাব হইতে উৎপন্ন হয়। সমষ্টিতে পাপ ও পুণ্য মিশিয়া নির্গুণভাবের বিকাশ হয়। অতএব পাপপুণ্য বুঝিবার জন্য ব্যষ্টিভাব আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিতে হইবে।

কিন্তু ভূতপরম্পরার ব্যষ্টির বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা করা অসাধ্য। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা যে সকল কথা বলিয়াছেন, তর্কানুরোধে তাহা সমস্তই পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নর-যোনি ব্যতীত অন্য যোনির স্বধর্ম্ম কি, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। পুণ্য কিরূপ তাহা ক্রমশঃ বুঝা যাইবে, কিন্তু পুণ্য বলিয়া বল কিম্বা ব্রহ্মের সমদর্শিতা বলিয়াই বল, ইহার কোনও বিধানই পশু-যোনি সম্বন্ধে ভাবনা করিতে পারা যায় না। যদি কেহ মনে করেন যে আমি পশুগণের প্রতি নর-নির্ব্বিশেষে সমদর্শী হইব, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তিনি একটি কথা পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি পশুর প্রতি সমদর্শী হইলেও, পশুর তাঁহার প্রতি সমদর্শী হইবার কোনও সম্ভাবনা হয় না। এবং পশুগণ সমদর্শী হইলে তাঁহার যেরূপ ভাব হইত, উহার বিপরীত অবস্থাতে তিনি আত্মপ্রকৃতিতে তাহা কখনই প্রত্যাশা করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, এ কথার সার্থকতা কেবল এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের সমদর্শিতা অনুধ্যান করিবার জন্য পশু-পক্ষী-স্থাবর-জঙ্গমাদি যোনিসমগ্রকে সমতুল্য ভাবে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু একবারে কোন যোনির সমষ্টির প্রতি লক্ষ্য করাও অসাধ্য। অগ্রে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিতে হইবে।

ক্রমশঃ নরযোনি এবং পরে সমগ্র যোনির কথা বিবেচনা করিতে হইবে। ব্রহ্ম এবং ভূতসমষ্টি সম্বন্ধে এক একটি যোনি যেমন, এক একটি যোনি সম্বন্ধে এক একটি ব্যক্তিকেও তেমনই ব্যষ্টিভাবে অবলোকন করিতে পার। অনন্তর ব্যক্তিগণের সমষ্টি বা নরযোনির স্বধর্ম্ম স্থির করিয়া ক্রমশঃ ভূতসমগ্রের প্রতি ব্রহ্মের সমদর্শিতা কিরূপ তাহা বুঝিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

অনন্ত মুহূর্ত্ত

কালের গতি অবিরাম। কাল কেবলই চলিতেছে। কবে কোথায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে কেহ জানে না, কেহ কহিতে পারে না। কিন্তু সকলেই দেখে চলিতেছে—কেবলই চলিতেছে। আবার শুধু চলিতেছে?—ভীষণ বেগে চলিতেছে!

কাল চলিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে—অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সঙ্গে লইয়া কাল চলিতেছে। যেন কালের বেগে বেগপ্রাপ্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভীষণ বেগে চলিতেছে! একবার যে এক জায়গায় দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিব কাল কেমন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেমন, তাহার যো নাই। দাঁড়াইব কেমন করিয়া—আমিও যে কালের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণবেগে চলিতেছি। কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যাই আর, কত কি দেখি। কিন্তু হায়! এই মাত্র যাহা দেখিয়াছি তাহা আর দেখিতে পাই না—কালের ভীষণ স্রোতে তাহা কোথায় চলিয়া গেল দেখিতে পাই না, আমিই বা কোথায় চলিয়া আসিলাম বুঝিতে পারি না! অতএব কালও দেখিতে পাই না, কালস্রোতে-প্রবাহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও দেখিতে পাই না! বড়ই দুঃখ—ক্ষোভের সীমা নাই!

কবি বলেন ক্ষোভ করিও না—তোমার মনের দুঃখ ঘুচাইব। দেখ দেখি—

পৃথিবীর ঐ মধ্য প্রদেশে—যথায় প্রকৃতির সমস্ত অনুরাগ পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটিত, প্রজ্বলিত—কেমন একটি সুন্দর, স্বচ্ছ, সুগভীর সরোবর পড়িয়া রহিয়াছে! সরোবরে তরঙ্গ নাই—কেবল মাত্র উহার জল একটু উষ্ণ। উহা এত গভীর, কিন্তু উহার তলদেশ পর্য্যন্ত যেন চক্ষের নিকটেই পড়িয়া রহিয়াছে। উহার তলদেশে পাঁক কি কর্দ্দম কিছুই দৃষ্ট হয় না—দৃষ্ট হয় কেবল ঐ উচ্চ উষ্ণ আলোকময় দীপ্তিপূর্ণ সান্ধ্যাকাশের সিন্দূর-সদৃশ ঘোরতর অনুরাগ।—ভ্রম হয়, ঐ সিন্দূর-সম অনুরাগ আকাশে না সরোবরে।

অমন অনেক দেখিয়াছ—কিন্তু এমন দেখিয়াছ কি?—

ঐ উচ্চ উষ্ণ সান্ধ্যাকাশের সিন্দূররাগ ঘুচিয়া গিয়াছে—যেখানে সিন্দূর রাগ ছিল, সেখানে এখন মেঘরাশিতে যেন আগুন লাগিয়াছে—ঝড়ে সেই জ্বলন্ত মেঘরাশি ভীষণভাবে ভীষণবেগে ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি মারামারি করিতেছে। কিন্তু সেই সুন্দর স্বচ্ছ সরোবর তেমনি স্থির—উহাতে একটি তরঙ্গ নাই, উহার জলের এতটুকু আন্দোলন নাই, উহার বারিরাশি যেন ঐ উন্মত্ত জ্বলন্ত মেঘরাশি বুকে করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তেমনি নিঃশব্দ ও নিস্পন্দ!

বল দেখি এ-তুফানের এই-সরোবর যে দেখে সে আর উহা ভুলিতে পারে কি—পৃথিবী দেখিলে পৃথিবী আর উহা ভুলিতে পারে কি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর উহা ভুলিতে পারে কি? বল দেখি—এ-তুফানের এ-সরোবর যে দেখে, সে উহা অনন্ত কাল দেখে কি না? বল দেখি, এই মুহূর্ত্তের এই সরোবর অনন্ত কাল কি না? বল দেখি—এই মুহূর্ত্তে অনন্ত কাল প্রবিষ্ট হইয়াছে কি না—কালের অনন্ত স্রোত অবরুদ্ধ হইয়াছে কি না—যে কাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে লইয়া কেবলই চলে, সে কাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে লইয়া একবার অনন্ত কালের জন্য দাঁড়াইয়াছে কি না? বল দেখি—এই মুহূর্ত্ত অনন্ত মুহূর্ত্ত কি না? এখন শুন—

Desdemona. Cousin, there's fallen between him and my lord
An unkind breach: but you shall make all well.

Othello. Are you sure of that?

Des. My lord?
Oth. *This fail you not to do, as you will—*
[*Reads.*
Lodovico. He did not call; he's busy in the paper.
Is there division 'twixt thy lord and Cassio?
Des. A most unhappy one; I would do much
To atone them, for the love I bear to Cassio.
Oth. Fire and brimstone!
Des. My lord?
Oth. Are you wise?
Des. What, is he angry?
Lod. 'May be, the letter mov'd him;
For, as I think, they do command him home,
Deputing Cassio in his government.
Des. By my troth, I am glad on't.
Oth. Indeed?
Des. My lord?
Oth. Devil! [*Striking her.*
Des. I have not deserv'd this.
Lod. My lord, this would not be believ'd in Venice,
Though I should swear I saw it: 'Tis very much;
Make her amends, she weeps.
Oth. O devil, devil!
If that the earth could teem with woman's tears,
Each drop she falls would prove a crocodile:—
Out of my sight!
Des. I will not stay to offend you.
[*Going.*

"I will not stay to offend you"—ইহাতেই তুফানের সেই অপূর্ব্ব সরোবর—ইহাই সেই অনন্ত মুহূর্ত্ত।

আর এক জন কবি কি দেখাইতেছেন দেখ দেখি—

অত্যুচ্চ অভ্রভেদী হিমাচলের কোলে শান্ত শব্দহীন সৌন্দর্য্যময় বনপ্রদেশ। তথায় স্বচ্ছ শুভ্রসলিলা মালিনী নদী নিঃশব্দে প্রবাহিত—মালিনীর পার্শ্বে

পুণ্যবান্ ঋষির পবিত্র আশ্রম। আশ্রম নিস্তব্ধ—যেন যোগীর ন্যায় যোগমগ্ন। হঠাৎ বিদ্যুদ্বৎ বজ্রধ্বনি হইল—

অয়মহং ভোঃ

হিমাচল, মালিনী, বৃক্ষ, বন, বায়ু, পশু, পক্ষী, ঋষি, ঋষিকুমার, ঋষিকন্যা—সেই গভীর নিস্তব্ধতা—সকলই চমকিয়া উঠিল। কেবল চমকিল না—একখানি ক্ষুদ্র কুটীরের একটি ক্ষুদ্র বালিকা।

দেখিয়া বজ্রের ক্রোধ বাড়িল। বজ্র হিমাচল, মালিনী, বৃক্ষ, বন, বায়ু সমস্ত বিদীর্ণ করিয়া গর্জ্জিতে লাগিল—

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥

সব বিদীর্ণ হইল—হইল না কেবল সেই ক্ষুদ্র কুটীরে সেই ক্ষুদ্র বালিকা! বালিকা তখন ব্রহ্মাণ্ডান্তরে বিলীন। বজ্রও সে বিলীনতা বিদীর্ণ করিতে পারিল না। বালিকা যেমন তাহার ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন, বজ্রও তেমনি সেই বালিকার বিলীনতায় বিলীন হইয়া গেল!

বল দেখি—বালিকার এই বিলীনতায় বজ্রের এই বিলীনতা দেখিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই সংযুক্ত বিলীনতায় অনন্তকাল বিলীন হইয়া থাকে কি না—যে কাল কেবলই চলে, সেই কাল সেই বিলীনতায় অনন্তকাল বিলীন হইয়া থাকে কি না? বল দেখি—যে মুহূর্ত্তে বালিকার এই বিলীনতায় এই ভীষণ বজ্রকে বিলীন হইতে দেখি, সে মুহূর্ত্ত অনন্ত মুহূর্ত্ত হইয়া যায় কি না?

সেই কবি সীতা দেবীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি বলিতেছেন শুন—

সীতা নিতান্তই রাম-লইয়া—সীতা নিতান্তই রাম-সর্ব্বস্ব। সেই জন্যই সীতা ছায়ার ন্যায় রামের অনুগামিনী—যেখানে রাম, সেইখানেই সীতা—দুঃখ কষ্ট বিপদ, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই—রাজপুরী তুচ্ছ করিয়া সীতা অরণ্যবাসিনী, অশোকবনে বসিয়া সীতা দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকুলবিনাশিনী। রাম ব্যতীত সীতা জীবন্মৃতা—রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রামমাত্র সার। তাই রামের জন্য

সীতা ত্রিলোকসমীপে অগ্নিপরীক্ষা দিয়াছেন—তাই আবার হৃদয়ে রামকে ধরিয়া সিংহাসন ছাড়িয়া বনবাসযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। আজ আবার সর্ব্বলোকসমক্ষে রাম বলিতেছেন—পরীক্ষা দেও। এতও কি সয়? সীতার আর সহিল না! তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি হৃদয় সকলই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—'যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতি হইতে বিচলিত হইয়া না থাকি, তবে দেবি বিশ্বম্ভরে! আমাকে অন্তর্হিত কর।' সীতা পতি হইতে বিচলিত হন নাই, কিন্তু আজ দেবতাদের নিকট যাহা চাহিতেছেন তাহা পাইলে তিনি যে তাঁহার সেই পতিকে হারাইবেন, সেই পতিকে যে দেখিতে পাইবেন না, সে জ্ঞান তাঁহার গিয়াছে। ফলে, আজ সীতারূপী ব্রহ্মাণ্ড মেরুদণ্ড হারাইয়া দিক্‌ হারা, পথহারা, আপন হারা। তবুও কিন্তু ব্রহ্ম হারা নয়!

> সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্ত্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্।
> মামেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ॥

তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত, বসুন্ধরা সীতাকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং রাম, "না" "না" ইহা বলিতে না বলিতেই রসাতলে প্রবেশ করিলেন।

"তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত!" ব্রহ্মাণ্ডের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবুও ব্রহ্মাণ্ড আপন ব্রহ্মকে আগেও যেমন এখনও তেমনি হৃদয় ভরিয়া ধরিয়া রহিয়াছে! এই অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্তকাল স্তম্ভিত—মহাকাল বিস্ময়ে অচল। এই অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড একটি অনন্ত মুহূর্ত্ত!

আর একজন কবি কি কহিতেছেন শুন দেখি—

একটি কাল ছোট সুন্দর মেয়ে—নাম ভ্রমর। ভ্রমরটি এমনি ছোট যে বোধ হয় যেন একটি অঙ্গুলির টিপ্‌নিতেই মরিয়া যায়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ভ্রমরের ক্ষুদ্র প্রাণে প্রেমের সমুদ্র—অনন্ত, অতলস্পর্শ। সে সমুদ্রের যেখানে খোঁজ—দেখিবে কেবল গোবিন্দলাল। কিন্তু গোবিন্দলাল পাপী। তাই এই ক্ষুদ্র ভ্রমরের তেজ সিংহ শার্দ্দূলের তেজ অপেক্ষাও বেশি। গোবিন্দলাল

মুষ্টিভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে—বলিলে তখন সে প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে পারে, পণ পর্য্যন্ত বলি দিতে পারে। তবুও ত রাগ পড়িল না—তেজ কমিল না। এত তেজ এত রাগ দেখিলে যেন রাগ হয়।

কিন্তু ইহা বা কি দেখিলে? দেখিবে ত এইবার দেখ। ক্ষুদ্র ভ্রমরের অন্তিমকাল উপস্থিত। ভ্রমর এখন গোবিন্দলালের জন্য লালায়িত—একটিবার মাত্র গোবিন্দলালকে দেখিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। গোবিন্দ-লাল দেখা দিতে আসিয়াছে—আপনি আসে নাই, ডাকিয়া আনিয়াছে তাই আসিয়াছে। ভ্রমর সে কথা শুনিয়াছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়া ভ্রমরের মৃত্যুযন্ত্রণা ঘুচিয়া গেল—ভ্রমরের সাত বৎসরের হৃদয়াগ্নি নিভিয়া গেল—ভ্রমরের ইহকাল পরকাল সার্থক হইল। তবুও ভ্রমর বলিল—'আশীর্ব্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই'—বলিয়া ভ্রমর মরিয়া গেল! ভ্রমরের উপর এত যে রাগ হইয়াছিল তাহা কোথায় চলিয়া গেল। ভ্রমরের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু হৃদয়ে যত দুঃখ উপজিল, হৃদয় তাহার সহস্রগুণ বিস্ময়ে পূরিয়া উঠিল। যে গোবিন্দলালকে না দেখিতে পাইয়া ভ্রমর আজ মৃত্যুশয্যায়, সেই গোবিন্দলালকে এ-হেন মৃত্যু-মুহূর্ত্তে ইহজন্মের মতন একটিবার দেখিতে পাইয়াও ভ্রমর বলিল কি না—'যেন জন্মান্তরে সুখী হই'! এ সেই আগেকার মতন কাটা কাটা কথা নয় বটে, এ কাতরতার কথা, কিন্তু ইহাতেও ত সেই আগেকার তেজ, সেই আগেকার কঠোরতা আছে। এ কথা শুনিলে কান্না পায় বটে, কিন্তু এ কথাও যে পাপীর কাছে তাহার পাপের কথা—পাপীর প্রতি পাপের জন্য তিরস্কারের কথা। মিছরির ছুরি যাহাকে বলে, এ কথা যে তাহাই। ভ্রমরের সব ভাঙ্গিয়াছে—অস্থি, ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক, দেহ, মন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু সে গোবিন্দলালও ভাঙ্গে নাই, আর গোবিন্দলালের প্রতি সে কঠোরতাও ভাঙ্গে নাই! বল দেখি এই বিষম দৃশ্য দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইয়া যায় কি না, মহাকাল থমকিয়া দাঁড়ায় কি না? এখন বুঝিলাম ভ্রমরের রাগ, ভ্রমরের তেজ—দর্পও নয়, অহঙ্কারও নয়, প্রেমের অভিমান ও পুণ্যের কঠোরতা। আর সে অভিমান কি?—না, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না বলিয়া, ভালবাসার পাত্রকে পাপ স্পর্শ করিল বলিয়া মরমের যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা কিছুতেই ঘুচে না, ঘুচে কেবল অসম্পূর্ণকে পূর্ণ দেখিলে—পাপীকে নিষ্পাপ

দেখিলে। তাই গোবিন্দলাল অসম্পূর্ণ বলিয়া মরিতে মরিতেও ভ্রমর তাহার প্রতি তেমনি কঠোর। পুণ্যের কঠোরতা বিষম কঠোরতা-এতটুকু অসম্পূর্ণতা থাকিতে পুণ্যের কঠোরতা যায় না। পুণ্য দেয়ও ষোল আনা.চায়ও ষোল আনা, কাণ ক্রান্তিটি ও ছাড়ে না। লেশ মাত্র পাপ বা অসম্পূর্ণতা থাকিতে প্রেমময় ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভ্রমরের এই বিষম কঠোরতা সেই প্রেমময়ের কঠোরতা। কিন্তু সে কঠোরতা কেবলই কঠোর নয়—সে কঠোরতা করুণ-কঠোর। অসম্পূর্ণতা যন্ত্রণার কারণ বলিয়া পুণ্য অসম্পূর্ণতার প্রতি এত কঠোর। পুণ্যের কঠোরতা করুণ-কঠোর। তাই আজ পুণ্যবতী গোবিন্দলালকে আপনার যন্ত্রণার কথা বলিয়া তাহার আশীর্ব্বাদ লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁদাইয়া চলিয়া গেল। ধন্ম-বুক খুলিয়া আপন যন্ত্রণা দেখাইয়া বলিয়া গেল, পৃথিবীর যন্ত্রণা ঘুচাইও—পূর্ণ হইবে ও পূজ্য হইবে। তাই দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্তকাল বিস্মিত ও ভক্তিপূর্ণ চিত্তে সাশ্রু নয়নে ভ্রমরের পূজা করিল আর স্বয়ং কাল যেন তাহা দেখিবার জন্য অনন্তকাল দাঁড়াইয়া রহিল! ভ্রমরের ঐ মৃত্যু মুহূর্ত্ত সত্যই একটি অনন্ত মুহূর্ত্ত!

এইরূপে আমাদের কবিগণ কালের গতি রোধ করেন এবং অনন্ত কালকে মুহূর্ত্ত কালে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। কালের ভঙ্গি ভ্রূকুটী আদি নষ্ট করিয়াই তাঁহারা কালকে বাঁধিয়া ফেলেন। তাঁহারা দেখেন যে ঈশ্বরের কাছে কালের ভ্রূকুটী ভঙ্গি কিছুই নাই—ঈশ্বর অনন্তকালেও যা মুহূর্ত্ত কালেও তাই।—ঈশ্বর অনন্ত মুহূর্ত্ত। সেই চরমাদর্শ শিরোপরি রাখিয়া তাঁহারা সাহিত্যে অনন্ত মুহূর্ত্ত সৃষ্টি করেন—বুঝি বা তাঁহাদের ইচ্ছা যে মানুষ যেন এতই উচ্চ, এতই ঈশ্বর-সদৃশ হয় যে কালে তাহার বিপর্য্যয় না ঘটে, আর যখনি তাহাকে দেখা যায় তখনি তাহাকে যেন পূর্ণ দেখা যায়—তখনি যেন তাহার সমস্তটা দেখা যায়। কবির সাহিত্য বড় জিনিস। কবির কাহিনী বড়ই গূঢ়। ব্রহ্মাণ্ডের মহাকবির উপাসক না হইলে কবির সাহিত্য, কবির কাহিনী বুঝা ভার।

শান্তি

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যে দিন কালীর ফাঁসি হইবার কথা তাহার চারিদিন পূর্ব্ব হইতে একটা গুরুতর বৈষয়িক মোকদ্দমা উপলক্ষে রমাপতি বাবু কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। চৌরঙ্গিতে তাঁহাদের এক প্রকাণ্ড বাড়ী আছে; তিনি বহু লোকজন সঙ্গে লইয়া সেই বাটীতে বাস করিতেছেন। আলিপুর ও কলিকাতার উচ্চপদস্থ বিস্তর সাহেব ও বড়লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। বিশেষতঃ আলিপুরের তখনকার মেজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত তাঁহার বড়ই সম্প্রীতি ছিল। কালীর ফাঁসি হইবার দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মেজিষ্ট্রেট সাহেব রমাপতি বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমাপতি তাঁহাকে বিশিষ্ট সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া স্বাস্থ্যাদি বিষয়ক শিষ্টাচারসূচক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। মেজিষ্ট্রেট সাহেব সমুচিত শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া যে উদ্দেশে তাঁহার আগমন তাহা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,—

"আপনার দেশের কালীর ফাঁসি উপলক্ষে যে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা আপনি শুনিয়াছেন বোধ হয়।"

রমাপতি বাবু সে সকল ব্যাপারের কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি সাহেবকে সেইরূপ বলিলে, সাহেব সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া রমাপতি বাবু নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং সেই স্ত্রীলোককে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। মেজিষ্ট্রেট্ বলিলেন,—

"আমি তাহাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। এই অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব, তদারকের কোন ত্রুটী করা হয় নাই। আমি স্বয়ং এবং পুলিস নিয়ত ইহার তদন্তে নিযুক্ত রহিয়াছি, কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার বোধ হয় আপনার দেশের কোন লোক ইহাতে লিপ্ত আছে; এজন্য আপনি একবার দেখিলে হয় ত সহজেই সকল কথা

বাহির হইয়া পড়িতে পারে; নিতান্ত পক্ষে তদন্তের সুবিধাজনক অনেক কথা ব্যক্ত হইবে বলিয়া আমার ভরসা আছে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"বেশ কথা। একবার কেন, আবশ্যক হইলে, আমি বহুবার তথায় যাইতে প্রস্তুত আছি। আমি জেলখানায় যাইলে যাহাতে এই স্ত্রীলোকের কামরায় যাইতে পারি এবং তাহার সহিত আবশ্যকমত কথাবার্ত্তা কহিতে পারি, আপনি দয়া করিয়া জেলর সাহেবকে তাহার বিহিত উপদেশ দিবেন। আমি কল্য প্রাতেই সেখানে যাইব।"

মেজিষ্ট্রেট বলিলেন,—

"আপনি এ জেলার একজন অনরেরী মেজিষ্ট্রেট, এবং সর্ব্ববিধ রাজকীয় অনুষ্ঠানের ও সাধারণহিতকর কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী, সুতরাং আবশ্যক ও ইচ্ছা হইলে জেল পরিদর্শন করিতে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তথাপি এ সম্বন্ধে অদ্য রাত্রেই জেলরকে এক বিশেষ পত্রদ্বারা আমি বিহিত উপদেশ প্রদান করিব। তা ছাড়া আপনি আমার এই কার্ডখানি রাখিয়া দিউন। ইহার পৃষ্ঠে আমি স্বতন্ত্ররূপ আদেশ লিখিয়া দিতেছি। ইহা আপনার নিকটেই থাকিবে, আবশ্যক হইলে এই কার্ড হাতে দিয়া আপনি অপর কোন ব্যক্তিকেও সেখানে পাঠাইতে পারিবেন।"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মেজিষ্ট্রেট সাহেব পেন্‌সিল দ্বারা কার্ড পৃষ্ঠে স্বীয় আদেশ লিখিয়া, তাহা রমাপতিবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনার অনুসন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত আমি উৎসুক থাকিব। হয়ত কালি প্রাতে আমিও জেলখানায় যাইতে পারি।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আপনার যাওয়া হয় ত ভালই; না হইলে আমি জেলখানা হইতে ফিরিবার সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।"

তাহার পর মেজিষ্ট্রেট সাহেব বিহিত বিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে বেলা আটটার সময় রমাপতির অশ্বদ্বয় বাহিত ক্রহাম আসিয়া জেলখানার দ্বারে উপস্থিত হইল। তিনি গাড়ি হইতে নামিবার

পূর্ব্বেই জেলর সাহেব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলেন এবং বিশেষ সম্মানসহকারে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রমাপতি বাবু পকেট হইতে মেজিষ্ট্রেট সাহেব প্রদত্ত কার্ডখানি বাহির করিয়া জেলরের হস্তে দিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"থাকিতে দিন—উহা আপনার নিকটেই থাকিতে দিন। যদি মহাশয় অন্য কোন লোক পাঠান, তাহা হইলে তাহার হস্তে ঐ কার্ডখানি থাকা আবশ্যক হইবে। এ সম্বন্ধে কল্য রাত্রে মেজিষ্ট্রেট সাহেব, পত্রদ্বারা আমাকে তাঁহার আদেশ জানাইয়াছেন। এক্ষণে আমি মহাশয়ের আজ্ঞার অধীন। আপনি একাকী কি অপর লোক সঙ্গে লইয়া আসামীর ঘরে যাইবেন আজ্ঞা করুন।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আমার অনেক কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি প্রথমে আমাকে বলুন, সে স্ত্রীলোক সারাদিন কি করে।"

জেলর বলিলেন,—

"তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কারণ সে যেরূপ লজ্জাশীলা ও কোমলস্বভাবা, তাহাতে তাহাকে কোন ভাল ঘরের মেয়ে বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছে। এজন্য সারাদিন তাহার ঘরে উকি দিয়া দেখা আমার নিষেধ আছে। বোধ হয় সে সারাদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"ভাল, দুই চারিদিনের মধ্যে জেলখানার নিকটে কোন নূতন লোক দেখা গিয়াছে কি?"

জেলর একটু চিন্তার পর বলিলেন,—

"আজি চারি পাঁচ দিন হইতে একজন সন্ন্যাসী জেলখানার বাহিরে বটগাছ তলায় বাসা করিয়া আছে দেখিতেছি। আর কোন বিশেষ লোক আমরা লক্ষ্য করি নাই।"

রমাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"সন্ন্যাসী এ কয়দিন এখানে বাসা করিয়া আছে, আপনি তাহার সহিত কোন দিন কোন কথা কহিয়াছেন কি?"

জেলর বলিলেন,—

"না। আমি তাহার সহিত এ কয় দিন কোন কথা কহিবার আবশ্যকতা অনুভব করি নাই; অদ্যও কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। কারণ সে ব্যক্তির সহিত এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

রমাপতি বলিলেন,—

"তাহা ত আমিও বুঝিতেছি; তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে সন্ন্যাসী এতদিন কোথায় থাকিত তাহা আপনি জানেন কি?"

জেলর বলিলেন,—

"আমি রামদীন নামে পাহারাওয়ালার নিকটে তাহার অনেক সন্ধান লইয়াছি। শুনিয়াছি সে সন্ন্যাসী নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে কোন স্থানে স্থির হইয়া থাকে না। হয় ত সে আবার আজিই এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারে।"

রমাপতি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—

"তাহা যায় যাউক; কিন্তু এত দেশ থাকিতে সে এই জেলখানার নিকটেই আড্ডা গাড়িয়া বসিল কেন তাহার কোন সন্ধান আপনি বলিতে পারেন?"

"তাহা ঠিক জানি না। বোধ হয় এ স্থানটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন বলিয়া সে এখানেই বাসা করিয়াছে?"

"সে সারাদিন কি করে জানেন কি?"

"সারাদিন তাহার কাছে বিস্তর লোক থাকে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি সে অনেক আশ্চর্য্য ঔষধ জানে; তাহাই সে লোকদের দেয়।"

"তাহাই যদি তাহার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে লোকালয়ের আরও নিকটে তাহার থাকা উচিত ছিল। এরূপ এক প্রান্তে থাকিয়া ঔষধ বিতরণ বিশেষ সুবিধাজনক বোধ হয় না। সে যাহা হউক, আসামী কালী যখন জেলে ছিল, তখন কেহ কোন দিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল কি?"

"হাঁ একদিন তাহার খুড়া একা, আর এক দিন সে তাহার এক কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কালীকে দেখিতে আসিয়াছিল।"

আবার রমপতি বাবু জিজ্ঞাসিলেন,—

"সেই খুড়া ও তাহার কন্যা যখন কালীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি?"

"আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

"সেই কন্যা ঘোমটা দিয়া আসিয়াছিল, কি তাহার মুখ খোলা ছিল?"

"ঘোমটা দেওয়াই ছিল।"

"আপনি একবারও তাহার মুখ দেখিতে পান নাই?"

"না, বরাবরই তাহার মুখ ঢাকা ছিল।"

"তবে সে কিজন্য দেখা করিতে আসিয়াছিল? সে যদি একবারও মুখ না খুলিল তবে তাহার আসিবার কি দরকার ছিল? সে কথা যাউক, কালী কি সারাদিন মুখ ঢাকিয়া থাকিত, না খুলিয়া থাকিত?"

"প্রায়ই মুখ ঢাকিয়া থাকিত।"

"ফাঁসির কয়দিন পূর্ব্বে খুড়া ও তাহার কন্যা কালীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল?"

"আগের দিন।"

"ঠিক কথা!"

"তাহারা কখন্ আসিয়াছিল?"

"সন্ধ্যার একটু আগে।"

"ঠিক ঠিক!"

"কেন আপনি ইহা হইতে কি মীমাংসা করিতেছেন?"

"কেন আপনি কি দেখিতেছেন না আপনাদের চক্ষের উপরেই মানুষ বদল হইয়াছে? তাহা হউক। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে স্ত্রীলোক কালীর বদলে এখন জেলে আছে, সে যদিই কালীর আপনার খুড়তুতো ভগ্নী হয়, তাহা হইলেও একজনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণ দিতে যাওয়া সোজা কথা নয়। অতএব হয় সে দেবতা, না হয় পাগল।"

জেলর বলিলেন,—

"এরূপ ঘটনা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আপনি যেরূপ ভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা সেরূপ সম্ভাবনা একবারও মনে করি না। হয় ত আপনিই কৃতকার্য্য হইবেন।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আপনি বিশেষ সাবধান হইয়া জেলখানার বাহিরে গাছতলায় যে সন্ন্যাসী বাসা করিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই এ কাণ্ডের মধ্যে লিপ্ত আছে। সাবধান, সে যেন পলাইতে না পারে।"

"বলেন কি? সে নেংটা সন্ন্যাসীর সহিত এ কাণ্ডের কোনই সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলিয়া আমার ত বোধ হয় না।"

"কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব কি না, তাহা আপনি পরে বুঝিতে পারিবেন। অপাততঃ আমি স্বয়ং আসামীর ঘরের চাবি খুলিয়া একাকী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিব। আর কেহ আমার সঙ্গে যাইবার বা থাকিবার দরকার নাই। আপনি আমাকে নিঃশব্দে দূর হইতে সেই ঘরটি দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।"

রমাপতি গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া জেলরের সঙ্গে সঙ্গে জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। সেই পাপীর নিকেতন, অধম ও পতিতগণের বাসভূমি এবং দণ্ডবিধির লীলাক্ষেত্রের মধ্যে রমাপতি কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিতে লাগিলেন। নারীবিভাগে উপনীত হওয়ার পর, জেলর সাহেব রমাপতি বাবুর হস্তে একটি চাবি দিয়া দূর হইতে একটি প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া দিলেন। রমাপতি ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠসমীপস্থ হইয়া ধীরে ধীরে সেই চাবি খুলিলেন। ধীরে ধীরে সেই প্রকাণ্ড কবাট খুলিয়া গেল। তখন রমাপতি দেখিলেন, অপূর্ব্ব দর্শন!

দেখিলেন, সেই দ্বারের দিকে সম্মুখ করিয়া আগুল্‌ফলম্বিত জটাভার সমন্বিতা, বিভূতিবিলেপিতকায়া, আয়তপ্রদীপ্তলোচনশালিনী, শান্তি-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্যজ্যোতির্ম্ময়ী, ত্রিশূলধারিণী এক ভুবনমোহিনী ভৈরবী। কোথায় কালী? কোথায় বা মেজিষ্ট্রেটবর্ণিত সেই সুন্দরী? রমাপতিকে সম্মুখে দেখিবামাত্র ভৈরবী চমকিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার বদন হইতে একটি অপরিস্ফুট মৃদুধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল।

সেই সুকুমারকায়া সুন্দরী সন্ন্যাসিনী সন্দর্শনে রমাপতিও নিতান্ত বিচলিত-চিত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে কিন্তু কি করিতে সেখানে আসিয়াছেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। কে এ নবীনা সন্ন্যাসিনী? রমাপতির মনে হইতে লাগিল হয় ত, কোথায় যেন তিনি এই

ভৈরবীকে দেখিয়াছেন। যেন এই জটাজূটধারিণী সন্ন্যাসিনীর সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতে আলাপ ছিল। যেন এই বিভূতিসমাবৃতবদনা সন্ন্যাসিনীর মুখমণ্ডল তাঁহার চিরপরিচিত। কিন্তু কে এ নবীনা সন্ন্যাসিনী? এরূপ ভৈরবীর সহিত পূর্ব্বপরিচয় নিতান্ত অসম্ভব বোধে রমাপতি ধীরে ধীরে আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধিকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া অতি সঙ্কোচসহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আপনি—আপনি—কাশীকে জানেন কি?"

সংক্ষুব্ধ স্বরে সন্ন্যাসিনী উত্তর দিলেন,

"তাঁহার নাম শুনিয়াছি, কিন্তু আলাপ নাই।"

কিন্তু তাঁহার উত্তরের মর্ম্ম তখন কে প্রণিধান করিবে? তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর রমাপতিকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এ কি কণ্ঠস্বর! এইরূপ স্বর—প্রায় এইরূপ কোমল বীণাধ্বনিবৎ মধুর স্বর রমাপতির প্রাণের নিভৃত কোণে এখনও থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া থাকে। তবে কে এ সন্ন্যাসিনী? আবার রমাপতি নিজের উপর প্রভুতা হারাইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। আবার কিয়ৎকাল পরে সযত্নে চিত্তকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন;

"আপনি কি আমাকে কখন দেখিয়াছেন?"

যুবতী কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমাপতির ব্যাকুল চিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। তখন তিনি উগ্র এবং অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কিন্তু বল তুমি, তুমি ভৈরবীই হও আর যেই হও, বল, বল, তুমি আমার কে?"

রমাপতি প্রশ্নের কোন উত্তর পাইলেন না, কিন্তু তিনি দেখিলেন, লোচনপ্রবাহিত জলে সেই সন্ন্যাসিনীর সুগোল গৌর গণ্ডের বিভূতি বিধৌত হইতেছে। তখন তাঁহার প্রাণ মাতিয়া উঠিল। তখন নিতান্ত উন্মাদের ন্যায় ভাবে উভয় বাহু প্রসারণ করিয়া 'সুকুমারী, সুকুমারী' শব্দে চীৎকার করিতে করিতে তিনি সেই সন্ন্যাসিনীকে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে প্রধাবিত হইলেন। তখন সেই নবীনা কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া

সহসা ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন এবং উভয় হস্তে রমাপতির চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া রোদন-বিজড়িতস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"আপনি আমার দেবতা, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ গুরু। আমি আপনার দাসীর দাসী। কিন্তু প্রেমাবতার প্রভো! আমার এ দেহে এখন আর আমার বা আপনার কোনই অধিকার নাই। অতএব আমাকে আর স্পর্শ করিবেন না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর কালে রমাপতি বাবুর ব্রুহ্যাম সবেগে আসিয়া তাঁহার চৌরঙ্গিস্থ ভবনের গাড়ি বারান্দায় উপনীত হইতে না হইতে তিনি বালকের ন্যায় অস্থির ভাবে শকট হইতে নিক্রান্ত হইলেন এবং দৌড়িতে দৌড়িতে পুরমধ্যে সুরবালার সমীপস্থ হইয়া ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—

"সুরবালা, সুরবালা যাহা হইবার নহে তাহাও হইয়াছে। এতদিনে সুকুমারীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি। এবার স্বপ্ন বলিতে পারিবে না; ঘুমের ঘোর বলিতে পারিবে না। সুকুমারী এবার সশরীরে দেখা দিয়াছেন।"

সুরবালা সবিস্ময়ে বলিলেন,

"এবার বুঝি তুমি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছ; না হয়ত তোমার মাথার ঠিক নাই।"

রমাপতি বলিলেন,

"না না সুরবালা, আমি দিব্যজ্ঞানে, সম্পূর্ণরূপ জাগ্রত থাকিয়া তোমার সহিত কথা কহিতেছি। অসম্ভব হইলেও এবার আমার কথা মিথ্যা নহে। আমি এখনই সুকুমারীকে দেখিয়া তাহার সহিত কথা কহিয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া রমাপতি বাবু কালীর ফাঁসির উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই সুরবালাকে জানাইলেন। তাহার পর পকেট হইতে এক খানি কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন,—

"এই দেখ সুরবালা, আমার হাতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পরোয়ানা। আমি সুকুমারীকে কয়েদ হইতে খালাস করিবার জন্য জামিননামায় নাম

সহি করিয়াছি। মেজিষ্ট্রেট সাহেব এই পরোয়ানা দিয়াছেন; ইহা দেখাই-লেই জেলর সাহেব সুকুমারীকে ছাড়িয়া দিবেন। আমি এই পরোয়ানা লইয়া জেলখানা হইতে সুকুমারীকে আনিতে যাইতেছি। তুমি আর এক ঘন্টা অপেক্ষা কর; এখনই তোমার সম্মুখে সেই সুকুমারীকে উপস্থিত করিয়া দিব।"

তখন সুরবালা বলিলেন,—

"বল কি? এবার যেন তোমার কথা অনেকটা সত্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। এরূপ সম্ভাবনার অতীত শুভাদৃষ্ট যখন ঘটিয়াছে, তখন দয়াময়, তোমার এই দাসী তোমার চরণে একটি ভিক্ষা না চাহিয়া থাকিতে পারিতেছে না; তুমি তাহাকে তাহা দিবে কি? এমন শুভদিনে যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করিলে কর্ম্মের গৌরব হইবে কিসে?"

তখন রমাপতি সাদরে সুরবালার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"পাগলিনি, তোমাকে দেওয়া হয় নাই, এমন বস্তু আমার আর কি আছে? এখন বল কি তোমার হুকুম।"

সুরবালা বলিলেন,—

"রাগ করিও না—দিদিকে আনিবার জন্য আমি নিজে জেলখানায় যাইব। সেই অতি কদর্য্য স্থানে আমাকে যাইতে হইলেই কাজেই বহুলোকের সমক্ষে পড়িতে হইবে। কিন্তু যাহাই কেন হউক না, আমি সেই জেলখানায় না গিয়া ছাড়িব না। যখন সেই পুণ্যবতীর পদরজ সেখানে পতিত হইয়াছে, তখন সে স্থানের আর অপবিত্রতা নাই। আর লোকের চক্ষে পড়িলে যদি কোন ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি লোকেরই হইবে, আমার তাহাতে কি? তবে কেন আমাকে যাইতে দিবে না?"

রমাপতি বলিলেন,—

"কে বলিয়াছে, তোমায় যাইতে দিব না? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যখন আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘরে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তখন নানা অসুবিধার মধ্যে সেখানে তোমার নিজে যাওয়ার প্রয়োজন কি?"

সুরবালা বলিলেন,—

"প্রয়োজন যে কি, তাহা কেবল আমার প্রাণ জানে, আমি তাহা বলিয়া

বুঝাইতে অক্ষম। রাজভক্তি কি তাহা জান তো? রাজার সহিত প্রজার কোন জ্ঞাতিত্ব, কোন কুটুম্বিতা থাকে কি? তাহা থাকে না। তথাপি সেই প্রজারা, আবশ্যক হইলে, সেই রাজার জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত দেয় কেন? কেবল ভক্তিই তাহার কারণ। যে দেবী এখন কারাগারে তিনি আমার কে? লোকে বলিবে তিনি আমার কোন আপনার লোক হওয়া দূরে থাকুক, বরং আমার শত্রু। কিন্তু এ সকল লোকের কথা, আমার প্রাণ আমাকে অন্যরূপ উপদেশ দিয়াছে। আমার প্রাণ জানে ও বুঝে তিনি আমার রাজার রাজা। যিনি আমার রাজা, এ দাসীর জীবন মরণ যাঁহার ইচ্ছার অধীন, যাঁহার চরণে এ প্রাণ দিবারাত্রি লুঠিয়া বেড়ায়, তাঁহার হৃদয়রাজ্যে যাঁহা'র রাজত্ব, আমার সেই রাজার রাজা সুদীর্ঘ বনবাসের পর আবার তাঁহার রাজ্যে ফিরিয়া আসিবেন। তবে বল দেবতা, এমন শুভদিনে আমি রাজরাজেশ্বরীকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া না আনিয়া থাকিতে পারি কি? অতএব আমি আজি এ বিষয়ে কোন আপত্তি শুনিব না। তুমি কোচম্যানকে আর একখানি গাড়ি জুড়িতে বল, আমি আবশ্যকমত লোকজন সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই বাহিরে যাইতেছি। দেখিও, এক তিলও বিলম্ব হয় না যেন।"

সুরবালা আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন। তখন রমাপতি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বহুদিন যাহা বার বার ভাবিয়াছিলেন, আজি আর একবার তাহাই তাহাই ভাবিলেন।—'সুরবালা দেবী, না মানবী!'

সুরবালার বাসনানুযায়ী আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত হইলে তিনি মাধুরী ও খোকা বাবুকে সঙ্গে লইয়া রমাপতি বাবুর সহিত ক্রহামে উঠিলেন। দুইজন ঝি ও কয়েকজন দ্বারবান্ স্বতন্ত্র গাড়িতে উঠিল। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"মাধুরী ও খোকাকে রাখিয়া গেলে হইত না?"

সুরবালা বলিলেন,—

"কাহার জিনিষ আমি রাখিয়া যাইব? উঁহারা তাঁহারই। যদি তাঁহাকে ঘরে আনিতে পারা যায়, তোমার আমার সঙ্গে তাহা হইবে না। ভগবানের

কৃপায় যদি আমার মনের সাধ পূর্ণ হয়, সে জানিবে মাধু ও খোকার দ্বারাই হইবে।"

সুরবালা আজি নিরলঙ্কৃতা। তাঁহার পরিধান একখানি সামান্য বস্ত্র এবং অঙ্গ ভূষণবর্জ্জিত। কেবল বামি হস্তে সধবা নারীর সকল ভূষণের সার ভূষণ এক 'নোয়া' শোভা পাইতেছে। রমাপতির হৃদয়ে আজি দুর্ব্বিসহ ঝড় বহিতেছে; যাহা কখন মানব অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাহাই তাঁহার আজি ঘটিতেছে; তাঁহার ভাগ্যগুণে মরা মানুষ আজি আবার দেখা দিয়াছে; তাই রমাপতি আজি উন্মাদ। তাই তিনি এতক্ষণ সুরবালার বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। এক্ষণে সহসা সেই মণিমাণিক্যালঙ্কারবিভূষিত কায়ার এই বেশ দেখিয়া বলিলেন,—

"একি সুরবালা, তোমার আজি এ ভিখারিণীর ন্যায় সাজ কেন?"

সুরবালা বলিলেন,—

"আমি যাঁহার দাসী তিনি আজি ভিখারিণী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার না পরাইলে তাঁহার দাসীর দেহে অলঙ্কার সাজিবে কেন?"

রমাপতি মনে মনে বলিলেন,—

"সুকুমারি, আমি হীন ও অধম বলিয়া যদি আমার প্রতি তোমার কৃপা না হয়, কিন্তু এই সুরবালার মায়া তুমি কেমন করিয়া কাটাইবে?"

গাড়ি ত্বরিত চলিয়া জেলখানার দ্বারে উপনীত হইলে রমাপতি বাবু তাহা হইতে সত্বর নামিয়া পড়িলেন। জেলর সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপাগত হইলে রমাপতি বাবু মেজিষ্ট্রেট সাহেব প্রদত্ত পরোয়ানা তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন;—

"পাঠ করুন।"

জেলর সাহেব আজ্ঞা পাঠ করিয়া বলিলেন,—

"এজন্য আপনার এত কষ্ট করিয়া না আসিলেও চলিত। এই পরোয়ানা পাঠাইয়া দিলেই আমি স্বয়ং অথবা উপযুক্ত লোক সঙ্গে দিয়া আসামীকে আজ্ঞামত স্থানে পাঠাইয়া দিতাম।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"তাহা আমি জানি; তথাপি যে কেন আসিয়াছি তাহা আপনি ক্রমশঃ

জানিতে পারিবেন। আমি একা আসি নাই। এই গাড়িতে আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাও আছেন। তাঁহারা সকলেই আসামীকে জেলখানা হইতে মুক্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিতে চাহেন। অন্য কোন লোকজন সেদিকে না থাকে। আমার স্ত্রী, দুইজন দাসী, আমি স্বয়ং আর আপনি থাকিলেই হইবে।"

জেলর বলিলেন,—

"যদি বলেন তাহা হইলে আমিও সঙ্গে না থাকিতে পারি।"

রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আপনি সঙ্গে থাকায় আমার বা আমার স্ত্রীর কোন আপত্তি নাই। আপনি এ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা বিশেষ আবশ্যক।"

জেলর বলিলেন,—

"তাহাই হউক। আমি সেদিক হইতে অন্য লোকজন সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসি।"

তিনি একজন ওয়ার্ডারকে ডাকিয়া শীঘ্র নির্দিষ্ট কামরার চাবি আনিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন এবং একজন কনষ্টবলকে ডাকিয়া সেদিকে যাহাতে কোন লোক না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন। উভয়েই সাহেবকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। কনষ্টবল তখনই ফিরিয়া আসিয়া আজ্ঞামত ব্যবস্থা করা হইয়াছে জানাইয়া গেল। কিন্তু ওয়ার্ডার এখনও ফিরিল না। রমাপতি নিতান্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করায় জেলর সাহেব স্বয়ং চাবির জন্য ধাবিত হইলেন, কিন্তু অবিলম্বে বিমর্ষবদনে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—

"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! চাবির ঘরে হুকে ঝুলান সারি সারি চাবি রহিয়াছে, ঐ নম্বরের চাবিটি নাই!"

রমাপতি বাবু চমকিয়া বলিলেন,—

"বলেন কি? চাবি নাই? কি হইল? নিশ্চয়ই ওয়ার্ডার কোন ভুল করিয়াছে—নিশ্চয়ই আর কোথায় চাবি রাখিয়াছে।"

জেলর বলিলেন ;—

"এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক; কারণ ওয়ার্ডার পঁচিশ বৎসর এই কর্ম্ম করিতেছে, কখন তাহার কোন ভুল দেখা যায় নাই।"

রমাপতি বলিলেন ;—

"কখন কোন ভুল হয় নাই বলিয়া কখন যে কোন ভুল হইবে না তাহা স্থির নহে। আপনি আবার দেখুন।"

জেলর আবার গমন করিলেন এবং ত্বরায় ফিরিয়া আসিয়া নিতান্ত হতাশ ভাবে বলিলেন,—

"কোন আশা নাই—নিশ্চয়ই চাবি চুরি গিয়াছে। চাবি চুরি যাউক, কিন্তু খবর লইলাম সে ঘর এখনও খোলা হয় নাই। দরজা এখনও চাবি-বন্ধই রহিয়াছে। অতএব চাবি ভাঙ্গিয়া আসামীকে এখনই বাহির করা যাইতে পারে।"

"তাহাই হউক। জেলখানার যে মিস্ত্রী আছে তাহাকে শীঘ্র ডাকিয়া লউন, সেও সঙ্গে থাকুক।"

সাহেব শীঘ্র মিস্ত্রীকে তালা ভাঙ্গিবার যন্ত্র লইয়া আসিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন রমাপতির মুখের ভাব উন্মাদের ন্যায়। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"সে সন্ন্যাসীর সংবাদ কি?"

"তাহার আর কি সংবাদ? সে বোধ হয় সেই গাছতলাতেই পড়িয়া আছে।"

"বোধ হয় বলিলে চলিবে না, আপনি শীঘ্র তাহার সংবাদ আনিতে লোক পাঠান।"

জেলর সাহেব একজন কনষ্টবলকে সন্ন্যাসীর সংবাদ আনিতে বলিলে সে বলিল,—

"এখনই আমি বাহির হইতে আসিতেছি, দেখিলাম সে গাছতলা ফাঁকা; সেখানে সন্ন্যাসীও নাই, লোকজনও কেহ নাই। সন্ন্যাসী কখন চলিয়া গিয়াছেন কেহ জানে না; বোধ হয় বেলা ১টা হইতেই তিনি অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। তিনি যে ফিরিয়া আসিবেন এমন বোধ হয় না। কারণ তিনি তাঁহার হাঁড়ি কুঁড়ি ও উনান ভাঙ্গিয়া গিয়াছেন।"

এদিকে দরজা ভাঙ্গিবার জন্য মিস্ত্রী আসিয়াছে দেখিয়া সাহেব বলিলেন,—

"মহাশয়, মিস্ত্রী উপস্থিত। চলুন তবে।"

রমাপতি বাবু হতাশ ভাবে বলিলেন,

"চলুন; কিন্তু দরজাই ভাঙ্গুন, আর যাই করুন, দেখিবেন ঘরে আসামী নাই।"

"সেকি মহাশয়? তাহা কি কখন হইতে পারে? আপনি সন্ন্যাসীকে এ সঙ্গে জড়াইতেছেন কেন? সন্ন্যাসীই হউক, ভোজবিদ্যাশালীই হউক, আর দেবতাই হউক, দিনমানে দ্বিপ্রহর কালে, চারিদিকে প্রহরীবেষ্টিত এই জেলের মাঝখান হইতে আসামী লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব। এ কি কথা! আপনি আসুন।"

রমাপতি বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস সহ বলিলেন,—

"চলুন।"

তিনি সুরবালার হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামাইলেন। ঝিয়া মাধুরী ও খোকাকে কোলে লইল। প্রথমে মিস্ত্রী, তাহার পশ্চাতে জেলর সাহেব, তাঁহার পশ্চাতে রমাপতি ও সুরবালা, তৎপশ্চাতে ঝিয়া এবং সর্ব্বশেষে দুই জন দ্বারবান সারি বাঁধিয়া জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠের নিকটস্থ হইয়া জেলর সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"দেখুন দেখি, ঘর যেমন তেমনই বন্ধ রহিয়াছে, ইহার মধ্য হইতে আসামী পলাইবে কোথায়? বাবু, আপনাদের দেশে পূর্ব্বে যেরূপ মন্ত্র তন্ত্র চলিত, এখন আর তাহা চলে না। আসামী তো মানুষ—এখান হইতে বাহির হওয়া দেবতারও সাধ্য নহে।"

রমাপতি সে কথায় কর্ণপাতও না করিয়া বলিলেন,—

"আপনাদের আসামী আর এ ঘরে নাই। হায়! কি ভুলই হইয়াছে! আমি যদি চলিয়া না যাইতাম! কিন্তু এখন উপায়? এখন আর উপায় নাই। ভাঙ্গ, মিস্ত্রী, দরজা ভাঙ্গ। সাহেবকে দেখাও তাঁহার বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। সেই সন্ন্যাসী—কোথায় তিনি? হায় হায়, আপনি কেন সেখানে পাহারা রাখেন নাই?"

অতি সহজেই মিস্ত্রী চাবি খুলিয়া ফেলিল। সাহেব দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে

দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু একি! ঘর যে ফাঁক! তখন তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি, সুরবালা ও ঝিরাও প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু হায়! যাহার সন্ধানের জন্য সকলের এত উদ্বেগ সে কোথায়? ঘরে তাহার চিহ্নও নাই! জেলর সাহেব অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বিপদের সীমা নাই। তিনি স্থির বুঝিলেন, অদ্যই তাঁহার চাকরীর শেষ দিন। রমাপতি তখন সংজ্ঞাশূন্য। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মাধুরী সভয়ে ডাকিল,—

"বাবা! বাবা!"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"চল সকলে।"

রমাপতি সুরবালার হাত ধরিয়া বেগে গাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। ঝি খোকাকে কোলে দিতে গেলে রমাপতি তাহাকে 'আঃ' বলিয়া তাড়া দিলেন। অবশেষে ঝি খোকাকে সুরবালার কোলে ফেলিয়া দিল। মাধুরীকে আর এক ঝি কোল হইতে নামাইয়া দিলে এক জন দ্বারবান তাহার হাত ধরিয়া সাবধানতার সহিত গাড়িতে উঠাইবার যত্ন করিতে লাগিল। মাধুরীর গাড়িতে উঠা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই রমাপতি বাবু কেন কোচম্যান দেরি করিতেছে বলিয়া এমন কদর্য্য গালি দিলেন যে, সে তাঁহার মুখ হইতে তেমন কটূক্তি আর কখন শুনে নাই। সে বলিল,—

"হুজুর, দিদি বাবু এখনও গাড়িতে উঠেন নাই।"

তখন রমাপতি বাবু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত এমন জোরে মাধুরীর হাত ধরিয়া গাড়িতে টানিয়া লইলেন যে বোধ হয় তাহার বড়ই আঘাত লাগিল। সে কিন্তু ভাব গতিক দেখিয়া কাঁদিতে সাহস করিল না। জেলর সাহেব বিনীত ভাবে রমাপতি বাবুকে সেলাম করিয়া বলিলেন,—

"আমি শীঘ্রই মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমাকে রক্ষা করিবেন। আমার বিপদের সীমা নাই।"

রমাপতি বাবু তাঁহার সম্মানের কোন প্রতিশোধও দিলেন না, তাঁহার বাক্যের কোন উত্তরও দিলেন না। তাঁহাতে তখন তিনি নাই।

সুরবালা এতক্ষণ মুখে অঞ্চল চাপিয়া ছিলেন। গাড়ি বেগে চলিতে

আরম্ভ হইলে তিনি মুখের কাপড় খুলিয়া দেখিলেন। রমাপতি দেখিলেন,—বহু রোদন হেতু সুরবালার চক্ষু রক্তবর্ণ, নয়নজলে তাঁহার মুখ ভাসিতেছে।

পিতার এই ভাব, মাতার এই অবস্থা দেখিয়া মাধুরী কিছু না বুঝিয়াও কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া খোকা বাবু সুর চড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালকবালিকার ক্রন্দনে পিতা মাতা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন রমাপতি দীর্ঘনিশ্বাস সহ বলিলেন,—

"সুরবালা, ঐ স্বর্গ, ঐ স্বর্গ ভিন্ন আমরা আর কোথাও হয় ত তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব না।"

বর্ষ-বর্ত্তন

আমি এসেছি আবার—
বাসনা—গাহিয়ে গান
সুরসে জুড়াতে প্রাণ,
শুনাতে নূতন সমাচার—
এসেছি আবার!

আমি এসেছি আবার—
তরুরে ছেয়েছি ফল মুকুলে
ধরণী ঢেকেছি শ্যাম দুকূলে,
লতায় ঘিরেছি দিয়ে
আশেপাশে কত ফুল-হার—
এসেছি আবার!

আমি এসেছি আবার—
জগতের জুড়াইতে প্রাণ
দিন কত গাওয়াইতে গান,
নন্দন বনের পাখি
যতনে এনেছি ডাকি,
জগতের প্রিয় পরিবার—
এসেছি আবার!

আমি এসেছি আবার—
কাছে ডেকে অলিদল
পাখায় দিয়েছি বল,
মলয় পবনে সুধা-সার—
এসেছি আবার!

আমি এসেছি আবার—
জগৎ এ সাধনার ঠাঁই
দুখ বিনা সুখ হেথা নাই,
তাই এ বিমল প্রাতে
যতনে এনেছি সাথে
সুখময় দুখ বিধাতার—
এসেছি আবার!

আমি এসেছি আবার—
আমি যে গাহিয়ে গান
হরসে জুড়াতে প্রাণ
অথবা শুনাতে হাহাকার—
এসেছি আবার!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সংবাদ

ঢাকায় ঝড় ঝড় হইয়া গিয়াছে। শুনা যাইতেছে ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি নানা স্থানে ঐরূপ ঝড় হইয়াছে। সংবাদপত্রে জানা যায়, ঝড়ের নাম না কি "Tornado"। এখন যেমন ইংরাজ-রাজ্যে নারাণ সেনের বেটি আন্না গাউন পরিয়া Miss Anna Sane হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনি আমাদের সাবেক ঘূর্ণী ঝড়গুলা কালমাহাত্ম্যে সাহেব হইয়া Tornado হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝড়টি ঢাকায় ও ভদ্রেশ্বরে পাশ্চাত্য চালেই চলিয়াছে—নবাব সুবোকেও রেয়াত করে নাই; যে পথে গিয়াছেন, সে পথে ধূলি গুঁড়ি কিছু রাখেন নাই; সব সমান করিয়া ফেলিয়া, "Equal justice to all" কাহাকে বলে, তাহা আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন। শুনিয়াছি সেকালে না কি পবনদেব, সুন্দরীদিগের অলক-কুন্তল দোলাইতেন, অথবা ভাগীরথী-নির্ঝর-শীকর উড়াইয়া লইয়া গিয়া দেবদারু পাতায় সাজাইতেন; একালে তিনি সাত শত যাত্রী সমেত জাহাজ ডুবান, প্রাচীন রাজধানী ভাঙ্গিয়া জলে ফেলিয়া দেন। অতএব পবনদেব পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে সভ্য হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; এবং আন্না বৈদ্যী যেমন Miss Anna Sane হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তিনিও তেমনি মলয়ানিল নাম ত্যাগ করিয়া Tornado বাহাদুর হইবার অধিকারী হইতে পারেন, তাহাও স্বীকার করিতেছি। তবে, আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, সেটা ভাল ছিল, না এটা ভাল হইয়াছে? John Lawrence জাহাজখানা চুরি করিয়া সুখ বেশি, কি কমলা বিমলা সুরবালার খোঁপার ফুলটি চুরি করার সুখ বেশি? ঢাকা সহরখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় সুখ বেশি, না নিশীথমার্গাভিসারিণী ভয়চকিতার গায়ের উপর বকুলপাতাটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় সুখ বেশি? উড়িষ্যার দেশের সাগর তরঙ্গ চালাইয়া সুখ বেশি, না সরোবরে পদ্মপত্রের উপর মুক্তার মত এক ফোঁটা জল চালাইয়া দেওয়ায় সুখ বেশি? বলিতে পারি না শ্রীযুক্ত Tornado মহাশয়ের সম্প্রদায় কি ভাবেন, কিন্তু আমাদের Voteখানা সেই এক ফোঁটা মুক্তা, আর সেই মেয়ের মাথায় ফুলের দিকেই রহিল।

নূতন সম্রাট্ তৃতীয় ফ্রেড্রিকের গলা আজিও সারে নাই। সাগ সম্রাট্—কাজেই ডাক্তারের হাতে পড়িয়াছেন; যখন ডাক্তারের হাতে পড়িয়াছেন, তখন তাঁহার রক্ষার কথা———জগদীশ্বরই জানেন। আমরা ইহা দেখিয়াছি যে, যে একজন ডাক্তারের হাতে পড়িয়াছে, সে অনেক সময়ে রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু যাঁহাকে ডাক্তারের পাল ঘেরিয়া বসিয়াছে, তিনি সম্রাট্ হইলেও তাঁহার রক্ষা নাই। ডাক্তারমণ্ডলী সম্রাট্‌কে করতলগত দেখিয়া কয় মাস ধরিয়া অনেক প্রকার লীলা প্রচার করিলেন। প্রথমতঃ নানা প্রকার যন্ত্র তন্ত্র বেচারার গলার ভিতর পুরিয়া দিয়া, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া গলাটা কাটিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তার, কাজেই ইঁহারা যে গুণানুরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন না, একদা Sir Morell Mackenzie—ইংরেজরূপে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী,—রাজার গলার ভিতর সাঁড়াশী চালাইয়া এক অমূল্য পদার্থ বাহির করিয়া ফেলিলেন। পাঠক এতক্ষণে অতিশয় কৌতূহলী হইয়াছেন সন্দেহ নাই—কেন না, ফ্রেড্রিককে আজ কাল মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিলেও হয়; তিনি জর্ম্মনির সম্রাট্, রাজরাজেশ্বরের পুত্র স্বয়ং মহাবীর পুরুষ, অষ্ট্রীয়ার দর্পচূর্ণকারী, নেপোলেয়ানের বিজেতা, সেডান-রূপ কুরুক্ষেত্রে একাই ভীমার্জ্জুন—তাঁর গলা হইতে না জানি কি বাহির হইল? বলিয়া দিতে পারি। বাহির হইল—একটু আচার! রাজা একটু আচার খাইয়াছিলেন—সবটা গিলিতে পারেন নাই—একটু গলায় বাধিয়াছিল। ডাক্তার Morell Mackenzie মহা সৌভাগ্যবান্ পুরুষ, তিনি সাঁড়াশীর মুখে সেই আচারটুকু টানিয়া বাহির করিলেন। তাহাতে জগতে একটু হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাজার শাশুড়ি কুইন্ বিক্টোরিয়া ডাক্তার মেকেঞ্জিকে Knight Commander of the Order of the Bath করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতেই এই বৃহদ্ব্যাপার ক্ষান্ত পাইল না। আচার্য্য Virchow—"First Microscopist in the World," সেই আচারের টুক্‌রাটুকু হস্তগত করিয়া Microscope করিতে আরম্ভ করিলেন। বিজ্ঞান মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার স্কন্ধে সর্ব্বদা বিদ্যমান, অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, যে রাজার গলার ব্যাপারটা "Non-cancerous"—রাজা বাঁচিবে।" হুলস্থূল পড়িয়া গেল—

বাঁচিবে। পৃথিবীর নগরে নগরে তারে খবর ছুটিল—রাজা বাঁচিবে। এই আনন্দোৎসবমধ্যে হঠাৎ এক দিন ফ্রেড্রিক মরে—নিশ্বাস বন্ধ। ডাক্তার মণ্ডলী অপ্রতিভ হইয়া আর কি করেন—ধরিয়া গরিবের গলাটা ফুটা করিয়া একটা চোঙ্গা বসাইয়া দিলেন—নিশ্বাস চলুক। নিশ্বাস চলিল, কিন্তু আবার প্রাণ যায়! চোঙ্গার ঘেঁষ লাগিয়া বুকের ভিতর আওরাইয়া পাকিয়া উঠিল—Pneumonia উপস্থিত। তখন ডাক্তারমণ্ডলী বলিলেন, রাজা নিশ্চিত মরিবে। দেশে দেশে, নগরে নগরে, তারে খবর গেল—রাজা নিশ্চিত মরিবে। কিন্তু আবার ত রাজা বাঁচিয়া উঠিতেছেন। বাঁচুন—কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি। ফ্রেড্রিকের তুল্য সর্ব্বগুণে গুণবান বোধ হয় পৃথিবীতে আজ কাল আর কেহ নাই। জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি বাঁচুন; কিন্তু ইহাও প্রার্থনা করি, তিনি ডাক্তারদিগের হাত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হউন—নহিলে তাঁহার রক্ষা নাই।

বিলাতের বিখ্যাত কবি, সমালোচক, দার্শনিক এবং সুলেখক ম্যাথিউ আর্ণল্ড সাহেবের মৃত্যুসংবাদে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি।

ইন্‌কম টাক্সের হাত এড়ান বড় সহজ কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষোন্নতি সম্বন্ধীয় কমিটি ও সভাসমিতি এ দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম।

রবার্ট টরনবুল সাহেব ত্রিশ বৎসর কাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সাধারণে ইঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট। ইঁহার সম্মানার্থ টাউন হলে ইহাঁর একখানি সুন্দর প্রতিকৃতি সংস্থাপন করা হইয়াছে। গত ১২ই বৈশাখ ছোট লাট বাহাদুর এই প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। তবে টরনবুল সাহেবের চেহারা স্মরণ হইলে মনে হয় আবরণ উন্মুক্ত না হইলেই ভাল হইত।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান সেক্রেটারি ডুরাণ্ড সাহেব ইন্দোর রাজসংসারের বিভ্রাট মিটাইয়া দিতেছেন। দুঃখের

বিষয় ইন্দোরের খ্যাতনামা সুদক্ষ মন্ত্রী রঘুনাথ রাও এই সময়ে পদত্যাগ করিলেন। পতনোন্মুখ অট্টালিকা হইতে ইঁদুরেরাও পলাইয়া যায়।

অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়েটি গবর্ণমেণ্ট খাসে কিনিয়া লইবেন। অংশীদারদের টাকা ফেলিয়া দিতে হইবে, তাই বিলাত হইতে ৭ লক্ষ পাউণ্ড কর্জ্জ করা স্থির হইয়া গিয়াছে। ইহাকেই বলে ধারে হাতি কেনা।

তিব্বতীদিগের সহিত ইংরাজের একটা মিটমাট করিবার জন্য ভুটানরাজ চেষ্টা পাইতেছিলেন। ইংরাজ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখিলেন না। তীব্বতীরা ক্ষুদ্রজীবী, ভুটানরাজও ক্ষুদ্রজীবী।

এখন না হয় ইংরাজ মগদিগের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি রাখিবার অবসর পাইতেছেন, কিন্তু কখন কি হয় বলা ত যায় না। অন্য দিকে ইংরাজকে ব্যস্ত দেখিলে মগেরা এখনকার মত নিরীহভাব না দেখাইতে পারে; সেই জন্য দূরদর্শী ইংরাজ উহাদের নিরস্ত্র করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। কমন্স্ হাউসে ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল। কেহ কেহ আপত্তি করিলেও সভা নিরস্ত্রীকরণের পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ বড় জঙ্গলা দেশ। মগেরা এখন কি প্রকারে বন্যপশু হইতে আত্মরক্ষা করিবে বলা যায় না। না পারুক, এখন দেশ সুশাসিত হইবে। পশুর দৌরাত্ম্য বাড়ুক, মানুষের দৌরাত্ম্য কমিবে।

সে দিন কিড্ ষ্ট্রীটে হঠাৎ একটা বাড়ী পড়িয়া যাওয়ায় জন কয়েক লোক মারা পড়িয়াছে। ইহাতেই পুলিস মাজিষ্ট্রেট মার্শডেন সাহেব ভীত হইয়াছেন, যে পুলিস আদালতের বাটীটাও বা কোন্ দিন হঠাৎ পড়িয়া যায়; কেন না বাটীটা অনেক দিনের পুরাতন। নূতন বাটী নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদনও হইয়াছে। আমাদিগের পরিচিত একটি প্রাচীন লোক ছিলেন, পাড়ায় কাহারও ওলাউঠা হইলে তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইত, যে তাঁহারও ওলাউঠা হইবে।

সম্প্রতি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, মফঃসলের জেল পরিদর্শন করিয়া কোন ভদ্রলোক যদি কোন কয়েদীকে মেয়াদের পূর্ব্বে খালাস দিবার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিতে পারেন।

গবর্ণমেণ্টের খরচপত্র বড়ই বাড়িয়াছে একথা সকলেই জানেন। ভারত-সীমার সুরক্ষণব্যবস্থা এই ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ভারতীয় রাজারা এ সম্বন্ধে সৈন্যে ও অর্থে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবার জন্য লালায়িত। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু এপর্য্যন্ত কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। এরূপ সাহায্য লওয়া যুক্তিযুক্ত কি না ইহা বিবেচনা করিতেছেন। এইরূপ সাহায্যের আদান প্রদানে না কি গূঢ় রাজনৈতিক তত্ত্ব নিহিত আছে। সম্প্রতি নিজামরাজ্যের প্রধান বিচারপতি নবাব বাহাদুর বিলাতে আছেন। সেণ্ট্রাল নিউস্ এজেন্সির তরফ কোন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"করদরাজারা সীমারক্ষার্থ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে চাহিতেছেন কি না, এবং গবর্ণমেণ্টের এরূপ দান গ্রহণ করা উচিত কি না?" নবাব বাহাদুর বলেন—"করদরাজারা খুব রাজভক্ত, করদরাজ্য সমূহে যে সব ইংরাজ-প্রতিনিধি থাকেন, তাঁহারা নিঃস্বার্থ এবং সুবিবেচক; করদরাজারা যে ইঁহাদের পরামর্শানুসারে চলিবেন ইহা অবশ্যম্ভাবী। ইঁহারা স্বেচ্ছায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে চাহিতেছেন না, এরূপ সন্দেহ করা রাজনীতি-বিরুদ্ধ। যাহা হউক, ভারত-গবর্ণমেণ্টের এ সকল দান গ্রহণ করা উচিত নহে।" নবাব বাহাদুর সুবুদ্ধি, প্রিয়ভাষী এবং রাজনীতিজ্ঞ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দিলে নিতে নাই কেন? ভিক্ষুক রাজা এবং বালক ইহারা কবে নিব না বলিয়াছে? দেওয়াটা সত্য ত?

সমালোচন

HINDU MUSIC—Part I. By Nanda Kumar Mukhopadhayaya. এই গ্রন্থখানি ইংরাজি ভাষায় লিখিত, ইহাতে একটিও বাঙ্গালা অক্ষর নাই—যে কিছু সংস্কৃত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। অতএব আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, যে বাবু নন্দকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা অক্ষর-পরিচয় আছে কি না। নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—কেন না, বাঙ্গলা অক্ষর-পরিচয় থাকিলে, তিনি বঙ্কিম বাবুর নিকট 'Editor of the Prachar' বলিয়া গ্রন্থ পাঠাইতেন না। প্রচার-সম্পাদকের নাম প্রচারের টাইটল পেজে প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকে।

যাঁহারা প্রচারে সমালোচনার জন্য কোনও গ্রন্থ পাঠাইবেন তাঁহাদের প্রতি প্রচার-সম্পাদকের বিনীত নিবেদন, যে তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থ প্রচার-সম্পাদকের নিকটেই পাঠাইবেন—বঙ্কিম বাবুর নিকট পাঠাইবেন না। বঙ্কিম বাবু প্রচারের সম্পাদক নহেন, মালিক নহেন অথবা তৎসহিত কোন প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট নহেন। অন্য লেখকের সঙ্গে প্রচারের যে সম্বন্ধ, তাঁহার সঙ্গেও সেইরূপ। বঙ্কিম বাবুর নিকট যে সকল পুস্তক প্রেরিত হইবে, প্রচারে তাহার সমালোচনা হইবে না।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি আমরা বঙ্কিম বাবুর নিকট পাইয়াছি। কিন্তু উপরি-লিখিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা উহার সমালোচনায় বিমুখ হইলাম। গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে উহা ফেরত লইতে পারেন। প্রঃ সঃ

একটী চিত্র। উপন্যাস—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহা একটি ছোট সামাজিক গল্প। গ্রন্থকার বাঙ্গালা লেখেন মন্দ নয়। গ্রন্থকারের একজন "বিজ্ঞ সমালোচক" এই উপন্যাস খানি দেখিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

অবসর বিকাশ। কবিতাবলি—প্রথম ভাগ—জনৈক হিন্দুমহিলা প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। গ্রন্থখানি স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, এবং স্ত্রীলোকের নিকট যেরূপ লেখা প্রত্যাশা করা যায়, ইহাতে তাহার বেশিও কিছু নাই। গ্রন্থের সকল স্থানে রুচিটা 'হিন্দু মহিলার' যোগ্য

হয় নাই, বোধ হইল। যাহা হউক, গ্রন্থকর্ত্রী আজকার দিনের কবিতার ঢেউয়ে পড়িয়া কবিত্বের-ভাব-মাখান আলো-আঁধারের অস্পষ্টতার আবরণে কবিতা আচ্ছন্ন করিতে শিখেন নাই। বিশেষ তিনি যে বিভীষিকাময়ী "অমুকী ঘোষ" বা "অমুকী বটব্যাল" রূপে নাম প্রকাশ করিবার লোভটুকু সংবরণ করিয়াছেন, ইহা পরম সন্তোষের বিষয়।

সচিত্র পকেট পঞ্জিকা। ১২৯৫ সাল—বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ডিঃ গুপ্ত এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং প্রকাশিত। আজ কাল লোকে মূল্য দিয়া যে সকল খ্যাতনাম্নিকা ক্ষুদ্র পঞ্জিকা ক্রয় করেন, মুদ্রাঙ্কণ এবং কাগজের দোষে, সে গুলির দ্বারা অনেক সময়ে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। আমরা এ পঞ্জিকার অক্ষরগুলি পড়িতে পারিয়াছি। যদিও ইহাতে গ্রহাদির স্ফুট গণনা, চন্দ্রতারার শুদ্ধ্যশুদ্ধি ইত্যাদি জ্যোতিষিগণের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নাই, তথাপি গৃহীর নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয় সমস্তই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দণ্ড পলের পরিবর্ত্তে ঘণ্টা মিনিট দিলে সাধারণের বুঝিবার সুবিধা হইত।

হিন্দু-ল। ময়মনসিংহ জজ্-কোর্টের উকিল শ্রীঅভয়চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৷০ সিকা। হিন্দুর দায়ক্রম ও স্ত্রীধনাদি সম্বন্ধীয় উপদেশপূর্ণ একখানি গ্রন্থের অভাব বঙ্গভাষায় আছে। অভয় বাবু সেই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। হাইকোর্টে এবং প্রিভি কাউন্সিলে নিষ্পত্তীকৃত হিন্দু আইন সংক্রান্ত অনেকগুলি মোকদ্দমার নজির এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে সকল উকিল মোক্তারদিগের ইংরাজি ভাষায় তাদৃশ অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই গ্রন্থ উপকারী হইবে, এবং সাধারণ হিন্দু গৃহীও ইহা হইতে সহজে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।

প্রচার

৪র্থ খণ্ড]　　　১২৯৫　　　[২য় সংখ্যা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুদ্ধস্ব ভারত ॥১৮॥

নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর। ১৮।

টীকা।

নিত্য, অর্থাৎ সর্ব্বদা এক রূপে স্থিত। (শ্রীধর)

অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য। প্রত্যক্ষাদির অতীত।

শ্রীধর এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—"নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ, অতএব অবিনাশী, ও অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে আত্মা, তাঁহার এই দেহ সুখদুঃখাদিধর্ম্মক, ইহা তত্ত্বদর্শিদিগের দ্বারা উক্ত; যখন আত্মার বিনাশ নাই, সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ নাই, তখন মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না।"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যার পর শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। তিনি বলেন—"ইহাতে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বিধান করা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও ইনি শোকমোহপ্রতিবদ্ধ হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে আছেন, ভগবান তাঁহার কর্ত্তব্যপ্রতিবন্ধের অপনয়ন করিতেছেন মাত্র। অতএব 'যুদ্ধ কর' ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নয়।"

অনেকের বিশ্বাস, যে এই গীতাগ্রন্থের স্থূল উদ্দেশ্য—যুদ্ধের ন্যায় নৃশংস ব্যাপারে মনুষ্যের প্রবৃত্তি দেওয়া। তাঁহারা যে গীতা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। গীতা, বাজারের উপন্যাস গ্রন্থ নহে যে একবার পড়িলা মাত্র উহার সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। বিশেষরূপে উহার আলোচনা না করিলে বুঝা যায় না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য—স্বধর্ম্ম-পালনের অপরিহার্য্যতা প্রতিপন্ন করা। স্বধর্ম্ম বলিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরেজি প্রতিশব্দ—Duty—শুনিলে বোধ হয় সে কষ্ট থাকিবে না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য—সেই Duty ধর্ম্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা প্রতিপন্ন করা। সকল মনুষ্যের স্বধর্ম্ম এক প্রকার নহে—কাহারও স্বধর্ম্ম দণ্ড-প্রণয়ন; কাহারও স্বধর্ম্ম ক্ষমা। শিপাহির স্বধর্ম্ম শত্রুকে আঘাত করা, ডাক্তারের স্বধর্ম্ম সেই আঘাতের চিকিৎসা। মনুষ্যের যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তত প্রকার স্বধর্ম্ম আছে। কিন্তু সকল প্রকার স্বধর্ম্ম মধ্যে যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার। যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে যুদ্ধ কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এমন অবস্থা ঘটে, যে এই নৃশংস কার্য্য অপরিহার্য্য ও অবশ্যসম্পাদ্য হইয়া উঠে। তৈমুরলঙ্গ বা নাদের দেশ দগ্ধ ও লুণ্ঠিত করিতে আসিতেছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে জানে, যুদ্ধ তাহারই অপরিহার্য্য ও অবশ্যসম্পাদ্য স্বধর্ম্ম। অতএব গীতাকার স্বধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে ইংরেজি দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে Crucial instance বলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা এবং তদুপলক্ষে সমস্ত ধর্ম্মেরও নিগূঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত করিতেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, যে স্বধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ ও যাহাতে সাধুজন মাত্রই স্বতঃ অপ্রবৃত্ত, তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে—যুদ্ধের মধ্যে যে যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ, যাহাতে স্বভাবতঃ নৃশংস ব্যক্তিও সহজে প্রবৃত্ত হইতে

চাহে না, তাহাই উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। Crucial instance বটে। গীতার উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপাদন করা যে স্বধর্ম্ম এরূপ নৃশংস, ভয়াবহ এবং সাধুজন প্রবৃত্তির আপাতবিরোধী হইলেও তাহা অবশ্য পালনীয়।

কিন্তু শ্লোকটার ভাবার্থ, বোধ করি, এখনও পরিষ্কার হয় নাই। 'আত্মা অবিনাশী—কেহ তাহার বিনাশ করিতে পারে না—অতএব যুদ্ধ কর,' এই কথার অর্থ কি? আত্মা অবিনাশী বলিয়া কাহাকে হত্যা করায় কি দোষ নাই? ভগবদ্বাক্যের সে তাৎপর্য্য নহে। ইহার তাৎপর্য্য উপরিধৃত শঙ্করভাষ্যে যাহা কথিত হইয়াছে, তাই। অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত,তবে মোহে অভিভূত হইয়া, মানুষ মারিতে হইবে এই দুঃখে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন। ভগবান্ বুঝাইতেছেন যে দুঃখ করিবার কারণ কিছুই নাই—কেন না কেহই মরিবে না। শরীর নষ্ট হইবে বটে, কিন্তু শরীর ত অনিত্য, অর্জ্জুন যুদ্ধ না করিলেও একদিন অবশ্য নষ্ট হইবে। কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে মানুষ মরে না—যাহার শরীর, সে অমর—কেহই তাহাকে মারিতে পারে না। অতএব যুদ্ধের প্রতি অর্জ্জুন যে আপত্তি উপস্থিত করিতেছেন, সেটা ভ্রমজনিত মাত্র। অতএব তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

যে ইহাকে হন্তা বলিয়া জানে এবং যে ইহাকে হত বলিয়া জানে, ইহারা উভয়েই অনভিজ্ঞ। ইনি হত্যা করেন না—হতও হয়েন না। ১৯।

প্রাচীন টীকাকারেরা, এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; যথা—ভীষ্মাদির মৃত্যুনিমিত্ত অর্জ্জুনের শোক, উক্ত বাক্যে নিবারিত হইল। এক্ষণে "আমি ইহাদের বধের কর্ত্তা" এই নিমিত্ত যে দুঃখ প্রথম অধ্যায়ের ৩৪।৩৫ ইত্যাদি শ্লোকে অর্জ্জুনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তরে ভগবান বুঝাইতেছেন, যে আত্মা যেমন কাহারও কর্ত্তৃক হত হয়েন না, তেমনি তিনি কাহাকেও হত্যা করেন না। কেন না, আত্মা অবিক্রিয়।

শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে সেইরূপ বলিতেছি। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকেরও সেইরূপ

অর্থ করিব। অন্য অর্থ হয় কি না তাহাও বলা যাইবে। টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥

ইনি জন্মেন না, বা মরেন না, কখন হয়েন নাই, বর্ত্তমান নাই, বা হইবেন না। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ; শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না।২০।

টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহার ষড়্‌ভাববিকারশূন্যত্বের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করা হইতেছে। ইনি জন্মশূন্য—এই কথার দ্বারা জন্ম প্রতিষিদ্ধ হইল; মরেন না—ইহাতে বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হইল। ইনি কখন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্য বর্ত্তমান নাই। যাহা জন্মে, তাহাকেই বর্ত্তমান বলা যায়; কিন্তু ইনি পূর্ব্ব হইতে স্বতঃ সদ্রূপে আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া যে বিদ্যমানতা তাহা ইহার নাই। এবং সেইজন্য ইনি আবার জন্মিবেন না। সেইজন্য ইনি, অজ, অর্থাৎ জন্মশূন্য, ইনি নিত্য, অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ; শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষয়শূন্য, পুরাণ অর্থাৎ বিপরিণামশূন্য।

এক্ষণে পাঠক, এই দুইটি শ্লোক প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন, যে আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই। অস্পষ্টতঃ "নায়ং হন্তি" এই কথাটা আছে, কিন্তু ইহার অন্য অর্থ না হইতে পারে, এমনও নহে। যদি কেহ মরে না, তবে আত্মাও কাহাকে মারে না।

আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহা প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের একটি মত। তত্ত্বটা কি, তাহা পাঠককে বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। আবশ্যক বোধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমরা গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্তু এই দুইটি শ্লোক গীতার নহে। শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদের। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেটি ১৯শ শ্লোক, তাহা

কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক; আর গীতার ঐ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদের ঐ বল্লীর ১৮শ শ্লোক। গীতার শ্লোক ও কঠোপনিষদের শ্লোক পাশাপাশি লেখা যাইতেছে।

গীতা।	কঠোপনিষদ্।
য এনং বেত্তি হন্তারং	হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং
যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।	হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো	উভৌ তৌ ন বিজানীতো
নায়ং হন্তি ন হন্যতে। ২।১৯	নায়ং হন্তি ন হন্যতে। ২।১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-	ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।	ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো	অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ২।২০	ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। ২।১৮

শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদ্ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে—গীতা হইতে কঠোপনিষদে নীত হয় নাই। এ কথা লইয়া বোধ করি বেশি বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিব, উপনিষদ্ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে। অন্ততঃ প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের এই মত। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"শোকমোহাদি সংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তকমিত্যেতৎ পার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচাবানিনায়।" এবং আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—"হন্তাচেন্মন্যতে হন্তুং ইত্যাদ্যামৃচমর্থতো দর্শয়িত্বা ব্যাচষ্টে য এনমিতি।"

এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

প্রথম, আত্মা যদি কর্ত্তা নহে, তবে কর্ম্মযোগ জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহা বলা বাহুল্য। কর্ম্মযোগের কথা যখন পড়িবে, পাঠক তখন এ বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একটা দার্শনিক মত। প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী। ধর্ম্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্ত্বটি সপ্রমাণ করিয়া কোম্‌ৎ ও

তৎশিষ্যগণ দর্শন ও ধর্ম্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়া উচিত।

দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ মত—আত্মাই কর্ত্তা। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শত পৃষ্ঠা ধরিয়া বচন উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। আমরা কেবল দুইটি কথা তুলিব। একটি উপনিষদ্ হইতে, আর একটি পুরাণ হইতে।

> আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
> নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
> স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। ১
> স ইমাল্লোঁকান্ সৃজত অম্ভো মরীচীর্ম্মরমিত্যাদি
>
> ঋগ্বেদীয়ৈতরেয়োপনিষৎ।

আত্মাই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই কর্ত্তা।

দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিতেছি। উহা কঠোপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে তুলনা করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করা কি যন্ত্রণা—

> কঃ কেন হন্যতে জন্তুর্জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে।
> হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসৎসাধু সমাচরন্।
>
> বিষ্ণুপুরাণ ১।১৮।২৯

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কং ॥২১॥

যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ কাহাকে মারে? কাহাকেই বা হনন করায়? ২১॥

ভাবার্থ—যে জানে যে দেহ নাশ হইলেই শরীরের বিনাশ হইল না, সে যদি কাহারও দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উচিত নহে, যে সে "আমি ইহার বিনাশের কারণ হইলাম" বলিয়া দুঃখিত হয়। কেন না আত্মা অবিনাশী। শরীরের বিনাশে তাহার বিনাশ হইল না।

তবে যদি বল যে "ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীরের ত বিনাশ আছেই। শরীর নাশেরই বা আমি কেন কারণ হই?" তাহার উত্তর, পরশ্লোকে কথিত হইতেছে——

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র* গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা, পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সংগত হয়।২২।

অর্থাৎ, যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ ছিঁড়িয়া দিক্ বা না দিক্, তোমাকে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যোদ্ধৃগণ অবশ্য দেহত্যাগ করিবে, তোমার যুদ্ধবিরতিতে তাহাদের দেহনাশ নিবারণ হইবে না। তবে কেন যুদ্ধ করিবে না?

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকার্য্য করিতে হইবে বলিয়া শোক-মোহপ্রযুক্ত ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযুজ্য। নচেৎ আত্মা অবিনশ্বর এবং দেহমাত্র নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে, যে কেহ কাহাকে খুন করিলে তাহাতে দোষ নাই। খুন করিলে দোষ আছে কি না আছে—সে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সম্বন্ধই নাই—থাকিতেও পারে না। এখানে বিবেচ্য ধর্ম্মযুদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে কি না? উত্তর—কারণ নাই, কেন না আত্মা অবিনশ্বর, আর দেহ নশ্বর। দেহী কেবল নূতন কাপড় পরিবে মাত্র—তাহাতে কাঁদাকাটার কথাটা কি?

* "It was if my soul were thinking separately from the body; she looked upon the *body as a foreign substance, as we look upon a garment.*" *Wilhelm Meister*, Carlyle's *Translation*. Book VI.

যে কয়টা কথা ইটালিক অক্ষরে লিখিলাম, পাঠক তৎপ্রতি অনুধাবন করিবেন, গীতার কথাটা বেশ বুঝা যাইবে।

ব্রহ্ম নিরূপণ।—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্যক্তিগণ নানা চিত্তবৃত্তির বশীভূত, কিন্তু সকলেরই স্বধর্ম্ম এই যে, কোন কোন চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করিলে তাহারা পরস্পরের হনন কার্য্যে রত হয়, এবং কোন কোন স্থলে পরস্পরের মৃত্যু নিবারণ ও কষ্ট নিবারণ করিতে ব্যগ্র হয়। কাম-ক্রোধাদি রিপু সকলেরই আছে, কিন্তু মনুষ্য সমাজে নানা উপায় দ্বারা তাহার প্রতিবিধানও হইয়া থাকে। এক রিপু চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা বৃদ্ধি হইলে অন্য রিপু অগত্যা হীনবল হইয়া পড়ে। আবার জগতে ধর্ম্মশিক্ষা এবং পাপপুণ্যের বিচারও অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল উপায় দ্বারা পাপের প্রবলতা খর্ব্ব হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, রিপু সকল অবাধে চরিতার্থ করিতে পারিলেও একপ্রকার বৈষম্য উদয় হইবেই হইবে। উদ্দিষ্ট কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ হইবে, এবং সেই বিরোধসূত্রে পরস্পরের বৈর-নির্যাতন, এমন কি মৃত্যুসাধন পর্য্যন্ত হইবে। কেবল পরস্পরের অবরোধ দ্বারাই অনেকের রিপুশাসন ও মৃত্যুনিবারণ হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন আর এক সূত্রে পরস্পরের মৃত্যু এবং কষ্ট নিবারিত হয়। মনুষ্যগণকে কেবল রিপুর বশীভূত মনে করিলে অযথা উক্তি হইবে। যেমন কাম-ক্রোধাদি কয়েকটি রিপু আমাদিগের মৃত্যু বা অহিত সাধন করে, সেইরূপ সখ্যপ্রেম, দাস্যপ্রেম ও বাৎসল্যপ্রেম ইত্যাদি যে তিনটী প্রেম আছে তাহাও মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ বটে, এবং তাহার আধিক্য হেতু, বরং অপেক্ষাকৃত প্রকৃষ্টভাবে উল্লিখিত লোকক্ষয় নিবারিত হয়।

মনুষ্যপরম্পরা প্রেমের অনুরোধে এবং রিপুজনিত বিরোধ নিবারণার্থে অনেকগুলি কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, এবং অনেকগুলি কার্য্য হইতে ক্ষান্তও থাকে। কেবল পরস্পরের সম্বন্ধ হেতুই যে এইরূপ করিয়া থাকে, তাহাও নহে। কেবল বৈরনির্যাতনের ভয়ে, আনুকূল্যের আশয়ে, বা স্তবস্তুতির প্রলোভেই যে মনোগত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে এমন নহে। উদাসীন

অবস্থা হেতু কিম্বা বর্ব্বর বলিয়া অন্যের অনধীন হইলেও সকল সময়ে কেহ এক রিপুর বশীভূত থাকিতে পারে না, এবং সকল সময়ে প্রেমবিহীন হইয়া থাকাও মনুষ্যপ্রকৃতির পক্ষে অসম্ভাবিত। যেমন প্রতি ব্যক্তিকেই বিভিন্ন রিপু চরিতার্থ করিবার আশায় কোন কোন রিপু দমন করিতে হয়;—যথা ক্রোধের সময়ে লোভ উপস্থিত হইলে অন্যতর কামনা পরিত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ আবার সময়ান্তে প্রেমেরও উদয় হইয়া থাকে। প্রেমের উদয় হইলে রিপু মাত্রই ঘৃণিত হইয়া পড়ে।

প্রেম, বিরোধ উৎপাদন করে না। দাস্য উদয় হইলে সখ্য ও বাৎসল্যের হানি হয় না। সখ্য কি বাৎসল্য উদয় হইলেও দাস্য প্রেম নির্ব্বিঘ্ন থাকে। আবার ব্যক্তিবিশেষের চিত্তমধ্যেও যেমন এই রূপ সমন্বয় হয়, ব্যক্তিপরম্পরা মধ্যেও সেইরূপ সামঞ্জস্য ঘটিয়া থাকে। এক জন অন্যের দাস্য করিলে শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে অবাধে বাৎসল্য করিয়া থাকেন। এক জন অকৃত্রিম বাৎসল্যের অনুগামী হইলে তাঁহার বাৎসল্যের পাত্র স্বভাবতঃ দাস্য স্বীকার করে। আর সখ্যপ্রেমে, দাস্য-বাৎসল্যে ভেদ থাকে না; সখার আজ্ঞাবহন অথবা সেবাগ্রহণ কিছুতেই চিত্তবিকার হয় না।

সুতরাং নানা প্রকারে রিপুর প্রবলতা সত্বেও প্রেমের প্রাধান্য অবধারিত হইয়া যায়। ইহা মানবপ্রকৃতির স্বধর্ম্ম; রিপুতে রিপুতে বিরোধ হয়, কিন্তু প্রেমে প্রেমে বিরোধ ঘটে না। রিপু বলবৎ হইলে প্রেম থাকে না, কিন্তু প্রেম উদয় হইলে রিপুগণসম্বন্ধে আর এক মর্ম্ম ব্যক্ত হয়। কাম ক্রোধ লোভ দ্বারা জীবের জীবন ও বংশ রক্ষা এবং পরস্পরের হানি নিবারণও হইয়া থাকে বটে। প্রেম সহকারে মনে হয় যে মোহাচ্ছন্ন পাপিষ্ঠেরা স্ব স্ব রিপুর বশবর্ত্তী হইয়াও জগতের আত্মরক্ষা সাধন করিতেছে। সুতরাং ধার্ম্মিক ব্যক্তি অন্যের পাপকে লঘু জ্ঞান করিয়া থাকেন। আর তাহার মনেও ঐ প্রকার জগৎ রক্ষার চেষ্টা চৈতন্য উদয় হয় এবং সেই সঙ্গে আবার অবিমৃষ্টচিত্তে রিপুদমনের উদ্যম হইতে থাকে। মানুষে মানুষে বিরোধ করিয়া পরস্পরের রিপুদমন করে, কিন্তু প্রেম উদয় হইলে সেই রিপুদমন কার্য্যই আবার স্বেচ্ছানুগত হইয়া উঠে। অতএব চিত্তবৃত্তি মধ্যে প্রেমই সর্ব্বমঙ্গলের আলয়, এবং চিত্তবৃত্তি বিষয়ে যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে

এক অপূর্ব্ব শৃঙ্খলাও দৃষ্ট হইতেছে বটে। তাহা হইতেই প্রেমের প্রাধান্য ব্যক্ত হয়। এই শৃঙ্খলার সাক্ষাৎ ফলাফল জীবন ও মৃত্যুতে ব্যক্ত হইয়া থাকে। চিত্তবৃত্তির সুশৃঙ্খলা হেতু জীবনের উৎকর্ষ ও মৃত্যুর অবরোধ সাধন হয়। চিত্তবৃত্তির বিশৃঙ্খলা হইলে যেমন পাপের আতিশয্য হয় সেইরূপ আবার যমদণ্ডেরও প্রাদুর্ভাব ঘটে। মৃত্যু কিসে হয়, তাহার অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু মৃত্যু নিবারণ করিবার চেষ্টা অতীব প্রয়োজনবিশিষ্ট। এতদ্ব্যতীত কষ্ট নিবারণ হইতে পারে না। আর কষ্ট ও মৃত্যু নিবারণের নিমিত্তে চিত্তবৃত্তির ব্যবস্থা না করিলেও চলে না। তাহাতেই প্রাগুক্ত চিত্তবৃত্তির শৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়। এই ব্যবস্থা মনুষ্যগণ ব্যষ্টিভাবেও করে। আর সমষ্টিভাবে কেবল এই ব্যবস্থারই পারিপাট্য পরিবর্দ্ধিত হয়।

আমি মৃত্যুর গূঢ়তর হেতু বিচার করিতে সাহস করিলাম না। কিন্তু একটি কথা সকলেরই কিঞ্চিৎ পরিমাণে মনে হইতে পারে। মনুষ্যগণ স্ব স্ব চিত্তবৃত্তির বিরোধবশতঃ এবং পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হেতু যেমন কালগ্রাসে পতিত হয়, ভূতপরম্পরার মধ্যেও তদনুরূপ বিরোধ আছে, এবং সেই হেতুই আমাদিগের নানা প্রকার রোগ তাপ ঘটিয়া থাকে। পশু ও নর, পরস্পরের হন্তা; শীত গ্রীষ্ম মনুষ্যকে তাপিত করে এবং মনুষ্যও নানা কৌশল দ্বারা শীত গ্রীষ্ম নিবারণ করেন। ভূতপরম্পরার সমদর্শিতা দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু তাহাদিগের বিরোধ প্রত্যক্ষ বিষয় বটে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কিরূপ কার্য্য দ্বারা জীবনের কতদূর ক্ষতি, ক্লেশ ও ক্ষয় হয়, তাহার অভিজ্ঞতা একেবারে জন্মে না। সকলেই মুহুর্মুহু সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে, এবং যাহা এক ব্যক্তির আয়ত্ত হয় না, তাহা অন্যের দৃষ্টান্তে শিক্ষা করা যায়। যাহা এক পুরুষে সুসিদ্ধ হয় না, তাহা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত অভিজ্ঞতা কখনই সকলের মনে সমান দৃষ্ট হয় না, এবং এইরূপ জ্ঞানের তারতম্য যে কত কাল চলিবে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু পাপ-পুণ্যের বিচার এই অভিজ্ঞতাজনিত বলিয়া অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতে পারে। জনসমাজে পাপ-পুণ্যের বিধান যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সর্ব্বাগ্রে পাপ-পুণ্যের কোন প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐকান্তিক প্রেমসহকারে

তদনুযায়ী বিধান এবং সেই বিধানানুযায়ী উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উপদেশ শুনিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না; পাপ-পুণ্যের বিধান মানিলেই তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতা জন্মে না। সুতরাং আমরা মোহপরবশ হইয়া পদে পদে পূর্ব্বতন বিধান লঙ্ঘন করিয়া থাকি। কিন্তু বিধিভঙ্গ হেতু আবার পদে পদে যন্ত্রণা ও মৃত্যু আসিয়া আশ্রয় করে; অনন্তর কালস্রোতে ভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার পরিবর্দ্ধন হয়। এই রূপে, জগতে যে নানা প্রকার যমদণ্ড সহ্য করিতে হয়,—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাঁহা হইতে কেবল সেই পাপপুণ্যবিষয়ক মূলীভূত বিধানেরই অনুধ্যান করিতে হয়। কাম-ক্রোধের অধীন হইলে যত প্রকার মনঃপীড়া ও সমাজদণ্ড ভোগ করা যায়, তাহার সমষ্টি ধ্যান করিলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেবল কাল ও কালব্যাপী মৃত্যুর ভয়ানক মূর্ত্তিই নরজাতির অন্তরিন্দ্রিয় মধ্যে পরিদৃশ্যমান হয়। সুতরাং যেমন চিত্তবৃত্তি মধ্যে প্রেমের মাহাত্ম্য, সেইরূপ বিশ্বব্যাপারে মৃত্যুই কালব্যাপী অভিজ্ঞতার নিয়ন্তা।

মৃত্যু হইতে পাপ-পুণ্যের বিচার হয়, এ কথা বুঝিবার পরে আর একবার পাপ-পুণ্যের নিগূঢ় বিধানটি লক্ষ্য করা আবশ্যক। প্রেমই পুণ্যের উপাদান, এবং সেই প্রেম সহকারে মনুষ্যপরম্পরা মধ্যে যে পুণ্যভাব উদয় হয়, তাহারই নামান্তর সমদর্শিতা। কেন না প্রেম হইতেই সর্ব্বপ্রকার চিত্তবৃত্তির সুশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়। মনুষ্যগণ, সমান শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া প্রেম করে। কেহ দাস্য, কেহ সখ্য এবং কেহ বা বাৎসল্য প্রেম, সহকারে পরস্পরের হিত সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রেমস্থলে সর্ব্বত্রই অন্যের হিতকামনা প্রবল হয়। রিপু পরিতোষ করণার্থে অন্যের রিপু, অন্যের প্রেম সকলই বিরুদ্ধ জ্ঞান হয়; এমন কি আপনি কখন্ কি প্রকারে কোন্ রিপু পরিতৃপ্ত করিব, তাহাও মনে থাকে না। কিন্তু প্রেম উদয় হইলে আপনার, রিপু স্বভাবতঃ শান্তভাব প্রাপ্ত হয় এবং অন্যের রিপুজনিত মোহের প্রতিও ক্ষমার উদ্রেক হয়। সকলেই যেমন রিপুর অধীন, সেইরূপ সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে অন্যের মঙ্গলপ্রয়াসীও বটে। কিন্তু সকলের প্রতি সমদর্শী ভাবের উদ্দীপন করিতে হইলে, চিত্তবৃত্তি মধ্যে অনন্যরূপে প্রেমের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ মনুষ্যপরম্পরার মধ্যে সমদর্শিতা হেতু প্রতি ব্যক্তির

প্রেম ঐকান্তিকতা লাভ করে। এবং প্রেমই আবার অন্যান্য সকল বৃত্তির অন্ত বলিয়া প্রতীত হয়। কেবল তাহা নহে। পরিশেষে সেই ঐকান্তিক প্রেম সকলের প্রতি সমদর্শী হইলে. এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। সেই আনন্দই ব্রহ্মানন্দ জ্ঞানের আদর্শ।

আমরা নরযোনি ভিন্ন অন্য যোনির ধর্ম্ম বুঝিতে পারি না; নরযোনির ধর্ম্মানুযায়ী প্রেম সহকারে পশুপক্ষিগণের প্রতি দয়া করিতে পারি এবং সেই দয়া হেতু অনেক স্থলে পশুপক্ষিগণও আমাদের প্রতি মমতা করিয়া থাকে। ইহাতে আমাদিগের চিত্তে অন্য যোনির প্রতি সমদর্শিতা হইল বলিতে ভরসা হয় না। কিন্তু কেবল মনুষ্যপরম্পরা মধ্যে সমদর্শিতা ও প্রেম লক্ষ্য করিলে অন্ততঃ আংশিক মাত্রাতে সর্ব্বভূতব্যাপী ব্রহ্মের সমদর্শিতা অনুমান করিতে পারা যায়। ভূতপরম্পরার বিরোধ অতি প্রবল বটে, কিন্তু ভূতসমষ্টির পক্ষে সেই বিরোধ গণনীয় নহে। নর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা গুল্মাদি সকলেই পরস্পরের ক্ষয়সাধন করিতেছে। অগ্নি জল বায়ু বসুন্ধরাও তাহাতে বিরত নহে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতু কেবল সাময়িক লক্ষণ নহে, সকলেই মহাকালের অঙ্গ। কিন্তু তথাচ মানিতে হইবে যে এই বিরোধ ভূতপর্য্যায়ের ব্যষ্টিভাবের লক্ষণ মাত্র, সমষ্টিভাবে এই সকল বিরোধ এবং লোকক্ষয় গণনীয় হইতে পারে না। কেন না, এই সকল ক্ষয়ের সমষ্টি করিলেও সর্ব্বভূতের বিনাশ নাই।

ব্রহ্মাণ্ডে হয় ক্ষয় প্রবল, নতুবা বৃদ্ধিই প্রধান। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে বৃদ্ধিই একমাত্র গণনীয় লক্ষণ। ক্ষয়, ক্ষণিক; বৃদ্ধি স্থায়ী। সর্ব্বভূতের অস্তিত্ব ভুলিলে চলিবে না। সেই অস্তিত্ব কখনই নাস্তিত্বের সহিত একত্রিত হইতে পারে না। অতএব জগতে যে ক্ষয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের সর্ব্বস্বসূচক ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। সেই ব্রহ্মের লক্ষণে সমদর্শিতাই প্রধান অঙ্গ, এবং তাঁহার অমরতা আর এক অব্যর্থ কথা। সেই সমদর্শিতা এবং সেই অমরতার দ্বারাই আমাদিগের প্রস্তাবিত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সপ্রমাণিত হইতেছে। সেই সমদর্শিতা হেতু তিনি নির্গুণ আনন্দস্বরূপ। এবং তাঁহার অমরতা হেতু জগতের পাপ, পুণ্যাপেক্ষা গৌণ বিষয় হইতেছে। ভূতপরম্পরার সমষ্টিভাবে ব্রহ্মের সেই অমরতাই প্রবল হয়, সুতরাং পাপপুণ্যের ভেদ থাকে না; আর ব্যষ্টিভাবে

কাল করাল বদন বিস্তার করে—যমদণ্ডের দ্বারা পাপের অবসান ও পুণ্যের বর্দ্ধন হয়। সমষ্টিভাবে সমস্তই মঙ্গল; অমঙ্গল কেবল ব্যষ্টিভাবেই লক্ষিত হয়। কিন্তু অমঙ্গলের অভিজ্ঞতা ব্যতীত মঙ্গলের পরিচয় লাভ হয় না। আর ব্রহ্মস্বরূপকে লক্ষ্য করিলে, সেই অমঙ্গল নির্ব্বাপিত হইতেছে বুঝা যায়। ব্রহ্মের আনন্দ কাল ও ব্যোমের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না, কেন না তাঁহার ক্ষয় নাই। কিন্তু সেই আনন্দ তাঁহার সমষ্টিভাবেরই অঙ্গ। অতএব সমষ্টিসম্বন্ধে ভূতপরম্পরার ব্যষ্টিভাব এবং সেই ব্যষ্টির স্বধর্ম্মানুসারে পুণ্যরূপ মঙ্গল ও অমৃত অনুধ্যান করা যায়। ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলাতে এই সমস্ত কথাই বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্ম নিরূপণার্থে * ব্রহ্ম সর্ব্বভূতব্যাপী, এবং আনন্দস্বরূপ এ কথা বুঝা গেল। এখন তাঁহাকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু যেমন সমষ্টি ব্যষ্টি ব্যতীত ব্রহ্মের আনন্দ এবং মনুষ্যের পাপপুণ্য প্রতিপন্ন হয় না, সেইরূপ চিন্ময় ব্রহ্মকে বুঝিবার জন্য, অগ্রে বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের ত্রিকাল-বিস্তৃত সত্তা বুঝা আবশ্যক। ব্রহ্মের সত্তা এক প্রকার স্বীকার করিয়াই আনন্দময় সর্ব্বব্যাপী বস্তুর আলোচনা করা গিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইলে, কেবল আমাদিগের জ্ঞানের আধার স্বরূপ সত্তা বুঝিলেই হইবে না। তাঁহার সত্তার অভাব দূরে থাকুক, সেই অভাব মনে করিবারও পথ নাই। মনুষ্যবুদ্ধির স্বধর্ম্মই এইরূপ। তাঁহার যে সত্তা স্বীকার করিয়া এতক্ষণ বিচার করিয়াছি সেই সত্তার ক্ষয় নাই, এই কথাই এখন বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তদনন্তর সেই ব্রহ্ম যে চিন্ময়, তাহাও উপলব্ধ হইবে।

---

* 'ব্রহ্ম সর্ব্বভূতব্যাপী' ইহা হস্তলিপির অন্য পরিচ্ছেদে বিচার করা গিয়াছে।

আনন্দ উচ্ছ্বাস

(সিন্ধুতীর বাসিনী জননীর মুখে)

১

রহ রহ সিন্ধো ! নিবার বারেক
নব নিদাঘের গর্জ্জনভীষণ !
দেও সরাইয়া দেও একবার,
নব নীরদের ঘন আবরণ !

২

নিবার বারেক তরঙ্গ হুঙ্কার,
শুনিব বাছার যশের গান ;
মধুরে সুদূর অনীলে বহিয়া
জুড়াইছে আহা ! দুখিনী-প্রাণ !
বারেক সরাও, মেঘ আবরণ,
সরাও উত্তাল তরঙ্গ দল !
দূর নভঃ পটে, দেখি তার মুখ,
কালীদহে যেন প্রফুল্ল কমল !

৩

আয় মা ! আয় মা ! কাঙ্গালিনী আমি,
দেখি মা ! বারেক নয়ন ভরিয়া
আলো করি মম স্নেহ সরোবর,
প্রফুল্ল কুমুদ থাক মা ! ফুটিয়া !

৪

যেই জ্ঞানালোকে হৃদয় রে তোর
বিভাসিত, তাহা নহে রবিকর ;
বৈশাখী জ্যোৎস্না, শান্ত সুশীতল,
নারী হৃদয়ের পূর্ণিমাসুন্দর !

স্নেহ মকরন্দ ; স্নেহ পরিমল ;
স্নেহ সুশীতল কুসুম-শ্বাস ;
দলে দলে স্নেহ, অধরে নয়নে ;—
স্নেহের ত্রিদিব ললাট আকাশ

৬

মূর্ত্তিমতী যেন স্নেহের সঙ্গীত !
স্নেহ লতা ওই কোমল দেহ
হৃদয় নির্ম্মল স্নেহের নির্ঝর ;
হাসি সুমধুর তরল-স্নেহ।

৭

জ্ঞানের মুকুট শিরে সমুজ্জ্বল,
হাসে প্রতিবিম্ব নীলাম্বুবুকে।
মা আমার "বীণা-পুস্তক-ধারিণী,"
বিরাজে শিতাজে সস্মিতমুখে।

৮

হউক তোমার করের পুস্তক
বিশ্ব-প্রেম কাব্য অমৃত ধাম !
গাইয়া যে কাব্য সীতা ও সাবিত্রী
এখনও জুড়ায় জগৎ প্রাণ।

৯

করস্থিত বীণা হউক তোমার
বিশ্বহৃদয়ের যন্ত্র একতান ;
বাজাইয়া তাহে আনন্দ সঙ্গীত
জুড়াও তাপিত জগৎ প্রাণ !

১০

এইরূপে মাগো! বীণাপাণিমত
বিরাজিয়া সুখে সুখশতদলে,
জগতের প্রাণে, মিশাইয়া প্রাণ,
রমণীর ব্রত পাল মা! ভূতলে!

১১

জ্ঞানের আলোকে দ্রবিয়া হৃদয়
হও স্নেহ গঙ্গা সন্তাপ হারিণী!
শিলাপূর্ণ এই সংসার মরুতে
যাও মা! বহিয়া যেন মন্দাকিনী!

১২

শীতলি তাপিতে, উদ্ধারি পতিতে,
মৃত্যু মুখে করি অমৃত দান,
শোকে দিয়া শান্তি, বিপদে সান্ত্বনা;
আঁধারে আলোক, অজ্ঞানে জ্ঞান।
হাসি পর সুখে, কাঁদি পর দুঃখে,
সাধিয়া রমণী জীবন নিষ্কাম,
দেখিবে, হায়! মা! কে তুমি, কে আমি;—
অনন্তরূপেতে এক ভগবান!

১৩

কবি কহে "দিদি! কবিতাকুসুমে
"গাঁথি জয়মালা দিনু উপহার;
"হৃদয়ের প্রীতি মাখিয়া তাহাতে,—
"দিদিরে! গলার পর একবার।
"আয় দিদি। আয় আকাশের পানে,
"চাহিয়া চাহিয়া উদাসীন প্রাণ,
"বীণা বাজাইয়া, গায়ে আর বার
"শুনি প্রাণ ভরি সেই হরিনাম!"

নবীন

ভারতের দারিদ্র্য

ইংরাজের রাজত্বে ভারতের চতুর্দ্দিকে সুখ এবং শান্তি বিরাজমান। লোকের ধন প্রাণ নিরাপদ, উচ্চশিক্ষার, স্রোত প্রবল বেগে বহিতেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে দেশ উদ্ভাসিত। ডাক, রেল, টেলিগ্রাফে দেশের কতই না উপকার করিয়াছে। কিন্তু কথাটা হইতেছে, পঁচিশ কোটি ভারতবাসির মধ্যে কয় জন এ সুখের ভাগী ?

রাজা ইংরাজ বলিতেছেন—তাঁহাদের রাজত্বে সবাই সুখী। কিন্তু প্রজারা সকলে সে কথা বলে না। ইংরাজের শাসনপ্রণালীতে সকলকেই সন্তুষ্ট দেখা যায়। কিন্তু দেশের দারিদ্র্য দিন দিন বড়ই বাড়িতেছে। প্রজাসাধারণের সাংসারিক কষ্ট নিত্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। দুর্ভিক্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা খুব ঘন ঘন হইতেছে। পরিশ্রমের মূল্য কমিয়াছে। দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। রাজকর কতই হইতেছে, এবং এতন্নিবন্ধন রাশি রাশি লোক অনশনে এবং অর্দ্ধাশনে মরিতেছে। ইংরাজের সুশাসনে বড় মানুষেরা বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছেন, মধ্যবিত্তেরাও কতক পরিমাণে সুখী, কিন্তু ইতর সাধারণের অবস্থা ক্রমেই হীন হইতে হীনতর হইতেছে। প্রাচীনদের মুখে শুনা যায়, সেকালে সকল কৃষকেরই প্রায় দুই তিনটি গোলা, পাঁচ সাতটি গোরু এবং দুই দশ বিঘা জমি থাকিত। এখন তাহার কিছুই নাই। হয় ত জমিদার মহাশয় খাজনার আইনের সুব্যবস্থার সাহায্যে প্রজার জোত টুকু বেচিয়া লইয়াছেন।

প্রজাদের এই দারিদ্র্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে কি না এবং ইহার প্রতিকারই বা কি রূপে হইতে পারে, তাহাই নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমে দেখা যাউক, ভারতের লোক প্রতি আয় এবং ব্যয় কত। আয় ব্যয়ের তারতম্য দেখিয়া দারিদ্র্যের পরিমাণ উপলব্ধি হইবে।

প্রদেশ	হাসিল জমির পরিমাণ বিঘা	হাসিল জমির উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য	লোকসংখ্যা	জন প্রতি উৎপন্ন দ্রব্যের গড়
মধ্য প্রদেশ	৩৭১৩৮৬৫৫	১৬০০০০০০০৲	৯০০০০০০	১৮৲
পঞ্জাব	২৮৪৪১১১৪	২৮০০০০০০০৲	১৭৫০০০০০	২৩৲
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	৬৮০০০০০০	৪০০০০০০০০৲	৩০০০০০০০	১৪৲
বাঙ্গালা	১৬২০০০০০০	৯৫০০০০০০০৲	৬৭০০০০০০	১৪৲
মান্দ্রাজ	৪৯০০০০০০	৪৬০০০০০০০৲	৩৬৫০০০০০	১৪৲
বোম্বাই	...	৪০০০০০০০০	১১০০০০০০	৩৬৲
অযোধ্যা	২৩৯৭৩৩২০	১৩০০০০০০০৲	৯৫০০০০০	১৪৲
	৩১৬৫৪৮৮৭৯	২৭৭০০০০০০০৲	১৭০৫০০০০০	১৬২৲

অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাক না হইলে ভারতবর্ষের শস্য পরিমাণ এইরূপ। উপরি উক্ত হিসাবে গোচারণ ভূমি, খড় ইত্যাদি সামগ্রী ধরা হয় নাই। কিন্তু পালিত পশুগণ কেবল মাত্র খড় ও ঘাস খায় এমন নহে। ছোলা, মাস কলাই, সরিষা প্রভৃতি দ্রব্যও খাইয়া থাকে। সুতরাং সে সকল বাদ দিলে জন প্রতি গড় আরও কমিয়া যায়। উক্ত তালিকায় প্রদত্ত ২৭৭০০০০০০০৲ টাকার দ্রব্যজাতের মধ্যে শতকরা ছয় টাকা হিসাবে পর বৎসরের বীজাদির জন্য বাদ দিয়া ধরিলে ২৬০০০০০০০০৲ টাকার জিনিস মানব জীবন ধারণের নিমিত্ত ভারতবর্ষে ব্যয়িত হয়। উপরি উক্ত তালিকাটি গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত হিসাব হইতে আমাদের সংগৃহীত। অপর লোকে গণনা করিলে ইহা অপেক্ষা আরও ন্যূন হয় কি না বলা যায় না।

গবর্ণমেণ্টের হিসাব অনুসারে লবণ, অহিফেন, কয়লা এবং রপ্তানির লাভ —সর্ব্বসমেত বাৎসরিক ১৭০০০০০০০৲ টাকা। বাৎসরিক শিল্পজাতের মূল্য স্থির জানিবার ভাল উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট বলেন, পঞ্জাবের শিল্পজাতের মূল্য ৩৭৭৪০০০০৲ টাকা। পঞ্জাবে সাল, রেসম, পশম প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যবান্ শিল্পজাত প্রস্তুত হয়। সেরূপ ভারতের অন্য কোথাও হয় না। ঐ ৩৭৭৪০০০০ টাকা হইতে শিল্পজাতের মূল্য(যাহা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের ভিতর ধরা হইয়াছে) বাদ দিলে পঞ্জাব প্রদেশের পরিশ্রমের মূল্য উচ্চ সংখ্যায় ২০০০০০০০৲ টাকা হয়। এখন পরিশ্রমের মূল্য অধিবাসির সংখ্যার উপর নির্ভর করে। সমস্ত ব্রিটিশ ভারতের লোক সংখ্যা পঞ্জাবের দশ গুণ। অতএব সমস্ত ব্রিটিশ ভারতের

শিল্পজাত পরিশ্রমের মূল্য পঞ্জাবের দশগুণ ধরিলে অধিক বই অল্প হইবে না। এই হিসাবে ব্রিটিশ ভারতের পরিশ্রমের মূল্য ১৭০০০০০০০৲ টাকা। দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি দ্রব্যের হিসাব সংগ্রহ করিবার কোনও উপায় নাই! এই সমস্ত ও অন্যান্য খুচরা দ্রব্যের মূল্য ১৫০০০০৲ টাকা ধরিয়া লওয়া যাউক। অজ্ঞাত বিষয়ের জন্য আরও ৩০০০০০০০৲ টাকা ধরা যাউক। এখন একুনে ১৭০০০০০০০ লোকের আয় ৩৪০০০০০০০০৲ টাকা হইল। অর্থাৎ হিসাবে জন প্রতি ২০ টাকা পড়িল। ভূমিজাত ও শিল্পজাত প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার আয় উক্ত ৩৪০০০০০০০০৲ টাকার ভিতর ধরিলে প্রত্যেক প্রদেশে গড় পড়তা লোক প্রতি এইরূপ আয় হয়।

মধ্যপ্রদেশ	২১৷০
পঞ্জাব	২৪৸০
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ	১৭৸০
বাঙ্গালা	১৮৸০
মাদ্রাজ	১৭৸০
বোম্বাই	৩৯৸০
অযোধ্যা	১৭৸০

এই ত গেল ব্যক্তিপ্রতি আয়ের হিসাব। এখন ব্যক্তিপ্রতি ব্যয়ের হিসাবটা দেখা যাউক। খরচ সম্বন্ধে আমরা কেবল মনুষ্যের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একান্তপক্ষে যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহাই ধরিব।

১৮৭০ সালে গবর্ণমেন্টের নিয়োজিত কুলিদিগের স্বাস্থ্যপরিরক্ষক সাহেব (Government Medical Inspector of Emigrants) কুলিদিগের বেকার অবস্থায় শুদ্ধ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য আবশ্যক বলিয়াছেন :—

প্রত্যেক অন্নাহারীর জন্য			প্রত্যেক গমভোজীর জন্য		
চাউল ...	পোয়া	২½	ময়দা ...	পোয়া	১¾
ডাইল ...	”	½	ডাইল ...	”	½
মাংস ...	”	¼	মাংস ...	”	¼
তরকারি ...	”	½	তরকারি ...	”	½
ঘি ...	”	⅛	ঘি ...	”	⅛
সরিষা তৈল ...	”	⅛	সরিষা তৈল ...	”	⅛
লবণ ...	”	⅛	লবণ ...	”	⅛
		৪½			৩¾

এতদ্ব্যতিরেকে মসলা, পান, সুপারি, তামাক, কাঠ, ইত্যাদি আছে। ডাক্তার সাহেবের মতে ঐ তালিকার দত্ত দ্রব্যের অপেক্ষা কম খাইলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং বর্দ্ধন স্থগিত হয়। ঐ সকল দ্রব্য মাঝামাঝি রকমের খুব কম দরে কিনিতে পাইলেও প্রতি মাসে এক জন লোকের এই রূপ ব্যয় হয় :—

চাউল	...	...	...	২॥০
ডাইল	...	...	...	।/০
মাছ মাংস	...	...	...	।৶১০
তরকারি	...	...	...	।৵৫
ঘি	...	...	...	।৶০
তেল	...	...	...	।০
নুন	...	...	...	/১০
মসলা	...	...	...	।০
কাঠ	...	...	...	।০
				৫।৶৫

এমতে এক জন লোকের বাৎসরিক খাই খরচ ৬৮।৶০ হইতেছে।

তার পর বিছানা কাপড় এবং গৃহনির্ম্মাণাদি আছে। এ সম্বন্ধেও সেই কুলিদের ডাক্তারের মত লওয়া যাউক। তাঁহার মতে এক জন লোকের নিম্নলিখিত বস্ত্রাদি অপরিহার্য্য :—

ধুতি (এক বৎসরে ৪ খান)	৩।৵
জুতা (১ জোড়া)	৸০
পাকড়ি বা টুপি (৩ বৎসরে ১ টার হিসাবে)	১৲
জামা (১টা)	১৲
কম্বল (২ খান)	২৲
গামছা	৶০
ছাতি (৪ বৎসরে ১টার হিসাবে)	।০
	৮।৶০

কুটির নির্ম্মাণ (পরিশ্রম বিশেষ)	২০৲
কুটিরের জীর্ণসংস্কার	৪৲
পোড়াইবার তৈল	৩৲
মাদির	২৲
গৃহসামগ্রী (পাত্র ভাণ্ড প্রভৃতি)	১৲
	৩০৲

প্রতি পরিবারে ১০ জন লোক ধরিলে, জন প্রতি গৃহনির্ম্মাণাদিতে ৩৲ টাকার বেশি পড়ে। খাই খরচ ৬৮৸৴০, কাপড় ৮৸৴০ টাকা, গৃহ নির্ম্মাণাদি ৩৲ টাকা। এমতে প্রতি ব্যক্তির বাৎসরিক ব্যয় ৭৯৴০।

গত সেন্সস্ রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শতকরা ১২॥০ সাড়ে বার জনের বয়স ১২ বৎসরের কম; ইহার জন্য এবং দ্রব্যাদির মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ধরিয়া আমরা ঐ টাকার এক চতুর্থাংশ বাদ রাখিয়া লোক প্রতি ব্যয়ের নিম্নলিখিত রূপ হিসাব ধরিলাম। খাওয়া ৪৭৲ টাকা, পরা ৬৲ টাকা, গৃহ ৩৲ টাকা—একুন ৫৬৲ টাকা। এই হিসাবমতে দেখা যায় যে প্রত্যেক ভারতবাসীর আয় উচ্চকল্পে ২০৲ কুড়ি টাকা এবং ব্যয় ন্যূন কল্পে ৫৬৲ টাকা।

আর একটা হিসাব ধরিয়া আয় ব্যয়ের তারতম্য বুঝা যাউক।

	প্রত্যেক ব্যক্তির আয়	কয়েদিদের খাওয়া পরার ব্যয়ের ভাগ অংশ
মধ্যপ্রদেশ	টা. ২০ [illegible]	২৩
পঞ্জাব	২৮ [illegible]	২০
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ	১৭ [illegible]	১৬
মাদ্রাজ	১৮ [illegible]	৪১
বাঙ্গালা	১৮ [illegible]	২৩
বোম্বাই	৩৯ [illegible]	৩৫

অতএব দেখা গেল যে, কয়েদিদের ন্যায় নিকৃষ্ট অন্নবস্ত্র পাইবারও আয় আমাদের নাই। সুজন্মার বৎসরেই এই রূপ, অজন্মা০ হইলে যাহা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। তার পর, কয়েদিদের ঘর তৈয়ার করিতে হয় না, সামাজিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোনরূপ অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উৎসবাদির জন্য কোনরূপ ব্যয় বা দুর্দ্দিনের জন্য কোনরূপ সংস্থান ইহাদের করিতে হয় না। আয়ের যে গড় ধরা গেল, তাহাও সকলে সমান পায় না। অধিকাংশই কয়েকজন মাত্র ধনীর হাতেই থাকে। গবর্ণমেণ্টপ্রদত্ত তালিকা হইতেই হিসাব সংগ্রহ করিয়া আমরা দেখাইলাম যে অধিকাংশ ভারতবাসীই, কুলি ও কয়েদিদের অপেক্ষা হীনদশাপন্ন। এ হিসাবে গবর্ণমেণ্টের অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

আমরা বোধ করি এই ভীষণ দারিদ্র্যের কারণ প্রধানতঃ এই কয়টি :— (১) স্বর্ণের অনুপাতে রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস, (২) আমদানির অপেক্ষা রপ্তানির আধিক্য, (৩) ভারতের শিল্পকর্ম্মের অবনতি, (৪) সাংসারিক সকল বিষয়েই ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের প্রতিযোগিতা, (৫) গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদ গুলি বিদেশীয়দিগের হস্তগত হওয়া, (৬) গবর্ণমেণ্টের ব্যয়াধিক্য, (৭) বিলাতি গবর্ণমেণ্টের সামরিক সাহায্য দান, (৮) ষ্টেট সেক্রেটারির ভারতীয় কোষা-গার হইতে বাৎসরিক প্রাপ্য টাকার আধিক্য, (৯) রাজকরের দৈনন্দিন বৃদ্ধি, (১০) মোকদ্দমার এবং আদালতের ব্যয়ের আধিক্য, (১১) ভিক্ষা—ব্যবসায়ী ও ফকির সন্ন্যাসী প্রভৃতির সমাজে প্রতিপালন প্রথা, (১২) অযথা দান ও একান্নপুষ্ট পরিবার-প্রথার অপব্যবহার, (১৩) খোলা ভাঁটী, (১৪) সুদ-খোর মহাজনের দৌরাত্ম্য, (১৫) কোম্পানির কাগজ ক্রয় (১৬) গবর্ণমেণ্টের তাঁবেদারদিগের দ্বারা চাঁদা সংগ্রহ।

আমরা যথাক্রমে এই সমস্ত বিষয় গুলিরই কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব এবং যথাসাধ্য সেই কারণের প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিব।

সে

সে দিঠি—তরল জোছনায়
 এলাইয়া পড়ে দেহ আলসে।
হৃদয়ের মেঘ-থরে-থরে
 সুখের লহরী কত ঝলসে!

সে শ্বাস—মলয়-সমীরণে
 কি মদির অধীরতা বরষে!
কল্পনার বনে-উপবনে
 কত ফুল ফোটে ঝরে, হরষে!

সে হাসি—বিমল উষালোকে
কি নব-চেতনা জাগে পরাণে।
স্বপনের ম্লান ঝোঁপে ঝাঁপে
কত পাখী গেয়ে ওঠে, কে জানে!

সে কথা—যৌবনে ভরা নদী,
উছলি চলিছে প্রেম-গরবে।
কামনার কূল-উপকূল
র'সে র'সে ভেসে যায় নীরবে!

সে পরশ—বিদ্যুৎ-চমকে
এ ধরা-জনম লয় ছিনিয়া।
কোটি জন্ম এ জন্মে মিশায়ে,
কোটি ধরা এ ধরায় আনিয়া!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

শান্তি

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চৌরঙ্গির সেই প্রকাণ্ড ভবনের একতম বৈঠকখানায় রমাপতি বাবু নিতান্ত কাতরভাবে অধোমুখে এক শয্যায় পড়িয়া আছেন। প্রকোষ্ঠ নানাবিধ সুরম্য বহুমূল্য শোভনসামগ্রী সমূহে পূর্ণ। গৃহমধ্যস্থ টানা পাখা বাহির হইতে একজন ভৃত্য ধীরে ধীরে টানিতেছে। নিতান্ত আবশ্যক উপস্থিত না হইলে কোন লোকজন নিকটে না আইসে ইহাই রমাপতি বাবুর বিশেষ আদেশ ছিল। এজন্ত তাঁহার নিকটে তখন একটাও লোক নাই। কিন্তু তাঁহার প্রকোষ্ঠের বাহিরে দুই জন ভৃত্য উৎকর্ণভাবে তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

আর এক সুন্দরী পার্শ্বের এক প্রকোষ্ঠে যবনিকার অন্তরালে রুদ্ধ নিশ্বাসে উপবিষ্টা। সেই সুন্দরী সুরবালা। কোথায় মাধুরী কোথায় বা খোকাবাবু তাহা সুরবালার মনেও নাই। যে ব্যক্তির সুখের জন্য তাঁহার জীবন, তাঁহার চরণের নখাগ্র হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত সকলই তন্ময়। সুতরাং সেই ভাবনা ব্যতীত সে দেহ ও সে মনে অন্য ভাবনার আর স্থান নাই। সুরবালার অঙ্গ আভরণশূন্য; কেশরাশি অবেণীসংবদ্ধ ও ধূসরিত; পরিচ্ছদ মলিন ও পারিপাট্যপরিশূন্য; দেহ শীর্ণ ও কাতর; লোচনদ্বয় বিষণ্ণ ও রক্তাভ এবং বদনমণ্ডল অবসন্ন ও শঙ্কাকুল। সুরবালার আহার নাই, নিদ্রা নাই, সাংসারিক কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ নাই। যে দেবতার পদাশ্রয় সুরবালার একমাত্র অবলম্বন তাঁহার চিন্তা ভিন্ন সুরবালার অন্তরে অন্য কোন চিন্তার অবকাশ নাই।

সেই দিন নিরাশায় আশা প্রতিষ্ঠা করিয়া হতাশ হওয়ার পর, সেই দিন বিগত অতুল্যনিধি করতলগত হইয়া হস্তভ্রষ্ট হওয়ার পর, সংক্ষেপতঃ সেই দিন কারাগারে সজীব সুকুমারীকে সন্দর্শন করিয়াও তল্লাভে বঞ্চিত হওয়ার পর হইতে রমাপতি নিতান্ত বিকলিতচিত্ত হইয়াছেন। সুকুমারী হারা হইয়াও তিনি যাহা যাহা লইয়া অধুনা সুখ সন্তোষময় সংসার সংগঠন করিয়াছেন তাহার কোন পদার্থেরই অভাব ঘটে নাই তো! সেই সুন্দরীশিরোমণি পুণ্যময়ী সুরবালা তাঁহার অবিশ্রান্ত সহচরী; সেই প্রেম-পুত্তলি সারল্য-প্রতিমা মাধুরী ও খোকার মধুর কণ্ঠস্বরে তাঁহার গৃহ দ্বার পরিপূরিত; সেই প্রয়োজনাতিরিক্ত দাসদাসী নিয়ত তাঁহার সেবা ও আদেশ পালনে নিযুক্ত; সেই অতুল সম্পত্তিরাশি ও সুখসংসাধক সামগ্রীসমূহ তাঁহার পদানত, তথাপি রমাপতি কাতর ও মর্ম্মাহত। অপ্রাপ্য পদার্থের প্রাপ্তিসম্ভাবনা বড়ই উন্মাদকারী। এবার রমাপতির হৃদয়ে বড়ই কঠিন আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহার প্রাণ মন নিতান্ত উদাস হইয়াছে, সুখ সন্তোষে তাঁহার আর স্পৃহা নাই, তিনি অনন্যমনে নিরন্তর হৃদয়গত নবীভূত যাতনার সেবায় নিযুক্ত আছেন। কেহ তাহার সম্মুখে আইসে না, কর্ম্মচারিগণ বিষয় কর্ম্মের কোন সংবাদ তাঁহার গোচর করিতে পায় না, কোন বিষয়েই তিনি আদেশ ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন না। প্রেমময়ী সুরবালার তিনি কোন সংবাদ লন না, হৃদয়ানন্দ-

প্রদ সন্তানের বার্ত্তা তাঁহার মনে নাই; তিনি কদাচিৎ সামান্ত মাত্র আহার করেন; নিদ্রা প্রায় তাঁহার নিকটস্থ হয় না; তিনি উন্মাদের ন্যায় বিকলিত চিত্ত। সুরবালা নিকটে আসিলে তিনি বিরক্ত হন; মাধুরী ও খোকা তাঁহাকে দেখিলে ভয় পায়।

কি করিলে স্বামীর এই দুরন্ত মনস্তাপ নিবারিত হইবে, কি উপায়ে রমাপতি বাবু আবার প্রকৃতিস্থ হইবেন সুরবালা নিরন্তর সেই চিন্তায় নিমগ্না। এ ব্যাধির যে ঔষধ, এ ঘোর মানসিক অবসাদের যাহা একমাত্র প্রতিষেধক তাহা তাঁহার অবিজ্ঞাত নাই। কিন্তু সে সুকুমারীকে কোথায় পাওয়া যাইবে? কে সে সন্ধান বলিয়া দিবে? যদি আত্মজীবনের বিনিময়ে, যদি সর্ব্বস্ব সম্প্রদান করিলেও সুকুমারীকে পুনরায় পাওয়া যাইতে পারে, সুরবালা এখনই তাহাতে সম্মত। কিন্তু সে আশা ক্রমেই ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হইতেছে। পুলিস সুকুমারীর সন্ধানের জন্য প্রাণপাত করিতেছে, সুরবালাও বহু অর্থ ব্যয়ে ও নানাবিধ উপায়ে সন্ধানের কোন ত্রুটি করেন নাই। কেবল আশাভঙ্গজনিত ক্লেশের বৃদ্ধিই হইতেছে।

কিন্তু কারাগারে রমাপতি বাবু যে ভৈরবীকে দর্শন করিয়াছিলেন তিনিই যে সুকুমারী এ কথা কে বলিল? তাঁহাকে আর কেহ দেখেন নাই, আর কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, তিনি যে কে তাহা স্থির করিবার রমাপতি বাবু ভিন্ন অন্য উপায় নাই। জেলখানায় কালীর পরিবর্ত্তে অন্য এক স্ত্রীলোক আসিয়াছে এ কথা অনেকেই জানেন এবং সে স্ত্রীলোককে বহুলোকেই দেখিয়াছে। কিন্তু রমাপতি বাবু কারাগারে যে ভৈরবী দর্শন করিয়াছেন তাহার বৃত্তান্ত আর কেহই জানে না। জেলর বা মেজিষ্ট্রেট্, ওয়ার্ডার বা পাহারাওয়ালা, ডাক্তার বা অন্য কেহই জেলখানায় কোন ভৈরবী দেখেন নাই—একজন নিরাভরণা গৃহস্থসুন্দরী মাত্র সকলেই দেখিয়াছেন। কেবল রমাপতি বাবুই ভৈরবী দেখিয়াছেন এবং ভৈরবীকে তিনি সুকুমারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হইতে পারে রমাপতি বাবুর সম্পূর্ণ ভ্রম ঘটিয়াছে। হইতে পারে সেই সুন্দরীর সহিত কিঞ্চিৎ মাত্র আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া রমাপতি উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার সবিশেষ বিচার ও আলোচনার শক্তি তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। সুকুমারীর মৃত্যুসম্বন্ধে কোনই

সন্দেহের কারণ নাই। তিনি সন্তরণে অক্ষম ছিলেন। ঘোর ক্লান্ত ও শ্রান্ত অবস্থায় রমাপতি বাবুর সমক্ষেই তিনি অগাধ জলে নিমজ্জিত হইয়াছেন। সেরূপ অবস্থা হইতে তাঁহার জীবন লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। এ কথা অন্যেও যেমন বুঝেন রমাপতি বাবুও তেমনিই বুঝেন; তবে দৈবাৎ এক ভৈরবী দেখিয়া তিনি সুকুমারীভ্রমে এতাদৃশ উন্মত্ত হইলেন কেন? বিশেষতঃ যদিই সুকুমারী কোন অলৌকিক উপায়ে জীবন লাভ করিয়াছেন স্বীকার করা যায়, তথাপি তিনি এরূপ কাণ্ডের মধ্যে কি প্রকারে লিপ্ত হইয়া এতাদৃশ অসমসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন তাহার কোন সঙ্গত মীমাংসা স্থির করা যায় না। সুকুমারীর পূর্ব্বপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ ব্যাপার তাঁহার পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার ন্যায় লজ্জাশীলা, কোমলস্বভাবা, সঙ্কুচিতা নারীর পক্ষে এতাদৃশ কঠোর ও লোমহর্ষণ কাণ্ডের নায়িকারূপে অবতীর্ণ হইয়া দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দকে ভয়ে চমকিত এবং বিস্ময়ে পরিপ্লুত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। যুক্তি ও তর্ক পথানুসরণ করিলে রমাপতি বাবুর সুকুমারী সন্দর্শন যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক কথা তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ থাকে না; কিন্তু সে কথা অন্যে বুঝিলে তিনি বুঝেন কই? আর তিনি যদি তাহা না বুঝিলেন তাহা হইলে ফল কি হইল? সেই ভৈরবী যে সুকুমারী তৎপক্ষে রমাপতি বাবুর কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। ন্যায় ও তর্কশাস্ত্রের সমস্ত ব্যবস্থাই তাঁহার প্রতিকূলে মস্তক উত্তোলন করিলেও তিনি কোনদিকে দৃকপাৎ বা কিছুতেই কর্ণপাত করিবেন না। অতএব তাঁহাকে বুঝাইবে কে?

এখন উপায় কি? তাহা সুরবালা নিরন্তর চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না। তবে কি ধীরে ধীরে চিন্তাচর্ব্বিত রমাপতির প্রাণান্ত হইবে? এরূপ দুঃসহযন্ত্রণা আর কিছুকাল থাকিলে মানবপ্রাণ অবশ্যই অপগত হইবে। তাহাই কি রমাপতির অবস্থার শেষ পরিণাম? যখন যাতনা খর্ব্বীকৃত করিবার কোনই পন্থা নাই, তখন ধীর ভাবে অবশ্যম্ভাবী চরমকালের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করা ভিন্ন আর কি ব্যবস্থা আছে?

সারল্যপ্রতিমা সুরবালা এ সকল কথাই বিরলে বসিয়া বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন যখন রমাপতি বাবুর জীবন

রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় নাই, তখন অতঃপর আত্মজীবন রাখিবার আর কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সেই নিদারুণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনামাত্র স্মরণ ও মনন করিলে যখন হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহার আগমন দর্শন করিবার জন্য অপেক্ষা করিবে কে? সুরবালা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন কি? আত্ম-হত্যা দ্বারা জীবন বিধ্বংসিত করা ভিন্ন সুরবালার বাসনাসিদ্ধির উপায়ান্তর নাই। তিনি তাহাতেই কৃতসংকল্প। আত্ম-হত্যা মহা পাপ, এ জ্ঞান তাঁহার এক্ষণে নাই; আত্ম-হত্যা পরম সুখের সোপান বলিয়া তাঁহার এক্ষণে ধারণা হইয়াছে।

বহুক্ষণ যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া ধীরে ধীরে সুরবালা তাহা অপসারিত করিলেন এবং ধীরে ধীরে রমাপতি বাবুর গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে রমাপতির শয্যা-প্রান্তে উপবেশন করিলেন। রমাপতি তাঁহার আগমন বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু কোনই কথা কহিলেন না—একবার ঘাড়টী তুলিয়া ফিরিয়াও চাহিলেন না। সুরবালা বহুক্ষণ সেই স্থানে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন,

"আমি তোমাকে কোন প্রকার প্রবোধ দিয়া বিরক্ত করিতে আসি নাই। দুইটা কথা বলিব মনে করিয়াছি, শুনিবে কি?"

রমাপতি একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—

"সুকুমারী নাই, আমার ভ্রম হইয়াছে, এরূপ কাণ্ড সম্পূর্ণ অসম্ভব, এ সকল কথা তোমার মুখে দশ হাজার বার শুনিয়াছি; তাহাই কোন রূপান্তর করিয়া এখন আবার বলিবে বোধ হয়। আমি সেরূপ কথা কর্ণে ঠাঁই দিব না জান, তথাপি এ প্রকারে আমাকে কষ্ট দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতা।"

সুরবালা নিতান্ত বিনীতভাবে বলিলেন,—

"তোমার মনের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে তোমার সহিত এ সময়ে কোন কথা কহিয়া তোমাকে ত্যক্ত করাই নিষ্ঠুরতা। কিন্তু আমি তোমাকে দিদির সম্বন্ধে আজ কোন কথাই বলিব না। আজি আমি তোমাকে নিজের দুইটা কথা বলিব, কৃপা করিয়া যদি শুন।"

রমাপতি বলিলেন,—"তোমার নিজের কথা! তোমার এমন কি

কথা আছে, যে এখনি না শুনিলে চলিবে না। কৃপা করিয়া আজ আমাকে ক্ষমা কর; যাহা বলিবে দুদিন পরে বলিও"।

সুরবালা নীরব। একথার পর তিনি কি বলিবেন? যে দেব-চরণে তিনি প্রাণ উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন, সেই দেবতার আজি এই ভাব!

তাঁহার চক্ষে জল আসে আসে হইল, কিন্তু আসিল না। কিন্তু কণ্ঠস্বর কিছু বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি সেই স্থূল স্বরে আবার বলিলেন,—

"দুই দিন পরে আমার আর তোমার সহিত সাক্ষাতের সময় হইবে না।"

সুরবালার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই রমাপতি মুখ ফিরাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। বোধ করি সুরবালার কণ্ঠস্বর তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি বলিলেন,—

"সময় হইবে না—সে কি কথা সুরবালা?"

এতক্ষণে সুরবালার চক্ষু হইতে অজস্র ধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে উভয় বাহুর দ্বারা রমাপতির পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,—

"অদ্যকার সাক্ষাতই আমাদের ইহজীবনের শেষ সাক্ষাৎ। তোমার প্রেমময় হৃদয়ের এ অসহনীয় যাতনা তোমার এ দাসী আর এক দিনও দেখিবে না। তোমার দাসী হইয়াও যখন তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, তোমার তীব্র শোকের কোন প্রতিবিধান করিতে পারিলাম না, তখন বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? দয়াময়, তোমার দাসী তাই আজি এত জেদ্ করিয়া তোমার চরণে চিরবিদায় প্রার্থনা করিতেছে।"

কথাটা রমাপতি বাবুর হৃদয়ে বাজিল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। সুরবালা তখনও তাঁহার চরণে পতিতা। তিনি সাবধানে সুরবালাকে উঠাইলেন। তিনি জানিতেন সুরবালা কখন মিথ্যা কথা কহেন না এবং তাঁহার হৃদয় কপটতার বার্ত্তা জানে না। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"সুরবালা, তুমি সত্যই কি প্রাণত্যাগের সংকল্প করিয়াছ?"

"বল দেবতা, আমার আর কি উপায় আছে? তোমার প্রসাদ সম্ভোগ, তোমার আনন্দ সন্দর্শন, তোমার সুখ সন্তৃপ্তি আমার জীবনের মূল্য। তাহা আর তোমাতে নাই; অতএব আমার জীবনের আর কোনই মূল্য নাই।

যাহাতে তোমাকে আনন্দময়, সুখময় ও প্রসাদময় করা যাইবে বুঝিতেছি তাহা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। অনেক সন্ধান করিলাম, অনেক যত্ন করিলাম, দিদির সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অতএব তোমার চিত্তে শান্তি সঞ্চারের আর উপায় নাই। এইরূপ কাতর ভাবে, এইরূপ অনাহারে অনিদ্রায় কালাতিপাত করিতে হইলে তোমার জীবন যে আর সপ্তাহ কালও টিকিবে না তাহা আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তুমিও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? তবে বল দেবতা, বল সর্ব্বস্বধন, আমি জীবন রাখি কোন সাহসে? তুমি আমাকে বড় ভাল বাস জানি। তুমিই বল, তোমার সেই নিশ্চিত বিষাদময় পরিণামের পূর্ব্বে আমার চির-পলায়ন নিতান্তই আবশ্যক নয় কি?"

রমাপতি বহুক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—

"সুরবালা, আমার জীবন যদি থাকে সে তোমারই জন্য থাকিবে, আর যদি যায় সে তোমারই জন্য যাইবে। মনে করিয়া দেখ সুরবালা, এ জীবন রাখিয়াছে কে? তুমি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জান; সেই মন্ত্র বলে তোমার এই মুগ্ধ, অনুগত মরিলেও আবার বাঁচিয়া উঠিবে। তুমি আমাকে বাঁচাইয়া দেও দেবী—এ যাতনা আমি আর সহিতে পারি না।"

এই বলিয়া রমাপতি উভয় বাহুদ্বারা সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। সুরবালা মনে মনে বলিলেন,—"আমার প্রাণের প্রাণ, তোমার দাসী তোমার জন্য প্রাণপাত করিয়াও যে সুখ পায়, তাহারই কি তুলনা আছে? হায়! আজি যদি প্রাণ দিলেও দিদিকে দেখিতে পাইতাম!"

কবি ও কাব্য

"মর্ত্তে রসজ্ঞ বিদুরৈর্বিহিতে ক নাম
গ্রন্থেঽস্তি দোষবিরহঃ সুচিরন্তনেঽপি"

জা ঠেরং ব হসন্তী কইবঅণংবুরুহবদ্ধবিণিবেসা
দাবেদি ভুঅণমণ্ডলমন্নং বিঅ জঅই সা বাণী

কোন গ্রন্থকার উপরি উক্ত শ্লোকে কবিবাক্যের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন যে কবিবদনরূপপদ্মে* কৃতাবস্থানা যে বাণী (বাক্য) স্থবিরকে (বৃদ্ধ ব্রহ্মাকে) উপহাস করিয়াই যেন জগন্মণ্ডলকে (ব্রহ্মনির্ম্মিত জগৎকে) অন্যরূপ করিয়া দেখান, সেই বাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (তাহাকে আমি নমস্কার করি)। এস্থলে ব্রহ্মাকে স্থবিরশব্দে অভিহিত করাতে যেমন স্থবির কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্যতা প্রযুক্ত ভাল ও মন্দ উভয়রূপ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে তদ্রূপ ব্রহ্মাও স্বকৃত-জগতে যদৃচ্ছাক্রমে ভাল ও মন্দ উভয়ই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন সুতরাং ঐ জগৎ অসম্পূর্ণ ইহা সূচিত হইল। "হসন্তী" এই বিশেষণ দ্বারা কবিশক্তির অপরিচ্ছেদ ও জগতের বৈকল্য সূচিত হইল অর্থাৎ ব্রহ্মকৃত জগতে নানা দোষ আছে সুতরাং উহা কবির উপহাসের বিষয় হইতে পারে। অথবা অপরিচ্ছিন্নশক্তি কবি, পরিচ্ছিন্নশক্তি ব্রহ্মাকে উপহাস করিতে পারেন।

ভুবনমণ্ডল যেন অন্য করিয়া দেখান এই বাক্যে ইহা সূচিত হইতেছে যে কবির এরূপ একটী শক্তি আছে যদ্দ্বারা তিনি এই দোষাক্রান্ত ও অসম্পূর্ণ জগৎকে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান করিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি একজন ঐন্দ্রজালিক বিশেষ। ঐন্দ্রজালিক যেমন স্বীয় মন্ত্রাদিবলে অবাস্তবপদার্থে

* ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্মে বাস করেন সুতরাং ব্রহ্মা অপেক্ষা কবিবদনপদ্মনিবাসিনী বাণীর প্রশংসা করায় বিষ্ণুর অপেক্ষাও কবির উৎকর্ষ সূচিত হইল, ইহা সহৃদয়েরা বুঝিয়া লইবেন।

বাস্তবত্ববুদ্ধি উৎপাদন করিতে পারেন তদ্রূপ কবিও স্বশক্তিবলে অসুন্দরকে সুন্দর, সদোষকে নির্দোষ, দুঃখ মোহাদিময়কে সুখময় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন। কবির শক্তি বা প্রতিভাকে নমস্কার না করিয়া বাক্যকে নমস্কার করিয়া, শ্লোককর্ত্তা শক্তিপ্রতিভাদি অপেক্ষা, তদ্ব্যঞ্জক বলিয়া শব্দেরই প্রধানতঃ কাব্যে উপযোগ স্বীকার করিয়াছেন*। অর্থাৎ শব্দরচনাবৈচিত্র্য না থাকিলে রসভাবাদি ভাল করিয়া ব্যক্ত হয় না বলিয়া শক্তিপ্রতিভাবিশিষ্ট ব্যক্তিও শব্দগ্রথনপটু না হইলে ভাল কবি হইতে পারেন না ইহাই শ্লোক-কর্ত্তার অভিপ্রায়। আমরা এক্ষণে উপরিউক্ত শ্লোকার্থের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইব অর্থাৎ উপরি উক্ত শ্লোকে যে যে কথার উল্লেখ করা হইয়াছে তৎসমুদায় সত্য কি না তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

১মতঃ কবি যে এই জগন্মণ্ডলকে অন্যরূপ করিয়া দেখান এই কথাটীর বিচার করা যাউক। পাঠক চলুন আমরা মহাত্মা ভবভূতির সহিত, যে স্থলে ভগবান্ রামচন্দ্র শূদ্রতপস্বির মস্তকচ্ছেদনার্থ উদ্যোগ করিতেছেন সেই স্থানে যাই। আপনি হয়ত বলিয়া উঠিবেন সে স্থানে যাইবার প্রয়োজন কি, একজন নিরপরাধী ব্যক্তি আর একজন ধর্ম্মদারপরিত্যাগিকর্ত্তৃক হত হইবে এ দৃশ্যে দেখিবার পদার্থ কৈ? ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয়ই মনে যুগপৎ ক্রোধ, ঘৃণা, করুণা প্রভৃতি ভাবের উদয়ের সম্ভাবনা। অতএব না যাওয়াই ভাল। কথা সত্য কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কবি একজন ঐন্দ্রজালিক সুতরাং এস্থলেও হয়ত তিনি স্বীয় মোহিনী শক্তি দ্বারা এক অতি মনোহর দৃশ্য দেখাইতে পারেন, আর ভবভূতির নামটাও বড়, চলুন একবার যাই।

এই যে "রামভদ্র" প্রবেশ করিতেছেন—ততঃ প্রবিশতি সদয়োদ্যতখড়্গো রামভদ্রঃ—এই যে তিনি কি বলিতেছেন পাঠক মনোযোগ করুন্

রাম :—রে হস্ত দক্ষিণ! মৃতস্য শিশোর্দ্বিজস্য,জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুনৌ কৃপাণম্
রামস্য গাত্রমসি দুর্ব্বহগর্ভখিন্নসীতাবিবাসনপটোঃ করুণা কুতস্তে?॥

"রে দক্ষিণ হস্ত! তুমি মৃত ব্রাহ্মণপুত্রের জীবনের নিমিত্ত শূদ্রমুনির

---

* রসাদ্যভিব্যঞ্জকশব্দঃ কাব্যং ইতি রসগঙ্গাধরং।

উপর কৃপাণ বিসর্জ্জন কর। তুমি দুর্ব্বহগর্ভখিন্নসীতার বিবাসনে পটু রামের গাত্র, তোমার করুণা কোথায়?

একণে শ্লোকটীর গূঢ়ার্থ পর্য্যালোচনা করা যাউক।

১মতঃ রামভদ্রের একটী বিশেষণ আছে "সদয়োদ্যতখড়্গঃ" অর্থাৎ সদয়ভাবে উৎক্ষিপ্তখড়্গ। সদয় এই বিশেষণ দ্বারা হনুমান শূদ্রতপস্বির প্রতি দয়া প্রকাশ হইতেছে ও প্রকারান্তরে অতি ক্রূরকর্ম্মানুষ্ঠানকালেও দয়াদি সহজ সদ্‌গুণ মহাত্মা ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করে না ইহাও সূচিত হইতেছে। এই ভাবটী ভবভূতি শ্লোকান্তরে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমর্হতি"

রামচন্দ্র লোকাপবাদভয়ে সীতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু তিনিই আবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সময় স্বর্ণময়ী সীতার প্রতিমূর্ত্তি লইয়া সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ বিষয়ক শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এই স্থলে ভবভূতি বলিলেন "লোকোত্তর অর্থাৎ অলৌকিক, ব্যক্তিদিগের চরিত্র বজ্র হইতেও কঠিন অথচ কুসুম হইতেও মৃদু।

"সদয়োদ্যতখড়্গ" এই বিশেষণের তাহাই তাৎপর্য্য।

"রে হস্ত দক্ষিণ" অচেতন হস্তকে চেতনের ন্যায় সম্বোধন কেন? তবে কি কর্ম্মটা এতই গর্হিত যে অচেতনেরাও তাহার অনুমোদন করে না? তাহারা কি করিতে স্বীকার করে না?

অন্ততঃ রামচন্দ্র শূদ্রতপস্বির বধকে সেই ভাবেই দেখিতেছেন সেই জন্য হস্তকে এই কঠোর কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বলিতেছেন "মৃতস্য শিশোর্দ্বিজস্য জীবাতবে বিসৃজ শূদ্রমুনৌ কৃপাণং" অর্থাৎ "হস্ত তুমি ইহা সম্পাদন কর, ইহা গর্হিত কর্ম্ম হইলেও ইহা হইতে মৃত ব্রাহ্মণপুত্র জীবিত হইবে সেও মহালাভ অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হও"। আরও এক কথা যখন মনুষ্য কোন গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তখন সে নানাবিধ কাল্পনিক যুক্তি দ্বারা ঐ কর্ম্মকে অগর্হিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে। ইহা একটি মনুষ্য হৃদয়ের গূঢ় তত্ত্ব। ঐ তত্ত্বটী "মৃতস্য শিশোর্দ্বিজস্য" ইত্যাদি কথায় কি পরিস্ফুট হইতেছে না? যখন "দ্বিজপুত্রের জীবনের নিমিত্ত আমি এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়েছি তখন উহা

করণীয়” এই যুক্তিতেও মনের সন্তোষ হইল না তখন রামচন্দ্র মনে করিলেন “ভাল একর্ম্ম করিতে আমার এত ভাবনা কেন? আমিত নিরপরাধা গর্ভ-ভারখিন্না সীতার বিবাসনকালে ইহা অপেক্ষা অনেক কঠোর কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছি তখন ত নির্ঘৃণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছি—তবে এখন এই শূদ্র তপস্বীর বধে এত দয়া কেন?” ও বলিলেন “দক্ষিণ হস্ত তুমিত দুর্ব্বহ গর্ভখিন্ন সীতার নির্ব্বাসনে পটু রামচন্দ্রের গাত্র তোমার আবার দয়া কোথায় যে তুমি এই শূদ্রতপস্বির বধে ইতস্ততঃ করিতেছ?” পাঠক ভাবিয়া দেখুন শেষ চরণদ্বয়ে কতদূর মর্ম্মভেদী ক্লেশ, কৃতকর্ম্মদ্বেষ, ও স্বাত্মাবমাননার ভাব প্রকাশ হইতেছে ও সদয়োদ্যতখড়্গ এই বিশেষণ ও সমস্ত শ্লোকটী নায়কের কতদূর মহানুভবতা ও কর্ত্তব্যমুখপ্রেক্ষিতার পরিচয় দিতেছে। এখন বলুন দেখি এরূপ নায়ককে ভাল বাসিতে হয় কিনা? এরূপ নায়কের দুঃখে কাঁদিতে হয় কিনা? এরূপ নায়কের পরিতাপে অন্তঃকরণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয় কিনা? যদি হয় তবে এ নায়কের নির্ম্মাতা কবিকে কি ঐন্দ্রজালিক বলিব না? আর একটী উদাহরণ, বঙ্গদেশের প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস গুপ্ত প্রেমের নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন।

কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা জলের সিহালা
পড়সি জীয়ল আছে
কুল পানিফল কাঁটায় সকল
সলিল বেড়িয়া আছে
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়
ছাকিয়া খাই না যদি।
অন্তর বাহিরে, কুট কুট করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥

কি চমৎকার বর্ণনা! সকলেই জানেন যে অকৃত্রিম প্রেম অতি

সুন্দর পদার্থ ও দৈববশে গোপনে সঙ্ঘটিত হইলে উহাতে নানা আশঙ্কা নানা বিঘ্ন। কিন্তু কয়জন চণ্ডীদাসের ন্যায় ঐ সমস্ত বিঘ্ন ও আশঙ্কা বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন? কয়জনের মুখ হইতে "কুল পানিফল কাঁটায় সকল সলিল বেড়িয়া আছে, কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায় ছাকিয়া খাইলা যদি" ইত্যাদি অবিনশ্বর পংক্তিগুলি নির্গত হয়? কয়জনই বা দুঃখকে প্রেম-সরোবরে নিয়ত পরিভ্রমণশীল মকর বলিয়া বর্ণনা করিয়া নিজের অসাধারণ তত্ত্বদর্শিতার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন?।

পাঠক, আপনার, আমার সকলেরই প্রিয় পদার্থ আছে। সকলেরই বন্ধু, আত্মীয়, সুহৃদ আছে সকলেই নানা কথায় নানা ভাবে নানা উপায়ে প্রিয় পদার্থের প্রিয়তা প্রকাশ করেন—কিন্তু কয়জন বিদ্যাপতির ন্যায় উহা প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন?। বিদ্যাপতি এক স্থলে লিখিয়াছেন "শীতের ওঢ়নি পিয়া, গীরিষের বা বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না।" পিয়া অর্থাৎ প্রিয় ব্যক্তি শীতকালে ওঢ়নি (শীতবস্ত্র) স্বরূপ, গ্রীষ্মকালে বায়ুস্বরূপ, বর্ষাকালে ছত্র স্বরূপ ও নদীতে নৌকা স্বরূপ। যিনি প্রচণ্ড শীতে অনাবৃত-গাত্রে অবস্থানের পর শীতবস্ত্র পাইয়াছেন, যিনি নিদাঘে প্রখর রবিকিরণ-তপ্ত হইয়া সুশীতল সমীরণ সেবা করিয়াছেন, যিনি বর্ষাকালে মেঘাম্বুসেক-দুঃখের পর ছত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ও যিনি নদীতে জলমগ্ন হইবার পর আশ্রয়-তরী লাভ করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন যে উপরি উক্ত বর্ণনা কতদূর হৃদয়গ্রাহিণী ও কতদূর মনুষ্য-হৃদয়ের অন্তস্তলপ্রেক্ষিণী।

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী।

মাসিক সম্বাদ

হায়দ্রাবাদ একটা "লুটের বিলেত"। বিদ্যাটা জানা থাকিলে সেখান হইতে কিছু না কিছু হাত করা যায়। পামার কোম্পানির বৃত্তান্তটা যাঁরা জানেন তাঁহারা এ কথা সহজে বুঝিবেন। তাঁহারা এক ডজন পেপারমেণ্ট লজেঞ্জেসের দাম ১২০ টাকা, একটা ময়ূরের দাম ২০০০ টাকা, একটা দেশালাইয়ের বাক্‌স ১৩।৷০ টাকা লইয়াছিলেন। সেই পামার কোম্পানির দরুণ এখনও সর হরেশ রম্বোল্ড্‌ ষাট লক্ষ টাকা দাবি করিতেছেন। দরিদ্র চোরেরা জেলে যায়; বড় মানুষ চোরেরা পুত্রপৌত্রাদিকে চোরা মার্গে হক্ হকীকৎ দিয়া যায়। এখন পামার কোম্পানি যাহা করিয়াছেন আবদুল হকের মত একজন দেশী মুসলমানের তাহা সয় কি? সিংহ হইতেছেন পশুরাজ—চাই কি একটা হাতী মারিয়া খাইতে পারেন—তাই বলিয়া কি কুকুরের পেটে ঘৃত হজম হইবে? দেশীয় লোকের সাহেবী মেজাজ, তাঁহাদের বড় বিপদের কারণ হইয়াছে। আবদুল হক নিজামের হোম সেক্রেটরি —তিনি যদি দুই একটা সেকেলে রকম অপরাধ করিতেন, তা নয় পদের গুণে মানাইয়া যাইত। কিন্তু অপরাধ গুলা বড় সভ্যরকমের হইয়াছে। তাঁহার প্রথম অপরাধ যে যেঁ ষাট লক্ষ টাকা নিজাম প্রান্তসীমা রক্ষার্থ ভারতগবর্ণমেণ্টকে দিবেন বলিয়া এত হুলস্থূল—নিজাম তাহার কিছুই জানেন না—আবদুল হক মিছামিছি ভারতগবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে নিজাম আপনাদিগকে এত টাকা দিবেন। তা এ জন্য আমরা আবদুল হককে বেশী গালিগালাজ করিতে প্রস্তুত নহি—কেন না খোস খবরের ঝুটাও ভাল—ভরসা করি কর্তৃপক্ষদিগেরও সেই মত। হক মহাশয়ের দ্বিতীয় অপরাধ, তিনি কতকগুলি দেশী বিলাতী ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নিজামের রাজ্যস্থিত খনি সকলে রাজার যে অধিকার তাহা নিজামকে ফাঁকি দিয়া লিখাইয়া লইয়াছেন। তৃতীয় অপরাধ ঐ সকল খনির লাভ ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইবার জন্য একটা কোম্পানি খাড়া করিয়া নিজের সেয়ারগুলি ফাঁকি দিয়া আবার নিজামকে বিক্রয় করিয়া ২৪০০০০০ টাকা হাত মারিয়াছেন। চতুর্থতঃ একটা উড়ো রেইলওয়ে কোম্পানির হুজুগে

নিজামের আরও কতকগুলি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। এখন এ সকল কথার বিচারের জন্য বিলাতে একটা কমিটি বসিয়াছে।

কমিটি কেন? আবদুল হক একটা কীট পতঙ্গের মধ্যে; তার জন্য আবার কমিটি কেন? ইংরেজ বাহাদুরের প্রচণ্ড প্রতাপ—ইংরাজ মশা মারিতে কামান পাতে না। তবে কি না অনেক বড় বড় ইংরেজ নাকি হক্ সাহেবের বখরাদার, তাই। প্রধানতঃ হায়দ্রাবাদের ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্ট কর্ডরি সাহেবের নামে লোকে কলঙ্ক রটাইতেছে। কর্দ্দমের সংস্রবে থাকায় ভারত-গবর্ণমেণ্টের ফরেন আপিসেও একটু কাদা লাগিয়াছে। কাজেই বৃহদ্ব্যাপার উপস্থিত।

এক্ষণে শুনা যাইতেছে হক সাহেব টাকা ফেরত দিতেছেন। পশু-বিশেষের পেটে দুষ্পচ্য সামগ্রী গেলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কর্ডরি সাহেবের কি হইবে? সিংহ যদি এক টুকরা মাংস খাইয়াই থাকে তবে কি হজম হইবে না? আমরা বিলাত হইতে তারে খবর পাইয়াছি কর্ডরি সাহেব গোলযোগ দেখিয়া একটা টাকা হাতে করিয়া ভাবিতেছেন:—

কে না যায় মথুরায়, কে না যায় যমুনায়
মাথে লয়ে দধির পাশোরা।
তোমার ও চাঁদ বদন কে না করে দরশন
সবে ভাল—কলঙ্কিনী মোরা!

গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায়, বিগত বর্ষে উত্তর ব্রহ্মে ৪৯ লক্ষ টাকা আয় এবং ১ ক্রোটী ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ব্যয় মোটে ১ কোটী বেশী। ক্রমে খরচের এই টাকা কয়টা কুলান হইয়া, লাভ হইতে আরম্ভ হইবে এমন আশা করা যাইতে পারে, লাট গবর্ণর জেনারেল সাহেব খোদ বলিয়াছেন। সুতরাং তদ্বিষয়ে আর আমাদের কোন সংশয়ই নাই। তবে এই খানে বিলাতী সম্বাদপত্র Weekly Despatch হইতে একটু উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

The Dacoits are now the absolute masters of the village population. The season is passed when our troops can undertake field operation; the dacoits have

abundance of guns and ammunition—the villagers are defenceless. The population are in consequence fleeing from their home-steads to find protection in the places where British troops are actually quartered. The land is lying untilled and Upper Burmah is in the clutches of a famine for which the Indian Government is solely and wholly responsible. It is literally true that we have at this moment a weaker hold upon Upper Burmah than when our troops first occupied Mandalay. We hold just so much ground as our troops are encamped upon. Elsewhere where the population is not openly rebellious, the villages are tenantless and the fields once cultivated, overgrown with jungle, or transformed into pestilential swamps. Even the sagacity of Indian officialism has rarely anything quite so black and lamentable as the desolation it has wrought to Upper Burmah,

টাকার ত কুলান হইবে—কিন্তু ইহাকেই কি বলে না—ক্ষেয়ায় কড়ি দিয়ে ডুবে পার ?

তিব্বতপ্রান্তের গোলযোগ সহজে মিটিল না। নাটং দুর্গ ইংরেজে অধিকার করার পরেও তিব্বতীয়রা যুদ্ধ করিতে আসিল—ইংরাজের ছাউনি আক্রমণ করিল। তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পর তাহারা হটিয়া যায়—যুদ্ধে তাহাদের অনেক হতাহত হইয়াছে। এ পক্ষে ঘণ্টাপিছু একজন মাত্র মরিয়াছে,সম্বাদ আসিয়াছে। এ ক্ষুদ্র যুদ্ধে ইংরাজের কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু বিধাতা চিত্রপট খানা আঁকিয়াছেন মন্দ নহে। পূর্ব্বে—মগের ডাকাইতি গ্রাম দাহ; উত্তরে—তিব্বতের যুদ্ধ; পশ্চিমে—কাবুল বিভ্রাট ও রুসভীতি; দক্ষিণে—সমুদ্রের বাত্যা। মধ্যে পর্ব্বতশিখরে নিশান উড়াইয়া মহাসিংহ ডাকিতেছেন "মাভৈঃ"

অথান্ধকারং গিরিগহ্বরানাং দংষ্ট্রাময়ূখৈঃ শকলানি কুর্ব্বন্

প্রসন্নচিত্তে ডাকিতেছেন "মাভৈঃ ইনকম্ ট্যাক্স দিও, তেল নুনের মাসুল দিও, ভয় করিও না, কোন চিন্তা নাই"। ব্রহ্মের ডাকাইতেরাও দিলীপের ন্যায় বলিতেছে,—

"স ত্বং মদীয়েন শরীরবৃত্তিং দেহেন নির্ব্বর্ত্তয়িতুং প্রসীদ" !

শুনা যায় রুসিয়া না কি মধ্য এসিয়ায় আবার কি গোলযোগ বাধাইবার চেষ্টায় আছেন। ইংলণ্ড যদি ইওরোপে রুসিয়ার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া না চলেন, তাহা হইলে রুসিয়া এসিয়ায় ইংরাজকে বিরক্ত করিতে ত্রুটি করিবেন না—মধ্য এসিয়ার রুস বলবান। লর্ড রাণ্ডল্ফ চর্চিল সে দিন পার্লামেণ্টে ভারতের সীমাপ্রশ্ন সম্বন্ধে বলিয়াছেন "ইউরোপে আমরা রুসের সহিত সদ্ব্যবহার রাখিলে ভারতসীমায় রুস-উপদ্রবের বড় শঙ্কা থাকিবে না।" ইহার ভিতর একটা কথা আছে। ইওরোপে শীঘ্র আগুন লাগিবে; রুসে জর্ম্মণে একটা তুমুল যুদ্ধ শীঘ্র উপস্থিত হইবে। ইংরেজ সে সময় যদি জর্ম্মণ-পক্ষ অবলম্বন করেন, তবে রুস ভারতের দিকে দৃষ্টি করিবেন। অতএব প্রভু চর্চিলের কথা সেই প্রাচীন কথাটা মাত্র—"চাচা আপনা বাঁচা"।

পঞ্জাব ইউনিবর্সিটির রেজিষ্ট্রার লার্পেণ্টের কার্য্য অনুসন্ধানের জন্য যে কমিসন বসিয়াছিল—তাঁহারা ভারত গবর্ণমেণ্টে যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা নাকি রেজিষ্ট্রার সাহেবের অনুকূলে নহে। তা হউক, ডিফেনস্ এস-সিয়েসন অনুকূল আছেন। ভয় কি? বৃহন্নলা সারথি থাকিতে বিরাট-পুত্রের ভয় কি? বৃহন্নলার সম্মোহন বান আছে—চাই কি শেষ পুরস্কারটাও ঘটিতে পারে—

রশ্মীন্ সমুৎসৃজ্য ততো মহাত্মা রথাদবপ্লুত্য বিরাটপুত্রঃ।
বস্ত্রাণ্যুপাদায় মহারথানাং তূর্ণং পুনঃ স্বং রথমারুরোহ॥

সিন্ধু প্রদেশটাকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন না রাখিয়া পঞ্জাবের অন্তর্ভূত করিবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু সেদিন হাউস অব কমনস সভায় অণ্ডার সেক্রেটরি বলিয়াছেন এরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না। সিন্ধুবাসিরা বোধ করি ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করিবেন না। বিক্রয়ের কথা শুনিয়া গরু বলিয়াছিল "আমায় বেচ না বেচ সমান কথা—আমার এখানেও ঘাসজল, সেখানেও ঘাসজল"।

হাবড়াপুলে পারাপার হইতে মনুষ্যযাত্রীর আর পয়সা লাগিবে না। কড়া মিউনিসিপাল আইন হইয়াছে—গঙ্গা পারেরও সুবিধা হইল—এখন কলিকাতা বাসীরা কি বলেন?

সমালোচন

HINDU MUSIC.—Part I. By Nanda Kumar Mukhopadhyay. আমরা এই গ্রন্থ পুনশ্চ সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। "মার্গদেশী সংগীত" সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য কথা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে যত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তকের প্রথম ভাগে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে "দেশী সংগীত" সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। শ্লোকগুলি সংস্কৃত অক্ষরে মুদ্রিত এবং গ্রন্থখানি ইংরাজি ভাষায় লিখিত হওয়ায় ইহা হিন্দুসংগীত জিজ্ঞাসু শিক্ষিত ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করিবে—স্থানে স্থানে, ইংরাজি স্বর গ্রামের সহিত আমাদের স্বরপ্রণালীর সম্বন্ধও দেখান হইয়াছে। নিভাজ ইংরাজি-নবিশ বাবুও ইচ্ছা করিলে এই গ্রন্থ হইতে সংগীত সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিতে পারেন—সংস্কৃত শ্লোকগুলির ইংরাজি অনুবাদ আছে।

কৃষ্ণ-জীবনী। স্মার্ত্তচূড়ামণ্যুপাধিক শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুল্য ১৲ এক টাকা। অনুক্রমণিকায় গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার দেশের লোক এখনও কৃষ্ণচরিত্র বুঝিবার উপযুক্ত হন নাই। তবে অনেক লেখক না কি এখন ইহাকে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আনিয়া ফেলিতেছেন, কাজেই তাঁহার আর চুপ করিয়া থাকা ভাল দেখায় না। এই গ্রন্থে কৃষ্ণের জন্মগ্রহণ এবং শকটভঞ্জন, পূতনাবধ, ননীচুরি, বস্ত্রহরণ ইত্যাকার অলৌকিক ও অসাধারণ ঘটনা হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত সমস্ত কথা বিবরিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, মহাভারতীয় কৃষ্ণের সমালোচনা, কৃষ্ণ কি পূর্ণব্রহ্ম, কৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রবক্তা, তাঁহার ব্রহ্মত্বের প্রতিবাদ, নরনারায়ণ ঋষি, আদর্শ মহাপুরুষ, ভগবদ্‌গীতা, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সন্ন্যাস বা মোক্ষযোগ, এই সকল বিষয়ের সমালোচনা আছে। কৃষ্ণ ইহাতে যোগাচার্য্য স্বরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ইহা পাঠ করিতে পারেন। গ্রন্থকার "চূড়ামণ্যুপাধিক" হইলেও, সকল সময়ে সেকেলে বামন পণ্ডিতের মত গ্রন্থ লিখেন নাই। গ্রন্থকার বিবেচনা করেন, তাঁহার প্রবন্ধ স্বাধীন ভাবে লিখিত হইয়াছে। কাজটা আজ কাল বড় দুষ্কর।

শ্রীমতী কিরণশশী বসুর নাম বন্ধুবর্গের স্মরণার্থ এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইল—পুস্তকের নাম এই। শ্রীভবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্রে মুদ্রিত। ঈদৃশ গ্রন্থের সমালোচনা করা অনুচিত। কেন না, ইহা মন্দ হইলেও ভাল। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে এরূপ গ্রন্থ বন্ধুমধ্যে প্রচারই ভাল।

উন্মাদ মন। শ্রীনগেশচন্দ্র বসু দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা মাত্র। উপরিউক্ত পুস্তকের উদ্দেশ্য যাহা, ইহারও তাহাই—কেবল বেশির ভাগ ইহা বাজারে কিনিতেও পাওয়া যাইবে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র ও সমালোচনা—২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম, এস, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার এল, এম এস, ও শ্রীজগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত। আজ কালকার বাজে গ্রন্থের অপেক্ষা ইহার বিষয় ও উদ্দেশ্য যে ভাল, ইহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। আমরা নাটক, নবেল ও রঙ্গরসের অপেক্ষা এ সকল গ্রন্থ মন্দ হইলেও ভাল বলি।

লঘু ভূগোল। শ্রীদীননাথ চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৶০ আনা। বাঙ্গালা ভূগোল যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইয়াছে। বালকদিগের উপকারে আসিতে পারে।

মোহ-মুদ্গরঃ। শ্রীদুর্গাদাস রায় কৃত বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজি অনুবাদ সমেত, মূল্য /১০ আনা। সংস্কৃত মোহ-মুদ্গরের ষোলটী শ্লোক বড় সুন্দর—ইহা অনেক সংস্কৃতানুরাগীর কণ্ঠস্থ আছে। দুর্গাদাস বাবু তাহারই বাঙ্গালা ও হিন্দী পদ্যে এবং ইংরাজি গদ্যে অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছেন। বাঙ্গালা অনুবাদটীও গদ্য হইলে ভাল হইত। মোহ-মুদ্গরের যে মধুময় লালিত্য, তাহা সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় পদ্যে রাখা যায় না।

প্রচার

৪র্থ খণ্ড] ১২৯৫ [৩য় সংখ্যা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩॥

টীকা।

এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে শুকায় না। ২৩।

আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য অস্ত্রাদির অতীত।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥ ২৪॥

ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। (ইনি) নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য্য, বলিয়া কথিত হন। ২৪।

স্থাণু, অর্থাৎ স্থিরস্বভাব। অচল—পূর্ব্বরূপ অপরিত্যাগী। সনাতন—চিরন্তন, অনাদি। অব্যক্ত—চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অচিন্ত্য—মনের অবিষয়। অবিকার্য্য—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়।

শঙ্কর এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেদ্য, ইত্যাদি, এজন্য আত্মা নিত্য; নিত্য, এজন্য সর্ব্বগত; সর্ব্বগত, এজন্য স্থিরস্বভাব; স্থিরস্বভাব, এজন্য অচল; অচল, এজন্য সনাতন, ইত্যাদি।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক করিও না।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং* শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্মা সর্ব্বদাই জন্মে, সর্ব্বদা মরে, তথাপি হে মহাবাহো! ইহার জন্য শোক করিও না। ২৬।

কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া। পরশ্লোকেও সেই কথা আছে। কিন্তু পরশ্লোকে, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এই বাক্যে আত্মার অবিনাশিতাও সূচিত হইতেছে। তাহা হইলে আর, আত্মার বিনাশ স্বীকার করা হইল কৈ? এবং নূতন কথাই বা কি হইল? এই জন্য শ্রীধর আর এক প্রকার বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, যে আত্মাও যদি মরিল, তাহা হইলে তোমাকেও আর পাপপুণ্যের ফলভাগী হইতে হইবে না। তবে আর দুঃখের বিষয় কি?

কেন তথাপি শোক করিবে না, তাহা পরশ্লোকে বলা হইতেছে।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

যে জন্মে, সে অবশ্য মরে; যে মরে, সে অবশ্য জন্মে। অতএব যাহা অপরিহার্য্য, তাহাতে শোক করিও না। ২৭।

আত্মার অবিনাশিতা গীতাকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। "নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্" বলিয়া মানিয়া লইয়াও, উত্তরে আবার বলিতেছেন, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" যদি মরিলে আবার অবশ্য জন্মিবে, তবে আত্মা

* "নৈবং" পাঠান্তর।

অবশ্য অবিনাশী, "নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্" বলা আর খাটে না। তবে, শ্রীধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে এ আপত্তি উপস্থিত হয় না।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

জীবসকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার) নিধনে অব্যক্ত; সেখানে শোকবিলাপ কি?। ২৮।

অব্যক্ত শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শঙ্কর অর্থ করেন, "অব্যক্তম-দর্শনমনুপলব্ধির্যেষাং ভূতানাং" অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) ভূত সকলের দর্শন বা উপলব্ধি নাই। শ্রীধর অর্থ করেন, "অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপম্।" অর্থাৎ ভূত সকল উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ রূপে অব্যক্ত থাকে। অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শঙ্করের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়।

শ্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল, আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বে চক্ষুরাদির অতীত ছিল; কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর পর আবার চক্ষুরাদির অতীত হইবে, তখন আর তজ্জন্য শোক করিব কেন? "প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুষ্বিব শোকো ন যুজ্যতে" (আনন্দগিরি)—ঘুম ভাঙ্গিলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জীবের জন্য শোক অনুচিত।

এখানেও আত্মার অবিনাশিত্ববাদ জাজ্বল্যমান।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

এই (আত্মা) কে কেহ আশ্চর্য্যবৎ দেখেন; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়া থাকেন; শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না। ২৯।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই। আত্মা অবিনাশী হইলেও পণ্ডিতেরাও

মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহার কারণ এই, যে তাঁহারাও প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন। আত্মা তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মাত্র—তাঁহারা আশ্চর্য্য বিবেচনা করেন। আত্মার দুর্জ্ঞেয়তাবশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি।

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে, যে "আত্মা অবিনাশী," এবং "ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়" এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই যে পণ্ডিতেও বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য কেবল দুর্ব্বোধ্যতা প্রতিপাদন করা নহে। আমরা আত্মার অবিনাশিতা বুঝিতে পারিলেও, কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না। তদ্বিষয়ক যে বিশ্বাস, তাহা আমাদের সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বিশ্বাসকে আমরা একটা সর্ব্বদা-জাজ্বল্যমান, জীবন্ত, সর্ব্বথা-হৃদয়ে-প্রস্ফুটিত-ব্যাপারে পরিণত করি না। ইহাই ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

হে ভারত! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও অবধ্য। অতএব জীব সকলের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে। ৩০।

আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

স্বধর্ম্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ভীত হইও না। ধর্ম্ম্যযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়ঃ আর নাই। ৩১।

এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্লোকের টীকায় যাহা বলা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। স্বধর্ম্ম কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ীর স্বধর্ম্ম—যুদ্ধ। কিন্তু যোদ্ধার স্বধর্ম্ম যুদ্ধ বলিয়া, যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এমন নহে। অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম্ম। অনেক রাজা পরস্বাপহরণ জন্যই যুদ্ধ

করেন। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মানুমত নহে। কিন্তু যে যুদ্ধব্যবসায়ী, মনুষ্যসমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ধৃগণ রাজা বা সেনাপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী। তাঁহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে, অধীন যোদ্ধৃমাত্রেই বাধ্য। কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তাঁহারা পরস্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশী হয়েন। এই অধর্ম্ম যুদ্ধই অনেক। যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না। ভীষ্মের ন্যায় পরমধার্ম্মিক ব্যক্তিরও অন্নদাসত্ববশতঃ দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক অধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই আছে। ইউরোপীয় সৈন্য মধ্যে খুঁজিলে ভীষ্মের অবস্থা-পন্ন লোক সহস্র সহস্র পাওয়া যাইবে। অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দুর্ভাগ্য যে স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ধার্ম্মিক যোদ্ধা ইহাকে মহদ্দুঃখ বিবেচনা করেন। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজন রক্ষা, সমাজ রক্ষা, দেশ রক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষার জন্যও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্ম্ম সঞ্চয় না হইয়া, পরম ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্ম্ম পালন নহে, তাহার সঙ্গে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়। এরূপ ধর্ম্ম যুদ্ধ যে যোদ্ধার অদৃষ্টে ঘটে, সে পরম ভাগ্যবান্। অর্জ্জুনের সেই সময় উপস্থিত। এরূপ যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি পরম অধর্ম্ম—অনর্থক স্বধর্ম্মপরিত্যাগ। অর্জ্জুন সেই অনর্থক স্বধর্ম্মপরিত্যাগরূপ ঘোরতর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত। ইহার কারণ আর কিছু নহে। কেবল স্বজনাদি নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভীত শোকাকুল বা মুগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা ভগবান বুঝাইলেন; বুঝাইলেন যে কেহ মরিবে না—কেন না দেহী অমর। যাইবে কেবল শূন্যদেহ কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বস্ত্র মাত্র। অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বধর্ম্মে উপেক্ষা অকর্ত্তব্য। এই ধর্ম্ম্যযুদ্ধের মত এমন মঙ্গলময় ব্যাপার ক্ষত্রিয়ের আর ঘটে না। ইহাই শ্লোকার্থ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, সুখী ক্ষত্রিয়েরাই ইহা লাভ করিয়া থাকে। ৩২।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

আর যদি তুমি এই ধর্ম্ম্য যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি পরিত্যাগে পাপযুক্ত হইবে। ৩৩।

৩১ শ্লোকের টীকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সমর্থ ব্যক্তির অকীর্ত্তির অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। ৩৪।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে। যাঁহারা তোমাকে বহুমান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে। ৩৫।

অবাচ্য বাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা বলিবে। তারপর অধিক দুঃখ আর কি আছে। ৩৬।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব, হে কৌন্তেয়! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর। ৩৭।

৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭, এই চারিটি শ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। এই চারিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য। গীতায় ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক তত্ত্বও আছে। এই চারিটি শ্লোকের বিষয় না

ধর্ম্ম, না দার্শনিক তত্ত্ব! ইহাতে বিষয়ী লোকে যে অসার অশ্রদ্ধেয় কথা সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই। ইহা ঘোরতর স্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৩৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন। ৩৮ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরম্ভ হইবে। এই চারিটি শ্লোকের সঙ্গে, দুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপরিবর্ত্তে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, যে লোক-নিন্দা-ভয় কোন প্রকার ধর্ম্ম নহে। সত্য বটে আধুনিক সমাজ সকলে ধর্ম্ম এতই দুর্ব্বল, যে অনেক সময়ে লোক-নিন্দা-ভয়ই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে। অনেক চোর, চৌর্য্যে ইচ্ছুক হইয়াও কেবল লোকনিন্দা ভয়ে চুরি করে না; অনেক পারদারিক লোকনিন্দা ভয়েই শাসিত থাকে। তাহা হইলেও ইহা ধর্ম্ম হইল না; পিতলকে গিল্টি করিলে দুই চারি দিন সোনা বলিয়া চালান যায় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া পিতল সোনা হয় না। পক্ষান্তরে এই লোকনিন্দা বহুতর পাপের কারণ। আজিকার দিনে হিন্দুসমাজের ভ্রূণহত্যা ও স্ত্রীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন। এক সময়ে ফরাসীর দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার অভাবই নিন্দার কারণ ছিল। সিয়াপোষ কাফরদিগের মধ্যে, যে একজনও মুসলমানের মাথা কাটে নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নহে, সে সমাজে নিন্দিত—তাহার বিবাহ হয় না। সকল সমাজেরই সহস্র সহস্র পাপ লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন; কেন না সাধারণ লোক নির্ব্বোধ, যাহা ভাল তাহারও নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে যাহা ভাল বলে মনুষ্য এখন তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই, মনুষ্যের ধর্ম্মাচরণে অবসর বা তৎপ্রতি মনোযোগ নাই। লোকনিন্দা ভয়ে অনেকে যে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না, এবং ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে অসার লোকে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শন করে, ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। যে লোক-নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরপিশাচ। ভগবান্ স্বয়ং যে অর্জ্জুনকে সেই মহাপাপে উপদিষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই ইহা ঈশ্বরোক্তি বলিয়া গ্রহন করিবেন না। ইহা গীতাকারের নিজের কথা বলিয়াও গ্রহণ

করিতে পারা যায় না; কেন না গীতাকার যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্ধর্ম্মে সুদীক্ষিত; এরূপ পাপোক্তি তাঁহা হইতেও সম্ভবে না। যদি কেহ বলেন, যে এই শ্লোক চারিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে, যে ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। শঙ্কর এই কয় শ্লোককে "লৌকিক ন্যায়" বলিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি "লৌকিক ন্যায়" পরিত্যাগ না করিবেন, তবে আর দাঁড়াই কোথায়! যাহাই হউক লোকনিন্দার কথার পর, ও পৃথিবী ভোগের কথার পরেই "এষাতেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে" ইত্যাদি কথা অসংলগ্ন বোধ হয় বটে। অতএব যাঁহারা এই চারিটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি।

বলিতে কেবল বাকি আছে, যে যদিও ৩৭শ শ্লোকে লোক-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, তথাপি ইহা স্বার্থবাদ পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, আর ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, তুল্য কথা। উভয়ই নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার উত্তেজনা মাত্র।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অতএব, সুখদুঃখ লাভালাভ জয়পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও। নচেৎ পাপযুক্ত হইবে। ৩৮।

যুদ্ধই যদি স্বধর্ম্ম, অতএব অপরিহার্য্য, তবে তাহাতে সুখ দুঃখ, লাভালাভ জয় পরাজয়, সমান জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কেননা ফল যাহাই হউক, যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য—করিলে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই পশ্চাৎ কর্ম্মযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। ৪৮।

পাঠক দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আবার সুর ফিরিয়াছে। এখন যথার্থ ভগবদ্গীতার মহিমাময় শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই যথার্থ কৃষ্ণের বংশীরব। ৩৪-৩৭শ শ্লোক ও ৩৮শ শ্লোকে কত প্রভেদ!

কবি ও কাব্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অনেকেই দীর্ঘপ্রবাসাগত পতির প্রতি স্বস্থ পতিপ্রাণা রমণীর সাকাঙ্ক্ষ দৃষ্টি অবলোকন করিয়াছেন, কিন্তু কয়জন ঐ দৃষ্টিকে ভবভূতির ন্যায় বর্ণনা করিতে মনেও সমর্থ হইয়াছেন ?

বিলুলিতমতিপুরৈর্বাষ্পমানন্দশোক
প্রভবমবসৃজন্তী তৃষ্ণয়োত্তানদীর্ঘা।
স্নপয়তি হৃদয়েশং স্নেহনিষ্যন্দিনী তে
ধবলবহুলমুগ্ধা দুগ্ধকুল্যেব দৃষ্টিঃ ॥

উত্তরচরিত নাটকে দীর্ঘকালের পর দণ্ডকারণ্যে শূদ্রকবধার্থ-আগত রামচন্দ্রকে দেখিয়া সীতাদেবী তাঁহাকে সস্নেহ, সদয়, সাকাঙ্ক্ষ ও সতৃষ্ণ ভাবে অবলোকন করিতেছেন। কবি তমসার মুখে উপরিউক্ত ভাবে সেই অবলোকন বর্ণনা করিতেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দেববাণী সংস্কৃত ব্যতীত অন্য কোনও ভাষাতেই এরূপ গূঢ় হইতেও গূঢ়তর ভাব প্রকাশের উপায় নাই, সুতরাং আমরা অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠককে এই অসমুদ্রোত্থিত অমৃতের আস্বাদনে সম্পূর্ণ সাহায্য করিতে পরিলাম না।

শ্লোকটির অনুবাদ এই :—

প্রবলবেগে যুগপৎ আনন্দ ও শোকোদ্ভব বাষ্পমোক্ষকারি, তৃষ্ণাপ্রযুক্ত দীর্ঘবিস্ফারিত, স্নেহক্ষরণশীল, ধবল ও অত্যন্ত মুগ্ধ তোমার দৃষ্টি (নেত্র) দুগ্ধ-নদীর ন্যায় প্রাণেশ্বরকে স্নপিত করিতেছে। পাঠক দেখুন, এস্থলে মহাকবি ভবভূতি স্নপয়তি, স্নেহনিষ্যন্দিনী ও দুগ্ধকুল্যেব এই কয়েকটি কথা প্রয়োগ করিয়া কিরূপ অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। পাঠক, একবার ভাবুন দেখি, দৃষ্টি প্রাণেশ্বরকে স্নাত করাইতেছে, এই কয়েকটি কথায় কত গূঢ় ভাব নিহিত রহিয়াছে।

পাঠক এখন মনে করুন, প্রবন্ধের প্রথমে যে প্রাকৃত শ্লোকটি লিখিত হইয়াছে উহাতে "দাবেদি ভুঅণমণ্ডলং অঙ্গং বিঅ" অর্থাৎ "দর্শয়তি ভুবন-

মণ্ডলং অন্যদিব" এই কথাটি আছে, অর্থাৎ যিনি ভুবনমণ্ডল অন্য প্রকার করিয়াই যেন দেখান এইরূপ কথা আছে। তাহার অর্থ এই যে কবিজগৎ প্রাকৃতিকজগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক ভিন্ন নহে। ফল কথা এই যে, কবি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা বলে বাহ্য ও আন্তর জগতের পদার্থগত অতি নিপুণবুদ্ধিগ্রাহ্য গূঢ় শাশ্বত সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন ও ঐ সম্বন্ধ-বলেই সুপরিজ্ঞাত পদার্থকেও অপরিজ্ঞাতবৎ, অসুন্দরকেও সুন্দরবৎ ও অসম্পূর্ণকেও সম্পূর্ণবৎ প্রতীয়মান করিতে পারেন। কবির হৃদয় স্নেহময়। আমাদের স্নেহ, মমতা সমস্তই প্রায় চেতনে নিবদ্ধ। চেতনের মধ্যেও আবার সকল চেতনে নহে, যাঁহারা আমাদের স্বজাতি, স্বশ্রেণী ও আত্মীয় তাঁহাদেরই আমরা অধিক ভালবাসি; কিন্তু কবি সকল জগৎকেই অবিশেষে ভালবাসেন। তাঁহার সম্বন্ধে সকল পদার্থই সজীব, সকল পদার্থই সুন্দর ও সকল পদার্থই ভালবাসার যোগ্য। বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদিও তাঁহার বন্ধু, * কঠোর প্রস্তর, বজ্রাদির সহিতও তাঁহার "ভাব" আছে। তাহারাও তাঁহার দুঃখে কাঁদে। তিনি একটি মনুষ্য হত হইলে যেরূপ দুঃখিত হন, ব্যাধের পরশু দ্বারা ছিন্ন বৃক্ষশাখা দেখিয়াও সেইরূপ পরিতপ্ত হন।

পাঠক, যদি তুমি তাঁহার বর্ণনার রসগ্রহ করিতে চাও ও সত্যতার উপলব্ধি করিতে চাও, তবে তুমি জগৎকে ভালবাসিতে শিখ। যতদিন তোমার জগতের সহিত ভালবাসা না হইবে, ততদিন তোমার সম্বন্ধে সমস্ত জগৎ নীরস ও শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

"দশগ্রীবস্য বৈদেহীং রক্ষিতাং রাক্ষসীগণৈঃ।
দদর্শ দীনাং দুঃখার্ত্তাং নাবং সন্নামিবার্ণবে॥
অসংবৃতায়ামাসীনাং ধরণ্যাং সংশিতব্রতাম্।
ছিন্নাং প্রপতিতাং ভূমৌ শাখামিব বনস্পতেঃ॥"

* "যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে
যানি প্রিয়াসহচরশ্চিরমধ্যবাৎসম্।
এতানি তানি বহুনির্ঝরকন্দরাণি
গোদাবরীপরিসরস্য গিরেস্তটানি॥"
"অপিগ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্।" উত্তরচরিত।

উপরিউক্ত শ্লোক দুইটি রামায়ণ হইতে গৃহীত। এক দিবস রাবণ, সীতার প্রসাদনের নিমিত্ত অশোককাননে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যেরূপ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, উপরিউক্ত শ্লোকদ্বয়ে তাহারই বর্ণনা আছে। অনুবাদঃ—দশগ্রীব রাবণ, রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক পরিবৃত বিদেহনন্দিনী সীতাকে অর্ণবে অবসন্ন পোতের ন্যায় দীন ও দুঃখার্ত্ত দেখিল। তিনি ব্রতনিয়মচারিণী ও আস্তরণরহিত ভূমিতে আসীনা; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন বনস্পতির শাখা ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। এই দুইটি শ্লোকে দুইটি উপমা আছে। একটি "নাবং সন্নামিবার্ণবে" ও অপরটি "ছিন্নাং প্রপতিতাং ভূমৌ শাখামিব বনস্পতেঃ।" পাঠক একবার বিশাল অর্ণবমধ্যে অর্দ্ধমগ্ন বা প্রায়মগ্ন এক খানি পোতের চিত্র মনে করুন। একবার তরঙ্গমালাকুল দুস্তরসাগরবক্ষে নিমজ্জন্ত, অসহায়, বিদীর্ণসন্ধি, ভগ্নকূপদণ্ড, সলিলস্রোতে ব্যাযচ্ছমান পোতের দুর্দ্দশা স্মরণ করুন। স্মরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ পোতকে দুঃখ, দীনতা ও অসহায়তার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে করিতে পারা যায় কি না ও শত্রুকারাগারমধ্যে অবরুদ্ধ রাক্ষসীকুলপরিবৃত দুঃখ ও অনাহার-কৃশা, জানকীর ঐ পোতের সহিত ঔপম্য ঘটিতে পারে কি না।

দ্বিতীয় উপমাটি বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ ছেদের পূর্ব্বে যখন শাখাটি বনস্পতির অঙ্গীভূতা ছিল, তখনকার অবস্থা স্মরণ করিতে হইবে। পরে যখন সেই শকুন্তকুলসংকুল গগনস্পর্শী ফলপল্লবশোভিত শাখাটি ব্যাধের পরশুদ্বারা ছিন্ন হইয়া একেবারে বনস্পতিসংসর্গচ্যুত হইয়া ভূমিতে শয়ান হইল, তখনকার অবস্থার সহিত পূর্ব্ব অবস্থার তুলনা করিতে হইবে। ঐরূপ করিলে অনাস্তরণ ভূমিতে আসীনা, সংশিতব্রতা, ক্ষত্রপ্রকাণ্ড রামের গেহিনী সীতার সহিত উহার সাদৃশ্য উপলব্ধ হইবে—নতুবা নহে। এক্ষণে পাঠক দেখুন, যে সকল ঘটনা নিত্যই ঘটিতেছে ও যাহাতে স্থূলদর্শীরা কিছুই সুন্দর বা অলৌকিক দেখিতে পায় না, দিব্যচক্ষু কবি সে স্থানে কত কি দর্শন করেন— কত কি ভাব আবিষ্কার করেন। প্রায় নিত্যই সহস্র সহস্র পোত অর্ণবগ্রস্ত হইতেছে, শত শত বনস্পতির শাখা বাত্যা ও কুঠারাদিদ্বারা ছিন্ন হইয়া ভূমিশায়িনী হইতেছে; কিন্তু কৈ—কবি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি পোতের ও শাখার নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করেন বা তাহাদের নিমিত্ত চিন্তা করেন? আমরা সকলেই

জানি যে কবি অচেতন বৃক্ষলতাদিকেও সম্বোধন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কেন ওরূপ করেন, তাহার অনুসন্ধান কয়জন করিয়াছেন? অনেকেই শকুন্তলার রসাস্বাদে রসিক হইয়াছেন, কিন্তু কয়জন —

"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাহপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥"

এই অমৃতময় শ্লোকের গূঢ়মর্ম্ম আবিষ্কারে চেষ্টা করিয়াছেন? ফল কথা এই যে, কবিরা অচেতনকে সাক্ষী মানেন, তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, ইহা তাঁহাদের উন্মত্ততাসূচক কার্য্য নহে, পরন্তু তাঁহাদের তত্ত্বদর্শিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ম্লেচ্ছকবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ঐ বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন—

"—The Poets, in their elegies and songs
Lamenting the departed, call the groves,
They call upon the hills and streams to mourn,
And senseless rocks; nor idly; for they speak;
In these their invocations with a voice
Obedient to the strong creative power
Of human passion. Sympathies there are
More tranquil, yet perhaps of kindred birth,
That steal upon the meditative mind,
And grow with thought."

আমরা সময়ান্তরে এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। আপাততঃ দুই একটি উদাহরণদ্বারা কবিদিগের পদার্থগত গূঢ় সম্বন্ধ আবিষ্কার বিষয়ক বাক্যটি প্রতিপন্ন করিয়া অদ্যকার মত প্রবন্ধ উপসংহার করিব।

জড়জগৎ হইতে দুইটি পদার্থ গ্রহণ করা যাউক, যেমন অন্ধকার ও ভেদ। প্রথম শব্দটি আলোক নামক পদার্থের অভাব ও দ্বিতীয়টি পরমাণুবিশ্লেষক-ক্রিয়াবিশেষের বাচক। অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, উহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কারণ ভাবপদার্থপরমাণ্বাদিনিষ্ঠ ক্রিয়া,

অন্ধকাররূপ অভাব পদার্থে থাকিতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাউক, কবি এই দুই পদার্থের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন কি না। মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত উদ্ঘাটন করিয়া দেখা গেল যে, উহাতে নিম্নলিখিত বাক্যটি আছে "রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ" উহার অর্থ —"সূচিভেদ্য অন্ধকারদ্বারা রুদ্ধালোক রাজমার্গে অর্থাৎ যে অন্ধকার সূচি (ছুঁচ) দ্বারা ভেদ করা যাইতে পারে তাদৃশ অন্ধকারদ্বারা রুদ্ধ রাজমার্গে"। অতএব দেখা গেল যে, কবির জগতে সূচি সকল অন্ধকারকে ভেদ ও অন্ধকার আবার জড়ের ন্যায় পদার্থান্তরকে রোধ করে। শুদ্ধ যে আমাদের মহাকবিই এইরূপ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রায় সকল দেশেরই মহাকবিরা এইরূপ করিয়াছেন। মহাকবি মিল্‌টনের "প্যারাডাইস্ লষ্ট্" নামক কাব্যে "Through palpable darkness made his uncouth way" এই পংক্তিটি দেখা যায়। তাহার অর্থ এই যে, যে অন্ধকার স্পর্শ করিতে পারা যায় সেইরূপ অন্ধকারের মধ্য দিয়া..........। তবেই হইল, যাহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায় তাহা ভেদও করা যায়। আমরা প্রতিপন্ন করিব যে, ঐরূপ আপাততঃ অবাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান সম্বন্ধগুলি মহাকবিগণের চিন্তাসমুদ্রোত্থিত রত্নবিশেষ; তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রতিভাশক্তির চরমফল, ও জড়জগতের পদার্থগত গূঢ় সম্বন্ধের পরিচায়ক। রুদ্ধালোকে ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্যে অন্ধকারের ঘনত্ব বর্ণনা করাই কবির অভিপ্রেত। কিন্তু তিনি ঘন, সান্দ্র, নিবিড় প্রভৃতি সাধারণ বিশেষণ ত্যাগ করিয়া "সূচিভেদ্য" এই বিশেষণটি গ্রহণ করিলেন। এইরূপ করার একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। কবি জানেন যে, আলোক অতি দুরবরোধ পদার্থ। যেমন তেমন অবরোধক, আলোক রোধ করিতে পারে না। উহা অতি সূক্ষ্ম আকাশের মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে, সুতরাং উহা সম্পূর্ণরূপে রোধ করিতে হইলে রোধক পদার্থটির পরমাণুগুলি স্বল্পাবকাশ ও দৃঢ়সন্নিবিষ্ট হইয়া চাই। "সূচিভেদ্য" এই বিশেষণটির দ্বারা ঐ উভয় ধর্ম্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, যে সকল পদার্থের অবয়বঘটক পরমাণুসকল শিথিল বা দূরবিক্ষিপ্ত, তাহাদের ভেদের নিমিত্ত সূচ্যাদি সূক্ষ্মাগ্র পদার্থের আবশ্যক হয় না। সূচি অপেক্ষা অনেক স্থূল পদার্থ দ্বারা তাহাদের ভেদ সম্ভব। তবেই দেখা যাইতেছে যে,

যেস্থানে সাধারণ লোক ঘন, নিবিড়, সান্দ্র, প্রভৃতি শব্দমাত্রে সন্তুষ্ট হয়, কবি সে স্থলে স্বীয় প্রতিভায় বস্তুতত্ত্বের মর্ম্ম স্পর্শ করেন, ও বাহ্য ও অন্তর্জগতের পদার্থসমূহের মধ্যে অতি নিপুণবুদ্ধিগ্রাহ্য শাশ্বত সম্বন্ধ সকল আবিষ্কার করেন।

এই বিষয়ে আর একটি উদাহরণ—

"দেব্যাঃ শ্রুতৌ নেতি নলার্দ্ধনাম্নি
গৃহীত এব ত্রপয়া নিপীতা।
অথাঙ্গুলীরঙ্গুলিভিঃ স্পৃশন্তী
দূরং শিরঃ সা নময়াঞ্চকার॥"

এই শ্লোকটি মহাকবি শ্রীহর্ষকৃত নৈষধ কাব্য হইতে গৃহীত। উহার অর্থ, "দেবী সরস্বতীর কর্ণে 'ন' এই নল নামের অর্দ্ধাক্ষরটি গৃহীত হইবামাত্র দময়ন্তী লজ্জাকর্ত্তৃক নিপীত হইয়া অর্থাৎ অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা অঙ্গুলিসকল স্পর্শ করিয়া স্বীয় মস্তক অবনত করিলেন।" এই শ্লোকের "ত্রপয়া নিপীতা" এই প্রয়োগের বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব। শব্দার্থ পর্য্যালোচনায় এইরূপ বোধ হয় যে, দময়ন্তী লজ্জাকর্ত্তৃক নিঃশেষরূপে পীত হইয়াছিলেন। কথাটা ভাল বোঝা গেল না। কবির অভিপ্রায় এই যে, দময়ন্তী স্বীয় পতির নামার্দ্ধ "ন" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াই যৎপরোনাস্তি লজ্জিতা হইলেন। কিন্তু কবি সেই অভিপ্রায়প্রকাশক শব্দান্তর (যুক্ত, বিশিষ্ট, সনাথ, বশীকৃত) ত্যাগ করিয়া "নিপীত" এই শব্দ প্রয়োগ করিলেন। এইরূপ করার একটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আমাদের মানসিক ভাব সকল (feelings) স্বসত্তাদ্বারা ভাবান্তর ও জ্ঞানান্তরের বিরোধী, অর্থাৎ যে সময়ে আমাদের মনে কোন ভাবের উদয় হয়, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ভাব যে পরিমাণে প্রবল থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মনে ভাবান্তর ও জ্ঞানান্তরের বিকাশও সেই পরিমাণে রুদ্ধ হয়। পরে ভাব সম্পূর্ণরূপে চিত্তভূমি অধিকার করিলে জ্ঞানান্তর ও ভাবান্তরও একেবারে তিরোহিত হয়। তখন বেদ্য (thing known) বেদক (the knower), বেদনা (the act of knowing) এই তিনটির মধ্যে প্রথম দুইটি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়। এই অবস্থাই ভাবোদয়ের চরমাবস্থা। দময়ন্তীর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে তাহাই হইয়াছে। লজ্জা তখন কেবল তাঁহার জ্ঞানান্তর ও

ভাবান্তর রোধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাঁহার সত্তা পর্য্যন্তও গ্রাস করিয়াছে। তখন দময়ন্তীর সম্বন্ধে তিনি নিজে বা জগৎব্রহ্মাণ্ড কিছুই নাই। এখন সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, "ত্রপয়া নিপীতা" (ত্রপা দময়ন্তীকে নিঃশেষরূপে পান করিয়াছে, দময়ন্তীর আত্মা একেবারে ত্রপায় লয় পাইয়াছে) এই বিশেষণে ঐ ভাবের সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি হইয়াছে কি না। তবে দেখুন, কবির এক একটি কথার মধ্যে কত গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে—কতদূর ভাবনা ও প্রতিভাবলে কবি ঐ সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

ধনুর্ব্বেদ

ধনুর্ব্বেদ যজুর্ব্বেদান্তর্গত উপবেদ। ধনুর্ব্বাণ পূর্ব্বকালে মানবের প্রধান অস্ত্র ছিল; এজন্য খড়্গ, গদা, শেল, শূল, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আয়ুধ-প্রয়োগ-বিদ্যাকে ধনুর্ব্বেদ বলা যায়।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ এই যে, ব্রাহ্মণ যাজন অধ্যাপনাদি ক্রিয়া দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে না পারিলে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন।

অগ্নিপুরাণমতে কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ধনুর্ব্বেদে অধিকার আছে। পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতির উপাখ্যান পাঠ করিলে বিদিত হইবে যে প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণযোধের অভাব ছিল না।

পূর্ব্বকালে যুদ্ধের আদর ও গৌরব বিলক্ষণ ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অধিকাংশ কেবল বীরপুরুষদিগের গুণকীর্ত্তন মাত্র।

বীরপুরুষ শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া সম্মুখ সমরে হত হইলে নিশ্চয় স্বর্গলাভ করেন, এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল।

"যত্র তত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে॥
জিতেন লভ্যতে লক্ষ্মীর্মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ।
ক্ষণবিধ্বংসিনি কায়ে কা চিন্তা মরণে রণে॥"

যে বীরপ্রসবিনী ভারতে অর্জ্জুন প্রভৃতি মহাবীর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যেখানে শৌর্য্যের এত গৌরব ছিল যে, ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত পুরাণ শূর-পুরুষের গুণগানপূর্ণ, তাহার কিরূপে এমন অধঃপতন হইল? কেনই বা তাহা এত কাল মুসলমানদের পদতলে দলিত হইল? এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না, তথাপি যতদূর সম্ভব ততদূর চেষ্টা করিব।

১—ভারতের স্বাধীনতালোপের প্রধান কারণ—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব।

বৌদ্ধধর্ম্ম সাত্ত্বিকতার পরাকাষ্ঠাস্থল; কিন্তু কেবল সত্ত্বগুণে সংসার চলে না। সত্ত্বগুণের যেমন প্রয়োজন, পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায়, রজোগুণ ও তমোগুণের তেমনই প্রয়োজন। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" সিদ্ধান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। পূর্ণ সাত্ত্বিকতা আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত বটে; কিন্তু যে পৃথিবীতে খল সর্প এবং হিংস্র শ্বাপদের অভাব নাই, যেখানে সর্প ব্যাঘ্র অপেক্ষা ক্রূর মনুষ্যও দেখিতে পাওয়া যায়, সে পৃথিবীতে আত্মরক্ষার জন্যও যদি আমরা অস্ত্রধারণ না করি, তাহা হইলে আমাদের পুরুষ বলিয়া আত্মপরিচয় না দিয়া ক্লীব বলিয়া পরিচয় দেওয়াই কর্ত্তব্য।

বুদ্ধঘোষ ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মৃগয়াজীবী ব্যাধ, কৌবেয়ব্যবসায়ী, অস্ত্রনির্ম্মাতা কর্ম্মকার এবং সৈনিক পুরুষ—সকলেই সমান পাপী, এবং ইহারা সকলেই নরকের একদেশ অধিকার করিবে। বুদ্ধঘোষ নূতন মত প্রচলিত করেন নাই। তিনি কেবল শাক্যমুনি বুদ্ধের উপদেশ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন মার্গের শিক্ষা এই যে, সৈনিক শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া রণক্ষেত্রে শায়ী হইলে নিশ্চয় স্বর্গলাভ করেন; বৌদ্ধদের শিক্ষা এই যে, তিনি শূর হউন বা কাপুরুষই হউন, তিনি

অবশ্যই নরকে যাইবেন। এই শিক্ষার প্রভাবে শৌর্য্যের গৌরব আর রহিল না। বীরের আদর না থাকায় ভারতভূমি ক্রমে বীরশূন্যপ্রায় হইল। আর্য্য-কুল-চূড়ামণি বুদ্ধদেবের অতি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাহা সাধিত হইয়াছিল। তিনি মর্ত্ত্যলোককে দেবলোকে পরিণত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন; তাহা না হইয়া সাত্ত্বিকতার কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি হইল, কিন্তু যুগপৎ ক্লৈব্যের ভীষণতর বিস্তার হইল। বিধাতার বিড়ম্বনায় অতি মহৎ কার্য্য হইতেও কখন কখন অননুভূত কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।*

২—দুরদৃষ্টবাদ, আমাদের অধঃপতনের আর একটি প্রধান কারণ। যাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস এই, যে তাহারা কলির প্রভাবে ক্রমশ অধঃপাতে যাই-তেছে, তাহারা অধঃপাতেই গিয়া থাকে। যাহারা বলিয়া থাকে যে, কলিযুগে

---

* আধুনিক জৈন মহাশয়দিগের সাত্ত্বিকতা বৌদ্ধদিগের সাত্ত্বিকতা অপেক্ষাও বিস্ময়কর। প্রায় ১৪। ১৫ বৎসর হইল, আজিমগঞ্জের একজন প্রসিদ্ধ জৈনের সহিত প্রবন্ধ-লেখকের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা লিখিত হইতেছে—

লেখক—যদি কৃষ্ণসর্প আপনার গৃহে প্রবেশ করে, তাহা, আপনি মারিবেন কি না?

জৈন—না।

লেখক—কালসর্প ধরা অপেক্ষা মারা অতি সহজ। মনে করুন, সাপ ধরার জন্য আপনি মাল বা রোজা ডাকিতে গেলেন; কালসর্প ঐ অবসরে আপনার পুত্রকে দংশন করিল। এমন জন্তুকে বধ করার দোষ কি?

জৈন—পাপ আছে। পুত্র যদি মরে, আপন অদৃষ্টে মরিবে।

লেখক—যদি আজিমগঞ্জে বাঘ আসিয়া মানুষ ও গরুর প্রতি উপদ্রব করে, আপনি তাহাকে মারিবেন কি না?

জৈন—না।

লেখক—বাঘে অনেক মানুষ হত্যা করিতেছে তাহাও ভাল, তথাপি বাঘকে মারিয়া মানুষের প্রাণরক্ষা করা উচিত নহে, ইহা কিরূপ ধর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।

জৈন—যে মানুষ মরিবে, সে আপন অসাবধানতায় বা অদৃষ্টবৈগুণ্যে মরিবে। আমি বাঘ মারিয়া পাপে পতিত কেন হইব?

জৈন মহাশয়দের এইরূপ অহিংসার প্রশংসা না করিয়া নিন্দা করাই কর্ত্তব্য। ইঁহাদের মশা, ছারপোকা, বাঘ, সাপের প্রতি যত দয়া, তত দয়া যদি হতভাগা অধমর্ণদের প্রতি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্লীবসাত্ত্বিকতা সত্ত্বেও তাঁহারা প্রশংসার পাত্র হইতেন। জৈনেরা বৌদ্ধদের ন্যায় বৈদিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা বেদ মানেন, তাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণবগণ সাত্ত্বিকশ্রেষ্ঠ; কিন্তু ইঁহাদেরও সাত্ত্বিকতায় ভণ্ডামি বা বিটকেলমো প্রবেশ করিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে "কাট" "কোট" শব্দ উচ্চারণ করা অতি গর্হিত বিবেচনা করেন; অথচ যে দেবতা 'মধুসূদন' 'মুরারি' ও 'কংসারি' নামে বিখ্যাত, তাঁহাকে সত্ত্বগুণের আধার বলিয়া উপাসনা করে—

বসুন্ধরা ম্লেচ্ছীভূতা হইবে, তাহারা ম্লেচ্ছের দাসই হইয়া থাকে। ম্লেচ্ছদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে তাহাদের হৃদয়ের সাহস এবং বাহুর বল উভয়েরই হ্রাস হয়; কারণ তাহাদের মনে হয় যে, শাস্ত্রকারদের ভবিষ্যৎবাণী অলঙ্ঘনীয় —ম্লেচ্ছগণ নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে।

শিখজাতি এই মহা অনিষ্টকর দুরদৃষ্টবাদ অতিক্রম করিয়াছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ভগবানের কৃপায় খালসা দিগ্বিজয়ী হইবে; এই কারণে শিখেরাই কিয়ৎকাল ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

মনোরমা

১

ভালবাসা নানাপ্রকার। অবস্থাভেদে ইহার প্রকারভেদ হইয়া থাকে। যেরূপ মানবের মূলপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ, কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি অবস্থাভেদে তাহা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া দাঁড়ায়—ভালবাসারও বুঝি মূলপ্রকৃতি সেইরূপ সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ, বিভিন্ন অবস্থাতেই ইহার বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ এক কথার মধ্যেই অন্য কথা অন্তর্নিবিষ্ট আছে—ভালবাসাও মানবের একটি মূলপ্রকৃতি।

আমাদিগের বঙ্গীয় কবি বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে, প্রণয়ের এই বিভিন্ন রূপ বড়ই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। তাঁহার এক একটি রমণী—এক এক প্রকারের ভালবাসা; তাঁহার এক একটি পুরুষ—এক এক প্রকারের প্রণয়! প্রণয়ই তাঁহার কাব্যের প্রধান উপাদান; এই উপাদানটি তাঁহার হস্তে এরূপ প্রকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, এতদ্দ্বারা তিনি যথেচ্ছা প্রণয়ের মূর্ত্তি গঠন করিয়া লইতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি অনেক স্থলে দেখা যায়, কিন্তু এক বৃত্তির এরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি এত স্পষ্ট ও এত মধুর আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

এক এক করিয়া তাঁহার রমণী-মূর্ত্তিগুলি পরীক্ষা কর, দেখিবে প্রায়ই প্রণয়ভেদে তাহাদের বিভিন্নতা হইয়াছে। সেই বিমলা, আয়েষা, তিলোত্তমা; সেই কপালকুণ্ডলা, পদ্মাবতী, শ্যামাসুন্দরী; সেই মৃণালিনী, মনোরমা, গিরিজায়া; সেই সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, কমলমণি; সেই শৈবলিনী, সুন্দরী, দলনী; সেই লবঙ্গলতা, রজনী; ভ্রমর, রোহিণী; শান্তি, কল্যাণী; সেই প্রফুল্ল, সাগর; নন্দা, শ্রী, রমা—ইহারা সকলেই ন্যূনাধিক সেই ভালবাসার জন্যই প্রকারভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার পুরুষগুলিও প্রায় এইরূপ—তবে পুরুষচরিত্রে ততটা প্রকারভেদ হইতে পারে নাই; ইহার কারণও আছে। শৈবলিনীর একদিকে প্রতাপ, একদিকে চন্দ্রশেখর থাকিলে যেরূপটি ঘটিয়া উঠে, সীতারামের একদিকে নন্দা, অপরদিকে রমা থাকিলে সেরূপটি ঘটিয়া উঠে না। প্রণয়ের বৈচিত্র্য অবস্থানুযায়ী রমণীতে যেরূপ দেখিতে পাইবে, পুরুষে সেরূপ দেখিতে পাইবে না। এই প্রণয় লইয়া রমণীকে যেরূপ ঘটনা-বৈচিত্র্যে পড়িতে হয়, পুরুষকে সেরূপ হয় না। ইহাই আমাদিগের সামাজিক গঠন—তাই পুরুষের প্রণয়-বৈচিত্র্য অপেক্ষা রমণীর প্রণয়-বৈচিত্র্যই বঙ্গীয় কাব্যে অধিক দেখিয়া থাকি।

এই প্রণয়-বৈচিত্র্য বঙ্কিম বাবু তাঁহার কাব্যের মধ্যে কারণসহ অতি সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন। যেরূপ অবস্থায় ভালবাসা যেরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিনি সেইরূপ অবস্থা আঁকিয়া, সেইরূপ ভালবাসার মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। সর্ব্বত্রই যে তিনি এইরূপ করিয়াছেন, এরূপ নহে—কোন কোন স্থলে আমরা সেই মূর্ত্তিই দেখিতে পাই, তৎপ্রতি কারণ বড় একটা দেখিতে পাই না। বাল্যাবস্থার কথা না জানিলে এ কারণ সহজে ব্যাখ্যা করার সম্ভব নাই। কিন্তু যেখানে তিনি এইরূপ গোড়ার কথা পাঠকবর্গকে বলিয়া দিয়াছেন, সেইখানেই আমরা কারণসহ ভালবাসার এক একটি মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কপালকুণ্ডলা, ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী প্রভৃতির কথা মনে করিয়া এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

আমাদিগের শীর্ষোক্ত মনোরমাও ভালবাসার সেইরূপ একটি মূর্ত্তি। অবস্থাধীন এই মূর্ত্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়াছে। সেই অবস্থা ও তজ্জাত সেই মূর্ত্তিটির অবয়বগুলি আমরা অদ্য আলোচনা করিব ইচ্ছা করিয়াছি।

এ সময়ে পাঠকবর্গকে একবার কপালকুণ্ডলাকে স্মরণ করিতে হইবে। পার্থক্য তুলনা হইতেই জাত—তুলনা করিয়া না দেখাইলে সে পার্থক্য ভাল বুঝা যাইবে না। আমরা তাই কপালকুণ্ডলার অবস্থার সহিত মনোরমার অবস্থা তুলনা করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইব, অবস্থাভেদে কিরূপে মূর্ত্তিভেদ হইয়া থাকে। ক্ষেত্রাদির দোষগুণে, একপ্রকার শস্যের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতি প্রাপ্তির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে মনের গঠনও ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা বঙ্কিম বাবু তদীয় কাব্যমধ্যে জলন্ত অক্ষরে লিখিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলার ভিত্তি বা পূর্ব্ব পরিচয় এইরূপ—

কপালকুণ্ডলা বাল্যকালে নৌকাপথে তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া কোনও এক সমুদ্রতটে পরিত্যক্ত হয়েন। সেই সাগরতীরে, প্রকৃতির নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে এক দুরন্ত কাপালিক তাঁহাকে প্রতিপালন করে। কাপালিক ঘোর নিষ্ঠুরপ্রকৃতি—মানববধে তাহার ধর্ম্ম। সে সেই বিজন প্রদেশে নরবলি ইত্যাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা ভবানীর সাধনা করিত। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ভগবতী ইহাতেই সাধকোপরি প্রসন্না থাকেন। সেই বিজন কাননে আরও একটি বৃদ্ধ ভবানীভক্ত ছিল। তাহার সহিত কপালকুণ্ডলার স্নেহ ভক্তি বিনিময় হইত। সেই বৃদ্ধ অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করিতেন।

এই ভিত্তি হইতে, কিরূপে ঘটনার পর ঘটনা সংযোগে কপালকুণ্ডলা নির্ম্মিতা হইয়াছিল, তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। এখন আমরা মনোরমার কথা বলিব।

মনোরমার ভিত্তি এইরূপ—

কাশীধামে কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে তাঁহার এক কন্যা ছিল—অষ্টমবর্ষে কেশব পশুপতি নামক কোন এক ব্রাহ্মণকুমারের সহিত তাহার বিবাহ দেন। একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ কেশবের নিকটে গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, কেশবের কন্যা অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে। কেশব এই ভয়ে বিবাহের রাত্রেই কন্যা লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। পশুপতির সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না।

অল্পবয়সেই হৈমবতীর মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, কিছুদিন পরে আবার পিতৃবিয়োগও ঘটিল। মৃত্যুকালে কেশব জনার্দ্দন নামে তাঁহার এক আচার্য্যের হস্তে হৈমবতীকে সমর্পণ করিয়া যান। আচার্য্য শিষ্যের নিকট প্রতিশ্রুত থাকেন, পশুপতির সহিত সেই কন্যার পরিণয়কাহিনী কখনও তিনি পশুপতি কিম্বা হৈমবতীর নিকট প্রকাশ করিবেন না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে জনার্দ্দন নবদ্বীপে গমন করিয়া এক প্রাচীনা শক্তিহীনা ব্রাহ্মণীর সহিত মনোরমাকে লইয়া একখানি পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিতান্ত দরিদ্র ও নিঃসহায় ছিলেন। কিছুদিন পরে প্রবল বাত্যায় ইহাদের সেই পর্ণকুটীরটিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তদবধি ইহারা এক বৃহৎ রাজপুরীর একাংশে রাজানুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। ওদিকে পশুপতি কাল-ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়া নবদ্বীপের ধর্ম্মাধিকার-পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তখন পর্য্যন্তও দারান্তর পরিগ্রহ করেন নাই।

কালক্রমে হৈমবতীর জ্ঞানসঞ্চার হইলে, তিনি জানিতে পারিলেন যে, পশুপতি তাঁহার স্বামী। এই সংবাদ জানিবার পূর্ব্বে তিনি আপনাকে বিধবা বলিয়াই জানিতেন। অন্যের নিকটে তিনি বিধবা বলিয়াই পরি-চিত ছিলেন। পশুপতির সহিত তাঁহার নির্জ্জনে প্রণয়ালাপ হইত। পশু-পতি হৈমবতীকে চিনিতেন না, কিন্তু তৎপ্রতি তিনি একান্ত আসক্ত ছিলেন। হৈমবতী এ কথাও জানিতেন।

ইহাই মনোরমার প্রকৃত ভিত্তি বা পূর্ব্বপরিচয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া লইতে হইবে। কথাটি এই—

নবদ্বীপে পশুপতি ও মনোরমার আবাস-সন্নিকটে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকার তীরে কতকগুলি বট, অশ্বত্থ, পাইন,বকুল, প্রভৃতি প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি অতি ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। এমন ভাবে ছিল, যে দিবসেও সেই দীর্ঘিকাতীর ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। এমন অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা ঘটিল। কিম্বদন্তী হইল যে, সেই সরোবরে ভূতযোনী বিহার করিয়া থাকে। সুতরাং সে স্থানে বড় একটা কেহ গমন করিত না। কিন্তু হৈমবতী এই স্থানে সর্ব্বদা আগমন করিতেন। একদিন হেমচন্দ্র তাঁহার নিকটে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে রাত্রে তাঁহার গা জ্বালা করে,

তাই মধ্যে মধ্যে এই সরোবরে তিনি স্নান করিতে আসিয়া থাকেন। এই কপালকুণ্ডলা ও মনোরমার ভিত্তিস্বরূপ যাহা বলা হইল, তাহা এক-প্রকার দার্শনিক কাব্য। কপালকুণ্ডলায় সে কাব্য অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার —মনোরমায় তাহা কিছু জটিল। কিন্তু দুইটি চরিত্রেই ইহার প্রত্যেক কথা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। মনোরমার এই পূর্ব্বপরিচয় না বুঝিলে, তাহার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত থাকে। এই বাঁধনি বা পূর্ব্বপরিচয় কবির একটি অতি অদ্ভুত কাব্য-কৌশল। ক্রমে তাহা বিশদ হইবে।

আরও একটি কথা এখানে বলিয়া লইতে হয়। পাঠকবর্গ কপালকুণ্ডলা ও হৈমবতীর অবস্থার সামঞ্জস্য ও পার্থক্য একটু ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিবেন, কারণ আমাদিগের মনোরমায় সেই কপালকুণ্ডলা কিয়ৎপরিমাণে বিরাজিত রহিয়াছেন। মনোরমা বুঝিতে হইলে কপালকুণ্ডলা বুঝিতে হয়।

ভিত্তির কথা একরূপ বলা হইয়াছে। এখন তদুপরি-গঠিত মূর্ত্তির কথা বলিতে হইবে। পরিশেষে সেই ভিত্তি ও মূর্ত্তির সম্বন্ধের কথা বলা যাইবে। ফলতঃ তাহাই আমাদিগের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

মনোরমার আকৃতি গ্রন্থকার দুই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। এক প্রকার হেমচন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া, অন্যপ্রকার পশুপতির সম্মুখে ধরিয়া। এই উভয়ের নিকটে, তাঁহার দ্বিবিধ মূর্ত্তিই প্রকাশিত হইত সত্য, তবু যেন দুই জনের কাছে দুই মূর্ত্তিই কিছু বেশি ফুটিত। আমরা 'মৃণালিনী' হইতে উক্ত স্থানগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল সম্মুখে একখানি "কুসুম-নির্ম্মিতা দেবী-প্রতিমা"। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, "প্রতিমা সজীব"; তৃতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা নাই, বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল-সীমা-রূপিণী "বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।"

সেই বাপীকুলের, আকৃতিও বলিয়া রাখি। হেমচন্দ্র সহসা চমকিত হইয়া দেখিলেন, "চন্দ্রালোকে, সর্ব্বাধঃস্থ সোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসন-পরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল।

শ্বেতবসনা, অবেণীসম্বদ্ধকুন্তলা; কেশজাল স্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযুগল, মুখ-মণ্ডল, হৃদয়, সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।”

পাঠকবর্গের এই বর্ণনা দুইটি পাঠ করিয়া আর কাহাকেও মনে পড়ে কি? অন্যত্র—

“সেই রত্নপ্রদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোক-বিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। মনোরমা নিতান্ত খর্ব্বাকৃতা নহে, তবে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, তাহার হেতু এই যে, মুখকান্তি অনির্ব্বচনীয় কোমল, অনির্ব্বচনীয় মধুর; নিতান্ত বালিকাবয়সের ঔদার্য্যবিশিষ্ট; সুতরাং হেমচন্দ্র যে তাঁহার পঞ্চদশ-বৎসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় হয় নাই। মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ কি ষোড়শ, কি তদধিক, কি তন্ন্যূন, তাহা ইতিহাসে লিখে না। পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।”

“মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাহার রূপরাশি অতুল—চক্ষে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্ব্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোণার চাঁপা; তাহাতে ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; এক্ষণে বাপীজল সিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত নির্ম্মল ললাট; ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল; মুহুর্মুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা; অধরোষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত, প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন রক্ত-কুসুমাবলীর স্তরযুগল তুল্য। কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাম্বুবিস্তারবৎ প্রসন্ন; শাবকহিংসাশঙ্কায় উত্তেজিতা হংসীর ন্যায় গ্রীবা,—বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশ সকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিরদ-রদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিম্বা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিম্বা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত,—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে, মনোরমার রূপরাশি কেবল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ সৌকুমার্য্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার; অধর, ভ্রূযুগ, ললাট সুকুমার; সুকুমার কপোল; সুকুমার কেশ। অলকাবলী

যে ভুজঙ্গশিশুরূপী সেও সুকুমার ভুজঙ্গশিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে, সৌকুমার্য্য; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে সৌকুমার্য্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য্য। সুকুমার চরণ, চরণবিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার, বসন্ত-বায়ুসঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য; বচন সুকুমার, নিশীথ সময়ে জলরাশিপার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য; কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্রজন্য মেঘমালাযুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য, আর এই যে মনোরমা দেবী গৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,—পশুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমুখী, নয়নতারা ঊর্দ্ধস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র, অবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ হস্তে ধরিয়া, একারণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্ত্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছেন,—ও ভঙ্গীও সুকুমার; নবীন সূর্য্যাগ্রে সদ্যঃপ্রফুল্ল দলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার। সেই মাধুর্য্যময় দেহের উপর দেবীপার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোক পতিত হইল। পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন।”

এইটি মনোরমার “মোহিনী” মূর্ত্তি।

সেই গম্ভীরনাদী বারিধিকূলে, সন্ধ্যালোকে ক্লান্ত নবকুমারের চক্ষে সেই কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তি দেখিয়াছ; অদ্য এই রত্নপ্রদীপদীপ্ত দেবীমন্দিরে চন্দ্রালোক-বিভাসিত দ্বারদেশে দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে মুগ্ধ ধর্ম্মাধিকার পশুপতির চক্ষে এই মনোরমা মূর্ত্তি অবলোকন কর। কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাও কি? কপালকুণ্ডলাকে যদি মনোরমার সমাজে পুষিয়া লওয়া যাইত, তবে তাহাতে এ মনোরমামূর্ত্তি দেখিতে পাইতে কি?

আবার হৈমবতীর এ মনোরমামূর্ত্তি ছাড়িয়া মনোরমার এক মনোরমা-মূর্ত্তি দেখ—

“পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য্য-সাগরের এক অপূর্ব্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন সূর্য্যের প্রখর করমালায় হাস্যময় অম্বুরাশি মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার (হৈমবতীর) সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকা-সুলভ ঔদার্য্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত, প্রশস্ত

বয়সেরও দুর্লভ গাম্ভীর্য্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল। পশুপতি কহিলেন, 'মনোরমে, এতরাত্রে কেন আসিয়াছ?—এ কি? আজি তোমার এ ভাব কেন'?" (শেষের অংশটুকুও মনোরমার রূপবর্ণনা)।

এইটি মনোরমার চিন্তাশালিনী গম্ভীরা মূর্ত্তি।

এই দুই আকৃতি বা প্রকৃতি পশুপতি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, মনোরমার দুই মূর্ত্তি—"এক মূর্ত্তি 'আনন্দময়ী, সরলা, বালিকা,' অন্য মূর্ত্তি 'গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রখরবুদ্ধিশালিনী'।" এই দ্বিবিধ মূর্ত্তি এইস্থলে একের পরে অন্যটি কেন প্রকটিত হইল, তাহা আমরা পরে বলিব, এখন এই দুই মূর্ত্তি বা প্রকৃতি মনোরমার কিরূপে গঠিত হইয়াছিল, তাহাই বলি।

মনোরমা যে আকৃতি বা প্রকৃতিতে আনন্দরূপিণী অলৌকিক সরলা বালিকা, সেই আকৃতিমধ্যে আমরা কপালকুণ্ডলা অথবা মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই রূপও সেই—কথাবার্ত্তাও তদনুরূপ। শৈশবে যে যে ভাবে পালিতা হয়, যৌবনেও তাহার সে ভাব অন্তর্হিত হয় না। নির্জ্জনে পরিবর্দ্ধিতা মাতৃহীনা কপালকুণ্ডলা ও কুন্দনন্দিনীর ন্যায় হৈমবতীও শৈশবে পালিতা হইয়াছিলেন। অবস্থানুযায়ী হৃদয়ের স্নেহভাগ ইহাদের সকল মধ্যেই কিছু অধিকতর প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাঁরা সংসারে থাকিয়াও একরূপ সংসার-ছাড়া ছিলেন। ইহা ইহাদের অলৌকিক সরলতার একটি প্রধান কারণ। অন্য সম্বন্ধে একমাত্র কারণ বলিলেও চলে, মনোরমা সম্বন্ধে আমরা ইহাকে একটি প্রধান কারণ বলিব। কারণ, মনোরমার এ প্রকৃতির কারণান্তরও পরিদৃষ্ট হয়।

মনোরমার অপর প্রকৃতিটি কিছু মিশ্র, জটিল, সুতরাং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বারান্তরে আমরা তাহাই বলিব।

ক্রমশঃ

সংসার-সঙ্গিনী

১

দাঁড়াও আলোকময়ি,
এ ঘোর সংসার-পথে ;
এ ঘোর নিশীথে আমি
পথ-হারা বন-ভূমে,
শ্রান্ত ক্লান্ত পা দু'খানি
বন-ভূমি চুমে চুমে,
অবসন্ন দেহ প্রাণ
চাহিছে বিরাম স্থান,
কাতরে বহিছে বারি
নিদ্রাতুর আঁখি হ'তে,
দাঁড়াও সংসার পথে !

২

দাঁড়াও আনন্দময়ি,
এ ঘোর সংসার-পথে ;
হেথা যে দুর্ব্বল প্রাণে
আশার নিরাশ খেলা,
প্রাণের আনন্দ নাশে
সারা নিশি সারা বেলা ;
পেয়ে ও করুণা-ধারা
হাসে চন্দ্র, ফুটে তারা,
ঢাল ও শান্তির বারি,
এ শ্রান্ত শরণাগতে
দাঁড়াও সংসার-পথে !

৩

দাঁড়াও করুণাময়ি,
এ ঘোর সংসার-পথে ;
করুণার তরে আমি
আকুল জগত ঘুরে,
এখানে পেয়েছি দেখা
জগতের অতি দূরে,
বিশদ করুণা-রেখা
যেন ও ললাটে লেখা,
যেন ও হৃদয় মগ্ন
জগতের মহাব্রতে,
দাঁড়াও সংসার-পথে !

৪

দাঁড়াও মঙ্গলময়ি,
এ ঘোর সংসার-পথে ;
জগতের কার্য্য যত
তোমার করুণা লভি',
আশা হয় মনে যেন
সাধিতে পারিব সবি,
এ বিশ্বে ঢালিতে প্রীতি
প্রীতিরাশি মূর্ত্তিমতী
তোমারে এ কোন্ বিধি
মিলাইল কোথা হ'তে,
এ ঘোর সংসার-পথে !

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ।

পাশ্চাত্য দর্শন*

ন্যায়বাক্য ও ব্যাপ্তি।

বেদার্থ সংগ্রহ করিবার জন্য দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাই অনন্য উপায়। সুতরাং দর্শনশাস্ত্রের মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য নূতন আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু এস্থলে এই তর্কের উদয় হইতে পারে যে, যে দর্শন শাস্ত্রের মাহাত্ম্য অধ্যাপক মহাশয়েরা স্বীকার করেন তাহা প্রাচীন দর্শন; অতএব তদ্বিষয়ের মাহাত্ম্য যে পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রাদিতেও বর্ত্তিবে, ইহা সংশয়বিহীন নহে। এই তর্কের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত দুটি কথা স্মরণ করিতে হইবে। (১) বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদিগের অবস্থা, আর (২) এই গ্রন্থের মূলীভূত সংকল্প, অর্থাৎ আমি যে বিষয়ী লোকদিগের উদ্দেশে লিখিতে বসিয়াছি, তাঁহাদের নিমিত্ত পাশ্চাত্য দর্শনের আবশ্যকতা আছে কি না।

ইদানীন্তন লোকের মনে ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল সংশয়ের উদয় হইতে দেখা যায়, তাহা পাশ্চাত্য শাস্ত্রমূলক, এবং তাহার প্রতিবাদ করণার্থ ঐ মূলীভূত শাস্ত্রে কিয়ৎপরিমাণে দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। অন্যথা, আচার্য্যকে উপদেশ দাতার পদ হইতে অবসৃত হইতে হইবে। আমি তাহার প্রতিবিধানের আকাঙ্ক্ষাতেই এই গ্রন্থ লিখিতেছি। অতএব পাশ্চাত্য দর্শনকে বর্জ্জন করা যাইতে পারে না। আর দ্বিতীয় কথা যাহা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, বিষয়ী লোকেরা নিরবচ্ছিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহারা যুক্তি অন্বেষণ করেন, এবং আমাদিগের শাস্ত্রের যুক্তি সংগ্রহ করিতে হইলে অগত্যা পাশ্চাত্য প্রথা ও পাশ্চাত্য দর্শনের অনুকরণ করিতে হইবে। ফলতঃ প্রাচীন দর্শনে বৌদ্ধ চার্ব্বাকাদি মতের বিচার অনেক দেখা যায়। ঐ সকল মত বেদবিরোধী বলিয়া যে তাহাতে দৃষ্টিপাত করাও নিষিদ্ধ, দার্শনিকদিগের আচরণে এরূপ সংকল্প দেখা যায় না। অতএব পাশ্চাত্য মতের স্থলেই বা এতাদৃশ বিপক্ষতা করা কেন ন্যায় সঙ্গত হইবে? "পাশ্চাত্য দর্শন কদাচ পাঠ করিব না,

---

* লেখকের "সনাতন ধর্ম্মশিক্ষা" নামক অসম্পূর্ণ হস্তলিপি হইতে উদ্ধৃত।

প্রতিবাদের প্রয়োজনার্থেও পাঠ করিব না।” এতাদৃশ বিপক্ষতা বুদ্ধিসঙ্গত এবং শাস্ত্রসঙ্গত, হওয়া দূরে থাকুক, ইহা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীগণের পক্ষে এক প্রকার আত্মঘাতী আচরণ বলিতে হইবে। এরূপ বাসনা সফল হইলে পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের যত ক্ষতি হউক না হউক, সনাতন ধর্ম্মের শাস্ত্রাদি বিনাশেরই বিলক্ষণ উপায় হইবে।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। পাশ্চাত্য দর্শনে যে কোন সার বস্তু নাই, এতাদৃশ কথার উদয় কোথা হইতে হইল? উক্ত দর্শন না দেখিয়াই কি স্থির করিতে হইবে যে উহা অগ্রাহ্য? যাঁহারা এত অদ্ভুত যন্ত্র, এমন উৎকৃষ্ট কার্য্যপ্রণালী এবং এতাদৃশ গভীর রাজনীতি প্রয়োগ করিতেছেন, তাঁহারা যে দর্শনশাস্ত্র ও পরমার্থ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে ব্যুৎপত্তিবিহীন, এরূপ অনুমিতি কোনমতে দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে। অতএব পাশ্চাত্য দর্শনের কয়েকটি মূলতত্ত্ব উপলব্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। এমন কি, আমার এত দূর প্রত্যাশা হয়, যে তদ্দ্বারা আমাদিগেরই ধর্ম্মশাস্ত্রের অভীষ্ট অপেক্ষাকৃত সুগম উপায়ে সুসিদ্ধ হইবে।

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ অনুমান। এই ‘অনুমান’ শব্দ পাশ্চাত্য ‘deduction’ শব্দের মর্ম্মজ্ঞাপক এবং সচরাচর যে ‘আন্দাজি কথার’ পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইতে সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন। স্বয়ং ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থবিশেষ হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া ভাল।

৩৩—যথার্থানুভবশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রত্যক্ষানুমিত্যুপমিতিশাব্দভেদাৎ। তৎকরণমপি চতুর্ব্বিধং প্রত্যক্ষানুমানোপমান শব্দভেদাৎ * * * *। ৩৪—অনন্যথাসিদ্ধকার্য্যনিয়তপূর্ব্ববৃত্তিঃ কারণম্। * * *। ৩৮—অনুমিতি করণমনুমানম্। পরামর্শজন্যং জ্ঞানমনুমিতিঃ। ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ। যথা বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ং পর্ব্বত ইতি জ্ঞানং পরামর্শঃ। তজ্জন্যং পর্ব্বতো বহ্নিমানিতি জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ। যত্র যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরিতি, সাহচর্য্য নিয়মো ব্যাপ্তিঃ। ব্যাপ্যস্য পর্ব্বতাদিবৃত্তিত্বং পক্ষধর্ম্মতা। ৩৯—অনুমানং দ্বিবিধং, স্বার্থং পরার্থঞ্চ। স্বার্থং স্বানুমিতি হেতুঃ। তথাহি। স্বয়মেব ভূয়ো ভূয়ো দর্শনেন যত্র যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরিতি মহানসাদৌ ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা পর্ব্বত

সমীপং গত্বা তদ্গতে চাগ্নৌ সন্দিহানঃ পর্ব্বতে ধূমং পশ্যন্ ব্যাপ্তিং স্মরতি যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরিতি। তদনন্তরং বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ অয়ং পর্ব্বত ইতি জ্ঞান-মুৎপদ্যতে। অয়মেব লিঙ্গপরামর্শ ইত্যুচ্যতে। তস্মাৎ পর্ব্বতো বহ্নিমানিতি জ্ঞানমনুমিতিরুৎপদ্যতে। তদেতৎস্বার্থানুমানম্।

অন্নভট্টকৃত তর্কসংগ্রহ।

ইহার ভাষান্তর এই—

প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং বাচনিক এই বিভেদ অনুসারে চারি প্রকার যথার্থ অনুভব গণিত হয়। আর প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ এই চারি ক্রিয়া হইতেই উক্ত চারিপ্রকার অনুভব উৎপন্ন হয় * * * *। কার্য্যের অন্যথাবিহীন নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী যে ঘটনা হয়, তাহাকেই কারণ বলা যায় * * * *। অনুমানক্রিয়া হইতেই অনুমিতি হয়। "এই পর্ব্বত বহ্নিব্যাপ্যধূমবিশিষ্ট" ইত্যাকার জ্ঞানকে পরামর্শ বলে। আর ইহা হইতে "এই পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট" ইত্যাকার যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে অনুমিতি বলে। যে যে স্থানে ধূম, সেই সেই স্থানে অগ্নি থাকে, এই সাহচর্য্যের নিয়মকে ব্যাপ্তি বলে। ব্যাপ্য বস্তু পর্ব্বতাদি যে যে স্থানে বর্ত্তে, সেই স্থানের বৃত্তিকে পক্ষধর্ম্মতা বলে। এইরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানকে পরামর্শ বলে, এবং পরামর্শজন্য জ্ঞানকে অনুমিতি বলে।

অনুমান দ্বিবিধ; স্বার্থ ও পরার্থ। স্বার্থানুমানক্রিয়া স্বকীয় অনুমিতির হেতু। যথা—পাকশালাদি যে যে স্থানে ধূম থাকে সেখানে অগ্নিও থাকে, স্বয়ং ভূয়োভূয় দর্শন দ্বারা এই ব্যাপ্তিগ্রহ পূর্ব্বক পর্ব্বত সমীপে যাইয়া তাহাতে অগ্নি থাকা সন্দেহ করিবে, পরে পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া, যেখানে ধূম সেখানে অগ্নি, এই ব্যাপ্তি স্মরণ করিবে। তদনন্তর, এই পর্ব্বত বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবিশিষ্ট, এই যে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, তাহাকে লিঙ্গপরামর্শ বলিয়া জানিবে। তাহা হইতে, এই পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট, আবার এই যে জ্ঞান জন্মিবে তাহাকে স্বার্থানুমান বলিয়া জানিবে।

অনন্তর পরার্থ অনুমান দ্বারা অন্যের বোধ জন্মাইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহার বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা পঞ্চাবয়ব বাক্য নামক বাক্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

পর্ব্বতটি বহ্নিমান্,	ইহার নাম প্রতিজ্ঞা। (১)
ধূমবিশিষ্টতা হেতু,	,, হেতু বা অপদেশ। (২)
যাহা যাহা ধূমবান্ তাহাই বহ্নিবিশিষ্ট; যথা, পাকশালা,	,, দৃষ্টান্ত বা নিদর্শন। (৩)
এই পর্ব্বত সেইরূপ বস্তু,	,, উপনয় বা অনুসন্ধান। (৪)
অতএব ইহাও সেইরূপ বহ্নিবিশিষ্ট,	,, নিগমন বা প্রত্যাম্নায়। (৫)

উল্লিখিত পঞ্চাবয়ব ন্যায়-বাক্যের বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখিয়াছি। বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে শঙ্কর মিশ্র কৃত উপস্কর গ্রন্থে নিম্নলিখিত কথাগুলি পাইয়াছি—

"তচ্চানুমানং দ্বিবিধং স্বার্থং পরার্থঞ্চ; তত্র স্বার্থং স্বয়মেব ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতয়োরনুসন্ধানাৎ, পরার্থঞ্চ পরোদীরিতন্যায়জন্যব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানাৎ ন্যায়শ্চ তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শপ্রয়োজকশব্দজ্ঞানজনকবাক্যম্ 'তদবয়বাশ্চ পঞ্চ তত্রাবয়বত্বং তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শপ্রয়োজকশাব্দজ্ঞানজনক বাক্যত্বং তানি চ বাক্যানি প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানি তত্র প্রতিজ্ঞা—উদ্দেশ্যানুমিত্যানুমানাতিরিক্তবিষয়কশাব্দজ্ঞানজনকং ন্যায়াবয়ববাক্যম্ হেতুশ্চ প্রকৃতসাধনগতপঞ্চম্যন্তো ন্যায়াবয়বঃ উদাহরণন্তু প্রকৃত সাধ্যাসাধনাবিনাভাবপ্রতিপাদকো ন্যায়াবয়বঃ* উপনয়নশ্চা বিনাভাববিশিষ্টস্য হেতোঃ পক্ষবৈশিষ্ট্যপ্রতিপাদকো ন্যায়াবয়বঃ, নিগমনন্তু পক্ষে প্রকৃতসাধ্যবৈশিষ্টপ্রতিপাদকো ন্যায়াবয়ব এবঞ্চ প্রবর্ত্ততে ন্যায়ঃ

শব্দোঽনিত্যঃ
কৃতকত্বাৎ
যদ্যৎকৃতকং তদনিত্যং
অনিত্যত্বব্যাপ্য কৃতত্ববাংশ্চায়ং
তস্মাদনিত্যঃ।

* এই কথাগুলি গফ সাহেব এই প্রকারে ইংরাজি করিয়াছেন। The instance or example is a member of the Syllogism that the given major is not absent from the middle.

এতেষামেব প্রতিজ্ঞাপদেশ নিদর্শনানুসন্ধান
প্রত্যাম্নায়া ইত্যন্বর্থা বৈশেষিকানাং সংজ্ঞা।*

তর্কসংগ্রহ অনুসারে পঞ্চাবয়ব ন্যায় বাক্যের তৃতীয় অবয়বটি এই—

যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্—যথা মহানসঃ

যাহা যাহা ধূমবান্ তাহাই বহ্নিবিশিষ্ট—যথা পাকশালা।

আর বৈশেষিক দর্শনের কথামতে উক্ত অবয়ব এইরূপ—

যদ্‌যৎকৃতকং তদনিত্যং

যাহা যাহা কৃত তাহাই অনিত্য।

এখানে "যথা মহানসঃ" ইত্যাকার কোন দৃষ্টান্ত নাই।

পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রে স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান মধ্যে বিভেদ নাই, সুতরাং কোথাও এমন হয় না যে, কেবল লিঙ্গপরামর্শ হইতেই অনুমিতির উদয় হইবে, অথবা তন্নিমিত্তে পাঁচটি অবয়ব একত্র না করিলে নয়। পাশ্চাত্য ন্যায়ে তিনটি মাত্র অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়। উহা এইরূপে বিন্যস্ত হইতে পারে।

যাহা যাহা ধূমবান্ তাহাই বহ্নিবিশিষ্ট;
এই পর্ব্বত ধূমবান্,
অতএব এই পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট।

অথবা

সকল মনুষ্যই মৃত্যুবশ;
রাম একজন মনুষ্য,
অতএব রাম মৃত্যুবশ।

পরন্তু ডাক্তার ব্যালান্টাইন নামক এক জন পাশ্চাত্য ও প্রাচীন উভয় দর্শনাভিজ্ঞ মহাপণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন যে,

The first normal difference that requires to be noticed is the fact that whilst European logic employs a

---

* The *Vaiseshika* aphorisms of Kanada with comments from the *Upaskara* of Sankara Misra and the *Vivritti* of Joya Narayan Tarkapanchanana, Translated by A. E. Gough, Benares: E. J. Lazarus London, Trubner & Co. 1873 pp 283—86.

phraseology founded on classification, the Nyaya goes to work with the terms on which the classification is based. The former infers that kings are mortal because they are men, a class of beings who are mortal, the latter, arrives at the same inference by means of the consideration that mortality is inherent in humanity and humanity in kings.

ইহার বাঙ্গালা এই—

ইউরোপীয় ন্যায়শাস্ত্রে যে ভাষা প্রয়োগ হয়, তাহা পদার্থের বর্গবিন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট হয়। আর সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে যে সকল পদ বা শব্দ দ্বারা বিচার করিতে হয়, তাহা বর্গ বিন্যাসের ভিত্তির স্বরূপ। প্রথমোক্ত শাস্ত্র অনুসারে এই অনুমিতি হইবে যে, রাজারা মৃত্যুবশ যেহেতু তাঁহারা নর; নর কি? না, এমন কোন জীববর্গ, যাহারা মৃত্যুবশ। আর শেষোক্ত শাস্ত্রে প্রাগুক্ত অনুমিতি এইরূপ বিচার দ্বারা হইবে যে, মরণশীলতা নরগণ সম্বন্ধে, এবং নরত্ব রাজগণ সম্বন্ধে নিয়ত সাহচর্য্য ধারণ করে। প্রস্তাবিত শাস্ত্রদ্বয় মধ্যে এই বিভেদটি সর্ব্বাগ্রে লক্ষিত হইবে এবং উহা যে নিয়ত বিদ্যমান আছে, তাহার প্রতিও লক্ষ্য থাকা আবশ্যক।

এতদ্ভিন্ন আর একটি কথা আছে। সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অবয়বে যে ব্যাপ্তি প্রকাশ হয়, উহাতে দুটি পৃথক এবং প্রকাণ্ড ব্যাপার থাকে। এক, ভূয়োদর্শন দ্বারা ব্যাপ্তি পরিগ্রহ করা। আর সেই ব্যাপ্তি বিষয়ান্তরে উপনয় পূর্ব্বক একটি অনুমিতি স্থির করা। তাহার কথা পরে বলিতেছি, আপাততঃ পাঠক দেখিবেন যে, ন্যায় বাক্যের তৃতীয় অবয়বে ব্যাপ্তিগ্রহ এবং তাহার মূলীভূত ভূয়োদর্শনের দৃষ্টান্ত এই দুই কথাই বিদ্যমান থাকে। যাহা যাহা ধূমবান্ তাহাই বহ্নিমান্ এই ব্যাপ্তি প্রকাশ থাকে, আবার সেই সঙ্গে 'যথা মহানস' ভূয়োদর্শনের এইরূপ একটি দৃষ্টান্তও থাকে। কিন্তু কোন কোন স্থলে তাদৃশ দৃষ্টান্তের অভাবও দেখা যায়। 'যদযৎকৃতকং তদনিত্যং' এই স্থলে ভূয়োদর্শনের কোন দৃষ্টান্তই ব্যক্ত হয় নাই। কেবল সাধ্যসাধনের মধ্যে পরস্পরের অবিনাভাব ব্যক্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য ন্যায়ে

এরূপ দৃষ্টান্ত কখনই থাকে না, কেবল অবিনা ভাব প্রকাশিত হয়। আর সংস্কৃত ন্যায়ের চতুর্থ অবয়বে আবার "বহ্নিব্যাপ্যধূমবাংশ্চায়ং" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তির উপনয় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া "অয়ং" পর্ব্বতের পক্ষধর্ম্মতা ব্যক্ত করিতে হয়। পাশ্চাত্য ন্যায়ে তাদৃশ দ্বিরুক্তি থাকে না। পূর্ব্ববাক্যের প্রদর্শিত ব্যাপ্তি লক্ষ্য করিয়া "এই পর্ব্বত ধূমবান্" এইমাত্র কথা ব্যক্ত হয়।

সংস্কৃত ন্যায়বাক্য মধ্যে এই যে জটিলতা দৃষ্ট হইল, তাহার দুটি উদ্দেশ্য আছে। চতুর্থ অবয়বটি স্বার্থানুমানের অন্তর্গত লিঙ্গপরামর্শের সহিত অভিন্ন। কিন্তু তৃতীয় অবয়বে পরার্থ অনুমানের উদ্দেশে সেই পরামর্শের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূয়োদর্শনটিও ব্যক্ত হয়, এবং কোন পূর্ব্বপক্ষকে নিরস্ত করিবার উদ্দেশে তাহা আবার সদৃষ্টান্ত ব্যক্ত করিতে হয়। স্বার্থানুমান স্থলে যে সকল কথা সংস্কারগত বলিয়া অব্যক্ত থাকে, পরমার্থানুমান স্থলে তাহা অগত্যা ব্যক্ত করিতে হয়। অতএব স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানের বিভেদ হেতুই এই জটিলতা উৎপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য ন্যায়বাক্যে তাহার প্রয়োজনই হয় না। আর ইদানীন্তন বাদ-প্রতিবাদ স্থলে ছল, জল্প, নিগ্রহাদি যখন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন প্রাগুক্ত জটিলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্থ অবয়বটি সংক্ষেপ করা অসাধ্য নহে।

ক্রমশঃ

মাসিক সংবাদ

কৃষ্ণের মহিমা বাঙ্গালায় প্রচারিত হইতেছে। এত কালের পর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেক কৃষ্ণভক্ত দেখা যাইতেছে। শুনা যায়, মান্দ্রাজ অঞ্চলেও ঐরূপ ঘটিতেছে। কিন্তু ইউরোপীয়েরাও যে কৃষ্ণমহিমা বুঝিতে আরম্ভ করিবে, ইহা আশার অতীত। অথচ তাহাও ঘটিতেছে। বিখ্যাত ফরাশী *Revue des Deux Mondes* নামক পত্রের গত সংখ্যায় কৃষ্ণ সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত লেখক (M. Schure) যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ইংরাজি অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"We cannot therefore, as is the manner of most European savants, explain a figure like that of Krishna by saying it is an old woman's fable dovetailed into a solar myth with a veneer of philosophic mysticism over all. It is not thus, we may rest assured, that a religion is founded which lasts for thousands of years, gives birth to a marvellous poesy and several grand philosophies: resists the formidable attack of Buddhism, the Mongolian and Mahometan invasions, and the English conquest, and preserves even in the depth of its decadence, the sentiment of its lofty and timeless origin. Now great institutions are ever the work of great men. Considering the dominant part played by the person of Krishna in the epic and religious tradition, his human aspects on the one hand and his constant identification with an incarnate deity or Vishnu on the other, we must perforce believe that he was the creator of the Vishnavite cult, which gave to Brahmanism its force and its prestige. The logical inference therefore is that, in the midst of the religious and social chaos produced in prehistoric India by naturalistic modes of worship, there appeared an enlightened reformer who renewed the pure Aryan doctrine through the idea of the Trinity and the Divine Word made manifest, who sealed his work with the sacrifice of his life, and thus gave India its religious soul, its national bent, and its peculiar organisation.

"The importance of the Krishna tradition will appear to us still greater, and its character more truly universal, if we observe that its doctrine embraces two

fundamental ideas, two principles, which lie at the foundation of all religion and all esoteric philosophy. I mean the organic doctrine of the immortality of the soul, or of progressive existence through re-incarnation, and that corresponding with the Trinity or the Divine Word revealed in man. In the above essay I have merely indicated the philosophic scope of that central conception which, rightly understood, would be found to react vitally on all the domains of science, of art and of life. I must limit myself, in conclusion to one historical remark. The idea that infinite God, truth, beauty and goodness are revealed in conscious man with a redemptive power which regains the sublimities of Divine existence by the force of love and sacrifice, that prolific idea appears for the first time in Krishna. It finds itself personified at the moment when, emerging from its Aryan youth, humanity is plunging more and more into nature worship. Krishna revealed to humanity the idea of the Divine Word, and humanity will never forget the revelation."

ভগবানের কি ইচ্ছা হইয়াছে, যে সমস্ত জগতে তাঁহার মহিমা পুনঃ প্রচারিত হউক ?

জর্ম্মন সম্রাট্ ফ্রেড্রিক বর্ষাধিক কাল রোগের উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১৫ই জুন, পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় চিরদিনের জন্য শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপ তাঁহার জন্য দুঃখ করিতেছে, কিন্তু ইউরোপ তাঁহার জন্য উচিত মাত্রায় দুঃখ করিতে জানে না। তিনি ইউরোপীয়-দিগের মনের মত রাজা ছিলেন না। চতুর্দ্দশ লুই, দ্বিতীয় কাথেরীন বা দ্বিতীয় ফ্রেড্রিকের মত রাজা ছিলেন না। তিনি হিন্দুর মনের মত রাজার ন্যায় রাজা ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রাদির ন্যায় রাজা ছিলেন। তিনি সত্য-

বাদী, পরোপকারী, ন্যায়নিষ্ঠ এবং প্রজাবৎসল—অথচ যুদ্ধে অজেয়, মহা ধর্ম্মধর ছিলেন।

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥

ইউরোপে এরূপ রাজা কখন হয় নাই—আলফ্রেডের কথা কতকটা ঔপন্যাসিক।

এইক্ষণে ইঁহার পুত্র, দ্বিতীয় উইলিয়ম নামে সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন। ইনি তরুণবয়স্ক। লোকে ইঁহার নামে নানাপ্রকার রটনা রটাইতেছে। ফলে ইনি যে একজন মহাপ্রতাপশালী সম্রাট্ হইবেন, ইহা সকলেরই বিশ্বাস। সিংহাসনে বসিয়াই, ইনি পাঁচখানা লোহার জাহাজ লইয়া রুষিয়ার সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতে চলিয়াছেন। মেঘে মেঘে সংঘর্ষণ হইলেই বিদ্যুজ্জ্বালা ও বজ্রাঘাত হইয়া থাকে। এ আসন্ন বজ্র কোন্ দেশে পড়িবে বলা যায় না।

আফ্রিকার পূর্ব্বদিকে উপকূল ভাগে একটু স্থান আছে। জাঞ্জিবারের সন্নিহিত "জর্ম্মন্ ইষ্ট্ আফ্রিকান্ সোসাইটির" অধীনস্থ প্রদেশের উত্তর হইতে ধরিয়া সোমালি দেশ অবধি ইহার সীমা। আলবার্ট্ নায়েঞ্জা হ্রদটিই ইহার পশ্চিম সীমা। তবেই স্থানটুকু বড় কম নয়, একটি অতি বৃহৎ রাজ্যের পরিমাণ বটে। ইহার উপর জমিটুকুও বেশ উর্ব্বর, আবার প্রজাও অনেক গুলি আছে; কাজেই এখানে একটি সম্যক্ নেতা নরপতির বড়ই প্রয়োজন—নচেৎ স্থানটুকু কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় হইয়া ভারত-সমুদ্রে ডুবিয়া যায়! পরদুঃখকাতর লোক জগতে বিরল হইলেও, একেবারেই অপ্রাপ্য নয়—একটি বিলাতি বণিক-সম্প্রদায় দেশটির রক্ষাজন্য প্রকাশ্যভাবে দেখা দিয়াছেন। দেখা দিবার নানা কারণ; তন্মধ্যে, স্থানটির তিন দিকেই সুশাসিত রাজ্য, এই প্রদেশটি কোনও সুসভ্য রাজার দ্বারা শাসিত হইলেই এখানকার দাসব্যবসায়প্রথা একবারে তিরোহিত হয়; ইহাও একটি বটে। স্থানটি জাঞ্জিবারের সুলতানের নামে-মাত্র দখলে ছিল, কোম্পানি ইতিপূর্ব্বেই বেশ গুছাইয়া তাঁহার নিকট হইতে এটুকু আপনাদের নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও ইঁহাদিগকে এখানে কায়েম হইয়া বসিতে

বেশ জুত্ বরাত করিয়া সনন্দ দিয়াছেন। বণিক-সম্প্রদায় সেখানকার শাসন করিবেন। তাঁহারা দুর্গনির্ম্মাণ সৈন্যস্থাপন রণপোত রক্ষা এ সমস্ত শুভানুষ্ঠানেই আদিষ্ট হইয়াছেন। ইহা এখন ব্রিটিশ আফ্রিকান্ ষ্টেটের তালিকাভুক্ত হইয়াছে, কোম্পানির নাম হইয়াছে—"ব্রিটিশ ইষ্ট্ আফ্রিকান্ কোম্পানি"।

অতএব আফ্রিকা এখন সভ্য হইতে চলিল। কোথাও ইংরেজ কোম্পানি, কোথাও জর্ম্মন্ কোম্পানি, কোথাও ইটালি, কোথাও বেল্‌জম্, কোথাও পর্ত্তুগাল,—মৃতদেহকে যে প্রকার শৃগাল কুক্কুরে ঘেরিয়া ধরে, সেই প্রকার ধরিয়াছে। এই প্রকার ঘেরিয়া বসিয়াছিল বলিয়া আমেরিকা সভ্য হইয়াছে। সেখানে তাম্র চর্ম্মের কলঙ্ক-চিহ্ন আর বড় দেখা যায় না। আফ্রিকাও এক্ষণে কৃষ্ণচর্ম্মের কলঙ্কশূন্য হইয়া সভ্য হইতে চলিল। অতএব পৃথিবীর বড় মঙ্গল। যে দিন দশরথের বেটা রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া South-India and Ceylon Civilizing Company ফর্ম্ করেন, সেই দিন হইতে এইরূপ কোম্পানির ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। এখন অনেক বিভীষণ লঙ্কা ভোগ করিতেছেন। দুঃখের বিষয় আর বাল্মীকিও নাই কীর্ত্তিবাসও নাই, যে এখনকার কোম্পানি সকলের ইতিহাস লিখেন। লঙ্কাকাণ্ডের রচনায় ও মেকলে প্রণীত ওয়ারেন হেষ্টিংসের জীবনচরিত্রে কত প্রভেদ!

গ্লাস্‌গো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারত হইতে কুম্ভকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, হালুইকর ইত্যাদি করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৯ জন লোক গিয়াছেন। "নর্থ্ ব্রিটিশ ডেলি মেল" বলেন, তন্মধ্যে হালুইকরদিগের বড় পশার জমিয়া গিয়াছে। সাহেবেরা দেদার লুচি খাইতেছেন, লুচি ভাজিতে না ভাজিতে ফুরাইয়া যাইতেছে! গজারও বেশ আদর হইয়াছে। আবার দোকানের সম্মুখে যে মাটির রং-করা ফলফুলগুলি সাজান আছে, সে গুলি এমন স্বাভাবিক গোছের হইয়াছে, যে হঠাৎ তাহা দেখিয়া সেগুলি কত ক্ষণে পাক করা হইবে কেহ কেহ এমন প্রশ্ন করিতেও ছাড়িতেছেন না। এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, লুচি গজা সাহেবদিগকে এত ভাল লাগে কেন? উত্তর সোজা—এ যে ভারতবর্ষের সামগ্রী, সহজে জীর্ণ হয়।

ন্যাশন্যাল কঙ্গ্রেস যে কেবল জন কতক গলাবাজ বাঙ্গালির কাণ্ড

কারখানা নয়, ডাক্তার হণ্টার সাহেব ইহা বিলাতের টাইম্‌স্ পত্রে লিখিয়া তথাকার সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন। এদিকে ভারতবর্ষের নগরে নগরে নানাবিধ সভার অধিবেশন হইয়া কংগ্রেসের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে, নানা ভাষায় নানা রসে নানাবিধ বক্তৃতা হইতেছে। দেশে বিদেশে বড় আমোদ বাঁধিয়া গিয়াছে। রামের মার কথা এত দিনে সফল হইল। রামের মার রাম কোন ডেলিগেটের সঙ্গে চাকর হইয়া মান্দ্রাজে কংগ্রেস করিতে গিয়াছিল। কেহ রামের মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাম কোথায় গা?" রামের মা বলিল, "মান্দ্রাজে।" "মান্দ্রাজ কেন গা?" রামের মার মুখে কংগ্রেস কথাটা আসে না—রামের মা বলিল, "মান্দ্রাজে নাকি রঙ্গরস হবে, তাই গিয়াছে। তা, বাবা, রাম আমার ছেলে মানুষ—তোমরা কিছু মনে ক'রো না।" এখন বড় রঙ্গরস বাঁধিয়াছে—তবে আমরা কিছু মনে করিব না, রামের মার কাছে স্বীকার করিয়াছি।

চীনের কতকগুলি লোক জীবিকালাভের আশায় ইংরাজ-উপনিবেশ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে গমন করে, কিন্তু জাহাজের মাল জাহাজেই ছিল—নামিতে পায় নাই। চীনের লোকেরা বড় শ্রমশীল ও কার্য্যদক্ষ, তাহারা সেখানে জুটিলে ক্রমশঃ পাছে ইংরাজ শ্রমজীবী দলের অসুবিধা উপস্থিত হয়, এই ভয়েই নিউ সাউথ্ ওয়েল্‌সের গবর্ণর চীনাদের উপর এইরূপ আজ্ঞা করেন। চীন গবর্ণমেণ্ট কথাটি বিলাতের মন্ত্রীসভায় তুলিয়া ধরিলেন। শক্তের তিন কুল মুক্ত—এখন, গবর্ণর সাহেব স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া এ কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া সালিস্‌বারি বলেন, তিনি ইহার অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না। সালিস্‌বারির কল্যাণে আমাদের হীরা মালিনীকে মনে পড়িল—

ওরে বাছা ধুমকেতু
মা বাপের পুণ্য হেতু।
বেঁধে রাখ চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে
ধর্ম্মেতে বান্ধহ সেতু॥

ইংলিশ চ্যানেল্ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে অবস্থিত, ইহার নিম্ন দিয়া সুরঙ্গ পথ প্রস্তুত হইলে উভয় রাজ্যেরই বাণিজ্যাদির সুবিধা হয়। প্রস্তাবটি পার্লিয়ামেণ্টে উঠিয়াছিল, অধিকাংশ সভ্যের অমত হওয়ায় অগ্রাহ্য হইয়া

গিয়াছে। নৌ-বলের প্রতি ইংরাজের বিশ্বাস আছে; সুরঙ্গ কাটিলে পাছে কুরঙ্গ জুটে এই তাঁহাদের বড় ভয়। সত্য বটে, সিঁদমোহানায় সিঁধেল চোর ঢুকিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চুরি করিয়া লইয়া পলাইতে পারে।

মধ্য ভারতে তাস্তিয়া ভীলের অখণ্ড প্রতাপ। তাস্তিয়াকে ধরিবার জন্য কি চেষ্টাই না হইতেছে, কিন্তু তাহার কেশও স্পর্শ করিবার যোটি নাই। তাস্তিয়াকে ধরিবার জন্য যাহারা নিযুক্ত হয়, তাহারাই আবার তাহার গোয়েন্দাগিরি করে। সম্প্রতি মাউ নগরে একজনকে তাস্তিয়ার সাহায্যকারী বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় তাহার প্রতি ৭ বৎসর কালের জন্য কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। আরও "খোঁজ" "খোঁজ" পড়িয়া গিয়াছে। পুলিসের কল্যাণে, বোধ হয়, এখন সেখানে সাহায্যকারীর অভাব ঘটিবে না। তবে তাস্তিয়া সম্বন্ধে পুলিষের কর্ম্মঠতা দেখিয়া মহাত্মা ডগ্‌বেরির উপদেশ বাক্য মনে পড়ে।

Dogberry. You shall comprehend all vagrom men ; You are to bid any man to stand in the Prince's name.

2nd Watch. How, if a' will not stand ?

Dog. Why, then take no note of him, but let him go, and presently call the rest of the watch, and thank God you are rid of a knave.

ঠেকিয়া শিক্ষালাভ হইয়াছে। সহৃদয় বেলি সাহেব এই মর্ম্মে এক সর্কুলর জারি করিয়াছেন যে মাজিষ্ট্রেটগণ কেবল অভদ্র ও অল্পবয়স্কদিগের প্রতিই বেত্রাঘাত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এমন সাধু রীতিতেও ব্যাঘাত আছে। ভদ্রাভদ্র নির্ণয় করিতে অনেক সময় বোধ হয় গোলযোগ ঘটিবে। সকলেরই নিজের বিশ্বাস, সে ভদ্র লোক। একদা একজন ডোম আদালতে একটা বিবাদ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছিল। সে বলিল "আমরা পাঁচজন ভদ্র লোক থাকিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলাম।" শুনিয়া বিপক্ষের উকীল ক্রোধভরে তাহাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন " কেমন হে, তুমি একজন ভদ্র লোক ?" ডোম যুক্তকরে বলিল "আজ্ঞে হাঁ, ধর্ম্মাবতার!" উকীল বলিলেন, "তুমি যদি ভদ্র লোক, তবে আমরা কি ?

ডোম অতিশয় বিনীতভাবে বলিল, "হুজুর এমন আজ্ঞে করিবেন না—আপনাকে কি আর আমাদের মধ্যে গণ্য করি ?"

উকীল বাবু অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি নিজে সোণার বেণে। নিকটে একজন ব্রাহ্মণ উকীল বসিয়াছিলেন, তিনি ইঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কাণে কাণে বলিলেন, "ভাই দুঃখ করিও না—বক্তৃতার সময়ে না হয় বলিও, বামুন কায়েত ইত্তির জাত।"

তাই বলিতেছিলাম ভদ্রাভদ্র সম্বন্ধে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। বিশেষ অনেক হাড়ি ডোমকে বিচারাসনে বসিতে দেখা যায়।

পুলিসের গোপনীয় সার্কুলরের কথা লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। ভারত-সভা সর্কুলরের অনিষ্টকারিতা দেখাইয়া উহার সংসাদন—অন্ততঃ সংশোধনের জন্য ছোট লাটের কাছে আবেদন করিয়াছিলেন। আবেদন নিষ্ফল হয় নাই, উত্তর আসিয়াছে। তবে কি না, উত্তর আসায় না আসায় সমান। লাট সাহেব বলিয়াছেন, অনুসন্ধানকালে যাহাতে লোকের উপর দৌরাত্ম্য না হয়, এমন উপদেশ দিয়াছেন। পাঁটা কাটা হইবে শুনিয়া, একটি দয়ার্দ্র বালিকা বলিয়াছিল, "ছাগলটিকে আস্তে আস্তে কাটিও।"

পঞ্জাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার লার্পেণ্ট সাহেব কমিশ্যনের বিচারে বহুসহস্র মুদ্রা উৎকোচ গ্রহণের দোষে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কেবল পদচ্যুত করিয়াছেন। এদিকে সিন্ধুপ্রদেশে খুবচাঁদ নামা একজন দেশী ডিপুটি দুইশত টাকা উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে তিন মাসের জন্য কারাবদ্ধ ও হাজার টাকা জরিমানা দিতে অনুজ্ঞাত হইয়াছেন। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। ৺কাশীধামের ষাঁড়গুলি দোকানে দোকানে জামাই আদরে খাইয়া বেড়ায়, আর কলিকাতার ষাঁড় ময়লা ফেলা গাড়ি টানে। জন্মিবার সময়ে দেশ বাছিয়া জন্মিতে হয়।

বিলাতের টাইম্‌স্ পত্রে প্রকাশ, মুদ্রা সমিতির রিপোর্টে নাকি সোণা ও রূপা দুই ধাতুর মুদ্রা চালাইবারই কথা হইয়াছে। আমরা ভারতবাসী, বড় গরিব। আমরা বলি, পিতল কাঁসাও চালাও, ঘটি বাটি বেচিয়া যদি কিছু পাই, তবে টেক্স দিয়া বাঁচিব।

প্রচার

৪র্থ খণ্ড] ১২৯৫ [৪র্থ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল। (কর্ম্ম) যোগে ইহা (যাহা বলিব) শ্রবণ কর। তদ্দ্বারা যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে।

প্রথম—সাংখ্য কি? "সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা। সম্যগ্‌জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্।" (শ্রীধর)। যাহার দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা। তাহার সম্যগ্‌জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ত্ব সাংখ্য। সচরাচর সাংখ্য নামটি এক্ষণে দর্শনবিশেষ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইংরেজ পণ্ডিতেরা গুরুতর ভ্রমে পড়িয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই গীতাগ্রন্থে সাংখ্য শব্দ "তত্ত্বজ্ঞান" অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়—যোগ কি? যেমন সাংখ্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নাম, যোগও এক্ষণে পাতঞ্জল-দর্শনের নাম। পতঞ্জলি যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার

করিয়াছেন,* একণে সচরাচর যোগ বলিলে তাহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু গীতায় যোগ শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা হইলে, "কর্ম্মযোগ" "ভক্তিযোগ" ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় না। বস্তুত, গীতায় "যোগ" শব্দটা সর্ব্বত্র এক অর্থেই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। সচরাচর ইহা গীতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে ঈশ্বরারাধনা বা মোক্ষের বিবিধ উপায় বা সাধন বিশেষই যোগ। জ্ঞান, ঈদৃশ একটি উপায় বা সাধন, কর্ম্ম তাদৃশ উপায়ান্তর, ভক্তি তৃতীয়, ইত্যাদি—এজন্য জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। সচরাচর এই অর্থ, কিন্তু এ শ্লোকে সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এ স্থলে "যোগ" অর্থে কর্ম্মযোগ। এই অর্থে "যোগ" "যোগী" "যুক্ত" ইত্যাদি শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইতে দেখিব। স্থানান্তরে "যোগ" শব্দে জ্ঞান যোগাদিও বুঝাইতে দেখা যাইবে।

অতএব এই শ্লোকের দুইটা শব্দ বুঝিলাম—সাংখ্য, জ্ঞান; এবং যোগ, কর্ম্ম। একণে মনুষ্যপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন;—Thought, Action and Feeling. আমরা না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতাবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমরা নিজেই মনুষ্যজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিব যে তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে পারে; তিনই ঈশ্বরার্পিত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পারে। Thought ঈশ্বরমুখ হইলে জ্ঞানযোগ; Action ঈশ্বরমুখ হইলে কর্ম্মযোগ; Feeling ঈশ্বরমুখ হইলে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের কথা এখন থাক। ৩৩ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের কথা ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই "সাংখ্যযোগ"।† জ্ঞানে অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া ভগবান্ একণে

* যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

† চতুর্থাধ্যায়ের নাম "জ্ঞানযোগ।" অভেদ কি পশ্চাৎ জানা যাইবে।

৩৯ শ্লোক * হইতে কর্ম্মে উপদিষ্ট করিতেছেন। কি বলিতেছেন, এক্ষণে তাহাই শুন।

ভাষ্যকারেরা বলেন, এই কর্ম্ম, জ্ঞানের সাধন (শ্রীধর) বা প্রাপ্তির উপায় (শঙ্কর)। অর্থাৎ প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান কি তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া, "যদি অর্জ্জুনের তত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ না হইয়া থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত এই কর্ম্মযোগ" কহিতেছেন (হিতলাল মিশ্র)। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে নাই। তবে স্থানান্তরে এরূপ কথা আছে বটে, যথা—

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। ৩।৬

কিন্তু আবার স্থানবিশেষে অন্য প্রকার কথাও পাওয়া যাইবে, যথা—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে
ইত্যাদি। ৫।৬।৫।

এ সকল কথার মর্ম্ম পশ্চাৎ বুঝা যাইবে।

এই শ্লোকে কর্ম্মযোগের ফলও কথিত হইতেছে। এই ফল "কর্ম্মবন্ধ" হইতে মোচন। কর্ম্মবন্ধ কি? কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, এ জন্মে যাহা করা যায়, জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জন্ম না হয়, তবেই আর কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইল না। তাহা হইলেই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি হইল। অতএব মোক্ষপ্রাপ্তই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত।

কিন্তু যে জন্মান্তর না মানে, সেও কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদ্দেশ্য বলিয়া মানিতে পারে। পরকালে বা জন্মান্তরে কি হইবে তাহা জানি না, কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে ইহজন্মেই আমরা সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। আমরা সকলেই জানি যে হিম লাগাইলে ইহজন্মেই ছর্দ্দি হয়। আমরা সকলেই জানি যে রোগের চিকিৎসা করিলে রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে আমরা যদি কাহারও শত্রুতা করি, তবে সেও ইহজীবনেই আমাদের শত্রুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও

* মধ্যের চারিটি শ্লোক তবে কি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় না?

উপকার করি, তবে তাহার ইহজীবনেই, আমাদের প্রত্যুপকার করার সম্ভাবনা। সকলেই জানে, ধনসঞ্চয় করিলেই ইহজন্মেই “বড়মানুষী,” করা যায়; এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিলে ইহজন্মেই বিদ্যালাভ করা যায়। সকল প্রকার কর্ম্মের ফল, ইহজন্মেই এইরূপ পাওয়া গিয়া থাকে।

তবে কতকগুলি কর্ম্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা করিতে আমরা শিক্ষিত হইয়াছি। এই কর্ম্মগুলিকে সচরাচর পাপ পুণ্য বলিয়া থাকে। তাহার যে সকল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে আমরা শিখিয়াছি, তাহা ইহজন্মে পাই না বটে। আমরা শিখিয়াছি যে দান করিলে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাভ হয় না। কেহ বা মনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহজীবনে একগুণ দিলে অর্দ্ধগুণও পাওয়া যায় না। শুনা আছে, চুরি করিলে একটা ঘোরতর পাপ হয়। কিন্তু ইহজীবনে চুরি করিয়া সকলে রাজদণ্ডে পড়ে না—সকলে সে পাপের কোন প্রকার দণ্ড দেখিতে পায় না। সকলে দেখিতে পায় না বলিয়া ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার দণ্ড নাই—কর্ম্মফলভোগ নাই, এমন নহে। এবং দানের যে কোন পুরস্কার নাই তাহাও নহে। চিত্তপ্রসাদ আছে—পুনঃপুনঃ দানে আপনার চিত্তের উন্নতি এবং মাহাত্ম্য বৃদ্ধি আছে। পাপ পুণ্যে ইহজীবনে কিরূপ সমুচিত কর্ম্মফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইয়াছি,* পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে সেই গ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন।

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি, যে সম্পূর্ণ ধর্ম্মাচরণের দ্বারা ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করা যায়। সেই মুক্তি কি প্রকার এবং কিরূপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। সে সকল কথা আর এখানে পুনরুক্ত করিব না। ফলে জীবন্মুক্তি হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত তত্ত্ব নহে। এই গীতাতেই উক্ত হইয়াছে, যে জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কর্ম্মযোগ। ইহাও দেখিব। সুতরাং যাঁহারা জন্মান্তর মানেন না, তাঁহারাও কর্ম্ম-

---

* ধর্ম্মতত্ত্ব।

যোগের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন। গীতোক্ত ধর্ম্ম বিশ্বলৌকিক, ইহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

উপসংহারে বলা কর্ত্তব্য যে আর এক কর্ম্মফলের কথা আছে। হিন্দুরা যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন—কর্ম্মফল পাইবার জন্য। এই সকলের ইহলোকে যে কোন প্রকার ফল পাওয়া যায় না, এমন কথা আমরা বলি না। একাদশীব্রত করিলে শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ করা যায়, এবং অন্যান্য যাগযজ্ঞের ও ব্রতাদির কোন কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক ফল পাওয়া যাইতে পারে। তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে পাওয়া যায় না বটে। ভরসা করি, এ টীকার এমন কোন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, যিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা করিবেন।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥

এই (কর্ম্মযোগে) প্রারম্ভের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই; এ ধর্ম্মের অল্পতেই মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যায় না। কেন না, অল্পজ্ঞানের কোন ফলোপধায়িতা নাই; বরং প্রত্যবায় আছে,উদাহরণ—সামান্য জ্ঞানীর ঈশ্বরানুসন্ধানে নাস্তিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে, এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১॥

হে কুরুনন্দন! ইহাতে (কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়া থাকে। কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে।

শ্রীধর বলেন, "পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারা আমি নিশ্চিত ত্রাণ পাইব," এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। ইহা একই হয়, অর্থাৎ

একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত হয় না। কিন্তু যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাই, অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরাধনাবহির্ম্মুখ, এবং সকাম, তাহাদের কামনা সকল অনন্ত, এবং কর্ম্মফলগুণফলত্বাদির প্রকারভেদ আছে, এজন্ত তাহাদের বুদ্ধিও বহুশাখা ও অনন্ত হয়, অর্থাৎ কত দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই। যাহারা কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হইয়াই কাম্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই প্রধাবিত হয়।

কথাটার স্থূল তাৎপর্য্য এই। ভগবান্ কর্ম্মযোগের অবতারণা করিতেছেন, কিন্তু অর্জ্জুন সহসা মনে করিতে পারেন, যে কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই কর্ম্ম-যোগ, কেন না তৎকালে বৈদিক কাম্যকর্ম্মই কর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। কর্ম্ম বলিলে সেই সকল কর্ম্মই বুঝায়। অতএব প্রথমেই ভগবান্ বলিয়া রাখিতে-ছেন যে কাম্যকর্ম্ম কর্ম্মযোগ নহে, তাহার বিরোধী। কর্ম্ম কি, তাহা পশ্চাৎ বলিবেন, কিন্তু তাহা বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচলিত, পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন।

মনোরমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মনোরমার দ্বিতীয় প্রকৃতিটি ব্যাখ্যা করার পূর্ব্বে অন্ত একটি কথা বলিয়া লইতে হয়।

আমরা সচরাচর মানুষের একপ্রকার প্রকৃতিই দেখিয়া থাকি, তবে মনোরমার এই দ্বিবিধ প্রকৃতি কোথা হইতে আসিল? মনোরমা কি কবির কল্পনাসঞ্জাত কোন এক অমানুষী সৃষ্টি?—এইরূপ কথা অনেকের মনেই

উত্থাপিত হইবার সম্ভব; সুতরাং এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া লওয়া ভাল।

প্রথম কথাটি এই। কবিগণ এক প্রকার বিভাগানুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। সাময়িক কবি ও সর্ব্বসময়ের কবি। যাঁহারা সাময়িক কবি, তাঁহারা সেই সময়ের আচার, ব্যবহার, নীতি, প্রকৃতি লইয়াই তাঁহাদের কাব্যচিত্রিত চরিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগকে স্বাভাবিক (Realistic) কবিও বলা হইয়া থাকে। অপর শ্রেণীর কবিগণ এরূপ কোন সময়ের চিত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত হয়েন না। তাঁহাদের মনীষী কল্পনা, তাঁহাদের সেই সময়ের সীমা অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী ভাবী সময়ে লইয়া যাইতে সক্ষম; তাই তাঁহারা যাহা দেখিতে বা জানিতে পারা যায়, শুদ্ধ তাহাই কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ না করিয়া, যাহা ভবিষ্যতে দেখিতে বা জানিতে পারা যাইতে পারে, তাহাও কাব্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। যাহা সকল সময়েই সমান ছিল, যাহা সকল সময়েই সমান থাকিবে, সেই অবিকৃত অপরিবর্ত্তনীয় মূল "তত্ত্ব" গুলি ভিত্তি রূপে রাখিয়া তদুপরি তাঁহারা ভবিষ্যৎদর্শী তীক্ষ্ণ প্রতিভাবলে বিবিধপ্রকার চরিত্রাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই সব চরিত্র যদিও তাঁহাদের সমসময়ে অলৌকিক (Unrealistic) বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, সময়ান্তরে তাঁহাদের সেই সব চরিত্রই আবার লৌকিক বলিয়া আদরণীয় হইতে পারে। এক কথায় বলিতে গেলে, কবি মাত্রই (যাঁহারা প্রকৃত কবি, তাঁহাদের কথাই বলিতেছি) স্বাভাবিক চরিত্রস্রষ্টা—কবি মাত্রই Realistic. Realistic (স্বাভাবিক) না হইলে তিনি কখন কবিপদবাচ্য হইতে পারেন না। তবে প্রভেদ এই, এক শ্রেণীর কবির দৃষ্টি অদূরদর্শী, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের সময়ের চিত্রই আঁকিতে সক্ষম—অন্য শ্রেণীর দৃষ্টি কল্পনাবলে দূরদর্শিনী, তাঁহারা পরবর্ত্তী সময়েরও চিত্র দিব্য চক্ষে দেখিতে পারেন। এক শ্রেণীর কবি যাহা আছে, তাহাই দেখাইতে পারেন, অন্য শ্রেণীর কবি, যাহা নাই, কিন্তু যাহা হইতে পারে, তাহাও দেখাইতে সক্ষম—প্রত্যুত তাঁহারা তাহাই দেখাইয়া থাকেন। ফল কথা—Real এবং Ideal এ কোন প্রভেদই নাই। সবই Real, নতুবা Ideal এর কোন তাৎপর্য্যই থাকে না। আমরা এই দুই শ্রেণীর কবিকে, সাময়িক

কবি (Poet of his own age) এবং সর্ব্ব সময়ের কবি (Poet of all ages) নামে অভিহিত করিয়া থাকি। বলা বাহুল্য, যে শেষোক্ত শ্রেণীর কবিই সম্যক্ উচ্চে সমাসীন।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা আমাদিগের বর্ত্তমান প্রস্তাবের অপ্রাসঙ্গিক কথা, সন্দেহ নাই। তবু, এ কথা লইয়া সময়ে সময়ে বড় ঝগড়া করিতে হয়, স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা লইয়া অনেক তর্কও শুনিতে পাওয়া যায়, তাই মনোরমার চরিত্রের স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা উপলক্ষে এই কথাগুলি বলিয়া লইলাম। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া এই অসম্বদ্ধ কথা মাপ করিবেন।

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এইটুকু প্রাসঙ্গিক কথা বাহির করা যাইতে পারে যে, যাহা সচরাচর ঘটে না বা আমরা যাহা সচরাচর দেখিতে পাই না, তাহাই অলৌকিক বা অস্বাভাবিক নহে। যদি মনোরমার মত দ্বিবিধ প্রকৃতি-শালী লোক নাই দেখিতে পাওয়া যায়, তবু এ চরিত্রকে হঠাৎ অস্বাভাবিক বলিতে কাহারও অধিকার নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে আরও অনেকটা দেখিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয় কথাটি এই। মনোরমা আমাদিগের বর্ত্তমানেরও স্বাভাবিক চিত্র বটে। মনোরমার প্রকৃতি এখনকার মানুষেও দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা রমণীবৃন্দের স্ফুটনোন্মুখী যৌবনের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা মনোরমার এ দ্বিবিধ মূর্ত্তিতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা দেখিতে পাইবেন না। স্ত্রীলোকদিগের সেইরূপ বয়সে, তাহারা এক একটি ছোট খাটো মনোরমা। এত উজ্জ্বল, এত মধুর না হউক, মনোরমা বটে। একদিকে বালিকাবয়সের প্রকৃতি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে চলিতেছে; অন্যদিকে প্রৌঢ় বয়সের গাম্ভীর্য্য ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইতেছে। সেই গঙ্গাযমুনাসঙ্গমকালে, রমণীগণ এইরূপ মনোরমা হইয়া উঠেন। তাঁহারা মাতা পিতার কাছে, বয়স্ক অভিভাবকদিগের কাছে প্রতীয়মান হয়েন বালিকা—স্বামীর নিকট প্রতীত হয়েন যুবতী। তাহাই বা কেন, এক স্বামীর নিকটেই দুই ভাবে পরিচিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই সংসারজ্ঞানশূন্য সরলতা-ক্ষেত্রে যেন একটু একটু করিয়া জ্ঞানগাম্ভীর্য্যের ছায়া

পড়িতে থাকে। এই সময়কার এই প্রকৃতি যাঁহার চরিত্রে অবস্থাক্ষেত্রে স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়, তিনিই আমাদিগের এই কবির মনোরমা হইয়া পড়েন।

যাঁহাদিগের এই রমণীয় রমণীপ্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া দেখিবার সুযোগ হয় নাই, বা যাঁহারা স্মৃতিপথে এ সকল কথা আর আনিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে একটি অতি স্থূল দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে পারি। আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের অধ্যাপকশ্রেণীমধ্যেও মনোরমার মত দ্বিপ্রকৃতিক লোক বিরল নহে। এক এক সময়ে তাঁহাদের অদ্ভুত সরলতা বা অজ্ঞানতা দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা দুরূহ হইয়া উঠে, আবার এক এক সময়ে তাঁহাদেরই জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এ দৃষ্টান্তটি অতি স্থূল—সকলের চক্ষেই ইহা পড়ে, কিন্তু তাহাতে কাহারও বিস্ময় হয় না। এতদপেক্ষা আমাদিগের পূর্ব্বকথিত রমণী প্রকৃতিতে লোকের অধিক বিস্ময় হইয়া থাকে। কিন্তু মনোরমা পাঠ করিলে যেরূপ বিস্ময় হয়, এরূপ ইহার কিছুতেই হয় না। ইহার কারণও পরিষ্কার—মনোরমা কবির কাব্য। কবি এই প্রকার দ্বিবিধ প্রকৃতির একত্রাবস্থান মনোরমার চিত্রে আঁকিয়াছেন, এই সুন্দর রহস্যটি আরও সুন্দর করিয়া আমাদিগের চক্ষুর কাছে ধরিয়াছেন, তাই মনোরমা এত বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। আরও এক কথা। অধ্যাপকের কথাটা কারণসহ এত সুস্পষ্ট যে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। যৌবনোন্মুখী কামিনীর সেই মিশ্র প্রকৃতিটি একটু লক্ষ্য-সাপেক্ষ ও সর্ব্বত্র অধিক সময় স্থায়ী নহে, তাই তাহাও সকলের নিকটে তাদৃক্ বিস্ময়কর নহে। মনোরমার প্রকৃতিটি কবি উজ্জ্বলভাবে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছেন, আর সমস্ত মনোরমাই এই প্রকৃতি লইয়া—তাই মনোরমা কিছু বিস্ময়োৎপাদক। মনোরমার এ দ্বিবিধ প্রকৃতির কারণ তত পরিষ্কার নহে, তাই মনোরমা অত্যন্ত বিস্ময়কর। বিস্ময়ের কারণ এই—আবার আনন্দের কারণও এই। যখন অন্যান্য চরিত্রের ন্যায় মনোরমার চরিত্রেরও কারণটি খুঁজিয়া পাই, তখন কবির মনোরমা আমাদিগের মনোহারিণী হইয়া উঠে। এখন আমরা সেই কারণ খুঁজিব।

মনোরমার আনন্দময়ী, সরলা বালিকা মূর্ত্তির একটি কারণ পূর্ব্বপ্রস্তাবে কথিত হইয়াছে। সেটি—বয়স ও অবস্থাবিশেষের সম্মিলন। আমাদিগের

মনে হয়, ইহার অন্য একটি কারণও আছে। সেটি, মনোরমার কার্য্যবিশেষে আত্যন্তিকী একাগ্রতা। মনোরমার তবে সেই কার্য্যটি কি?—ইহা বুঝিতে পারিলেই, আমরা মনোরমার সব বুঝিলাম। এখন তাহাই দেখিব।

মনোরমার কার্য্য আর কিছুই নহে—চিন্তা। মনোরমা দিবারাত্র কেবল আপনার চিন্তাবিশেষেই মগ্ন থাকিত। ভগবান্ তাহাকে এরূপ চিন্তার কারণও দিয়াছিলেন। মনোরমা বড়ই দুঃখিনী। এই চিন্তাই মনোরমার সারল্যের অন্যতর কারণ, আবার এই চিন্তাই মনোরমার প্রখরবুদ্ধিশালিনী গম্ভীরা তেজস্বিনী প্রকৃতির কারণ।* এই চিন্তাই মনোরমার সর্ব্বস্ব। এই চিন্তা হইতেই প্রায় তাঁহার সেই দুই মূর্ত্তিই জাত—এক "আনন্দময়ী, সরলা, বালিকা মূর্ত্তি"—অপর "গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রখরবুদ্ধিশালিনী মূর্ত্তি"। প্রথম মূর্ত্তির কথা কিছু বলা হইয়াছে, তৎপ্রতি অন্য কারণও ছিল। এখন এই শেষের মূর্ত্তির কথা বলিব। ইহাতে সমস্ত মনোরমাই ব্যাখ্যাত হইবে।

পাঠক, তোমরা সেক্ষপীয়রের চিন্তাপ্রপীড়িত হ্যাম্‌লেট্ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছ? একবার এই চিন্তাপ্রপীড়িতা মনোরমামূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর। হ্যাম্‌লেট্ রাজপুত্র, তাহার চিন্তার বিষয় পিতার মৃত্যু, মাতার চরিত্র, প্রণয়িনীর ব্যবহার, পিতৃব্যের পাপরাশি; আমাদের মনোরমা দুঃখিনী ব্রাহ্মণকন্যা, তাহার চিন্তার বিষয় তাহার নিজের জীবন। সত্য বটে, হ্যাম্‌লেটের চিন্তার বিষয়ের সহিত মনোরমার চিন্তার বিষয় তুলনা করা যায় না, কিন্তু তবু চিন্তার গাঢ়ত্বে বুঝি মনোরমা হ্যাম্‌লেটকেও পরাস্ত করিয়াছেন। অত বড় পুরুষ হ্যাম্‌লেটের কাছে, অত বড় চিন্তাও যাহা, আমাদিগের দুঃখিনী ব্রাহ্মণবালিকার কাছে, তাহার ঐ ক্ষুদ্র চিন্তার বিষয়ও তাহা। হ্যাম্‌লেটের চিন্তা, পুরুষের চিন্তা—অনন্ত আকাশে অনন্ত মেঘাবলীর ন্যায়

* এই কথাটি কিছু নূতন বোধ হইতে পারে। চিন্তা হইতে যে সরলতা উৎপন্ন হইতে পারে, এ কথা সহসা কেহ বিশ্বাস না করিতেও পারেন। আমাদিগের যাহা মত ও বিশ্বাস, আমরা যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহাই লিখিলাম। পাঠকবর্গ না হয় কথাটা একবার ভাবিয়া ফেলিয়া রাখিবেন। সরলতা চিন্তা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না এরূপ কথা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহাদিগকে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে চিন্তা সরলতাবিরোধী নহে। নতুবা, মনোরমার চিত্রে সামঞ্জস্য নাই, ইহাই বলিতে হইবে। এরূপ কথা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের কোনই তর্ক নাই।

অনন্তরূপিণী, ভয়ঙ্করী; মনোরমার চিন্তা, রমণীর চিন্তা, ক্ষুদ্র ভুজঙ্গরূপিণী, বিষময়ী। ধীরোন্মত্ত হ্যাম্‌লেট্ সেক্ষপীয়রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—স্থিরোন্মাদিনী মনোরমাও বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ক্ষুদ্র আমরা, আমাদিগের নিকটে হ্যাম্‌লেটের সেই ব্যাপক বিরাট চিন্তা অপেক্ষা, মনোরমার এই গাঢ় বিষময়ী চিন্তা কিছু ভাল লাগে। হ্যাম্‌লেটের হোরেসিও ছিল, কুন্দনন্দিনীরও এক দিন কমলমণি ছিল, কিন্তু দুঃখিনী বালিকার সেই দীর্ঘিকা বই আর কেহই ছিল না। অধিক কি কহিব, হ্যাম্‌লেটের স্রষ্টা হ্যাম্‌লেটের জন্য যেরূপ যত্ন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, মনোরমার স্রষ্টা মনোরমার প্রতি তাহার শতাংশের একাংশও গ্রহণ করেন নাই। দুঃখিনীকে তিনি মৃণালিনীর আলয়ে সামান্যার ন্যায় রাখিয়া দিয়াছেন। মনোরমার প্রতি আমাদিগের স্নেহের ইহাও এক কারণ বটে।

মনোরমার কিসের চিন্তা? এ কথা যে পাঠক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে আমাদিগের পূর্ব্ববর্ণিত মনোরমার পূর্ব্বপরিচয় আর একবার ভাবিতে বলি।

এই দেখুন, এই একটি বঙ্গীয় বিধবা করলগ্নকপোল হইয়া নির্জ্জনে অন্য মনে কি ভাবিতেছে। পাঠক কি জিজ্ঞাসা করিবেন, উহার কিসের চিন্তা? ঐ শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা নিরাভরণা স্ফুটনোন্মুখযৌবনা স্নেহময়ী বালবিধবার চিন্তার বিষয় কি আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে? যদি তাহা না হয়, মনোরমার চিন্তার কথাও আপনাকে না বলিলে চলিবে। ঐ মূর্ত্তি মনোরমার চিন্তার প্রথম মূর্ত্তি। মনোরমা প্রথমে নিজের নিকটে এইরূপ বালবিধবা বলিয়া পরিচিতা।

যখন মনোরমার চিন্তাস্রোত এইরূপে প্রবাহিত, তখন হঠাৎ তিনি জানিতে পারিলেন যে তিনি বাস্তবিক বিধবা নহেন—তাঁহার স্বামী পশুপতি এখনও জীবিত আছেন। কথা ফিরিল, বিধবা সধবা হইল, কিন্তু চিন্তা ত থামিতে পারিল না। ক্ষণিক হর্ষোচ্ছ্বাসে এ চিন্তাস্রোত মন্দগতি হইল বটে, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস থামিলে আবার যে স্রোত বহিতে লাগিল! কে সেই স্বামী? কোথায় সে পশুপতি? ইত্যাকার চিন্তায় তখন মনোরমা প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তার এ প্রকৃতি সহসাই পরিবর্ত্তিত হইল।

মনোরমা ধীরে ধীরে সেই জ্যোতির্ব্বিদের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। এ যে কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে সেই ত্রিপত্রচ্যুতিস্মৃতি! ক্রমে আরও চিন্তা—মনোরমার তবে ত এ সংসারে কেহই নাই! পূর্ব্বে যে অশ্রুবিন্দু সলজ্জভাবে নীরবে গণ্ডদেশ বহিয়া পড়িত, এখন তাহা অবাধে গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতে লাগিল। এ সংসারে মনোরমার কেহই নাই। মা বাপ, ঘর বাড়ী, কিছুই নাই। পূর্ব্বে তিনি আপনাকে বিধবা জানিতেন, কিন্তু এখন যে সধবা বলিয়া জানিয়াও তাঁহার কষ্ট কমিল না। সেই যে একটু হর্ষের ভাব—তাহাও যে ঘোর দুঃখমিশ্রিত। এইরূপে আর একটি তরঙ্গ মনোরমার জীবনোপরি ভাসিয়া গেল। এইখানেও যদি এ চিন্তা শেষ হইত, আমরা মনোরমাকে চিন্তাময়ী বলিয়া এত কথা বলিতে সাহস করিতাম না। এতদূর পর্য্যন্ত ত সে চিন্তায় অনন্যসাধারণত্ব কিছুই নাই! এর পরে মনোরমা তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট স্বপ্নময় স্বামী পশুপতির সন্দর্শন লাভ করিলেন। একে বালবিধবার স্বামী, তাহে আবার সেই স্বামী পশুপতি—একি কম উচ্ছ্বাসের কথা? ইহার উপর আবার সেই পশুপতির সান্নিধ্যে বাস—তাহার প্রণয়প্রাপ্তি, এ যে মনোরমার ধারণার অতীত! সেই স্বামী আবার তাহাকে কুলটার ন্যায় ভাল বাসিতেছে—মনোরমা একবার বলিতে পারিতেছে না যে সে কুলটা নহে, বিধবা নহে, পশুপতির পরিণীতা পত্নী! রমণীহৃদয় ভিন্ন অন্য হৃদয় হইলে, এইখানেই যে তাহা ফাটিয়া যাইত! এত উচ্ছ্বাস কি ক্ষুদ্র হৃদয়ে নিবদ্ধ রাখা যায়? কিন্তু মনোরমাকে তাহা রাখিতে হইয়াছিল। জ্যোতির্ব্বিদের গণনার কথা তখনও মনোরমার হৃদয়ে জাগ্রত, সে কি কম কথা? তার পরে আরও দেখ, পশুপতি তখন রাজা—মনোরমা দুঃখিনী ব্রাহ্মণকন্যা—বালবিধবা বলিয়া পরিচিতা, এ কথা শুনিলে পশুপতি কি মনে করিবেন? তিনি কি এ কথা বিশ্বাস করিবেন? না, দুঃখিনী বালবিধবার দুরাকাঙ্ক্ষাজনিত প্রতারণা বলিয়া ভাবিবেন? আর—আর বিশ্বাস করিলেই কি তাহা বলা উচিত? মনোরমার প্রতি পশুপতির যেরূপ প্রবল আসক্তি, না জানি পশুপতি ইহা শুনিয়া কিরূপ করিয়া বসেন? না জানি এই সুসংবাদে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া উঠে! আর পশুপতি বিশ্বাস করিলেই বা অন্যে তাহা বিশ্বাস করিবে কেন? অন্যে যে কত কথা বলিবে—এজন্য পশুপতিকে যে কত

লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে—তাঁহার বড় মুখ ছোট হইবে—মনোরমার তাহা জীবন থাকিতে বলা হইবে না। ভাবিয়া ভাবিয়া মনোরমা অন্তরের ভিতর যে অন্তর সেইখানে এ কথা লুকাইয়া রাখিল। একি কম কথা? একি কম শিক্ষা? একি কম অভ্যাস? এতে হৃদয় গভীর হইবে না ত কিসে হৃদয় গভীর হইবে? এতে হৃদয়ে তেজ বাঁধিবে না ত কিসে হৃদয়ে তেজ বাঁধিবে? বাধ্য হইয়া মনোরমাকে এ শিক্ষা পাইতে হইয়াছিল। এ আগুন হৃদয়ে পুষিয়া রাখিতে হইয়াছিল। জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ইহা সেই হৃদয়প্রদেশকে দগ্ধ করিয়া গভীর হইতে গভীরতর করিতে লাগিল।

আরও দেখ। মনোরমা যেখানে থাকিতেন, সে একটা বৃহৎ রাজপুরী। তাহার এক কোণে মনোরমা বাস করিতেন। সেই বিশাল পুরীটি অন্যত্র খালি পড়িয়া থাকিত। ইহা দেখিয়া, না জানি মনোরমা কতবার তাঁহার নিজের কথা ভাবিয়াছেন! শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে—স্বামিবিরহিতা দুঃখিনী চিন্তিতা রমণীর পক্ষে সে দৃশ্য কি কম ব্যাকুলতা-পরিবর্দ্ধক—চিন্তার-উদ্দীপক? উহাতেই যেন তাঁহাকে ভাবিতে প্ররোচনা জন্মাইত। তাই মনোরমা ভাবিতেন, বসিয়া রাত্রিদিন কেবলই ভাবিতেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন হৃদয়প্রদেশ ক্ষতবিক্ষত হইত, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইত, তখনই বুঝি তাঁহার গা জ্বালা করিত। সেই গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ তিনি সেই বাপীজলে অবগাহন করিতে যাইতেন। কি চমৎকার কবিত্ব! সেই দীর্ঘিকা—আর সেই মনোরমা! কেমন একসুরে গাঁথা—সেই শাল-তমালতমসাচ্ছন্না বিশাল দীর্ঘিকা আর সেই চিন্তাচ্ছায়াসমাকুলা মনো-রমার হৃদয়? কোথায় হোরেসিও—এই দীর্ঘিকার সহিত তাহার তুলনা? সত্য সত্যই এইখানে আসিলে তাহার গায়ের জ্বালা নিবারণ হইত। এ মনোরমার অবগাহনযোগ্য দীর্ঘিকা। এই দীর্ঘিকার সোপানোপরি আসীন হইয়া তাহার বক্ষোদেশস্থ ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া না জানি মনোরমা কত ভাবনাই ভাবিতেন। এইরূপ চিন্তা, এইরূপ প্রকৃতির সহানুভূতিতে তাঁহার সুখ দুঃখ দুইই উৎপন্ন হইত। ইহাই তাঁহাকে অদ্ভুত সারল্যময়ী ও অদ্ভুত গাম্ভীর্য্যশালিনী, বালিকা ও পূর্ণযৌবনা তরুণী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এ কথা আরও কি বুঝাইতে হইবে?

এই আমাদিগের মনোরমা! সংসারে এমন অপূর্ব্ব সৃষ্টি আর কখন দেখিয়াছ? মনোরমা পরগৃহে পালিতা বলিয়া তুচ্ছ করিও না—মনোরমা কাব্যরাজ্যে রাজ্ঞী।

মনোরমার দ্বিবিধ মূর্ত্তি অবস্থাবিশেষে প্রকাশিত হইত। মনোরমার জ্ঞানমূর্ত্তি, আন্তরিক চিন্তা হইতে উৎপন্ন—তাহা হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে লুক্কাইত থাকিত। হৃদয়কবাটে আঘাত না লাগিলে সে মূর্ত্তি বাহির হইত না। মনোরমা তাহা এমনই লুক্কায়িত রাখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, সময়বিশেষে তিনিও তাহা ভুলিয়া যাইতেন। এই আত্মবিস্মৃতির অবস্থাতেই তিনি কপালকুণ্ডলা, মৃণ্ময়ী বা অপূর্ব্ব সরলা বালিকা। আত্মস্থা মনোরমা অন্যরূপ।* একরূপে তিনি কুসুমনির্ম্মিতা কপালকুণ্ডলা—অন্যরূপে তিনি চিন্তাময়ী উন্মাদিনী। এক মূর্ত্তিতে তিনি হেমচন্দ্রের স্নেহময়ী কনিষ্ঠা ভগিনী, পশুপতির প্রেমপ্রবৃত্তিময়ী বালিকা ভার্য্যা,—অন্যরূপে তিনি হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা সহোদরা—পশুপতির জ্ঞাননিবৃত্তিময়ী প্রৌঢ়া পত্নী। হরগৌরীমূর্ত্তি, সেই—আধ শিব আধ উমা মূর্ত্তি দেখিয়াছি—এরূপ একাধারে যুগলমূর্ত্তি দেখি নাই।

পাঠক, আমরা এ প্রস্তাবে মনোরমার দার্শনিক সৌন্দর্য্য দেখিলাম—প্রস্তাবান্তরে তাহার কাব্যের সৌন্দর্য্য দেখিব। আমরা বাহিরের অবস্থার সহিত মনোরমার অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিয়াছি—এইবারে আমরা অন্তঃপ্রকৃতির বহিস্ফুরণ দেখিব।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরি।

---

* মনোরমার কাব্যাংশ বুঝাইবার সময়ে আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার বিবৃতি করিব।

শ্রাবণে

১

সারাদিন একখানি জল-ভরা শ্রান্ত মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ।
বসিয়া গবাক্ষ-ধারে সারাদিন আছি চেয়ে,
জীবনের আজি অবকাশ!
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরু-গুলি হ্যালে-দোলে,
ফুল-গুলি পড়িছে খসিয়া;
লতাদের মাথা-গুলি মাটিতে পড়িছে ঝুলি,
পাখী-গুলি ভিজিছে বসিয়া।

২

কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই,
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল।
ভিজে ঘাস-ঝাড় হ'তে ফড়িং লাফায়ে ওঠে,
জলায় ডাকিছে ভেক-দল।
চাতক, ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল,
বেড়াতেছে উড়িয়া আকাশে।
কদম্ব-কেতকী-বাস কম্পিত বাতাসে ভাসে;
ঢাকা ধরা—নব কুশ-কাশে।

৩

দিঘীটি গিয়েছে ভ'রে ঘাটটি গিয়েছে ডুবে,
কাণায় কাণায় কাঁপে জল;
বৃষ্টি-ঘায়, বারি ঘায় পড়িতেছে মুঁয়ে মুঁয়ে
আধ-ফোটা কুমুদ-কমল।
তীর-নারিকেল-মূলে থল্ থল্ করে জল;
ডাহুক-ডাহুকী কূলে ডাকে;
শ্রেণী দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রাবা,
লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে।

৪

পাড়ে পাড়ে চকা-চকী ব'সে আছে দুটি দুটি;
মেঘ-কোলে বলাকারা ভাসে।
কচিৎ বা গ্রাম্য-বধূ শূন্য কুম্ভ ল'য়ে কাঁকে,
তরু-শ্রেণী তল দিয়া আসে।
কচিৎ অশ্বত্থ-তলে ভিজিছে একটি গাভী;
টোকা মাথে যায় কোন চাষী;
কচিৎ মেঘের কোলে, মুমূর্ষুর হাসি মত,
চমকিছে বিজলীর হাসি।

মাঠে নবশ্যাম-ক্ষেতে কচি ধানগাছ-গুলি
মাথা-গুলি জাগাইয়া আছে;
কোলেতে লুটিছে জল টল্‌মল্ থল্ থল্,
দল্‌মল্ বুকে বায়ু নাচে।
সুদূরে—মাঠের শেষে জ'মে আছে অন্ধকার,
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয়!
ঘরে ব'সে মুড়ি দিয়ে, চাষারা স্ত্রী-পুত্র মিলে
কত দুর্য্যোগের কথা কয়।

চেয়ে আছি শূন্য-পানে কোন কাজ হাতে নাই;
কোন কাজে নাহি বসে মন;
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই; দেহ আছে, মন নাই;
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন!
এই উঠি, এই বসি, কেন উঠি কেন বসি!
এই শুই, এই গান গাই;
কি গান—কাহার গান! কি সুর—কি ভাব তার!
ছিল কভু, আজ মনে নাই!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

পাশ্চাত্য দর্শন

ন্যায়বাক্য ও ব্যাপ্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে দুটি প্রকাণ্ড ব্যাপারের কথা বলিয়াছি, * ন্যায়বাক্য সংক্ষেপ করিলেও সেই ব্যাপারদ্বয় একত্রিত করা অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার। স্থূল সংশয় এই যে, ব্যাপ্তিপরিগ্রহ করিবার জন্য যে ভূয়োদর্শন করিতে হয়, তাহা অনুমানক্রিয়া হইতে পৃথক্ করা সাধ্যায়ত্ত কি না, এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক যে, ব্যাপ্তিগ্রহ করা এবং স্থিরীকৃত ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সাধ্য বিষয়ের পক্ষধর্ম্মতা নির্ণয় করা দুটি বিভিন্ন কার্য্য। যে যে বস্তু ধূমবান্ তাহাই বহ্নিবিশিষ্ট, এই ব্যাপ্তি স্থির করা একটি কার্য্য; আর, যে ধূম বহ্নিব্যাপ্য, এই পর্ব্বত সেই ধূমবত্তার পক্ষধর্ম্মতা করে এই কথার উপনয় করা, এবং ঐ উপনয়ান্তে যথাযোগ্য অনুমিতি করা, অন্য ব্যাপার। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যাপারটি ইংরাজিতে Induction নামে অভিহিত, আর দ্বিতীয়টিকে একত্রিতভাবে Deduction বলে। নিগমনবাক্য স্থির করিবার নিমিত্তে উপনয়বাক্য স্থির করা আবশ্যক। উভয় একত্র করিলে অনুমান স্থির হয়। তাহাকেই Inference কিম্বা Deduction বলে। উপনয়বাক্যে সাধ্য বস্তুর পক্ষধর্ম্মতা ব্যক্ত হয়। অর্থাৎ পর্ব্বতটি প্রস্তাবিত ধূমবত্তা ধর্ম্মের পক্ষ; অথবা পর্ব্বতে প্রস্তাবিত ধূমবত্তা ধর্ম্ম আছে, ইহা উপনয়বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া পরে নিগমন হয় যে, এই পর্ব্বতে বহ্নিও আছে। কিন্তু ব্যাপ্তিস্থির ব্যতীত পক্ষধর্ম্মতা স্থির কখনই হইতে পারে না। আর যদি ঐ কার্য্যদ্বয়ের বিভেদ করা হয়, তবে পক্ষধর্ম্মতানির্ণয়স্থলে ব্যাপ্তি এবং তাহার প্রমাণ দৃষ্টান্তাদির বিচার সমাপ্ত

* পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশে ভারতবর্ষীয় পঞ্চাবয়ব ন্যায়বাক্যের সহিত পাশ্চাত্য তিন অবয়ব ন্যায়বাক্যের তুলনা করা গিয়াছে। আর, "যাহা যাহা ধূমবান্ তাহাই বহ্নিমান্ যথা, পাকশালা" এবং "এই পর্ব্বত সেইরূপ বস্তু" এই দুটি বাক্য মধ্যে ব্যাপ্তিগ্রহ (Induction) এবং অনুমান (Deduction) সংক্রান্ত দুটি প্রকাণ্ড ব্যাপার আছে, এই কথার সূচনা করা গিয়াছে।

হইয়াছে জ্ঞান করিতে হয় ; এবং ব্যাপ্তিনির্ণয়স্থলে পক্ষধর্ম্মতা স্থির করণে কার্য্য স্থগিত রাখিতে হয়। ইহাতে লাভ, অলাভ দুই আছে। কার্য্যদ্বয় পৃথক্ করিলে প্রত্যেক কার্য্যে অপেক্ষাকৃত বাহুল্যরূপে মনঃসংযোগ করা যায়। কিন্তু অলাভ এই যে, কখনও বৃথা ব্যাপ্তি স্থির হয়, আর কখনও বা, অর্থাৎ ব্যাপ্তির ভুল থাকিলে, সেই ভুল অলক্ষিতভাবে উপনয় ও নিগমন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। বোধ হয় এই নিমিত্তই প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা "যথা মহানসঃ" এই দৃষ্টান্তটি ব্যাপ্তি-জ্ঞাপক উদাহরণবাক্যের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছিলেন। মনে কর যে, জীবমাত্রই মৃত্যুবশ এইরূপ ব্যাপ্তি অনুসারে বিচার করিলে অশ্বত্থামাকে সহসা মৃত্যুবশ বলিতে হইবে। কিন্তু যদি রাম শ্যাম আদি সামান্য এক জনের দৃষ্টান্ত সংযুক্ত থাকে, তবে সংশয় হইবে যে, অশ্বত্থামা রাম শ্যামের সহিত এক বর্গান্তর্গত, কি তিনি বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষ বা অবতারবিশেষ বলিয়া গণ্য হইবেন। এই প্রকারে অশ্বত্থামা মৃত্যুবশ এই অশাস্ত্রীয় অনুমান নিবারিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে সঙ্কট এই যে, পদে পদে ভাবনা করিতে হয় রাম শ্যাম নল নীল গয় গবাক্ষ ইহারা কোন্ বর্গের অন্তর্গত। এই বর্গ-বিন্যাসের বিষয়ে ব্যালান্টাইন সাহেবের কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। সংস্কৃত ন্যায় অনুসারে বর্গ শব্দের পরিবর্ত্তে "জাতি" প্রয়োগ করাই বিধেয় হইতে পারে। নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে বঙ্গভাষাতে এই স্থলে "বর্গ" শব্দ প্রয়োগ করিতে সাহসী হইয়াছি।

জিভন্‌স Jevons নামক একজন অভিনব অতি ধীমান্ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক লিখিয়াছেন—

All logical inference involves Classification, which is indeed the necessary accompaniment of the act of judging. It is impossible to detect similarity between objects without thereby joining them together in thoughts and forming an incipient class. Nor can we bestow a common name upon objects without implying the existence of a class. Every common name is the name of a class. It is evident also that

to speak of a general notion or concept is but another way of speaking of a class.

Principles of Science 2nd Edn. p. 673

অর্থাৎ—"ন্যায়ানুগত অনুমানস্থলে সর্ব্বত্রই বর্গবিন্যাসের কার্য্য মিশ্রিত থাকে। এমন কি, যে কোন প্রকার বিচারণা করিতে হইলেও তাহা আসিয়া পড়ে। কোন কোন বস্তুর সামান্যতা লক্ষ্য করিতে হইলে, সেই সেই বস্তুগুলিকে মনে মনে একত্রিত না করিলে হয় না, অর্থাৎ একটা বর্গের সূত্রপাত করিতে হয়ই হয়। যে কোন বস্তু হউক তাহার (উদ্দেশ) নামের বিধান করিতে হইলেও সেই আখ্যাবিশিষ্ট বর্গবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কেবল যেখানে ব্যক্তিবিশেষের নাম করিতে হয়, সেখানে বর্গও থাকে না এবং প্রস্তাবিত নাম সাধারণ সংজ্ঞা বলিয়া গণ্যও হয় না। আর এ কথা বলাও বাহুল্য যে, কোন লক্ষণজ্ঞাপক্ বাক্য প্রয়োগ করিলে, কেবল প্রকারান্তরে বর্গবিশেষের কথাই ব্যক্ত করিতে হয়।"

কিন্তু যেমন তেমন একটা বর্গ ধরিলেই যে তদন্তর্গত সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপ্তি স্থির হইতে পারে, তাহা নহে। বর্গবিন্যাসের স্থলে বর্গান্তর্গত পদার্থের সংখ্যা এবং তাহার সামান্যতা এই দুইটি গুণ লক্ষ্য করা আবশ্যক হয়। সামান্যতার পরিমাণ যত বৃদ্ধি হইবে, যত অধিক প্রকার সামান্যতা বর্গমধ্যে পরিগণিত হইবে, বর্গের পদার্থসংখ্যাও ততই খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইবে। এবং সংখ্যা বিস্তার করিয়া যে বর্গ স্থির করিবে, তদন্তর্গত পদার্থের সামান্যতাও তদনুসারে খর্ব্ব হইয়া পড়িবে। সুতরাং বর্গ স্থির হইলেই যে সর্ব্বপ্রকার সামান্যতা জানা যায়, তাহা নহে। যে যে সামান্যতার ব্যাপ্তি লক্ষ্য করিয়া বর্গ স্থির হইবে, সেই ব্যাপ্তি অনুসারেই উক্ত বর্গান্তর্গত পদার্থের পক্ষধর্ম্মতা অবধারিত হইবে। প্রাগুক্ত গ্রন্থকর্ত্তা Jevons লিখিতেছেন—

"The purpose of classification is the detection of the laws of nature. However much the process may in some cases be disguised, classification is not really distinct from the process of perfect induction whereby we endeavour to ascertain the connections existing between properties of the objects under treatment."

গ্রন্থকর্ত্তা এই কথা বলিয়া যাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে অন্য প্রকার তর্কস্থল দৃষ্ট হইবে। সে সকল তর্ক পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে অতি গুরুতর বিষয়। তাহার সূচনা পরিত্যাগপূর্ব্বক উল্লিখিত বাক্যের সার মর্ম্ম এই স্থির করিতেছি।

"প্রাকৃতিক ব্যাপারে যে অন্যথাসিদ্ধিশূন্য নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা দেখা যায়, সেই নিয়তি বা নিয়ম আবিষ্কার করাই বর্গবিন্যাসের উদ্দেশ্য। এই আবিষ্কার কার্য্য যতই প্রচ্ছন্ন থাকুক না কেন, তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি স্থিরীকরণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং শেষোক্ত কার্য্যের সহিত বর্গবিন্যাস কার্য্যের কোন বিভেদ নাই।" গ্রন্থকার এই স্থলে সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি স্থির কার্য্যের এই মাত্র লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "তদ্দ্বারা আমরা সাধ্য বস্তুর গুণ সমূহের সংযোগ স্থির করিয়া থাকি।" সুতরাং ঐ কার্য্য নৈসর্গিক নিয়ম আবিষ্কার করণের সহিত একই হইতেছে। অতএব প্রাচীন পঞ্চাবয়ব ন্যায়বাক্য এবং পাশ্চাত্য ন্যায়বাক্য মধ্যে এই কএকটি বিভেদ ব্যক্ত হইতেছে—

(১) পাশ্চাত্যগণ পরের মনে কোন অনুমিতি সংঘটন করাইবার জন্য ন্যায়বাক্য প্রয়োগ করেন না। তজ্জন্য নানাবিধ অলঙ্কারবিশিষ্ট বক্তৃতা আদি করিয়া থাকেন। তর্কশাস্ত্রের আলোচনা স্থলে অবয়বত্রয় দ্বারাই অনুমান কার্য্য সমাধা করেন।

(২) অনুমান স্থলে ব্যাপ্তিগ্রহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন না। বরং ব্যাপ্তি গ্রহের কার্য্য পৃথক্ রাখিয়া কেবল উপনয় ও নিগমন দ্বারা অনুমান করেন। ইহাতে ন্যায়ের জটিলতা লাঘব হয়। কিন্তু অনুমানের প্রামাণ্য অসম্পূর্ণ থাকে।

(৩) পাশ্চাত্যগণ অনুমানস্থলে ব্যাপ্তিপরিগ্রহের ভার পাত্রান্তরে স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন না। তাঁহারা ব্যাপ্তিজ্ঞাপক বর্গবিন্যাস করিতে তৎপর, এবং তাঁহাদিগের ন্যায়শাস্ত্রে ব্যাপ্তির পরিবর্ত্তে বর্গবিন্যাসের আলোচনাই প্রবল।

ব্যাল্যান্টাইন সাহেব এতদ্বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি আবার ঐ বর্গবিন্যাসের প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছেন—

"The point in the course of analyzing the reasoning

process at which the logic of India came to a halt whilst that of Europe made an important step in advance was that at which the sagacious mind of Aristotle discerned that whilst the process of induction in all save those barren cases where every one of the individuals is included in the enumeration must fall short of demonstrative certainty, the subsequent process of deduction could be placed on a basis as stable as that of mathematics".

উল্লিখিত বাক্য পাশ্চাত্য পাঠকের উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে; উহার যথাযথ ভাষান্তর করিলে এতদ্দেশীয় পাঠকের সমীপে অপরিচিত বস্তুকে পরিচিতের ন্যায় করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। উহার সারমর্ম্ম এই—

"যেখানে বর্গবিশেষের অবান্তর প্রত্যেক বস্তুকে পৃথক্‌রূপে দর্শন করা সম্ভব, সেখানে ঐ সকল বস্তু সামুদায়িক দর্শনপূর্ব্বক ব্যাপ্তি স্থির করাতে কোন আপত্তি নাই বটে। কিন্তু এরূপ ঘটনা সচরাচর হয় না এবং যেখানে সম্ভবে সে স্থলগুলি অতি তুচ্ছ। পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রকর্ত্তা আরিস্ততল্ অতীব সূক্ষ্ম বুদ্ধি সহকারে এই কথা বুঝিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রাগুক্ত অতি তুচ্ছস্থল ব্যতীত আর যে যে স্থানে ব্যাপ্তি স্থির করিয়া বর্গবিন্যাসের চেষ্টা করিতে হয়, সেই সেই স্থানেই প্রত্যক্ষপ্রমাণজনিত নিশ্চয়তার অল্পাধিক অভাব বর্ত্তিবে কিন্তু একবার যদি বর্গের স্থিরতা স্বীকার করা যায়, তবে তৎসংসৃষ্ট ব্যাপ্তি লক্ষ্য করিয়া যে কোন অনুমিতি করা যাইবে, তৎসমস্তই গণিতশাস্ত্রীয় কথার ন্যায় প্রামাণ্য হইতে পারিবে।" ব্যালান্টাইন সাহেব বিবেচনা করেন যে, ভারতবর্ষের ন্যায়শাস্ত্রে অনুমানক্রিয়া দ্রব্যের বর্গবিন্যাসের উপরে সংস্থাপিত হয় নাই বলিয়াই উক্ত শাস্ত্রের তাদৃশ উন্নতি হয় নাই।

আমার নিজের বিবেচনা এই যে, ব্যালান্টাইন সাহেবের কথা সঙ্গত বটে, কিন্তু তথাচ তাহাতে কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি আছে। একমাত্র আরিস্ততলের ন্যায়-শাস্ত্র হইতেই যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, তাহা নহে। কেন না গালিলিও এবং কেপ্লর নামক বিজ্ঞানবেত্তাদিগের পূর্ব্বে ঊনবিংশ শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রাগুক্ত ন্যায়শাস্ত্র ভারতবর্ষীয় ন্যায়শাস্ত্রের অনুরূপ নিষ্ফল হইয়াছিল। এবং ইউরোপে যে ব্যাপ্তিগ্রহ করিবার অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তিত

হইয়াছিল, তাহার হেতু আরিস্ততল নহে; অপেক্ষাকৃত জটিল সামাজিক অবস্থা। পাশ্চাত্যগণ সেই অবস্থাকে Renaissance এবং Revival of Letters অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনার পুনর্জ্জীবন নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাগুক্ত ঘটনা যেমন তৎকালীন বাণিজ্য এবং রাজসমৃদ্ধি হইতে উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনি আবার সেই সময়ে যে বিজ্ঞানের নব অভ্যুদয় হইয়াছিল সে বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা ইউরোপ এখন যার-পর-নাই প্রতাপান্বিত হইয়াছেন। সেই বিজ্ঞানও উল্লিখিত রাজ-সমৃদ্ধি সংসৃষ্ট পুনর্জ্জীবনের অঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব ব্যাল্যান্টাইন সাহেবের কথাতে কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি আছে। তথাচ স্বীকার করিতে হইবে যে, ন্যায়বাক্য মধ্যে কিম্বা যে কোন স্থলে হউক, অনুমিতির সঙ্গে পদে পদে সদৃষ্টান্ত উদাহরণ দ্বারা ব্যাপ্তি সপ্রমাণিত করিতে হইলে বিচারকার্য্য অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠে। ইউরোপে আরিস্ততলের ন্যায় বাক্য একপ্রকার উপেক্ষিত হইয়াই বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়। পরি-শেষে ফ্রান্সিস্ বেকন (Francis Bacon) দুই প্রণালীর সামঞ্জস্য করেন। করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, ভূয়োদর্শন দ্বারা ব্যাপ্তি স্থির করা একটি পৃথক্ ব্যাপার, উহা যার-পর-নাই প্রয়োজন; এবং সেই কার্য্যে অবিচলিতচিত্তে নিমগ্ন থাকা আবশ্যক। এই প্রকারে ব্যাপ্তি স্থির হইলে, তদনন্তর ন্যায়বাক্য রচনা ও অনু-মান আদি নির্ব্বাহিত হইতে পারে। ভারতবর্ষীয় ন্যায়বাক্য মধ্যে সদৃষ্ট উদাহরণ থাকাতে ব্যাপ্তিগ্রহের সত্যাসত্য বুঝাযায় বটে, কিন্তু ভূয়োদর্শন কার্য্যের সম্যক্ উন্নতি সাধন হইতে পারে না।

সে যাহা হউক, ব্যাপ্তি এবং বর্গবিন্যাসের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য নিম্নলিখিত বচন অনুধাবন করা আবশ্যক। উহা ইংরাজি correlation শব্দ উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে।

"Things are correlated when they are so related or bound to each other that where one is the other is, and where one is not, the other is not. ......In geometry the occurrence of three equal angles is correlated with the existence of three equal sides".

Jevons. Principles of Science p. 681.

অর্থাৎ "যখন কোন বস্তু পরস্পরের সহিত এতাদৃশ ভাবে সম্বদ্ধ থাকে যে, যেখানে একটি বিদ্যমান, সেখানে আর একটিও অবস্থান করে এবং যেখানে একটির অভাব, সেখানে আর একটিরও অভাব ঘটে, তখন সেই বস্তুগুলিকে (correlated) সসম্বদ্ধ বলে। রেখাগণিতে (Geometry) দেখা যায় যে, তিনটি সমান কোণ এবং তিনটি সমান ভুজ পরস্পরের সহিত সসম্বদ্ধ। সমত্রিভুজ ক্ষেত্রের কোণত্রয় সমান হয় এবং সমত্রিকোণ ক্ষেত্রের ভুজত্রয়ও সমান হইয়া থাকে।"

তর্কসংগ্রহকার অন্নভট্ট লিখিয়াছেন—

"লিঙ্গং ত্রিবিধং—অন্বয়ব্যতিরেকি, কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকি চেতি। অন্বয়েন ব্যতিরেকেন চ ব্যাপ্তিমদন্বয়ব্যতিরেকি, যথা বহ্নৌ সাধ্যে ধূমবত্ত্বম। যত্রধূমস্তত্রাগ্নির্যথা মহানস ইত্যন্বয়ব্যাপ্তিঃ। যত্র বহ্নির্নাস্তি তত্র ধূমোঽপি নাস্তি, যথা হ্রদ ইতি ব্যতিরেকব্যাপ্তিঃ।"

অর্থাৎ "লিঙ্গ [পরামর্শ] ত্রিবিধ। অন্বয়ব্যতিরেকি, কেবলান্বয়ি এবং কেবলব্যতিরেকি। অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয় স্থলে যে ব্যাপ্তি থাকে, তাহাকেই অন্বয়ব্যতিরেকি বলে; যথা—বহ্নিসাধ্য করিতে হইলে ধূমবত্ত্বাতে এই লক্ষণ ঘটে। যেখানে ধূম, সেইখানে বহ্নি থাকে, যথা মহানস; এই অন্বয়ব্যাপ্তি। যেখানে বহ্নি নাই, সেখানে ধূমও নাই—যথা হ্রদ; এই ব্যতিরেকব্যাপ্তি।"

ইংরাজি এবং সংস্কৃত বাক্যের মর্ম্ম লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, যে সকল পদার্থ—যথা সমত্রিভুজ—একবর্গীয়, তাহার মধ্যে যদি লক্ষণদ্বয় সসম্বদ্ধ হয়—যথা ভুজত্রয়ের সমতা ও কোণত্রয়ের সমতা একত্রিত হয়—তবে সেই সসম্বদ্ধ লক্ষণকে পাশ্চাত্যগণ correlated বলেন, আর তাদৃশ স্থলে প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা ব্যাপ্তি স্থির করিয়া বলেন যে, যে যে স্থানে ভুজত্রয়ের সমতা, তত্তৎস্থানে কোণত্রয়ের সমতাও থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এতাদৃশ স্থলে সমত্রিকোণ ক্ষেত্র বলিয়া একটি বর্গবিন্যাস করেন, প্রাচীন দার্শনিকেরা তাহার প্রতি বড় একটা লক্ষ্য করেন না। বর্গ এবং বর্গনাম প্রায়ই প্রচ্ছন্ন থাকে।

ক্রমশঃ।

ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা

বকরূপী ধর্ম্ম পুণ্যশ্লোক মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"কা চ বার্ত্তা"। বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া তুমি আমি ঐরূপ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়া থাকি। অদ্ভুত অবস্থায় পড়িয়া যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন অদ্ভুত। বলিলেন—"ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা"। যুধিষ্ঠির সৃষ্টির একদেশমাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, সৃষ্টিতে একজনের মাত্র ক্রিয়া অবলোকন করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন কালের সংহারমূর্ত্তি, দেখিতেছিলেন সংহারমূর্ত্তির ভীষণ ক্রীড়া। দেখাইলেন তাহাই। দেখাইলেন এক অতি বৃহৎ কটাহমধ্যে, অনিঃশেষিত ইন্ধন সহায়ে অতি প্রচণ্ড অগ্ন্যুত্তাপে বিশাল এক দর্ব্বী পরিঘট্টন করিতে করিতে এক মহাপুরুষ কি এক অতি ভীষণ ক্রিয়ায় নিযুক্ত। বিরাট পুরুষের এই মূর্ত্তি অতি ভয়ানক—স্মরণ করিলে শরীর কণ্টকিত, হৃদয় কম্পিত, বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়।

প্রথম কথা, যুধিষ্ঠির এ মূর্ত্তি দেখাইলেন কেন? বিরাটপুরুষের সে লীলাময়ী সন্তাপহারিণী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল না কেন? যে মূর্ত্তি দেখিয়া প্রকৃতি ফুল্ল ফুলে, শ্যামল পত্রে, নূতন বসন্তে হাস্য করিতে করিতে যেন কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করে—যে মূর্ত্তিতে প্রকৃতি নূতন প্রভাতে প্রতিদিন নূতন নূতন ফুল ফোটাইয়া তাহার উপর শুভ্র তুষারবিন্দুর মালা গাঁথিয়া কাহাকে যেন পূজা করে*—যে মূর্ত্তিতে জননী নবপ্রসূত সন্তানের পানে চাহিয়া চাহিয়া আবার চাহিয়া থাকে—যে মূর্ত্তিতে নবদম্পতি শতসহস্র

* নূতনবাসন্তবাদ্য সুহাস্যো
কুড্মলফুল্লে শ্যামলপত্রে
* * * *
সৌরভপূর্ণে মন্দসমীরে
ঘূর্ণিতদেহে শীর্ণসুকায়ে
* * * *
কুসুমপ্রসূনৈর্নিত্যমুষসি
শোভিনি কস্মৈ পূজয়সি ত্বম্—ইত্যাদি।

রূপ পরস্পরকে অবলোকন করিয়াও আবার দেখিতে চায়—যে মূর্ত্তিতে প্রণয়িযুগল নদীতীরে নিদ্রিত চন্দ্রালোকে দূরশ্রুত সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে আবেশে বিহ্বল হইয়া পড়ে—যে মূর্ত্তিতে ভক্তজন পরমাত্মার মুরলীধ্বনি শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হন—যে মূর্ত্তি দেখিয়া কবি লতায় পাতায়, ফলে ফুলে, প্রান্তরে কান্তারে কাহার যেন সাক্ষাৎ পান—অস্তমিত সূর্য্যালোকে, সান্ধ্য গগনে, উত্তাল তরঙ্গময় সাগর-সলিলে আর মানব-মনে সর্ব্বত্র যেন কাহার বাস-ভবন দেখিতে পান—যেন কাহার গতি, কাহার শক্তি চিন্তাশীল প্রতি পদার্থের মধ্যে, চিন্তাগ্রাহ্য প্রতি বস্তুর মধ্যে কার্য্য করিতে দেখেন,* যে মূর্ত্তিতে যোগী প্রণিধান-নিশ্চল হৃদয়াকাশে জ্যোতিরূপ পরমাত্মার † সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেন, আত্মায় আত্মায় এক হইয়া বলিয়া উঠেন "সোঽহং"—বলিয়া উঠেন সৃষ্টির সকলি সুন্দর ‡—সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি যুধিষ্ঠিরের চক্ষে প্রতিভাত হইল না কেন?

এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—তিনি জীবন ধরিয়া নানা ভাবে এই সংহার-মূর্ত্তি উপলব্ধি করিয়াছেন। অস্থিমজ্জার পরতে পরতে কালের তাণ্ডব অনুভব

---

* "..................................I have felt
A Presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of the setting suns,
And the round ocean, and the living air,
And the blue sky and in the mind of man:
A motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects of all thoughts,
And rolls through all things."

Wordsworth.

† যোগিনো যং হৃদাকাশে প্রণিধানেন নিশ্চলং।
জ্যোতিরূপং প্রপশ্যন্তি তস্মৈ শ্রীব্রহ্মণে নমঃ॥

শঙ্করাচার্য্য।

‡ Prayer is a soliloquy of a beholding and jubilant soul. It is the spirit of God pronouncing his works good.

Emerson.

করিয়াছেন। অন্য কোন মূর্ত্তির সংস্কার হৃদয়ে এত দৃঢ় অঙ্কিত হয় নাই। আজ চক্ষের উপর যে বিবর্ত্তন দেখিতেছেন, তাহাতে হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ।

যে মুহূর্ত্তে হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে, যে মুহূর্ত্তে উপস্থিত দুর্ঘটনা জীবনে সমস্ত বিষাদ রাশির সংস্কার উদ্দীপিত করিয়া তুলে, যে মুহূর্ত্তে মানব বিষাদের চরমসীমায় উপনীত হয়, তখন আর কি দৃশ্য দেখা সম্ভব? জগদ্বি-জয়ী ভীমার্জ্জুনের মৃতদেহ সম্মুখে পড়িয়া আছে, সংসারললামভূতা সঞ্চারিণী লতা ছিন্নমূল হইয়া সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়াছে, প্রাণসম নকুল সহদেব ধূলি-ধূসরিত হইতেছে—এ দৃশ্য দেখিয়া আর কাহার মূর্ত্তি মনে পড়িতে পারে? যুধিষ্ঠির জীবনে পুনঃপুনঃ সংহারমূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন—তাঁহার জীবন দুঃখময়। বারণাবতে জতুগৃহদাহে, পাঞ্চালদেশে দ্রৌপদীস্বয়ম্বরে, বনবাসকালে হিড়িম্ববকাদি উৎপাতে, যতবার কালের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, আজ যেন সকলের সমষ্টি সম্মুখে উপস্থিত—আজ যেন সকলের-সমষ্টি সেই মহাপুরুষ, নাচিতে নাচিতে হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে। এমন অবস্থায় হৃদয়ে আর কাহার মূর্ত্তি প্রতিভাত হইতে পারে? তাই বলিলেন—

"ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।"

জীবনের সুখের অবস্থায় আবার অন্য মূর্ত্তি। আমরা মিল্‌টনের গ্রন্থ হইতে এ চিত্র দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এইমাত্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। সুনিপুণ শিল্পীর বিচিত্র যন্ত্র হইতে বৃক্ষ লতা তৃণ পুষ্প, বিবিধ পশু পক্ষী যেন এই মাত্র নামান হইয়াছে। শিখী, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ, শশক, গো, মেষ—সমস্ত পশু, সমস্ত পক্ষী কেহ ঊর্দ্ধে, কেহ নিম্নে, কেহ বৃক্ষশাখায় কেহ জলাশয়ের ধারে উদগ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন সময়ে পশুপক্ষিমধ্যে তৃণলতাবেষ্টিত উদ্যানে আদি মনু সৃষ্ট হইল। পুচ্ছধারী শিখী তরুশাখা হইতে মস্তক উন্নত করিয়া প্রথম মনুষ্যকে দেখিতে লাগিল, দীর্ঘচঞ্চু বক চঞ্চু উন্নত করিয়া সতৃষ্ণে মানবের দিকে চাহিল, হরিণ "থির ভৃঙ্গ" সদৃশ সুনীল আয়ত লোচনে মানবের দিকে চাহিল, সর্প ফণা তুলিয়া দেখিল, ব্যাঘ্র সিংহ হস্তী মহিষ নিস্পন্দভাবে দেখিতে লাগিল—এখনও ইহারা যেন নিজ নিজ প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। দিগ্‌বসন আদি মনু ইহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া। সর্ব্বত্র বিস্ময়ের ভাব, সকলে তাহার

দিকে চাহিয়া আছে। তাহার জানুদ্বয় কিঞ্চিৎ অবনত, হস্তদ্বয় কৃতাঞ্জলিবদ্ধ, মুখে বিস্ময়ের ভাব, প্রফুল্ল রাজীববৎ লোচনযুগলে অনন্ত সৌন্দর্য্য পরিব্যক্ত! তাঁহার মুখ হইতে প্রথম বাক্য নিঃসৃত হইল, বলিলেন—"Hail Holy light!" আর কি বাহির হইবে? এইমাত্র অন্ধকার হইতে আলোক সৃষ্ট হইয়াছে—জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আকাশের উপর দাঁড়াইয়া! আদি মনু তাঁহাকে দেখিল, তাঁহাকেই ডাকিল—"Hail Holy Light!" এখনও সংসারে পাপ নাই—নূতন আলোকে, নূতন সৃষ্ট জীবজন্তু নূতন হীরকখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে—সমস্তই নূতন, সমস্তই আলোকময়। মানব বলিল—"Hail Holy Light!" আর কি বলিবে? জ্যোতির্ম্ময়ের সম্মুখে আর কি বাক্য সম্ভব? যখন দূরে নিকটে, ঊর্দ্ধে নিম্নে, সম্মুখে পশ্চাতে, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র জ্যোতিঃ, সর্ব্বত্র আলোক, সর্ব্বত্র একজনের মূর্ত্তি, তখন মানব আর কাহাকে ডাকিতে পারে? যখন শিখিপুচ্ছে ফণিফণায় দিব্য জ্যোতি ঝলসিতেছিল; যখন সিংহকেশরে, ব্যাঘ্রাজিনে, পক্ষিপক্ষে, হরিণগাত্রে শ্বেতকৃষ্ণনীললোহিত বর্ণ প্রতিফলিত হইতেছিল; যখন তরুশিরে, লতাকুন্তলে, বৃক্ষপত্রে পুষ্পগাত্রে, সর্ব্বত্র আলোক ঝলসিতেছিল, তখন মানব আর কি বলিবে, বলিল—"Hail Holy Light!" যখন জলস্থলব্যোমে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলে, পৃথিবীতলে জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিঃ প্রস্ফুট হইতেছিল, তখন মানবের মুখে আর কি বাহির হইতে পারে? তাই বলিল—"Hail Holy Light!"—যিনি জগতে এই দুই মূর্ত্তির সম্বন্ধ বুঝিয়াছেন, তিনিই "কা চ বার্ত্তা" উত্তরপ্রদানে সমর্থ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—উত্তরটি যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ের কথা—তাঁহার অবস্থোচিত। যুধিষ্ঠির মানুষ, এজন্য তাঁহার হৃদয়ের কথা আমাদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। সংসারে শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হয় নাই এমন লোক কি কেহ আছে? যুধিষ্ঠিরের মত আমরাও অনেক বার সংহারমূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছি। "ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা" আমাদেরও মনের কথা। কিন্তু প্রশ্নটি যেরূপ, উত্তরটি তদ্রূপ কি না? যুধিষ্ঠির মানবশ্রেষ্ঠ, তাঁহার নিকট হইতে আমরা সর্ব্বব্যাপক প্রশ্নের সর্ব্বব্যাপক উত্তর আকাঙ্ক্ষা করি। তোমার আমার মত তিনি যদি সাধারণ প্রশ্নের সঙ্কীর্ণ উত্তর প্রদান করেন, যদি তাঁহার চক্ষে সৃষ্টির কোন এক গুরুতর ক্রিয়া প্রতিভাত না হয়, তবে যেন আপনা হইতে মনে অতৃপ্তি আইসে।

এক্ষণে দেখা যাউক, যুধিষ্ঠিরদত্ত উত্তরটি সঙ্কীর্ণ কি না? আমরা ভয়ে ভয়ে পাঠকসমীপে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি। যদি ভারতের পূর্ব্বে ভগবদ্গীতা বা ভাগবত রচিত হইত, তবে বোধ হয় এ সঙ্কীর্ণতা থাকিত না; তবে বোধ হয় ব্যাসদেব "পরিত্রাণায় সাধূনাম্" এবং "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" এতদুভয় ব্যাপারকেই "কা চ বার্ত্তা" প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর নির্দ্ধারিত করিতেন। কেহ যেন মনে না করেন, আমরা ব্যাসদেবের সঙ্কীর্ণতা দেখাইতে বসিয়াছি। অন্য পক্ষে আমরা ব্যাসদেবকে কোটি কোটি প্রণাম করি। যে মানসক্ষেত্রের একদিকে কুরুক্ষেত্রের মহা সমর, অন্যদিকে গীতা ভাগবতের শান্তিময় ভক্তি উৎস, মনুষ্যমধ্যে সে হৃদয়ের—সে মনের—তুলনা হয় না!

সংসারে কাল ভূতসমূহ পাক করিতেছে, ইহাই জগতের গুরুতর বার্ত্তা, এরূপ বলিলে প্রশ্নের ঠিক উত্তর হইল না বলিয়া বোধ হয়।

সংসার সমর-ক্ষেত্র। এক দিকে কাল, অন্য দিকে প্রকৃতি—ঘোরতর যুদ্ধ। জগৎ প্রকৃতির আদরের সামগ্রী, এই স্নেহের বস্তু কাল জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছে! প্রকৃতি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু কাল প্রভূত পরাক্রমশালী—কালী সংগ্রামে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না! কালের নিকট হারিয়াও হারিতেছেন না, কৌশলে স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেছেন। অথচ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র মানব পশু পক্ষী তৃণ লতা কালের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে—বামা তাণ্ডবে নিমগ্না। নাচিতে নাচিতে প্রকৃতি এক দিকে হস্ত তুলিয়া স্বীয় সন্তানদিগকে বরাভয় দিতেছেন, অন্য দিকে খড়্গ ধরিয়া কাল সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রণশ্রমে লোলজিহ্বা-প্রকৃতি ক্রোধে ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু কাল দুর্দ্দান্ত। জড়প্রকৃতি কি মানব-প্রকৃতি যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে এই দুই মহাশক্তি দুই দিক হইতে সৃষ্ট পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

কবি ও কাব্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কবিরা স্বীয় প্রতিভাবলে বাহ্য ও আন্তর পদার্থসমূহের মধ্যে সূক্ষ্ম ও নিপুণবুদ্ধিগ্রাহ্য শাশ্বত সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন। ঐ সমস্ত সম্বন্ধ আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের নিপুণতর পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। সুতরাং কবিকেও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের ন্যায় পদার্থতত্ত্বের গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত হইতে হয়। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণ যেমন স্বীয় পুস্তকে স্ব স্ব গবেষণার ফল লিখিয়া রাখেন, সেইরূপ কবিও স্বকীয় স্মৃতিপটে পর্য্যবেক্ষণলব্ধ ফল লিখিয়া রাখেন। পরন্তু দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা তিনি ঐ কার্য্যে এতদূর পটু, যে এমন কি মনুষ্যহৃদয়ের ভাবপ্রবাহের ক্ষুদ্রতম উর্ম্মিটিও তাঁহার সর্ব্বসংগ্রাহক স্মৃতিপুস্তককে অতিক্রম করিতে পারে না। পাঠক মনে করুন, আপনি কোন নির্জ্জন অরণ্যানী বা গিরিশৃঙ্গে পরিভ্রমণ করিতেছেন ও তত্রত্য অলৌকিক নৈসর্গিক শোভায় মোহিত হইয়া আবিষ্টের ন্যায় নির্নিমেষনেত্রে উহা পান করিতেছেন। হঠাৎ কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে আপনার হৃদয় বিষণ্ণতায় পরিপূর্ণ হইল, আপনি উৎকণ্ঠিত হইলেন। বিষাদের কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেন বিষণ্ণ হইলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন কারণই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। ক্রমে হৃদয়ের ঔৎসুক্য ঘনীভূত হইল। নেত্র সবাষ্প হইল ও ভাবোচ্ছ্বাস অশ্রুজলরূপে পরিণত হইয়া হৃদয়ের ভারলাঘবে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু পরে আপনি প্রকৃতিস্থ হইলেন ও পূর্ব্বাবস্থা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। মনে করিলেন যে ঐ পূর্ব্বোক্ত ভাবোদয়টি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য—উহা আপনারই সম্বন্ধে ঘটিয়াছে অন্য কাহারও বোধ হয় উহার সহিত পরিচয় নাই। কিন্তু ফলতঃ উহা বাস্তবিক ব্যক্তিগত নহে। আপনার সহিত ঐ ভাবের নূতন পরিচয় হইলেও কবির সম্বন্ধে উহা পুরাতন। তিনি উহা পূর্ব্বেই পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন ও কি কারণে উহার উৎপত্তি হয়, তাহারও যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন।

ম্লেচ্ছ কবি টেনিসন্ লিখিয়াছেন—

Tears, idle tears, I know not what they mean,
Tears from the depth of some divine despair
Rise in the heart and gather to the eyes
In looking at the happy autumn fields,
And thinking of the days that are no more.

মহাকবি কালিদাস তাঁহার শকুন্তলা নাটকে লিখিয়াছেন—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকোভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥"

অর্থাৎ রম্যবস্তু অবলোকন ও রমণীয় শব্দ শ্রবণ করিয়া, প্রাণিগণ সুখিত (সুখী বা সুখভোগী) হইয়াও যে উৎকণ্ঠিত হয়, তাহার কারণ এই যে, তাহারা তৎকালে অন্তঃকরণে বদ্ধমূল জন্মান্তরীণ সংস্কারসমূহ স্মরণ করে। এই শ্লোকটি যে প্রসঙ্গে উত্থিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ আবশ্যক। রাজা দুষ্মন্ত বিদূষকের সহিত বিশ্রম্ভালাপে আনন্দে কালক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় হংসপাদিকানাম্নী একজন অন্তঃপুর-পরিচারিকা একটি গান করিল। রাজা গীতধ্বনি শ্রবণে হঠাৎ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কেন উৎকণ্ঠিত হইলেন তাহার কারণ কিছুমাত্র নির্ণয় করিতে পারিলেন না এবং পূর্ব্বোক্তরূপ শ্লোকটি দ্বারা ঐরূপ আকস্মিক বলিয়া প্রতীয়মান ভাবোদয়ের উপপত্তি করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি অথবা মহাকবি কালিদাস যেরূপ উপপত্তি করিলেন, তাহা প্রকৃত হইতেও পারে বা না হইতে পারে, কিন্তু তিনি ও ম্লেচ্ছ কবি যে ঐরূপ ভাবোদয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং তাহার উপপত্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণশক্তির চরম সীমা। এই পর্য্যবেক্ষণশক্তিবলেই কবিগণ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থগত সাধর্ম্ম্য আবিষ্কার করেন ও সেই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ উপমাদি অলঙ্কার দ্বারা স্ব স্ব

কাব্য ভূষিত করেন। এই পর্য্যবেক্ষণশক্তির উৎকর্ষবশতঃই মহাকবি কালিদাসের উপমাগুলি এরূপ হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। উদাহরণের নিমিত্ত আমরা এস্থানে দুই একটির উল্লেখ করিব।

শকুন্তলা নাটকে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছেন—

"ইদং চ মে মনসি বর্ত্ততে—

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নব মনাস্বাদিতরসং।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥"

"ইহা আমার মনে হইতেছে,—জানি না বিধি, অনাঘ্রাত পুষ্প কররুহ (নখ) দ্বারা অলূন (অচ্ছিন্ন) কিসলয় (নবপল্লব) (বজ্রাদিদ্বারা) অনাবিদ্ধ রত্ন নূতন ও অনাস্বাদিতরস মধু ও পুণ্যের অখণ্ডফলের ন্যায়, সর্ব্বথা দোষস্পর্শশূন্য (অনঘ) এই রূপকে কাহার ভাগ্যে ঘটাইবেন। পাঠক দেখুন, এস্থলে উপমানগুলি কিরূপ গুণপনার সহিত নির্ব্বাচিত হইয়াছে ও তদ্গত দোষশঙ্কাই বা কিরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। কবির অভিপ্রায় এই যে, রূপটি সর্ব্বতোভাবে দোষস্পর্শশূন্য সুতরাং তিনি উহাতে উপমান বিধায় কতকগুলি উৎকৃষ্টতম বস্তুর নিবেশ করিয়াছেন ও পাছে তাহাতেও কেহ দোষ আশঙ্কা করেন, এই বিবেচনায় কতকগুলি বিশেষণ দ্বারা সেই আশঙ্কার মুখ একেবারে রোধ করিয়াছেন। কেবল পুষ্প নহে, অনাঘ্রাত পুষ্প, কারণ পুষ্প যদি আঘ্রাত হইল তবে আর তাহার "অনঘত্ব" কোথায় রহিল? কেবল কিসলয় নহে, কারণ উহাও নখদ্বারা ছিন্ন হইলে বিবর্ণ ও মলিন হয় সুতরাং উহাকে নির্ব্বিশেষণ বলিলে চলিবে না, উহাও "কররুহ" দ্বারা অলূন হওয়া চাই। এমন কি, পুণ্যের ফল বলিলেও চলিবে না, উহা অখণ্ড হওয়া চাই, কারণ কেবল পুণ্যের ফলেও খণ্ডিতত্ব বা অসম্পূর্ণতা দোষ থাকিতে পারে সুতরাং উহা "অনঘ" শকুন্তলার রূপের উপমানরূপ নিবিষ্ট হইতে পারে না। উপরিউক্ত শ্লোকটি পাঠ করিলে বোধ হয় যেন কবি কল্পনাবলে জগতের সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তু এক একটি করিয়া নিজ মানসচক্ষুসমীপে স্থাপন করিয়া দোষগুণবিচারপূর্ব্বক

তাহাদের পরিত্যাগের পর পূর্ব্বোক্ত কয়টি গ্রহণ করিয়াছেন। যে কবি এরূপ উপমা সংঘটন করিতে পারেন, তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তি কত দূরব্যাপিনী! রঘুবংশ কাব্যে একটি শ্লোকে পুত্র অজ পিতা রঘুর সর্ব্বাংশে অনুরূপ হইয়া উঠিল, এই কথা বলিবার সময় কবি লিখিয়াছেন—

"ন কারণাৎ স্বাৎ বিভিদে কুমারঃ
প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ।"

অর্থাৎ একটি প্রদীপ হইতে প্রজ্বলিত অপর প্রদীপের ন্যায় কুমার "অজ" স্বীয় কারণ রঘু হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন হন নাই। এক্ষণে পাঠক ভাবিয়া দেখুন, এরূপ উপমা আর কোথাও দেখিয়াছেন কি, এইরূপ উপমা কি ঔপম্যের চরম উৎকর্ষ নয়? এরূপ উপমাসংঘটনকারী কবির সাধর্ম্ম্যপর্য্যবেক্ষণ শক্তি কি সর্ব্বাতিশয়িনী নয়? এই সাধর্ম্ম্যপর্য্যবেক্ষণ শক্তি আবার কল্পনাশক্তিসাপেক্ষ, কারণ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগত সাধর্ম্ম্য নিশ্চয় করিতে হইলে, তাহাদের ধর্ম্মগত তুলনা আবশ্যক। সেই তুলনা আবার তৎ তৎ ধর্ম্মের যুগপৎ মানস উপস্থিতি না থাকিলে হইতে পারে না। সেই মানস উপস্থিতি (mental presence) আবার কল্পনাশক্তিজন্য, সুতরাং পরম্পরাসম্বন্ধে কল্পনা শক্তিকেই পর্য্যবেক্ষণ শক্তির জনিকা বলিতে হইবে। এই নিমিত্ত যে সকল মহাকবি সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণকারী বলিয়া খ্যাত, তাঁহারাই আবার কল্পনাবলে অসীম বলীয়ান্ বলিয়া কীর্ত্তিত। এই শক্তিই মহাকবিদিগের সম্মোহন অস্ত্রস্বরূপ। এই শক্তিই তাঁহাদের ঐন্দ্রজালিক দণ্ড* এই শক্তি বলেই তাঁহারা অবাস্তব মানসিক পদার্থে বাস্তবত্ব বুদ্ধি উৎপাদন ও জড়জগতের পরিচ্ছেদ (finiteness) ও অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করেন। মহাকবি সেক্ষপীয়রের মিড্সামারনাইট্স্ ড্রিম ও মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত এই শক্তির চরম উৎকর্ষের ফল। এই নিমিত্তই প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মট কাব্যপ্রকাশের আরম্ভেই লিখিয়াছেন—

* "As imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name."

"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাং।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি ॥"

"ঈশ্বরের সৃষ্টি নিয়তি শক্তি দ্বারা নিয়তরূপা। অর্থাৎ ইহা কতকগুলি অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন ও পরমাণ্বাদি উপাদানকারণসাপেক্ষ, ইহা দুঃখ-শোক-মোহাদিময়, ইহাতে ছয়টি মাত্র রস (কটু-তিক্ত-কষায়াদি) আছে, সেই রসের সকলগুলিই আবার সুস্বাদু নহে। কিন্তু কবিকৃত সৃষ্টি অনিয়তরূপ,কোন কারণ বিশেষের অনধীন,দুঃখশোকাদিস্পর্শশূন্য, কেবলমাত্র আনন্দময়ী ও নবরসবিশিষ্ট (শৃঙ্গার করুণ ইত্যাদি) সুতরাং ইহা ঈশ্বরকৃত সৃষ্টি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আমরা এই অলৌকিক কবিসৃষ্টির দুই একটি উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধ উপসংহার করিব—

১। কিং তারুণ্যতরোরিয়ং রসভরোদ্ভিন্না নবা বল্লরী
বেলা প্রোচ্ছলিতস্য কিং লহরিকা লাবণ্য বারাংনিধে।
উদগাঢ়োৎকলিকাবতাং স্বসময়োপন্যাস বিশ্রম্ভিণঃ
কিং সাক্ষাদুপদেশযষ্টিরথবা দেবস্য শৃঙ্গারিণঃ ?

২। ইদং বক্ত্রং সাক্ষাৎ বিরহিতকলঙ্কঃ শশধরঃ
সুধাধারাধারশ্চিরপরিণতং বিম্বমধরঃ।
ইমে নেত্রে রাত্রিন্দিবমধিকশোভে কুবলয়ে
তনুর্লাবণ্যানাং জলধিরবগাহে সুখতরঃ ॥

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

মাসিক সংবাদ

গঙ্গাতীরে পাটনা নামে কোন নগর আছে। তথায় কর্কুড নামা প্রথিতযশা অতি জ্ঞানবান্ এক বিচারপতি জনসমাজের প্রতি কৃপা করিয়া মাসিক আড়াই হাজার টাকামাত্র বেতন লইয়া বিচার বিতরণ করিতেন। তাহাতে পুণ্যক্ষেত্র পাটলিপুত্র পবিত্রিত হইতেছিল। একদা, বুধিয়া নাম্নী অপ্রাপ্ত-যৌবনা কাচিৎকুমারী তাঁহার বিচারাগারে বিচার প্রার্থিত হইল। বলিল—"ধর্ম্মাবতার! গুরুচরণ দোসাদ নামে চোর, আমার ঘটি বাটি চুরি করিয়াছে।" বিচারনিধান এই অশ্রুতপূর্ব্ব অভাবনীয় অঘটনীয় সম্বাদশ্রবণে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া মনে মনে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন—"কালের কি বিচিত্র গতি! হায়! কুমারীর ঘটি বাটি চুরি! এমন কি হয়!" মলিম্লুচ যুক্তপাণি হইয়া বিচারাসনতলে নিবেদন করিল—"হে ধর্ম্মস্বরূপ! এমন কি হয়! বরং আকাশে স্তরে স্তরে সহস্রদল পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে—বরং প্রভাতে পশ্চিমে দ্বাদশ আদিত্য উদিত হইতে পারে, বরং হিমালয়-শিখর-দেশে যূথে যূথে মকর কুম্ভীর সন্তরণ করিতে পারে, তথাপি, হে ধর্ম্মস্বরূপ! কুমারীর কখন ঘটি বাটি চুরি যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার! এই দুশ্চারিণী বুধিয়া ঘোরতর অসতী—ইহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।" তখন বিচারাসন হইতে সেই জ্ঞানসমুদ্রের কল্লোল সমুত্থিত হইল—"রে মলিম্লুচ! সাধু সাধু! এ অতি সঙ্গত কথা। আমি অনন্ত জ্ঞানী বিচারক; আমি অচিরেই পরীক্ষার দ্বারা এ কঠিন সমস্যার মীমাংসা করিব।" তখন ধন্বন্তরির প্রতি মহা বিচারক আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "বিবস্ত্র করিয়া এই দুশ্চারিণীকে পরীক্ষিত কর।" দুশ্চারিণী পরীক্ষিতা হইয়া চরিতার্থ হইল। কিন্তু কালের কি অনন্ত মহিমা! সেই প্রদেশে "বেহার হেরাল্ড্" নামে অতি দুর্দান্ত রাক্ষস ধর্ম্মহিংসা করিয়া

দিন যাপন করে। সেই মহাধনুর্দ্ধর, পাটলিপুত্র নগরে এইরূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতারণা শ্রবণ করিয়া মহা ক্রোধভরে বিচারপতির প্রতি এমন এক শর প্রয়োগ করিলেন, যে তাহা ত্যাগে এক, মুদ্রাঙ্কনে সহস্র, পতনকালে লক্ষ, এবং সংহারকালে কোটি কোটি হইয়া পড়িল। প্রথিতযশা বিচারনিধি শরজালে বিদ্ধ হইয়া, বিচারাসন হইতে ভূপতিত হইলেন। ইতি কর্কুড-বধ।

He comes, nor law, nor justice his course delay.
Hide! blushing Glory, hide Budhia's day.
The vanquished hero leaves his broken bands,
And shows his misery in distant lands.
His fate was destined on Patna's sand,
A petty niggeress, and a Bāboo's hand!

***

কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় তাঁহার একটি রায়ে লিখিয়াছেন, হিন্দু বিধবাদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন অসতী। আমাদের একটি গল্প মনে পড়িল। গুরুদেব শিষ্যালয়ে গিয়াছেন, আদর অভ্যর্থনার পর যথাসময়ে শিষ্য রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিল। ঝোল রাঁধিতে বড় বড় দশটি কই মাছ আনিয়া দিল; অভিপ্রায়, গুরুদেবের সেবা হইবে, অবশিষ্ট শিষ্য সহ স্ত্রীপুত্র প্রসাদ পাইবেন। রন্ধন শেষ হইল, গুরুদেব ভোজনে বসিলেন। ঝোলে নুন ঝাল সমান হইয়াছিল, একটি একটি করিয়া অমৃত বোধে গুরুদেব নয়টি মাছ খাইয়া ফেলিলেন। তখন তিনি অম্ল রসাস্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কিন্তু গুরুদেবের কার্য্য শিষ্যের ভক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল, সে জিদ করিয়া বলিল—"এখন অম্বল থাকুক্, আগে ও মাছটি খান।" গুরুদেব কিন্তু কিছুতেই স্বীকার পাইলেন না। শিষ্য তখন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—"উটি যদি না খান, ত আপনার বেটার মাথা খান।" আমরাও চণ্ডী বাবুকে অনুরোধ করি, যদি নিরানব্বইটির মাথাই খাইলেন, তবে আর একটি রাখিয়া ফল কি? আর একবার রায় লিখিয়া উটিকেও টানিয়া লউন।

লর্ড রাণ্ডল্ফ চর্চ্চিল ভারত গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতাকেই ভারতের অর্থাভাবের মূল কারণ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতার ফলস্বরূপ কয়েকটি কার্য্যও তিনি চোকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টও না কি তাহার উত্তর দিয়াছেন। উত্তরটা মুশাবিদা করিতে আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই, তাহাতে আমরা কিছু দুঃখিত আছি। আমরা হইলে লিখিতাম—"দেখুন, কোনমতেই আমাদের অপব্যয়ী বলা যাইতে পারে না। অপব্যয়ীরা ঘরের টাকা খরচ করে, আমরা পরের টাকা খরচ করি। অপব্যয়ীরা মদ গাঁজা খাইয়া টাকা উড়াইয়া দেয়, আমরা মদ গাঁজা বেচিয়া টাকা করি। অপব্যয়ীরা দান ধ্যান করিয়া টাকা উড়াইয়া দেয়, কিন্তু কেহ কখন বলিতে পারিবে না যে আমরা এমন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; বরং Frontier Defences ইত্যাদি বাব সবুবে কিছু দান পাইলেও পাইতে পারি। আমাদের কিছু ঋণ আছে বটে, কিন্তু কবে দেখিয়াছ যে আমরা তাহা পরিশোধ করিয়াছি? আমরা অপব্যয়ী নহি। তবে টাকায় কুলায় না বটে, তাহার কারণ খরচ বেশী। আয়ের বেশী ব্যয় করিলে অপব্যয়ী বলে?"

***

হক সাহেবকে লইয়া যে খনির ধূয়া উঠিয়াছে, আগে হয় ত তাহার ভিতর রূপাই ছিল, এখন কিন্তু মেকি বই আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারীর আফিসও না কি আবার এই ব্যাপারের সহিত কতকটা সুসম্বদ্ধ। "রিপোর্টে তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির কথা প্রকাশ হইলে ইণ্ডিয়া আফিসের উপর সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মিবে, তাই কমিশনের কোন কোন সভ্য রিপোর্টে যাহাতে এ কেলেঙ্কারি বাহির না হয়, তাহার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাহা হইলে আর কি হইল?, আমরা বলি, ভাগ্যক্রমে খনি যখন মিলিয়াছে, তখন খুঁড়িয়া রত্ন বাহির করাই কর্ত্তব্য।

সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থিদিগের বয়সের সীমা এখন ১৯ বৎসর। পব্‌লিক সিবিল সর্ব্বিস কমিশন রায়ে পরীক্ষার্থিদিগের বয়সের সীমাটা একটু বাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সিবিল সর্ব্বিস সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনাধীন থাকিলেও বয়সটি যে কমাইতে পারিবেন না, অণ্ডর সেক্রেটারি গর্ষ্ট সাহেব তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। ইহাতে আমরা দেশীয়দিগের জন্য আপত্তি করি না, বিলাতীদিগের জন্যই আমাদের ভাবনা। এখন তোমাদের পেটের জ্বালায় এদেশে গাই কমিয়া গেল, এখন আর দুধের ছেলে অত পাঠাইলে চলিবে কেন ?

কলিকাতা পুলিসের কার্য্যপ্রণালীর কতকটা পরিবর্ত্তন হইবে শুনা যাইতেছে। পরিবর্ত্তনটা না কি আবার সংস্করণের দিকেই। কলিকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনর ল্যাম্বার্ট সাহেব এ কার্য্যে বড়ই উদ্যোগী হইয়াছেন শুনিতেছি। প্রত্যেক থানায় এক এক জন করিয়া সুশিক্ষিত কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের অধীনে আরও দুই জন করিয়া সহকারী নিযুক্ত হইবেন। থানার কর্ম্মচারিগণের কার্য্যের উপর ইহাদিগকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং প্রত্যহ ডেপুটি কমিশনরের নিকট এক এক খান রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে। আমরা যুক্তকরে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, পুলিষের আর সংস্কারে কাজ নাই। এ নিদারুণ অস্ত্রে আবার শাণ কেন ? কোন সুন্দরীকে অলঙ্কার পরিতে দেখিয়া এক জন ভোঁতা রকম কবি বলিয়াছিল, "ঠাকুরুণ! বাঘে খাবার বন্দোবস্ত ত আছেই, আবার কাঁটাবন দিয়া হিঁচুড়ে নিয়া যাবার ব্যবস্থা কর কেন ?" কর্ত্তৃপক্ষকে আমরাও তাই বলি।

***

ভারতের ভাবী বড় লাট্ মার্কুইস অব্ ল্যান্স্‌ডাউন নবেম্বরের মাঝামাঝি লণ্ডন ছাড়িয়া ডিসেম্বরের প্রথমেই বোম্বাই সহরে পহুঁছিবেন। কলিকাতায় আসিয়া ৮ই ডিসেম্বর পুরাতন লাটের হস্ত হইতে তাঁহার কার্য্যভার বুঝিয়া

পড়িয়া লইবার কথা। বাসুকি পৃথিবীর ভার বহন করেন, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ফণা বদলাইতে হয়; ইংলণ্ড ভারতবর্ষের ভার বহন করেন, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে লাট্ সাহেব বদলাইতে হয়। ফণা বদলাইবার সময় একটা ভূমি-কম্প হয়; লাট্ সাহেব বদলাইবার সময়ে কলিকাতায় একটা লম্ফঝম্প হয়। লম্ফঝম্প ত্রিবিধ, (১) আগ্নেয় বা Illumination, (২) বায়বীয় বা Address, এবং (৩) আর্দ্ধচন্দ্রিক বা Levee. কলিকাতাবাসীরা এই বেলা হইতে গলার ভিতর-বাহির শাণাইতে আরম্ভ করুন।

***

বিলাতে যাহাতে স্থায়িভাবে ভারত কথার আন্দোলন আলোচনা হয়, এই উদ্দেশ্যে তথায় একটি কার্য্যালয় স্থাপন করিবার উদ্যোগ হইতেছে। পনর হাজার টাকা ইহার বার্ষিক ব্যয় ধরা হইয়াছে। বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হইতে টাকাটা উঠিবে। এখানকার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা ও ভারতসভা একজোট হইয়া এ কাজে দাঁড়াইতেছেন। টাকার কিনারা হইলে ভারতবন্ধু ডিগ্‌বি সাহেবকে না কি কার্য্যালয়ের মুরুব্বি ধরিবার চেষ্টা করা হইবে। ডিগ্‌বি সাহেব এখন সচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারেন। সমুদ্রের কেনারা আজ কাল পাওয়া যায়, কিন্তু টাকার কেনারা! দেশী ভেলায় চড়িয়া পাওয়া ভার।

***

এবার না কি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন-কত পরীক্ষক কাগজ না দেখিয়াই ছাত্রদের নিপাত করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে তাঁহাদিগকে গালিগালাজ করিতেছে। আমরা গালিগালাজের কোন কারণ দেখি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সব রকম বিদ্যা থাকা উচিত। আছেও।

সমালোচন

ব্যবস্থাপক সভা। ৩৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট "ভারত-সভার" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত এক খণ্ড পুস্তিকা। ব্যবস্থাপক সভা কি, প্রজাসাধারণের তাহার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ এবং কিরূপে উহা সাধারণের হিতপ্রসূ হইতে পারে, ইহাতে সে কথাগুলি বিশদ রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই পুস্তিক খানি দেখিয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি, বাঙ্গালা গ্রন্থ দেখিয়া এরূপ অনেক দিন করি নাই। ভারত-সভা এত দিনে আপনাদের প্রকৃত কার্য্য বুঝিয়াছেন। তবে গ্রন্থ ত দেখিলাম, কিন্তু ইহার উপযুক্ত প্রচারের কি উপায় হইয়াছে? গৃহে গৃহে যাহাতে এই পুস্তিকা পঁহুছে, তাহার কোন সদুপায় হইয়াছে? ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে কি?

ক্ষণা-মিহির। শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। বিদুষী ক্ষণার নাম আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই শুনা আছে। গ্রন্থকার নানাস্থানপ্রচলিত প্রবাদাদি হইতে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই ইহাতে গল্পচ্ছলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহা যে প্রকৃত ইতিহাস নয়, তাহা গ্রন্থকার নিজেই ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃত অর্থে ইহা উপন্যাসও নহে। তথাপি যাঁহারা গল্প পড়িতে ভালবাসেন, ইহা পড়িলে আনন্দলাভের সহিত বিষয় সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। গ্রন্থের কলেবর বিবেচনা করিলে ইহার মূল্য সুলভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

ভারত-ভ্রমণ। ১ম খণ্ড, শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত বিরচিত, মূল্য ৷৶৹ আনা। গ্রন্থকার ইহাতে নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত অল্প-বিস্তর ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের সহিত মিশ্রিত করিয়া লিখিয়াছেন। বরদাকান্ত বাবুকে এক জন সুলেখক বলিয়াই আমাদের জানা আছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ প্রকার গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

অমৃত-পুলিন। ইতিবৃত্তান্তমূলক উপন্যাস, একজন পরিব্রাজক প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। পরিব্রাজক মহাশয়ের ভাষাটি বেশ, কিন্তু ভাষা ভাল হইলেই উপন্যাস ভাল হয় না। দুই চারিটা প্রাতর্ব্বর্ণন, সন্ধ্যা-বর্ণনাদি করিয়া আবশ্যক মত মেয়ে পুরুষকে কথা কহাইতে পারিলেই বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাস হইয়া যায়। মুদ্রাযন্ত্র হইতে অবিশ্রান্ত যে সকল উপন্যাস বাহির হইতেছে, তেমন না হউক, প্রশংসার কথাও ইহাতে কই বড় একটা দেখিলাম না। গ্রন্থকার যত্ন করিলে ভবিষ্যতে ভাল লিখিতে পারিবেন এরূপ ভরসা করা যায়।

বিজ্ঞান বাবু। প্রহসন, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৹ চারি আনা। এক শ্রেণীর লেখক আছেন, সম্ভবই হউক আর অসম্ভবই হউক, তিলটিকে তাল করিয়া দেখান। বিজ্ঞান বাবুও অনেক স্থলে এইরূপ অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। সমাজকে ব্যঙ্গ করিতে হয় সমাজের দোষের জন্য, সমাজ সংশোধন করিবার জন্য। যেরূপ বিদ্রূপ সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাতে প্রতীকারের সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, বিজ্ঞান বাবু পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। শীতল বাবুর দল যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, সে কথা বেশ বুঝা যায়। এটা সুলক্ষণ।

ললনা-সুহৃদ। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ॥৹ আট আনা। হিন্দুরমণীদিগের কি প্রণালীতে কি কি বিষয়ের শিক্ষা করা উচিত গ্রন্থকার সরল ভাষায় এ গুলি লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। উপদেশগুলি ভালই দেওয়া হইয়াছে, তবে গৃহস্থের বৌ ঝি বেশ নাচিয়ে গাহিয়ে হয় সেটা হিন্দুর কাছে কেমন কেমন ঠেকে না? ললনাগণের এই সুহৃদের সঙ্গে পরিচয় হয়—আমাদের ইচ্ছা।

প্রচার

৪র্থ খণ্ড] ১২৯৫ [৫।৬ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য বলে, যাহারা বেদবাদরত, (তদ্ভিন্ন) আর কিছুই নাই যাহারা ইহা বলে, তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত অপহৃত, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় না।

এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের ও ৫৩ শ্লোকের বিশেষ প্রাধান্য আছে; কেন না, এই ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব

নিহিত আছে। এবং গীতার এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতএব ইহার প্রতি পাঠকের বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি

প্রথমতঃ শ্লোকত্রয়ে, যে কয়টা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক। কাম্যকর্ম্মের কথা হইতেছিল। এখনও সেই কথাই হইতেছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথাকে আপাতশ্রুতিসুখকর বলা হইতেছে; কেন না বলা হইয়া থাকে, যে এই করিলে স্বর্গলাভ হইবে, এই করিলে রাজ্যলাভ হইবে, ইত্যাদি।

সেই সকল কথা "জন্মকর্ম্মফলপ্রদ।" শঙ্কর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, "জন্মৈব কর্ম্মণঃ ফলং জন্মকর্ম্মফলং, তৎপ্রদদাতীতি জন্মকর্ম্মফলপ্রদা।" জন্মই কর্ম্মের ফল, যাহা তাহা প্রদান করে, তাহা "জন্মকর্ম্মফলপ্রদ।" শ্রীধর ভিন্নপ্রকার অর্থ করেন; "জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎ ফলানি চ প্রদদাতীতি।" জন্ম, তথা কর্ম্ম, এবং তাহার ফল, ইহা যে প্রদান করে। অনুবাদকেরা কেহ শঙ্করের, কেহ শ্রীধরের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। দুই অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তার পর ঐ কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথাকে "ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল" বলা হইয়াছে। ইহা বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির জন্য ক্রিয়া বিশেষের বাহুল্য ঐ সকল বিধিতে আছে, এইমাত্র অর্থ।

---

* এই শ্লোকত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে বলিয়া পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ, মৎকৃত অনুবাদ ভিন্ন আর একটি অনুবাদ দেওয়া ভাল। এজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদক কৃত অনুবাদও এস্থলে দেওয়া গেল। উহা অবিকল অনুবাদ এমন বলা যায় না, কিন্তু বিশদ বটে।

"যাহারা আপাতমনোহর শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত; বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদের প্রীতিকর; যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরায়ণ; স্বর্গই যাহাদের পরমপুরুষার্থ; জন্ম কর্ম্ম ও ফলপ্রদ ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে; এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত সংসক্ত; সেই বিবেকবিহীন মূঢ়দিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না।"

কথা এইরূপ। যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহারা "বেদবাদরত।" বেদেই এই সকল কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথা আছে—অন্ততঃ তৎকালে বেদেই ছিল; এবং এখনও ঐ সকল কর্ম্ম বেদমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্ঠেয়। যাহারা কাম্যকর্ম্মানুরাগী তাহারা বেদেরই দোহাই দেয়—বেদ ছাড়া "আর কিছু নাই" ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মাত্মক যে ধর্ম্ম, তাহা ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা "কামাত্মা" বা কামনা-পরবশ—"স্বর্গপর," অর্থাৎ স্বর্গই তাহাদের পরমপুরুষার্থ, ঈশ্বরে তাহাদের মতি নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই। তাহারা ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে আসক্ত—সেই জন্যই স্বর্গকামনা করে, কেন না স্বর্গ একটা ভোগৈশ্বর্য্যের স্থান বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়ক পুষ্পিত বাক্য তাহাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তিরা অবিবেকী বা মূঢ়। সমাধিতে—ঈশ্বরে চিত্তের যে অভিমুখতা বা একাগ্রতা—তাহাতে, এবম্বিধ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না।

শ্লোকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে নানাবিধ কাম্যকর্ম্মের বিধি আছে; বেদে বলে যে সেই সকল বহুপ্রকার কাম্যকর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়। সুতরাং আপাততঃ শুনিতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণী। যাহারা কামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈশ্বর্য্য খুঁজে, সেই জন্য স্বর্গাদি কামনা করে, তাহাদের মন সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়, বলে ইহা ছাড়া আর ধর্ম্ম নাই। তাহারা মূঢ়। তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। কেন না তাহাদের বুদ্ধি "বহুশাখা" ও "অনন্তা" ইহা পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে।

কথাটা বড় ভয়ানক ও বিস্ময়কর। ভারতবর্ষ, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বেদশাসিত। আজিও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তাহার সহস্রাংশের এক অংশ নাই। সেই প্রাচীনকালে বেদের আবার ইহার সহস্র গুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না—ঈশ্বর নাই, একথা মুক্তকণ্ঠে তিনি বলিতে সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদ অমান্য করিতে সাহস করেন না—পুনঃপুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ়, বিলাসী; ইহারা ঈশ্বরারাধনার অযোগ্য !

ইহার ভিতর একটা ঐতিহাসিক নিহিত তত্ত্ব আছে। তাহা বুঝাইবার আগে, আর দুইটা কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ, কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক কর্ম্মবাদিদিগের নিন্দা। যাহারা বলে বেদোক্ত কর্ম্মই (যথা, অশ্বমেধাদি) ধর্ম্ম, কেবল তাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরই বিধি আছে, আর কিছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অত্যুন্নত ব্রহ্মবাদ আছে গীতা সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুবাদিনী, তদুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধৃত, সংকলিত, ও সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। অতএব কৃষ্ণের এতদুক্তিকে সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচনা করা অনুচিত। তবে, দ্বিতীয় কথা এই বক্তব্য, যে যাহারা বলেন, যে বেদে যাহা আছে তাহাই ধর্ম্ম, তাহা ছাড়া আর কিছু ধর্ম্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধর্ম্ম আছে ইহা মানি। (২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে—যথা এই সকল জন্মকর্ম্মফলপ্রদা ক্রিয়াবিশেষবহুলা পুষ্পিতা কথা। (৩) তিনি আরও বলেন, যে যেমন একদিকে, বেদে এমন অনেক কথা আছে যাহা ধর্ম্ম নহে, আবার অপরদিকে অনেক তত্ত্ব যাহা প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদাহরণ আমরা গীতাতেই পাইব। কিন্তু গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্যস্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ কর্ণপর্ব্ব হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রুতের্ধর্ম্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।
তত্তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্ব্বং বিধীয়তে॥ ৫৬
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতং॥ ৫৭ *

---

* "অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।" কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ—কর্ণপর্ব্ব, ৭০ অধ্যায়। সিংহ মহোদয় যে কাপি দেখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে এই শ্লোক দুটি ৭০ অধ্যায়ে আছে। কিন্তু অন্যত্র ৬৯ অধ্যায়ে ইহা পাওয়া যায়।

যদি কেহ ইহাকে বেদনিন্দা বলিতে চাহেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদনিন্দক, এবং গীতার এবং মহাভারতের অন্যত্র বেদনিন্দা আছে। বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত বেদনিন্দা, যে এতদ্দ্বারা বেদের অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়।

ততদূর ইহাকে না হয়, বেদনিন্দাই বলা যাউক। এই বেদনিন্দার ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি, তাহা মৎপ্রণীত "ধর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হইয়াছে। এজন্য পাঠকদিগের সুলভ না হইতে পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্ম্মে উপাস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর! হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন 'আমার পাপ ধ্বংস কর।' দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্ম্ম বলে।

কাম্যাদি কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাজ করিলে, তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে—এইরূপে ধর্ম্মার্জ্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায়, উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথা ধর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে কর্ম্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। একদল চার্ব্বাক—তাঁহারা বলেন, কর্ম্ম কাণ্ড সকলই মিথ্যা— খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নেতা শাক্যসিংহ—তিনি

বলিলেন, কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম্ম হইতে পুনর্জ্জন্ম। অতএব কর্ম্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্তসংযমপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে—সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম—জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদিদিগের কীর্ত্তি। ব্রহ্মনিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য। তার পর, ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক।”

শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে। কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদী যাহা দেখিতে পায় না, অনন্তজ্ঞানী তাহা দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, যে জ্ঞান সকলের আয়ত্ত নহে; অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ধর্ম্মের অন্য পথও আছে; অধিকারীভেদে তাহা জ্ঞানাপেক্ষা সুসাধ্য। পরিশেষে ইহাও দেখিয়াছিলেন, অথবা দেখাইয়াছেন, জ্ঞানমার্গ, এবং অন্যমার্গ, পরিণামে সকলই এক। এই কয়টি কথা লইয়া গীতা।

মনোরমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

এখন আমরা মনোরমার কাব্যাংশ ব্যাখ্যা করিব। তাহার অদ্ভুত বালিকাভাব—অলৌকিক সারল্য, তাহার অপূর্ব্ব প্রৌঢ়ভাব—প্রখরা বুদ্ধি-বৃত্তি, তাহার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন—সময়ে এক ভাব, সময়ান্তরে ভাবান্তর, গ্রন্থকার কিরূপে পাঠকবর্গকে অনুভব করাইয়াছেন, তাহাই বলিব। পশুপতি-মনোরমা-কাহিনী উপসংহারের জন্য রহিল। একমাত্র পশুপতির সহিত সম্বন্ধান্বিত হইয়াই যে মনোরমা মনোরমারূপে গঠিত হইয়াছিল, অবস্থাধীন ভালবাসাতেই যে মনোরমা ঐ রূপে বিকশিতা হইয়াছিল, তাহা উক্ত কাহিনী বর্ণন সময়ে পরিব্যক্ত হইবে। প্রস্তাবারম্ভে আমরা যাহা বলিয়া লইয়াছি, উপসংহারে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

বয়সের ধর্ম্মে মনোরমার দ্বিবিধ প্রকৃতি বিবিধ অবস্থার সংঘটনে স্বভাবতঃই কিছু জটিল ও রহস্যময় হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি কবি স্বীয় অপূর্ব্ব কুহক-দণ্ডসঞ্চালনে মনোরমাকে একটি অপূর্ব্ব প্রহেলিকায় পরিণতা করিয়াছেন। মনোরমা আকৃতিতে প্রহেলিকা, মনোরমা প্রকৃতিতে প্রহেলিকা। মনোরমা হেমচন্দ্রের নিকট প্রহেলিকা—মনোরমা পশুপতির নিকট প্রহেলিকা—মনোরমা তোমার আমার সকলের নিকট প্রহেলিকা। কুহেলিকাময়ী ঊষা বা ছায়াময়ী গোধূলি কেহই মনোরমার ন্যায় প্রহেলিকাময়ী নহে।

মনোরমার আকৃতিতে যে প্রহেলিকা ছিল, কবি তাহা সর্ব্বপ্রথমেই পাঠক-বর্গকে দেখাইয়া দিলেন। তাহাকে দেখিয়া হেমচন্দ্র প্রথমে ভাবিলেন, 'কুসুম-নির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা, পরে মনে করিলেন—এখনও হেমচন্দ্র মুগ্ধ ও আত্মবোধ-রহিত—কোন 'সজীব প্রতিমা'—শেষে স্থির হইল, মনোরমা কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমাও নহে, সজীব প্রতিমাও নহে—এক 'অপূর্ব্ব বালিকা অথবা পূর্ণ-যৌবনা তরুণী।' এ প্রহেলিকা কিন্তু হেমচন্দ্রের কখনও পরিষ্কার হইল না—হেমচন্দ্র কখনও ঠিক করিতে পারিলেন না, 'মনোরমা' বালিকা না 'তরুণী'! আকৃতিতে মনোরমা প্রহেলিকা নয় কি?

তার পর দেখ, পশ্চাৎ হইতে হেমচন্দ্রের উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া, "বীণানিন্দিত স্বরে সুন্দরী কহিলেন, 'তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন?' হেমচন্দ্র কহিলেন, 'তাহা ত পাইলেন না দেখিলাম। তুমি কে?' বালিকা কহিল, 'আমি মনোরমা।' হে। 'ইনি তোমার পিতামহ?' মনোরমা। 'তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে?' হে। 'শুনিলাম ইনি এ গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।' ম। 'এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন?' হে। 'আমিই সেই রাজপুত্র। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।' ম। 'কেন?' এ কেনর উত্তর নাই। হেমচন্দ্র অন্য উত্তর না পাইয়া কহিলেন, 'কেন? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত?' ম। 'তুমি কি আমার ভাই?' হে। 'আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে?' ম। 'বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত?' হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা? না উন্মাদিনী? কহিলেন, 'কেন তিরস্কার করিব?' ম। 'যদি দোষ করি?' হে। 'দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে?' মনোরমা ক্ষুণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বলিলেন, 'আমি কখন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়?' হে। 'না'। ম। 'তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না—তুমি আমাকে লজ্জা করিবে?' হেমচন্দ্র হাসিলেন—কহিলেন, 'আমার বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না—তাহার উপায় কি?' ম। 'আমি বলিতেছি।' এই বলিয়া মনোরমা মৃদু মৃদু স্বরে জনার্দ্দনের নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন। হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মনোরমার সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল।"

পাঠক এখন এক এক করিয়া মনোরমার এই কার্য্য ও কথাগুলি পরীক্ষা কর—এইরূপ অবস্থায় অপরিচিত যুবকের সম্মুখে অপরিচিত তরুণীর কথা ও ব্যবহারের সহিত ইহার তুলনা কর—অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার-প্রদেশে নিম্নস্থাপিত-দৃষ্টি যৌবনোন্মুখীর কবাট খুঁটিতে খুঁটিতে অপরিচিত বা অল্প পরিচিত অভ্যাগত

সহ কথোপকথন মনে কর, দেখিবে মনোরমার কি অপূর্ব্ব সারল্যই এতদ্দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে?

প্রথমে ধর, সেইরূপ করিয়া হেমচন্দ্রের উত্তরীয় ধরিয়া টানার কথা। তার পরে কথাগুলি পরীক্ষা কর। বালক-বালিকাদিগের স্বভাবই এই যে তাহারা উপযাচক হইয়া কথা বলে, প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়াই উত্তর প্রদান করে, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া প্রশ্নের পরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। মনোরমাতেও আমরা এই বালধর্ম্ম দেখিতে পাইলাম না কি? মনোরমা যুবতী—তিনি হেমচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলেন। মনোরমা ইতরবংশজ নহে—মনোরমা ব্রাহ্মণকন্যা, যুবতী, কিন্তু তবু তিনি হেমচন্দ্রকে 'তুমি' বলিয়া কথা কহিলেন। একি বালিকার কার্য্য নহে? আবার যখন হেমচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কে?' —মনোরমা কহিলেন 'আমি মনোরমা।' কি অপূর্ব্ব বালিকার উত্তর! উত্তরটি শুনিয়া আমাদিগের একদিনকার একটি কথা মনে পড়িল। একদিন কোন বন্ধুগৃহে গমন করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, একটি পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা আমাদিগের মুখপানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিয়াছে। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'তুমি কে গা?' বালিকা অমনি উত্তর করিল 'আমি সরলা।' সে এমন ভাবে আমার দিকে চাহিয়া কথাটি বলিল যে, আমার তখন বুঝিতে হইল, বালিকা মনে করিতেছে, সে তাহার নাম বলাতেই তাহার সকল পরিচয় আমরা পাইয়াছি। 'সরলা' বলাতেই সে পরিচিতা হইল, এই তাহার বিশ্বাস। মনোরমাও সেইরূপই একটি উত্তর করিলেন। মনোরমার নাম জানিবার জন্য কিছু হেমচন্দ্র প্রশ্নটি করেন নাই, সুতরাং তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইনি তোমার পিতামহ?'—মনোরমা হাঁ, না, কিছুই না বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে?' মনোরমা কি যুবতী?

সময়ে সময়ে বালকগণ এইরূপই এক একটি প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, বর্ষীয়ান্ কোন মতে তাহার উত্তর দিয়া উঠিতে পারেন না। একটু বয়স বাড়িলে, সংসারের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা জন্মিলে তাহারা আর সে রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। 'এটি কি গাছ? এ গাছ কে গড়িল? এ গাছ যে গড়িল, তাকে কে গড়িল?' এবম্বিধ প্রশ্ন বালকেই করিতে পারে।

এদিকে দেখ, হেমচন্দ্র মনোরমাকে বলিতেছেন ‘আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।’ যুবতী মনোরমা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ‘কেন?’ গ্রন্থকার লিখিলেন ‘এ কেনর উত্তর নাই।’ মনোরমার প্রশ্ন বালিকার প্রশ্ন নয় কি?

বাপীকূলের দৃশ্যটি একবার মনে করিয়া দেখুন। মনোরমা হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছে ‘তোমার এ বেশ কেন? হাতে শূল, কাঁকালে তরবারি; তরবারে এ কি জ্বলিতেছে? এ কি হীরা? মাথায় এ কি? ইহাতে যে ঝক্‌মক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে, এই বা কি? এও কি হীরা? এত হীরা পেলে কোথা?’

“এ রাত্রে এত হীরা পরিয়া কোথায় যাইতেছ? চোরে যে কাড়িয়া লইবে।”

কথাগুলি কি আপনাদিগের সম্মুখে একটি কৌতূহলপরায়ণা বালিকামূর্ত্তি স্থাপিত করিতেছে না? মনোরমা এক নিশ্বাসে কত কথা কহিল—কত প্রশ্ন করিল। উত্তরের অপেক্ষা নাই, প্রশ্নের ঔচিত্যানৌচিত্য বোধ নাই। মনোরমা বালিকার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছে—বালিকার ন্যায় চোরের ভয় দেখাইতেছে। কত আর দেখাইব? ‘তুমি কি আমার ভাই?’ ‘বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া কখন তিরস্কার করিবে না ত?’ এ সকলই মনোরমার মুখে কেমন সুন্দর শুনাইতেছে! যুবতী, ভাবিয়া কথা বলে; বালিকা, ভাবিয়া কথা বলে না। হেমচন্দ্রের কথা শেষ না হইতে হইতেই যেন মনোরমাকে আমরা কথা কহিতে শুনিতেছি! কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইয়া যুবতী মনোরমা-সম্বন্ধে হেমচন্দ্র এক দিন মনে করিয়াছিলেন ‘একি বালিকা না উন্মাদিনী?’

প্রকৃতিতে, ব্যবহারে মনোরমা প্রহেলিকা নয় কি?

যেমন আকৃতি-প্রকৃতিতে মনোরমা প্রহেলিকা, গ্রন্থকার দুই একটি ঘটনা সৃষ্টি করিয়াও মনোরমাকে আবার তেমনিই প্রহেলিকা করিয়া তুলিয়াছেন। ফলতঃ মনোরমার সমস্তই প্রহেলিকা—কথা, কার্য্য, ভালবাসা, পরিণাম, তাহার কিছুই সরল দৃষ্টিতে পরিষ্কার নহে। তাই বলিতেছিলাম; মনোরমা একটি অদ্ভুত প্রহেলিকা।

কবিসৃষ্ট সেই ঘটনাগুলির কথা এই স্থলে বলিয়া লইব।

আমরা দেখিতে পাইলাম, হেমচন্দ্র অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিয়াও বধির

জনার্দ্দনকর্ত্তৃক শ্রুত হইতে পারিয়্লেন না। কিন্তু মনোরমা অতি মৃদু কথায়ই জনার্দ্দনকে সব বুঝাইয়া দিলেন। এটি কবির অতি সুন্দর কৌশল। কবি জানেন যে ইহার কোন বৈজ্ঞানিক বা অন্যবিধ কারণ আছে কি না; সে সকল কথা তখন, কি হেমচন্দ্র কি পাঠকবর্গ, কাহারও মনে উদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন সকলেরই মনে হইবে, মনোরমা কোন এক অলৌকিক শক্তি সম্পন্না রমণী—মনোরমা দেবী। ইহা জানিয়া কবি এই কুহকদণ্ডটি পরিচালন করিলেন। পাঠকবর্গের পূর্ব্বের প্রহেলিকা আরও ছায়াময়ী হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে কবি প্রস্থান করিলেন! পাঠকবর্গ কিন্তু সেই মায়ায়ই মুগ্ধ রহিলেন।

ঘটনা সুন্দর, চেষ্টাও ফলবতী। কিন্তু ইহা যদি বাস্তবিকই অলৌকিক হয়, তবে অবশ্য পাঠকবর্গ কুহকীকে প্রশংসা করিতে প্রস্তুত হইবেন না। মিথ্যায় সত্যের ভাণ দিতে পারিলেই কুহকীর প্রশংসা—সত্যে সত্যের ভাণে প্রশংসা কি? মনোরমাকে যদি বাস্তবিকই অলৌকিকা করিয়া কবি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাকে সময়ে সময়ে দৈবীশক্তি সম্পন্না করিয়া পাঠক-বর্গের সমীপে উপস্থিত করিয়া থাকেন, তবে অবশ্য আমরা তাঁহাকে প্রশংসা করিতে প্রস্তুত হইব না। কিন্তু যদি মনোরমা স্বাভাবিক নিয়মানু-সারে কার্য্য করিয়াই পাঠকবর্গের নিকট অলৌকিকা বলিয়া প্রতীতা হইয়া থাকেন, তবে এটি যে কবির এক অদ্ভুত কৌশল, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। কথাটি একটু ভাবিয়া দেখা যাউক।

আমাদিগের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহাদিগের বধির সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন, আমাদিগের কবি কিরূপে একটি ছোট রকমের অভিজ্ঞতা হইতে কিরূপ একটি অপূর্ব্ব কুহক বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ সে অভিজ্ঞতাটুকু না থাকিলে, মনো-রমার এ কার্য্যটি ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠা যায় না। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে আমরা কোন বধিরসহ কথোপকথনে এ রহস্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। যদি ইহা ভাগ্যে না ঘটিত, হয় ত মনোরমার এ ভাগটি বুঝিতেই পারিতাম না। আমরা উক্ত উপায়ে জানিতে পারিয়াছি, যে, বধিরের কাণের কাছে গিয়া মৃদু কথা কহিলেও সে বুঝিতে পারিবে, কিন্তু

একটু দূরে বা কাণের কাছেই উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে সে শুনিতে পাইবে না। সকল বধিরই এরূপ কি না জানি না, কারণ ইহার বৈজ্ঞানিক কোন কারণ আমরা জ্ঞাত নহি; তবে দুই একজন যে এরূপ থাকে, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পাঠকবর্গ একবার বরং পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

এই এক কথা। তার পরে অন্য কথাও আছে। মনোরমা জনার্দ্দনের ঘরের লোক—জনার্দ্দনের সহিত কথা কহিতে কহিতে সেই সম্বন্ধে উভয়ের অনেকটা সুবিধা হইয়া গিয়াছে। মনোরমা কথা কহিতে আরম্ভ করিলে জনার্দ্দন জানেন যে তিনি সে কথা বুঝিবেন—কতক এই জ্ঞাননিবন্ধন মনোযোগের জন্য, কতক চিরপরিচিত আকার ইঙ্গিত বা মুখের ভাবাদি জন্য, জনার্দ্দন সে কথা-গুলি বুঝিতে পারিতেন। হেমচন্দ্র সম্পূর্ণ অপরিচিত—জনার্দ্দন তাঁহার কথা শুনিয়া প্রথমেই বুঝিতে পারিবেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন, সুতরাং মনোযোগ ত আদৌ হয় নাই। মুখ দেখিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তও সম্ভবপর নহে। তবে কথা শেষে যে সকল শব্দ হেমচন্দ্র উচ্চারণ করিতেন, বুঝি মৃদু হওয়ার জন্য জনার্দ্দন তাহাই খানিকটা শুনিতে পাইতেন। আর শেষ কথায় একটু মনোযোগী হইবারও সম্ভব—নহিলে উত্তর চলে না। যে কারণেই হউক, বধিরের এই রূপই ঘটিয়া থাকে।

একটি সামান্য কথা লইয়া আমরা এত বকিলাম মনে করিয়া কেহ আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। আমরা কিন্তু ইহাকে সামান্য মনে করি না। মনোরমাকে একটু অলৌকিক শক্তিসম্পন্না বলিয়া পরিচিতা করিতে, কবি কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। এই ঘটনায় তাঁহার সেই চেষ্টার সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কবির কৌশল বুঝিতে এটি বলার দরকার। আর, সে চেষ্টা এতদূর ফলবতী হইয়াছে যে, তাহার কথা না বলিলে, মনোরমার ব্যাখ্যাই হইয়া উঠে না। তাই এত কথা বলিতে হইল।

উক্ত ঘটনায় জনার্দ্দন-মনোরমার সম্বন্ধও সুন্দর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মনোরমা যে প্রতিপালক জনার্দ্দনকে কিরূপ প্রতিপালন করিতেন, মনোরমার মৃদু কথা শ্রুত হওয়ায় তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম। সুতরাং কল্পনাটি বড়ই মনোহারিণী হইয়াছে।

কবি এই এক স্থানেই মনোরমাকে হেমচন্দ্রের চক্ষে, সুতরাং পাঠকগণের চক্ষে অলৌকিকা বলিয়া পরিচিতা করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার এই চেষ্টা বিদ্যমান রহিয়াছে। আর দুই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ আবশ্যক।

পাঠক বাপীকূলের সেই হেমচন্দ্র ও মনোরমার কথা মনে কর। হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'এখান দিয়া কাহাকে যাইতে দেখিয়াছ? ম। 'দেখিয়াছি।' হে। 'তাহার কি বেশ?' ম। 'তুরকের বেশ।' হেমচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মনোরমা স্ত্রীলোক, হিন্দুরমণী—হিন্দুরাজ্যে তথনও তুরক আগমন করে নাই। তবে মনোরমা তুরক চিনিল কি প্রকারে? তারপরে দেখ—যখন মনোরমা হেমচন্দ্রকে তুরক দেখাইতে তদীয় পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে বলিলেন—হেমচন্দ্র কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মনোরমা তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন 'আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ?'। হেমচন্দ্র মনোরমার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন—'মনোরমা কি কুমারী?'। পাঠক! তোমরাও কি বিস্মিত হও নাই? ঐ ক্ষুদ্র বালিকাটি ঠিক মনের কথা বলিতে পারিল দেখিয়া কি চমকিত হও নাই? পূর্ব্বের কথা সকল মনে করিয়া তোমরাও কি মনে ভাব নাই 'মনোরমা কি মানুষী'—তখন অবশ্যই মনে করিয়াছ। তখন নিশ্চয়ই তোমাকে কবির কুহকে পড়িতে হইয়াছে। এইরূপ কুহকজাল বিস্তার করিয়া কবি স্বতঃ প্রহেলিকাময়ী মনোরমাকে আরও ছায়াময়ী করিয়া পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। এ সকল কথা কি বলিবার নহে?

আবার অন্য এক পরিচ্ছেদের কথা মনে কর। হেমচন্দ্র যখন শান্তশীল কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ, তখন মনোরমা হেমচন্দ্রের উদ্ধারসাধন করিয়া কিরূপ তাঁহাকে চমৎকৃত করিতে পারিয়াছিলেন! কিন্তু সে পরিচ্ছেদে পাঠকবর্গ প্রতারিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু হইতে পারিলে যেন ভাল হইত। সেই অধ্যায়ে বঙ্কিম বাবু লিখিয়া লইয়াছেন "মনোরমা পশুপতির নিকট বিদায় লইয়া দ্রুতপদে চিত্রগৃহে আসিলেন। পশুপতির সহিত শান্তশীলের কথোপকথন সময়ে শুনিয়াছিলেন যে, এই ঘরে হেমচন্দ্র রুদ্ধ হইয়াছিলেন"। আগা-

দিগের বিবেচনায় প্রথম ঘটনায়ও যেরূপ কবি নির্ব্বাক্ ছিলেন এখানেও সেইরূপ নির্ব্বাক্ থাকিলে ভাল হইত। আর 'ফাঁদ' ও 'মুক্ত' এই দুইটি পরিচ্ছেদ, কোন প্রকারে 'মোহিনী' ও 'মোহিতা' পরিচ্ছেদদ্বয়ের পূর্ব্বে স্থাপন করা যায়, তবে এই রহস্যটি কঠিন হইয়া—অন্য একটি কুহক বিস্তারে সমর্থ হয়। কিন্তু আমরা আমাদিগের অভিলাষই মাত্র ব্যক্ত করিতে পারি। কিরূপে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে, সে ভার শিল্পীর উপরে।

মনোরমার বালিকাভাব কবি কিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা, প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন তাহার প্রৌঢ়ভাব কিরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই দেখাইতে হয়। কিন্তু মনোরমাকে অবিকৃতা প্রৌঢ়া আমরা কোন স্থানেই দেখিতে পাই না। সুতরাং বালিকাভাব হইতে ভাবান্তরে পরিবর্ত্তন ব্যাখ্যা করিবার সময়েই উহা ব্যাখ্যাত হইবে। আমরা তিনটি দৃশ্য হইতে এখন এই অপূর্ব্ব ভাবান্তরগুলি পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি।

১। পশুপতি মুসলমানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র সুস্থির করিয়া অষ্টভুজাকে প্রণামানন্তর শয্যাগৃহে যাইবার জন্য ফিরিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন—"অপূর্ব্ব দর্শন—সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপিত করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমারূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পশুপতি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য্যসাগরের এক অপূর্ব্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন সূর্য্যের প্রখর করমালায় হাস্যময় অম্বুরাশি মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকাসুলভ ঔদার্য্যব্যঞ্জক ভাবে রহিল না। অপূর্ব্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত, প্রগল্ভ বয়সেরও দুর্ল্লভ গাম্ভীর্য্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল।"

দেখিলাম অপূর্ব্ব ভাবান্তর! তরুণী মনোরমা প্রৌঢ়া হইলেন। এখন ইহার কারণ অনুসন্ধান করা যাউক।

ইতিপূর্ব্বে মনোরমা পশুপতির মন্ত্রণা সব স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সে কথাগুলি মনোরমার প্রীতিকর কথা নহে। স্বামী কুপথে পদার্পণ করিতেছে—স্ত্রীর নিকটে ইহা অসহ্য যন্ত্রণার বিষয়। এই কুপথ হইতে পশুপতিকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য মনোরমা আজি স্বামি-সন্নিধানে আগমন

করিয়াছিলেন। অদ্য তিনি পশুপতিকে এজন্য তিরস্কার করিবেন, কুপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিবেন, অন্তরে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই পশুপতির গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন।' কিন্তু পশুপতিকে দেখিবামাত্র তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল। প্রৌঢ়া মনোরমা তরুণী হইলেন। হইবার কারণ আছে। মনোরমা পশুপতির ভার্য্যা—পশুপতি তাঁহার অন্তরের উপাস্য দেবতা —প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। যুবতী মনোরমা এখনও এ হেন স্বামীর সহিত মিলিতা হইতে পারেন নাই, সুতরাং মিলনের পূর্ব্বে প্রণয়ের যে উৎকট ভাবটি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, সে ভাবটি এখনও সম্যক্ তিরোহিত হইতে পারে নাই। মনোরমা চিত্তজয়ী—মনোরমা গম্ভীরা—মনোরমা যাহাই হউন, এই ধর্ম্মসঙ্গত মিলনের জন্য একটা ব্যাকুলতা তাঁহাতেও ছিল। তাই যখন মনোরমা প্রথমে পশুপতিকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পূর্ব্ব মনোভাব যাহাই থাকুক না কেন, "সূর্য্যের প্রখরকরমালায় হাস্যময় অম্বুরাশির ন্যায় তাঁহার সুন্দরী তরুণী মূর্ত্তি বহিরভ্যন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু মনোরমা সামান্যা তরুণী নহে। তিনি আত্মচিত্ত সংযত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মসংযম করিলেন। ক্ষণিক উচ্ছ্বাস হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেটি স্ত্রী প্রকৃতি ও প্রণয়ের সম্মোহন ভাব প্রদর্শন জন্য। সেটি মনোরমাকে আরও মাধুরীময়ী করিয়া তুলিবার জন্য। আত্মসংযতা হইয়া মনোরমা পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। অমনি "মেঘসঞ্চারে অম্বুরাশি যেরূপ ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়" সেইরূপ গম্ভীরা ও তেজস্বিনী হইতে লাগিলেন। প্রেমময়ী জ্ঞানময়ী হইলেন। দেখিয়া পাপী পশুপতি ভীত ও চকিত হইল। মনোরমা সেই উন্নত অন্তঃকরণের সাহস ও গাম্ভীর্য্য লইয়া পশুপতিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিরস্কার করিতে করিতে যখন মনোরমা বলিলেন "শুন পশুপতি, তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবেক না।" তখন যেন আমরা মনোরমার জ্ঞানমূর্ত্তি পূর্ণ বিকশিত দেখিতে পাইলাম। কিন্তু উত্তেজনের পর অবসাদন, সন্তাপের পর শীতলতা, প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়ম। তাই মনোরমাকে এইরূপ অবস্থায় গমনোদ্যতা দেখিয়া পশুপতি যখন কাঁদিয়া উঠিলেন, মনোরমার

জ্ঞানমূর্ত্তি দ্রব হইয়া গেল। পূর্ব্বের কঠোর কথায় আপনি কোমল হইয়া উঠিয়াছিলেন, এখন স্বামীর ক্রন্দনে একেবারে আত্মহারা হইলেন। তাই পশুপতি তখন মনোরমার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন 'তেজোগর্ব্ববিশিষ্টা কুঞ্চিতভ্রূবীচিবিক্ষেপকারিণী সরস্বতী মূর্ত্তি আর নাই। কুসুমকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে।"

প্রৌঢ়া তরুণী হইল, সেই তরুণী প্রৌঢ়া হইল—আবার প্রৌঢ়া তরুণী হইল। মনোরমা বহুরূপিণী নয় কি? মনোরমা প্রহেলিকা নয় কি!

২। হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের সহিত কথোপকথনান্তে মৃণালিনী-চিন্তায় অধীর হইয়া অনন্যমনে তাহাই পর্য্যালোচনা করিতেছেন। মৃণালিনীকে দুশ্চারিণী মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় শত সহস্র বৃশ্চিকদংশন অনুভব করিতেছে। এমত সময়ে মনোরমা তথায় উপস্থিত হইলেন। হেমচন্দ্রকে মনোরমা প্রথমাবধিই ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিয়া আসিতেছেন, অদ্য হেমচন্দ্রকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'ভাই আজ তুমি কেমন আছ?' হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, 'কেমন আমি?' মনোরমা কহিলেন, 'তোমার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধকার; ভাদ্র মাসের গঙ্গার মত রাগে ভরা; অত ভ্রূকুটি করিতেছ কেন? চক্ষে পলক নাই কেন? আর দেখি—তাই ত, চোখে জল, তুমি কেঁদেছ?' যেমন চরিত্র তেমনি কথা। কেমন স্নেহময়ী ভগিনী অথচ বালিকার ন্যায় কথা! হেমচন্দ্র এসব কথায় কোন উত্তর করিতে সহসা প্রস্তুত হইলেন না।

ইহাতে "মনোরমা প্রথমে কিছু বলিলেন না—পরে আপনা আপনি মৃদু মৃদু কথা কহিতে লাগিলেন। 'কিছু না!—বলিবে না? ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে?' বলিতে বলিতে মনোরমার চক্ষু দিয়া এক বিন্দু বারি বহিল।"

এই মৃদু মৃদু কথাও যেমন সুন্দর, ঐ এক বিন্দু বারিও তেমনি সুন্দর। মনোরমার কথায় কার্য্যে কি সুন্দর মিলন হইল।

"ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে?—কথাটি হেমচন্দ্রকে উপলক্ষ করিয়াই মনোরমার মুখ হইতে বাহির হইল সত্য, কিন্তু কথাটি ফিরিয়া গিয়া নিজের অন্তরপ্রদেশে বিদ্ধ হইল। মনোরমা বুকের ভিতর বিছাই পুষিয়া

রাখিয়াছিলেন। সে বিছা পোষার কষ্ট মনোরমা বিশেষ জ্ঞাত আছেন। কথাটি তাহার অন্তস্তল ত ভেদ করিবেই। তাই হেমচন্দ্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথাও অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হইল; মনোরমার চক্ষু হইতে 'একবিন্দু' বারি বহিল। একবিন্দু? হাঁ তাহাই ত হইবে। অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণ অসংযত চিত্তের লক্ষণ—যে আত্মসংযম করিতে পারে না, সেই বালকের ন্যায় কাঁদিয়া সুখলাভ করে। মনোরমা চিত্ত সম্বন্ধে বালিকা নহে—মনোরমার চক্ষু দিয়া যে বারিবিন্দু বহির্গত হইল, তাহা বারি নহে, মন্দারপর্ব্বতঘর্ষণে সাগর-সমুত্থিত হলাহল-বিন্দু। সমস্ত অন্তস্তল পেষণ করিয়া তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইল। মনোরমার চক্ষের জল এইরূপ এক ফোঁটা বই বহিতে জানে না। কিন্তু সে ত চক্ষের জল নয়, হৃদয়ের রক্ত। এইখানেই মনোরমা ভাবান্তর প্রাপ্ত হইতেছিলেন, কিন্তু সে ভাব সহসা প্রকাশ করিলেন না। তিনি বাহিরে পূর্ব্বের ভাব দেখাইয়া হেমচন্দ্রকে তাঁহার দুঃখের কারণ বলিতে বড়ই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। হেমচন্দ্র সুস্থ রহিতে না পারিয়া যখন কহিলেন 'আমার দুঃখ কি? দুঃখ কিছুই না। আমি মণিভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।' তখন—

"মনোরমা আবার পূর্ব্ববৎ হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমিকচক্ষে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার মুখমণ্ডলে অতি মধুর, অতি সকরুণ হাস্য প্রকটিত হইল। বালিকা প্রগল্‌ভতা প্রাপ্ত হইলেন। মনোরমা কহিলেন 'বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।"

হেমচন্দ্রের কথায় মনোরমার বিছা পোষার কথায় মিলিয়া গেল। হেমচন্দ্র প্রণয়ের কথাই ভাবিতেছেন। যে শাস্ত্রে মনোরমা অদ্বিতীয়া জ্ঞানবতী, হেমচন্দ্র আজি তাহারই কথা মনোরমার সম্মুখে উত্থাপিত করিলেন। মনোরমা হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমিকচক্ষে চাহিয়া রহিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রখরা বুদ্ধিবৃত্তি হেমচন্দ্রের কথা, হেমচন্দ্রের হৃদয় একবার সমালোচনা করিয়া লইল। সমালোচনা শেষ হইয়া যখন মনোরমা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে হর্ষচিহ্ন প্রকাশিত হইল—অতি মধুর, অতি সকরুণ হাস্য প্রকটিত হইল। হর্ষ, হেমচন্দ্রের দুঃখের কারণ আবিষ্কার

জন্য—সকরুণ হাসি হেমচন্দ্রের ভ্রান্তিজনিত কষ্টে সমবেদনা জন্য। প্রণয়-শাস্ত্রে মনোরমা অধ্যাপক, হেমচন্দ্র বালক মাত্র। সেই বালকের ভ্রান্তিতে মনোরমার হাসি আসিল; কিন্তু ভ্রান্তি হউক, তজ্জন্য হেমচন্দ্র যে কষ্ট পাইতেছেন, তাহা দেখিয়া হাসিটি সকরুণ হইয়া ফুটিয়া পড়িল। কবিত্ব কাহাকে বলে দেখিলে?

ক্রমে মনোরমার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যেমন শাদা জলে কোন প্রকার রঙ ফেলাইয়া দিলে আস্তে আস্তে সমস্ত জলই সেই রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠে, মনোরমারও তদ্রূপ ঘটিল। মন, শরীর, প্রকৃতি, ধীরে ধীরে জ্ঞানজ্বালায় বিভাসিত হইল। মনোরমা ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

এই স্থলটি উদ্ধৃত করিয়া দিবার প্রলোভন অতি কষ্টে সম্বরণ করিতে হইল। প্রচারের ক্ষুদ্র কলেবরে, অত দীর্ঘ প্রবন্ধ মানাইবে না, তাই নিতান্ত কষ্টের সহিত ক্ষান্ত রহিলাম। পাঠকগণ একবার 'আমি ত উন্মাদিনী' অধ্যায়টি এই সময়ে পড়িয়া লইবেন। প্রৌঢ়া মনোরমা এইখানে বড়ই খুলিয়াছে। এইখানেই মনোরমা তাঁহার জীবনব্যাপিনী শিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন। অধ্যায়টি উচ্ছ্বাসপূর্ণ।

পাঠকগণ এই অধ্যায়টি নূতন করিয়া পড়িয়া লইয়াছেন, এই ভাবিয়া এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এ অপরাধটুকু তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

যখন হেমচন্দ্র (মৃণালিনী সম্বন্ধে) কহিলেন 'ভাল বাসিতাম।' ঐ দেখ মনোরমা কি বলিয়া আপন সুন্দর অলকদাম সুন্দর চম্পকাঙ্গুলিতে জড়িত করিয়া টানিতে লাগিল। কি সুন্দর বিরক্তি প্রকাশ—কি সুন্দর অসন্তোষ প্রকাশ!—মনোরমার সকল কার্য্যই মনোরম। আবার ঐ দেখ, কথা বলিতে বলিতে মনোরমা কিরূপ বাগ্মী হইয়া উঠিলেন—ঐ দেখ মনোরমার চক্ষু কেমন জ্বলিতেছে—স্বর কেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—আকৃতি কেমন জ্ঞানময়ী হইয়া উঠিতেছে। "দেখিয়া হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, 'আমি ইহাকে একদিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম'!"

বালিকাভাব দেখিয়াছ, এইখানে প্রৌঢ়াভাব দেখিয়া লও। সরলতা দেখিয়াছ, এইখানে শিক্ষা দেখিয়া লও। প্রেম দেখিয়াছ, এইখানে জ্ঞান দেখিয়া লও।

পাপাসক্তকেও কি ভাল বাসিতে হইবে?—যখন হেমচন্দ্র মনোরমার নিকটে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোরমা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। "ইহার উত্তর মনোরমার উপদেষ্টা বলিয়া দেন নাই। উত্তর জন্য আপনার হৃদয়মধ্যে সন্ধান করিলেন; অমনি উত্তর আপনি মুখে আসিল।" এইস্থল একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। মনোরমার উপদেষ্টা কে, বোধ হয় তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে কি না, এ কথা তিনি মনোরমাকে শিখাইয়া দেন নাই। এ কথা তিনি শিখাইতে পারেন না। কিন্তু নাই শিখাউন, মনোরমার হৃদয়ে এ কথার উত্তর গাঁথা ছিল। এ প্রশ্ন তাঁহার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইল না। অবস্থাধীন পশুপতি যাহার প্রণয়পাত্র, তাহার নিকট এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই আসিল।

অন্যত্র হেমচন্দ্র যখন মনোরমাকে তাঁহার মতে পাপ-প্রণয় হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার জন্য গুরুগম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন

"মনোরমা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন; পরে মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিলেন—হাসি বন্ধ হয় না।"

কি সুন্দর মনোরমা খুলিল। প্রণয়ী মনোরমা, জ্ঞানী মনোরমা, বালিকা মনোরমা একত্র মিশ্রিত হইয়া এই হাস্যে বিরাজ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র অপ্রস্তুত হইলেন। শেষে যখন কথার বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল—মনোরমা যখন দেখিলেন, তাঁহার অন্তরের একটি গোপনীয় কথা বাহির হয়-হয় হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার অন্তরের কবাট, জ্ঞানের কবাট, বন্ধ করিয়া দিলেন—বাহিরে বালিকা মনোরমা হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—

'ভাই হেমচন্দ্র, এ ঢাল কিসের চামড়া?'

কি অপূর্ব্ব ভাবান্তরে কি অপূর্ব্ব কবিত্বই দেখিলাম!

এ সকল তবু এক রকম বুঝান যায়। কিন্তু সেই মনোরমার কথা—'কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী' বুঝাইয়া উঠা যায় না। কথা কহিতে কহিতে মনোরমা যেন হৃদয়স্থ অনন্ত প্রণয়-সমুদ্র দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিহরিয়া উঠিলেন—যত্নে লুক্কায়িত, হৃদয়-মন্দিরের চিরাবদ্ধ দ্বারদেশ হঠাৎ উন্মুক্ত-প্রায় দেখিয়া সহসা যেন ঈষৎ চমকিত হইয়া উঠিলেন—নিজের আত্মসংযমের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন দেখিয়া সহসা যেন বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। নিজের

হৃদয়ের কথা নিজেই জানিতে পারিয়া যেন ক্ষণিক আত্মহারা হইয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। তাই উক্ত কথা কয়টি মুখ দিয়া বহির্গত হইল। কথাগুলিতে মনোরমার হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করিল, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া ফেলিল—তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। ইহার পরেও মনোরমা প্রণয়ের কথা কহিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভাবে আর না। আবার যখন উচ্ছ্বাসের সময় আসিল, বুদ্ধিমতী মনোরমা সকল কথা চাপা দিলেন; বলিলেন—

'ভাই এ ঢাল কিসের চামড়া?'

এ হেন মনোরমা বহুরূপিণী নয় কি?

৩। 'আর একদিন মনোরমা পশুপতির অষ্টভুজা-মন্দিরে পূজাবশিষ্ট কতকগুলি ফুল লইয়া বিনাসূত্রে মালা গাঁথিতেছিলেন—পশুপতি প্রণাম বন্দনাদির জন্য দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া মনোরমাকে দেখিতে পাইলেন। পশুপতি কহিলেন, 'মনোরমা কখন আসিলে?'—মনোরমা কথার কোন উত্তর দিলেন না। পশুপতি কহিলেন 'আমার সঙ্গে কথা কও। যতক্ষণ তুমি থাক, ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।'

"মনোরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন! পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, ক্ষণেক পরে কহিলেন, 'আমি তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনে হইতেছে না।' কি বলিতে মনোরমা এখানে আসিয়াছিলেন, পাঠক বলিতে পার? মনোরমা মুগ্ধ হইয়া পশুপতির সে দিন পাপ-পথে অগ্রসর হইবার একমাত্র বাধাটি অপসারিত করিয়াছিলেন, মনোরমার সে মোহ কিন্তু অধিক সময় ছিল না—মোহান্তে মনোরমা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কাজটি তাঁহার পক্ষে ভাল হয় নাই; আজ মনোরমা তাহাই কি পশুপতিকে বলিতে আসিয়াছিলেন? পশুপতিকে পাপপথ-প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিবেন ইহা মনে করিয়াই কি মনোরমা অদ্য এখানে আসিয়াছিলেন? পশুপতি মনোরমার প্রণয়-পাত্র। প্রণয়-পাত্রের নিকটে কত কথা বলিবার থাকে, বিশেষতঃ মনোরমায় ত কথাই নাই, তাঁহার আকণ্ঠ কথায় ভরা, তাহারই কি কোন কথা পশুপতিকে বলিবার জন্য অদ্য মনোরমা আসিয়াছিলেন? যে কথাই বলিবার জন্য আসুন না কেন, মনোরমা বলিতে পারিলেন না কেন? পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়াই

কি মনোরমা সব ভুলিয়া গেলেন? তাহাই বটে। পূর্ণমাত্রায় দুই ইন্দ্রিয়ের কাজ একবারে চলে না।

পশুপতি বসিয়া রহিলেন—নিজে কত বকিলেন—মনোরমাকে কত বুঝাইলেন। কিন্তু বুঝিবে কে?—বালিকা মনোরমা? বালিকা মনোরমা পশুপতির কূটতর্ক কি বুঝিবে? তাই পশুপতি আজ প্রৌঢ়া মনোরমাকে চাহিতেছেন। এজন্য তিনি কত কৌশল অবলম্বন করিলেন। প্রথমে কহিলেন 'আমি শয়নে যাই'—মনোরমা অম্লানবদনে কহিলেন, 'যাও'। কত ভয় দেখাইলেন, কিছুতেই মনোরমার বুদ্ধিপ্রদীপ জ্বলিল না। জ্বলিল না কি? জ্বলিল বই কি? মনোরমা তখন বুদ্ধিপ্রদীপে অন্তর আলোকিত করিয়া তাহারই প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন—বাহিরে বিনা-সূত্রে মালা গাঁথিতেছেন। কিন্তু মনোরমার বিনাসূত্রে ত মালা গাঁথা হইল, না—মনোরমার ন্যায় রমণী বিনাসূত্রের মালা অন্যকে পরাইতে জানে না। এবারে সূত্র লইয়া মালা গাঁথা আরম্ভ হইল। বাহিরে, এই কাজ—অন্তরে, ঐ চিন্তা।

পশুপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমাকে কি বলিতে মন্দিরে আসিয়াছ?' মনোরমা কহিলেন, 'দেবতা প্রণাম করিতে।' গোল ফুরাইয়া গেল।

"পশুপতি বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, 'তোমাকে মিনতি করিতেছি, মনোরমে, এইবার যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন, তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না' ?"

মনোরমা তখন একটা বিড়ালের গলায় মালা পরাইতেছিলেন—বিড়াল মালা পরিবে কেন? পরিশেষে সেই ছেঁড়া মালা পশুপতির গলদেশই শোভা করিল। মনোরমা বিবাহসূত্রে গাঁথা প্রণয়ের মালা পশুপতিকে পরাইলেন। পশুপতি কিছু বুঝিলেন না। নাই বুঝুন—সেই সময়কার মনোরমার চিত্ত-ভাব যেরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল।

"তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন—অমনি মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইলেন—পথিমধ্যে উন্নতফণা কালসর্প

দেখিয়া পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল। পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন; ক্ষণেক মনোরমার মুখের প্রতি চাহিতে পারিলেন না—পরে চাহিয়া দেখিলেন—মনোরমা প্রৌঢ়বয়সী মহিমাময়ী সুন্দরী। পশুপতি কহিলেন, মনোরমে দোষ ভাবিও না। তুমি আমার পত্নী—আমাকে বিবাহ কর।' মনোরমা পশুপতির মুখপ্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিলেন

'পশুপতি কেশবের কন্যা কোথায়?'

পাঠক মনোরমার এ অপূর্ব্ব ভাবান্তরের কারণ বুঝিলে কি? যাই পশুপতি মনোরমাকে আলিঙ্গন জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন—অমনি বালিকা মনোরমার হৃদয়ের দ্বার বন্ধ হইল; প্রৌঢ়া, জ্ঞানী মনোরমা বাহিরে উপস্থিত হইলেন। যখন যাহার আবশ্যক, যে সময়ের যাহা, এক মনোরমা হইতে সে সময়ে তাহাই প্রকাশিত হয়। অদ্য পশুপতি আত্মসংযমে অপারগ হইয়া তাঁহার বিবেচনায় বিধবা রমণীকে আলিঙ্গন করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছেন—হিন্দুরমণী মনোরমা পতিকে এ হেন কুকার্য্য করিতে কি প্রশ্রয় দিতে পারে? আর হিন্দুরমণী কি কুলটা বলিয়া পরিচিতা হইয়া পতির সোহাগ কামনা করিতে পারে? তাই মনোরমা অমন চকিত হইয়া ফিরিলেন। জ্যোতির্ব্বিদের কথাটিও তখন মনে হইয়া থাকিবে। এ সকলই পূর্ব্ব-চিন্তিত কথা—পশুপতির সহিত মনোরমা যখন অত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া গিয়াছেন, তখন পশুপতি ঐরূপ অধীর হইলে মনোরমা কিরূপ কার্য্য করিবেন তাহা মনোরমার স্থিরই রহিয়াছে। সেই ভাবনা, সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হইল, তাই মনোরমা চকিতের ন্যায় পশুপতির নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত না থাকিলে, আত্মসংযমী মনোরমার পক্ষে পশুপতির এ উচ্ছ্বাসের সময় স্থির থাকা কষ্টকর হইত। যেরূপ পশুপতির উক্তকার্য্যে তাহার অন্তরস্থ জ্ঞানপ্রদীপ হঠাৎ বাহিরেও জ্বলিল—কারণ বাহিরে তাহার উপকরণ প্রস্তুত—বাহিরে তাহার কার্য্যের সময় উপস্থিত।

এ হেন মনোরমা প্রহেলিকা নয় ত কি?

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

যোগভাষ্য

নমস্কারশ্লোকঃ।

যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধাঽনুগ্রহায়
প্রক্ষীণ ক্লেশরাশির্ব্বিষম বিষধরোঽনেকবক্ত্রঃ সুভোগী।
সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূতির্ভুজগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যং
দেবোঽহীশঃ সবোঽব্যাৎ সিতবিমলতনুর্যোগদোযোগযুক্তঃ॥

অন্বয়ঃ। যঃ স্বস্যাদ্যং রূপং শেষাখ্যং ত্যক্ত্বা স্বাংশৈস্ততো বিভক্তো ভূত্বা লোকানুগ্রহার্থং বলরামাদিবিবিধরূপেনাবির্ভবতি স বো যুষ্মান্ শিষ্যান্ অব্যাৎ পালয়েৎ শাস্ত্রগ্রহণাদি প্রতিবন্ধং নিবারয়তু। অন্যৎ সুগমং।

শ্লোকার্থ। যিনি ভূমণ্ডলের হিতার্থে আদ্য অর্থাৎ শেষরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিধ মূর্ত্তিতে মর্ত্তালোকে অংশতঃ আবির্ভূত হইয়াছেন; স্বভাবতঃ যাঁহার্ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ ক্লেশ নাই; যিনি যোগ চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া মানবের দুঃখনিবারণোপায় বিধান করিয়াছেন; যিনি আয়তফণামণ্ডল-সহস্রবদনে বিষম বিষ ধারণ করিতেছেন; সর্পগণ যাঁহার তুষ্টিকামনায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত আছে; সেই দ্যোতনশীল শুভ্রমূর্ত্তি, যোগোপদেষ্টা, স্বয়ং যোগী, সমস্ত জ্ঞানের আলয় ভগবান্ সর্পরাজ অনন্তদেব আপনাদিগের বিঘ্ননাশ করুন।

মন্তব্য। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের এইরূপ রীতি আছে, তাঁহারা আপন আপন গ্রন্থ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হউক এইরূপ কামনা করিয়া গ্রন্থের আদিতে ইষ্টদেবতা-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। ভাষ্যকার মহামুনি বেদব্যাসও সেই কামনায় যোগশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক অনন্তদেবের স্মরণ করিয়াছেন। সূত্রকার পতঞ্জলি ঋষি অনন্তদেবের অংশাবতার, তাই যোগশাস্ত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া অগ্রে তাঁহাকেই নমস্কার করিয়াছেন। অনন্তদেব পতঞ্জলিরূপে যোগদর্শন, ফণিরূপে পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্য ও চরকরূপে বৈদ্যশাস্ত্রের চরক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। যোগসূত্র ও মহাভাষ্য (ফণিভাষ্য) স্ব স্ব নামেই প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকারের নামে বৈদ্যক্ চরকশাস্ত্র, অনন্তদেবের

বলিয়া পরিচিত নহে। সকলেই জানেন চরক, গ্রন্থকার ও শাস্ত্র উভয়েরই নাম। কিন্তু এই চরক যে অনন্তদেবের অবতার তাহা ভাবপ্রকাশে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে; যথা ভাবপ্রকাশে চরক প্রাদুর্ভাবে,

যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ।
তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্ ॥
অথর্ব্বান্তর্গতং সম্যক্ আয়ুর্ব্বেদঞ্চ লব্ধবান্।
একদা তু মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ ॥
তত্র লোকান্ গদৈর্গ্রস্তান্ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্।
স্থলেষু বহুষু ব্যগ্রান্ ম্রিয়মাণাংশ্চ দৃষ্টবান্ ॥
তান্ দৃষ্ট্বাতিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ।
অনন্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণং ॥
সঞ্চিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভূবহ।
প্রসিদ্ধস্য বিশুদ্ধস্য বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ ॥
যতশ্চর ইবায়াতো ন জ্ঞাতঃ কেনচিদ্যতঃ।
তস্মাচ্চরক নাম্নাসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥
সভাতি চরকাচার্য্যো বেদাচার্য্যো যথা দিবি।
সহস্রবদনস্যাংশো যেন ধ্বংসো রুজাং কৃতঃ ॥

পাতঞ্জল ভোজবৃত্তৌ।

শব্দানামনুশাসনং বিদধতা পাতঞ্জলে কুর্ব্বতা
বৃত্তিং রাজমৃগাঙ্ক-সংজ্ঞক মপিব্যাতন্বতা বৈদ্যকে।
বাক্‌চেতো বপুষাং মলঃ ফণিভৃতাং ভর্ত্রে্ব যেনোদ্ধৃত
স্তস্যশ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতের্ব্বাচো জয়ন্ত্যুজ্জ্বলাঃ ॥

অর্থাৎ ভোজরাজ ফণিভৃৎ স্বামির (সর্পরাজ অনন্তদেবের) ন্যায় ব্যাকরণ যোগ ও বৈদ্যক শাস্ত্র রচনা করিয়া যথাক্রমে বাচিক, মানসিক ও কায়িক

মল অপনোদন করিয়াছেন। বৈদ্যক শাস্ত্রে অনন্তদেবকৃত কোন গ্রন্থ না থাকিলে বৃত্তিকারের "ফণিভৃতাং ভর্ত্রেব" এই সাদৃশ্য প্রতিপাদন কথনই সঙ্গত হয় না। ভাষ্যকারও যোগশাস্ত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া "জগতোঽনুগ্রহায় অনেকধা প্রভবতি" এইরূপে বর্ণনা করিয়া অনন্তদেবকেই স্পষ্টতঃ নমস্কার করিয়াছেন। এইক্ষণ ভাবপ্রকাশ, যোগভাষ্য ও বৃত্তিকারের উক্তি একত্র সমন্বয় করিলে অনায়াসে প্রতীতি হইবে যে পতঞ্জলি, চরক প্রভৃতি মূর্ত্তি সমস্তই অনন্তদেবের অংশাবতার। অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশের স্বরূপ ও সাধননির্দ্দেশ দ্বিতীয় পাদে বর্ণিত হইবে।

যোগসূত্রং।

অথ যোগানুশাসনং—১

ব্যাখ্যা। অথেত্যব্যয়শব্দঃ অধিকারার্থকঃ। যোগঃ সমাধিঃ যুজসমাধাবিতি ধাতোর্ভাবে ঘঞ্প্রত্যয়ঃ। অনুশিষ্যতে ব্যাখ্যায়তে অনেনেতি অনুশাসনং শাস্ত্রং যোগস্যানুশাসনং যোগানুশাসনং যোগপ্রতিপাদকশাস্ত্রমিত্যর্থঃ তচ্চাধিকৃতমিতি বিজ্ঞেয়ং। এতদুক্তং ভবতি, আশাস্ত্রপরিসমাপ্তের্যদ্বক্ষ্যে তৎসর্ব্বং যোগবিষয়কমিতি।

তাৎপর্য্যার্থঃ। বিষয় বিশেষ অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তের বৃত্ত্যন্তর-নিরোধরূপ, অথবা নিরালম্বনে সমস্ত বৃত্তি-নিরোধরূপ যোগপ্রতিপাদক-শাস্ত্র আরব্ধ হইল। ইহার পর যাহা কিছু বলা যাইবে, সমস্তই যোগের কারণ, স্বরূপ বা ফলবিষয়ক বলিয়া জানিবে। এই স্থলে সংশয় হইতে পারে, যোগ প্রতিপাদক শাস্ত্রের কিম্বা যোগরূপ বিষয়ের অধিকার হইল? সিদ্ধান্তে উভয়েরই অধিকার জানিতে হইবে; অর্থাৎ কর্ত্তৃব্যাপার (শাস্ত্রকারের রচনারূপ) অপেক্ষা করিয়া যোগশাস্ত্র অধিকৃত হইল, করণ ব্যাপার অর্থাৎ প্রতিপাদক শাস্ত্রের ব্যাপার অপেক্ষা করিয়া সাক্ষাৎ যোগই অধিকৃত হইয়াছে।

সূত্রলক্ষণ।

স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখং।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদোবিদুঃ॥

অর্থাৎ যাহাতে অধিক বর্ণ নাই, যাহার সর্ব্বাংশেই সার পরিপূর্ণ যাহার বিষয় সন্দিগ্ধ নহে, যাহাতে শ্রোতৃবর্গের স্তোভ (ভ্রমাদি) না জন্মে, এরূপ অনিন্দিত বাক্যের নাম সূত্র।

ভাষ্যং—১

অথেত্যয়মধিকারার্থঃ। যোগানুশাসনং নাম শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যং। যোগঃ সমাধিঃ, স চ সার্ব্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্ম্মঃ। ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং, একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোসর্জ্জনীভূতঃ সমাধির্ন-যোগপক্ষে বর্ত্ততে। যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি, ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্, কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধমভিমুখং করোতি, স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। সচ বিতর্কানুগতঃ, বিচারানুগতঃ, আনন্দানুগতঃ অস্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ব্ববৃত্তি-নিরোধে তু অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ।

ব্যাখ্যা। সূত্রস্থিত অথশব্দ অধিকারার্থক হইলেও তাহার উচ্চারণ মাত্রেই মঙ্গল সিদ্ধি হইয়াছে। 'যোগ শব্দে সমাধি বুঝায়। যাহা দ্বারা উপদেশ করা যায়, তাহাকে শাসন বলে। অনুশাসন বলিবার তাৎপর্য্য এই, প্রথমতঃ ব্রহ্মাই যোগোপদেশ করেন। "হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ"—অতএব তাহারই অনুবাদ করা হইতেছে বলিয়া অনুশাসন (পশ্চাৎ শাসন) নামে অভিহিত হইল। যোগশাস্ত্র আরব্ধ হইল, ইহার পরে যাহা কিছু বলা যাউক না কেন, কেহই যোগের সীমা অতিক্রম করিবে না। সমাধি চিত্তবৃত্তি নিরোধ, অর্থাৎ কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া তদ্রূপ বারম্বার চিন্তনদ্বারা বিষয়ান্তর হইতে চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করাকে যোগ বলে। নিরোধ স্বরূপ এই যোগ চিত্তেরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে। 'বৃত্তিনিরোধ অর্থাৎ বৈষয়িক জ্ঞাননিরোধ চিত্তধর্ম্ম ইহা বলায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জ্ঞানাদি সমস্ত ধর্ম্মই চিত্তের, কোনটিই আত্মার নহে। কারণ একের ধর্ম্ম অপর স্থানে নিরুদ্ধ হইতে পারে না। বৃত্তি আত্মার ধর্ম্ম হইলে তাহার নিরোধরূপ ধর্ম্মটিও আত্মাতেই হইত, কখনই চিত্তের হইতে পারিত না।

শাস্ত্রকারগণ যোগবিষয়ে চিত্তের ভূমি অর্থাৎ অবস্থাকে, মধুমতী, মধু-প্রতিকা, বিশোকা ও সংস্কারশেষা এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের স্বরূপ অগ্রে বলা যাইবে। এই ভূমিচতুষ্টয়ে নিরোধরূপ চিত্তধর্ম্মকে যোগবলা

যায়। ব্যুত্থান ও যোগ এই উভয় পক্ষে অর্থাৎ সামান্যতঃ চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার। যথা, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিনটি, চিত্তের উপাদানভাগ। যে সময় রাজাভাগের আধিক্যনিবন্ধন তদ্দ্বারা চিত্ত বারম্বার চালিত হইয়া তাড়িতপ্রবাহের ন্যায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তর গমন করে, তাহাকে ক্ষিপ্ত অবস্থা বলা যায়। আলস্য তন্দ্রা ও মোহ প্রভৃতিকে মূঢ়ভূমি বলে। প্রায়শঃই চঞ্চল থাকিয়া কদাচিৎ স্থির ভাব অবলম্বন করার নাম বিক্ষিপ্তভূমি। একবিষয়ে বৃত্তিধারার (জ্ঞানধারার) নাম একাগ্র বা একতান। সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া যে অবস্থায় সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করা যায়, তাহাকে নিরুদ্ধভূমি বলে। এই ভূমি পঞ্চতয়ের মধ্যে ক্ষিপ্ত ও মূঢ় ভূমিতে যোগের সম্ভাবনাও নাই; সুতরাং এই ভূমিদ্বয়ে যোগ নিষেধ করেন নাই। প্রাপ্তি না থাকিলে প্রতিষেধ হয় না। বিক্ষিপ্ত চিত্তে সময় সময় স্থিরতা হয়, সুতরাং যোগের আশঙ্কা কথঞ্চিৎ হইতে পারে বলিয়া তাহাতেই নিষেধ করিয়াছেন। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যোগের নিষেধ করায় অর্থাধীনই (কৈমুতিক ন্যায়ে) ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থায় যোগের প্রতিষেধ প্রতীয়মান হইতেছে। বিক্ষিপ্ত চিত্তে যদিচ কখন কখন সাত্ত্বিকভাব আবির্ভূত হইয়া স্থিরতা জন্মায়, কিন্তু সেটি পরক্ষণেই বিক্ষেপ দ্বারা তিরোহিত হইয়া যায়। এমত অবস্থায়, তাহার সত্তা পর্য্যন্তই সন্দেহস্থল, যোগরূপ কার্য্য করা ত অতি দূরের কথা। যেমন চতুর্দ্দিকে প্রবল শত্রুগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত হীনবল ব্যক্তির জীবন থাকাই দুষ্কর, তদ্রূপ সর্ব্বদা জায়মান রাজসিকভাব বিক্ষেপসমূহের মধ্যে নিবিষ্ট কদাচিৎ উদ্ভূত সাত্ত্বিক বৃত্তির সত্তা বা যোগরূপ কার্য্যকারিতা কিছুই হইতে পারে না। পরিশেষে একবিষয়ক-বৃত্তিশালী একাগ্রচিত্তে সম্প্রজ্ঞাতরূপ যোগ হইতে পারে, তাহারই স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যোগ দুই প্রকার; সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। একাগ্রভূমিতে সম্প্রজ্ঞাত ও নিরোধ ভূমিতে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। সম্যক্ প্রজ্ঞায়তে, সাক্ষাৎ ক্রিয়তে ধ্যেয়মস্মিন ইতি। অর্থাৎ যে অবস্থায় আমি অমুককে চিন্তা করিতেছি এইরূপ ধ্যাতা, ধ্যেয় ও ধ্যান এই তিনের ভেদজ্ঞান থাকে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলা যায়। এই অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর (আত্মতত্ত্বের) পরমার্থ নির্ম্মল স্বরূপ প্রকাশ পায়, তখন অবিদ্যাপ্রভৃতি পঞ্চ ক্লেশ তিরোহিত হয় বলিয়া

ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মবন্ধন একেবারে শিথিল অর্থাৎ শক্তিহীন হইয়া পড়ে, সুতরাং আর কার্য্য জন্মায় না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, অবিদ্যাদির আশ্রিত হইয়াই জাতি আয়ুঃ ও ভোগরূপ স্ব স্ব কার্য্য উৎপাদন করে, অবিদ্যাদির সাহায্য না পাইলে তাহারা কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। যেমন তণ্ডুলকণা হইতে অঙ্কুর জন্মে, কিন্তু তণ্ডুল তুষের দ্বারা আবৃত হইয়াই অঙ্কুর জন্মায়, তুষবিমুক্ত হইলে আর সে শক্তি থাকে না, তদ্রূপ। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ, নিরোধ অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তবৃত্ত্যপগমকে সন্নিহিত করে, সম্প্রজ্ঞাত যোগ চিরাভ্যস্ত হইলে নিরুদ্ধ ভূমিতে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ আবির্ভূত হইতে পারে।

সম্প্রজ্ঞাত যোগ চারি প্রকার। বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত ও অস্মিতানুগত। স্থূল বিষয়ে, বিতর্কানুগত, সূক্ষ্ম বিষয়ে বিচারানুগত, ইন্দ্রিয় বিষয়ে আনন্দানুগত, ও গৃহীতৃবিষয়ে (আত্ম বিষয়ে) অস্মিতানুগত সমাধি হয়। ইহাদিগের স্বরূপ অগ্রে সূত্রভাষ্যে বর্ণিত হইবে। যে অবস্থায় চিত্তের একটিও বৃত্তির উদয় হয় না, তাহাকে নিরুদ্ধ ভূমি বলা যায়। এই ভূমিতেই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। ইহাতে চিত্ত কেবল ধ্যেয়রূপে ভাসমান হইয়া আমি অমুককে ধ্যান করিতেছি এরূপ বৃত্তি পর্য্যন্তও রহিত হয়,— তখন কেবল ধ্যেয়রূপ আনন্দময়ে মগ্ন হইতে থাকে। এই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ তৃতীয় পাদের প্রথমেই বর্ণিত হইবে। ইতি।

ভাষ্য-লক্ষণম্।

সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ সূত্রলক্ষণ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ বাক্য দ্বারা যাহাতে সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা হয়, এবং সূত্রস্থানীয় বাক্য স্বয়ং রচনা করিয়া স্বয়ংই যাহার ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাকে ভাষ্য বলে। সূত্রকার ও ভাষ্যকার উভয়ের উক্তিই তুল্য। এস্থলে ব্রহ্মসূত্রকার পুরাণপ্রণেতা ভগবান্ বেদব্যাস নিজেই ভাষ্য করিয়াছেন। সুতরাং যোগসূত্রে ও ভাষ্যে কতদূর প্রামাণ্যের তারতম্য হইতে পারে বা না পারে তাহা সহজেই প্রতীতি হওয়া উচিত।

মন্তব্য। পাতঞ্জল দর্শন পড়িবার পূর্ব্বে সাংখ্যদর্শনের পদার্থ সমুদায়

অবগত হওয়া সম্পূর্ণ আবশ্যক। পাতঞ্জল, সাংখ্যেরই পরিশিষ্টরূপ, ইহাতে পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ভিন্ন স্বতন্ত্র আর কোন পদার্থই বলা হয় নাই। এই জন্যই পাদসমাপ্তিতে পাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে এইরূপ লেখা যায়, পতঞ্জলি ঈশ্বর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই ভাগই সাংখ্যকারের অনুক্ত পূরণরূপ পরিশিষ্ট।

সাংখ্যদর্শনে পদার্থ বা তত্ত্ব সামান্যতঃ চারি ভাগে বিভক্ত। কেবল প্রকৃতি বা কারণরূপ ১। কেবল বিকৃতি বা কার্য্যরূপ ২। কারণ ও কার্য্য উভয় রূপ ৩। অনুভয়রূপ ৪। কেবল প্রকৃতি, সমান অবস্থাপন্ন সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়, ইহাকেই মূল প্রকৃতি বলে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও পঞ্চমহাভূত এই ১৬শটি কেবল বিকার। মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির সমষ্টি; অহঙ্কার, ও পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক এই ৭টি প্রকৃতিবিকৃতি উভয়রূপ। অর্থাৎ কোনটি অপেক্ষা করিয়া প্রকৃতি হয় ও কোনটি অপেক্ষা করিয়া বিকৃতি হয়। যেমন মহত্তত্ত্ব, মূলপ্রকৃতির কার্য্য, এবং অহঙ্কারের কারণ; এইরূপ। পুরুষ আত্মা, এতদুভয়ের অতীত, অর্থাৎ কাহারও কারণও নহে, কার্য্যও নহে। সাংখ্যদর্শনে এই পঞ্চবিংশতিটি তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সচরাচর উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকৃতির জীব দেখা যায়, সুতরাং ইহাদের মূল কারণও ঐরূপ তিনটি স্বভাবের হওয়া আবশ্যক, তাহাই সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়। সত্ত্বের ধর্ম্ম, লঘুতা প্রকাশ সুখ ইত্যাদি; রজোগুণের ধর্ম্ম, চঞ্চলতা, দুঃখ, প্রবৃত্তি, প্রবর্ত্তনা ইত্যাদি; তমোগুণের ধর্ম্ম, আবরণ, গুরুতা, মোহ ইত্যাদি। কারণের ধর্ম্ম কার্য্যে অনুবৃত্ত হয়, সুতরাং উহাদের পরিণামরূপ ব্রহ্মাণ্ডেও ঐ সমস্ত ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। চিত্তও গুণত্রয়ের পরিণাম, সুতরাং তাহাতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির (বিষয়াকারে পরিণামের) উদয় হয়। এই সাত্ত্বিক ভাবের যতই আধিক্য রূপে আবির্ভাব হইতে থাকে, ততই যোগিগণ অভিলষিত মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন।

আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত বিনাশের নাম মুক্তি। উহার কারণ আত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকার, অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে আত্মাকে পৃথক্‌রূপে জানা। পুরুষ নির্লেপ নির্গুণ, তাহার কোন ধর্ম্মই নাই,

সুখদুঃখ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মই বুদ্ধির। উহা আত্মায় আরোপিত হইয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী এইরূপে আত্মধর্ম্ম বলিয়া ভাসমান হয়। এইরূপ মিথ্যা জ্ঞানে অন্ধ হইয়া পুরুষ বদ্ধ হয়। ঐ মিথ্যাজ্ঞানরূপ রজ্জুবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই পুরুষ মুক্ত হয়। আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞান অপনোদনের একমাত্র কারণ। বৈরাগ্য সহকারে অষ্টাঙ্গ যোগের পুনঃপুনঃ অনুশীলন করিলে কদাচিৎ কোনও ভাগ্যবান্ মহাত্মার আত্মজ্ঞান হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয় উল্লিখিত যোগশাস্ত্রে অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইবে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু।

পাশ্চাত্য দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রাচীন ন্যায়ের উপলক্ষে ব্যালান্টাইন সাহেব একটি সামাজিক হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার কথা যুক্তি-সঙ্গত বোধ হয়। ইনি এতদ্দেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অধ্যাপকদিগের বোধগম্য করিবার মানসে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রতি গ্রন্থের এক ভাগে সংস্কৃত রচনা ও আর এক ভাগে তাহার ইংরাজিতে ভাষান্তর করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি সংস্কৃত অংশ ন্যায়শাস্ত্রের সূত্র অনুকরণপূর্ব্বক রচিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের একখানি হইতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত বাক্য ও তাহার ইংরাজি উদ্ধৃত করিলাম।

পরার্থাবয়বিনি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বং প্রকাশ্যতামিতি নৈয়ায়িকানাং বিধিঃ সচারুপ্রকারঃ সাধুনা জ্ঞানেপ্সুনা সহ সংবাদে শ্রেষ্ঠো ভবতি, পরন্তু নহি সর্ব্বে বাদিনস্তাদৃশা ভবন্তি। অনিষ্টাং প্রতিজ্ঞাং শ্রুত্বা কেচন স্বকর্ণৌ হস্তাভ্যাং পিদধতে তদ্ধেতুঞ্চ ন শৃণ্বন্তি। যত্র তাদৃশাঃ শ্রোতারস্তত্রান্যথা ব্যবহর্ত্তব্যম্। যবনদেশবর্ত্তিষু রাজ্যেষু বাক্পটুতাতি সফলাভূদ্যতো রাজ-

রহিতেষু তেষু রাজ্যেষু প্রত্যেকং যস্য পটুবচনং সামান্যজনমান্যমাসীৎ স এবাধিপত্যেন ররাজ। উক্তঞ্চ রাজ্যং কিমাজ্ঞাফলমিতি। তত্র বাক্‌পাটবকলস্য মুখ্যত্বাদ্যবনদেশে তদ্বিদ্যাভ্যাসোঽত্যন্তপরিশ্রমেণ কৃতো ভবেদ্যতোযদ্বাক্‌পাটবং তত্র দৃষ্টং নতাদৃগন্যত্র কচিদ্দৃশ্যতে। মহাবাক্‌পটূনাং অর্থসিদ্ধিং দৃষ্ট্বা যস্মিন্ যস্মিন্ বিষয়ে যেনোপায়েন সিদ্ধিঃ প্রাপ্যতে তত্র তত্র তেনোপায়েন পুনস্তৎসিদ্ধেঃ সম্ভবোঽস্তীতি সংচিন্ত্য আরিস্তোতিলাখ্যেন বাক্‌পাটবশাস্ত্রং কল্পিতম্। ইদানীং মুখ্যানাং য়ুরোপদেশে প্রসিদ্ধানাং তদ্বিদ্যাবিষয়কগ্রন্থানামিদমারিস্তোতিলাখ্য রচিতশাস্ত্রং মূলং ভবতি।

In the rhetorical section of the *Nyaya* we are directed to begin by stating the proposition to be proved. In addressing a candid enquirer after truth, this is the best and simplest mode of commencement. An audience however does not always consist of such persons. A prejudiced person on hearing a proposition opposed to his prejudices is apt to shut his ears and refuse to hear the argument in support of it. In dealing with such persons we must be guided by this consideration.

In the Grecian republics the art of persuasive speaking was a very important one; because the power of the State being in the hands of the people was in reality yielded, by the speaker who could persuade the assembled people, to adopt his views. The inducement to the cultivation of the methods of persuasion being so great, the art of rhetoric attained in Greece a degree of perfection which it never attained elsewhere. Observing the success of great orators, Aristotle reflected that if success in any matter has been once attained it must be attainable again provided the same means be employed. Having carefully considered the matter he wrote a treatise which forms the ground-work of the best treatises on the subject now current in Europe.

অর্থাৎ—

"নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন যে প্রথমে পরার্থ-অবয়বিনি প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া (আলোচনা) আরম্ভ করাই বিধেয়। জ্ঞানেপ্সু সাধুদিগের সহিত এ বিষয় আলোচনা কালে এই প্রকরণই শ্রেষ্ঠ বটে। কিন্তু সকলের প্রকৃতি সমান নহে। কোন প্রতিজ্ঞা ব্যক্তিবিশেষের স্বকীয় ইষ্টের বিপরীত হইলে অনেকে তাহার প্রতি ও তদ্বিষয়ক হেতুবাদে কর্ণপাত করেন না। এরূপ লোকের সহিত অন্য উপায় অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। যবনদেশবর্ত্তিরাজ্যে (গ্রীসে) বাক্‌পটুতা অত্যন্ত ফলদর্শী হইত। সেই সমস্ত রাজ-রহিত দেশে বাক্‌পটুতাদ্বারা যে যে ব্যক্তি সাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইত, সেই সেই ব্যক্তিই রাজ্যমধ্যে একপ্রকার আধিপত্য করিত। (গ্রীকেরা কহিতেন) রাজ্যকি কেবল আজ্ঞাফল? অর্থাৎ স্বাধীন রাজ্যের লোকেরা কি কেবল আজ্ঞাপনেই ব্যাপৃত থাকিবে? ফলতঃ যবন-দেশে বাগ্মিতা এরূপ মুখ্য পদে অধিরূঢ় বলিয়াই সে দেশের লোকে এই বিদ্যা অতি যত্নে শিক্ষা করিতেন। আর সে দেশের লোকে ইহাতে যতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাদৃশ উন্নতি অন্য কোথাও দেখা যায় না। মহাবাগ্মিদিগের সিদ্ধিলাভ দর্শন করিয়া, ও যে বিষয়ে যে উপায়ে একবার সিদ্ধিলাভ হইল পুনরায় সেই বিষয়ে অনুরূপ উপায়ে সিদ্ধিলাভ সম্ভব এই বিবেচনা করিয়া, আরিস্ততল বাক্‌পটব শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। এ বিষয়ে অদ্যাবধি ইউরোপে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সমস্তই আরিস্ততিলকৃত এই প্রথম গ্রন্থমূলক।"

বর্গবিন্যাসপূর্ব্বক অনুমিতি করিলে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়। কেন না, তাহাতে ভূয়োদর্শনের আবশ্যকতা থাকে না এবং সাধ্য বিষয়ে যে ব্যাপ্তি প্রকাশ করিতে হয় তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করিতে হয় না। অথবা এরূপ দৃষ্টান্ত দিতে হয় যে সামান্য লোকে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। ব্যাপ্তি স্থির করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সামান্যতার সমবায় করিতে হয় না।

অতএব ভারতবর্ষের ন্যায়শাস্ত্রে যে ব্যাপ্তিনির্ণয়ের প্রাধান্য হইবে, আর গ্রীস ও তদনুরূপ দেশস্থ সাধারণতন্ত্র-প্রিয় লোকমধ্যে যে বর্গবিন্যাসের বাহুল্য হইবে ইহাতে বিচিত্র কি? পূর্ব্বে নৈয়ায়িকেরাই ন্যায়শাস্ত্র একারত্ত

করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন আমি, তুমি, রাম, শ্যাম সকলেই বলিয়া দিই অমুক কথাটি বড় "অন্যায়"। ইংরাজিতে সকলেই Logic ধরিয়া কথা কহে, এবং এক একটি কথা'ও বর্গনাম ধরিয়াই ধুমধাম করিতে হয়। নৈয়ায়িকেরা এই আধুনিক অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করিলে ভাল হয়।

পাশ্চাত্য বিধানে বর্গবিন্যাস করা আর প্রাচীন ন্যায়মতে তত্ত্বনির্ণয় করা এতদ্বয় মধ্যে যে লাভ অলাভ, তাহা আরও বিশদরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দিতেছি।

চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ ত্বক্ ও শ্রোত্র এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলেরই পরিচিত আছে। এবং ঐ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এবং শব্দ এই পাঁচ প্রকার জ্ঞান জন্মে, ইহাও সকলে স্বীকার করেন। পরন্তু সেই জ্ঞানের সত্তা কোথায়? মনুষ্যের মনে, না বাহ্যবস্তুর মধ্যে? এ বিচার করা যে কত বড় দুঃসাধ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। কেন না, বাহ্যবস্তুকে তাহার রূপরসাদির সহিত বিভিন্ন করা দুরূহ ব্যাপার। নিরীশ্বর সাংখ্য এগুলিকে তন্মাত্র নামে আখ্যাত করিয়াছেন। অনন্তর, তিনি সম্ভবতঃ এই সংশয় করিয়া থাকিবেন যে তন্মাত্র আর বাহ্য-বস্তু অভিন্ন না বিভিন্ন। সম্ভবতঃ এই সংশয়ের মীমাংসা করিতে গিয়াই তিনি পরিশেষে পঞ্চভূতের সহিত পঞ্চ তন্মাত্রের গ্রথিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বলিলেন যে ভূতপ্রপঞ্চ ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী এক পদার্থ আছে। তাহাকেই তন্মাত্র বলে। অনন্তর নৈয়ায়িক বলিলেন যে পঞ্চ তন্মাত্রকে পৃথক্ তত্ত্ব বলিবার এবং ভূতপ্রপঞ্চ হইতে বিভিন্ন আর পাঁচটি তত্ত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি অবধারণ করিলেন যে ভূতপ্রপঞ্চকে, দ্রব্য নামক বর্গের অন্তর্গত করিলেই যথেষ্ট হইবে। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রসিদ্ধ তন্মাত্র পাঁচটিকে গুণ নামক বর্গাধীন করিলেন। এস্থলে ইহাও স্মরণ করিতে হইবে যে, তন্মাত্রকে গুণ নামে অভিহিত করিলে কেবল নামেরই পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। উহার পৃথক অস্তিত্ব নাস্তিত্ব বিষয়ে কোন মীমাংসা হয় না। সামান্য লোকে গুণ নামক বস্তু অনুসরণ পূর্ব্বক নানাবিধ অনুমিতি করিতে পারে বটে; কিন্তু এরূপ অনুমিতি স্থলে গুণত্ব কি, নিরবচ্ছিন্ন তন্মাত্র কি—গুণ না, দ্রব্য—এ সকল প্রশ্নের কোন মীমাংসা থাকে না। এমন কি

সাংখ্য ও নৈয়ায়িকের পর বৈদান্তিক আসিয়া বলিলেন যে, গুণকে এক তত্ত্ব বলা এবং তন্মাত্রকে পাঁচটি তত্ত্ব মনে করা সমস্তই ভুল—"ও সমস্তই অবিদ্যামাত্র; উহা কিছুই নহে।"

ওদিকে আর এক প্রকার অনিশ্চয়তা থাকিয়া গেল। চক্ষুর সম্বন্ধে রূপ, আবার রূপের সম্বন্ধে তেজ নামক গুণ স্থির হইল বটে; কিন্তু উত্তাপ বা শীতোষ্ণ গুণ কথনও তেজের সহিত চক্ষুসংস্পৃষ্ট, এবং কথনও বা স্পর্শের সহিত ত্বকেন্দ্র সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকিল। অন্যত্র তেজ নামক ভূত পার্থিব তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন বলিয়া স্বর্ণ রৌপ্য আদি তৈজস সামগ্রী নৈয়ায়িক-দিগের মধ্যে তেজোময় বস্তু নামে পরিগণিত হইল এবং পার্থিব বস্তু অনেক স্থলে মিশ্রিত থাকে বলিয়া সুবর্ণে যে স্পর্শাধীন পার্থিবত্ব আছে এবং পরীক্ষা-দ্বারা উহাতে যে অমিশ্রতা জানা যায়, সে সমস্তই অস্বীকৃত হইয়া গেল। নৈয়ায়িকের সঙ্গে তর্ক করে কাহার সাধ্য? যতই প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বল, যতই বল যে পরীক্ষাতে সুবর্ণের মিশ্রভাব কথনই পাওয়া যায় নাই, তিনি কিছুই গ্রাহ্য করেন না। তিনি ব্যাপ্তি স্থির করিয়া বসিয়া আছেন যে, সুবর্ণাদি তৈজস পদার্থ তেজঃসম্ভূত। তেজ পৃথিবী হইতে বিভিন্ন; পার্থিব আদি তত্ত্ব ব্যতীত কিছু স্পর্শ ও গুরুত্ব গুণ আশ্রয় করে না। অতএব সুবর্ণে যে স্পর্শ বা গুরুত্ব বোধ হয়, সে কেবল তেজ ও পার্থিব তত্ত্বের সঙ্করমূলক। সুবর্ণ যে তৈজস সেই তৈজসই আছে। কিন্তু বোধ হয় এরূপ জিদ না করিয়া তেজবিষয়ক অভিনব বিজ্ঞানের আলোচনা করাই বিধেয়। আর যদি ন্যায়শাস্ত্র এক দিকে ও Optics বিজ্ঞান অন্য দিকে রাখিয়া অন্যতর গ্রহণ করিতে হয়, তবে ন্যায়শাস্ত্রের কিছুমাত্র অব্যাহতি নাই।

আবার দেখ শ্রোত্র হইতে শব্দ নামক তন্মাত্র বা গুণ এবং শব্দ হইতে ব্যোম নামক ভূতবিশেষ লক্ষিত হইল। কিন্তু ব্যোম যে কি, তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ব্যোম শব্দ সংস্কৃত ভাষাতে বিলক্ষণ প্রচলিত, কিন্তু নৈয়ায়িকেরা সাংখ্যানুমত ব্যোম শব্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কবিরা তৎপরিবর্ত্তে আকাশ এবং দিক্‌ নামক দুইটি দ্রব্য অবধারণ করিয়াছেন। তাহাতে ব্যাপ্তিস্থির কিছুই হইল না, কেবল কল্পিত বর্গস্থির হইল মাত্র। একটি শব্দ কালের অনুরূপ সর্ব্বদ্রব্যের আচ্ছাদনকারী বর্গ আর এক পক্ষ

ভূতের অঙ্গ। যদি ইংরাজি time এবং space নামক যুগল পদার্থের কল্পনা করিয়া একটি শব্দকে space জ্ঞাপক বল, তবে অপর শব্দ দ্বারা তাহা পঞ্চ ভূতের মধ্যে আর একবার পরিগণিত হইতে পারিবে না। যদি space ও দিক্ পদার্থকে ভূতবিশেষ বল তবে এই সঙ্কট উপস্থিত যে, কাল পদার্থ কোন্ বর্গ মধ্যে গণনীয়? Space নামক ভূতকে দিক আকাশ না ব্যোমের প্রতিশব্দ বলিয়া গণনা করিবে? এবং একার্থবোধক তিনটি সংজ্ঞা দ্বারা বুদ্ধিভ্রংশ হইবারই কথা বটে।

পাশ্চাত্যগণের মধ্যে এ বিষয়ের আলোচনা ও অনুসন্ধান করিতে হইলে আর এক প্রকার বিপত্তিতে পড়িতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে দুই তিন প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। এক পক্ষে এই পুরাতন বিধান দেখা যায় যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত ভূতগণের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি একথা স্বীকার স্থলে ভূতগণ ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি মাত্র, পাশ্চাত্যগণ এইরূপই বলেন; এবং তাঁহাদের গ্রন্থে পঞ্চভূত না হইয়া বহুকাল হইতে ভূত চতুষ্টয়ের কথাই দেখা যায়। দ্বিতীয়—এক পক্ষে অভিনব বৈজ্ঞানিক মতে ঐ চারিটি ভূতের স্থানে যাইট বাষট্টিটি অমিশ্র স্পর্শাধীন দ্রব্য স্বীকৃত হয়। আর উত্তাপ, তেজ ও তাড়িত এই তিনটি সংজ্ঞার বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের কথা এই বলেন যে, উহার লক্ষণ মাত্রই কেবল পরিচিত। সেই লক্ষণ রাশির বা আধেয় গুণ সমূহের আধার কি, তাহা এপর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইতে পারে নাই। কেহ কেহ বলেন, জ্যোতির্জনক এক প্রকার তরল দ্রব্যের তরঙ্গ হইতে তেজ উৎপন্ন হয় এবং রূপজ্ঞান হয়। কেহ কেহ তাদৃশ দ্রব্যের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। সে যাহা হউক, শব্দ এক প্রকার কর্ম্মের ফল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। উহা উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণের সংযোগ এবং তরঙ্গ মালার কর্ম্মানুরূপ। কোন কোন লেখক এরূপ ভাবে কথা বলেন যে, প্রাচীন শাস্ত্রানুগত শব্দসংসৃষ্ট ব্যোম বা আকাশ এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানোক্ত জ্যোতির্জনক ether (ইথর) একই দ্রব্য। কিন্তু শব্দের মূলীভূত তরঙ্গমালা এবং তেজের মূলীভূত তরঙ্গমালা এক-পদার্থ-সংসৃষ্ট নহে। শব্দের তরঙ্গমালা প্রত্যক্ষ হয়। তেজের মূলীভূত ইথর পদার্থের তরঙ্গ দূরে থাকুক, ঐ পদার্থও কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। ফলত আকাশও ইথর

নিশ্চিত, সুতরাং প্রস্তাবিত তুলনা করা ন্যায়সঙ্গত নহে। তৃতীয় সাংখ্য এক পক্ষ প্রাগুক্ত অভিনব বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই বলেন যে, তন্মাত্র লইয়া আড়ম্বর করা বড়ই ভুল। বাহ্যবস্তুর সত্ত্বা তর্কের দ্বারা স্থির করা যায় না। অথচ স্বীকার না করিলেও সংসার চালান যায় না। জগৎ সমস্তই স্বপ্নবৎ হউক না হউক, স্বপ্নবৎ মনে করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা অসাধ্য। অতএব বাহ্যবস্তুর যে অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে, তাহা এক প্রকার অগত্যা বলিতে হইবে। এবং উহা আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়াধীন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তদপেক্ষা ভেদাভেদ করিতে গেলে ভ্রম আশ্রয় করিবে। এই মত অনুসারে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংখ্যা পরিবর্দ্ধনপূর্ব্বক, ত্বগিন্দ্রিয়ের মধ্যে শীতোষ্ণস্পর্শ, গুরুত্বস্পর্শ এবং তাড়িতস্পর্শ আদি কএকটি বিভেদ করিয়া এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্মস্বরূপ, তাড়িত উত্তাপ তেজ গুরুত্ব শব্দ আদি জ্ঞানের সংস্থান করিতে হইবে এবং সেই জ্ঞান অনুসারেই সমগ্র বাহ্য-বস্তুর বর্গ নির্দ্দেশ করাই বিধেয়।

আমি এত বাহুল্য করিয়া ইতিপূর্ব্বে এই সকল কথা বলিলাম, ইহার অভিসন্ধি এই যে,

(১) ব্যাপ্তি স্থির করা গুণ সমূহের সামান্য সম্বন্ধনির্ণয় করা, দ্রব্যের বর্গ নির্দ্দেশ করা; এ সমস্ত গুলি অতি গূঢ় এবং নিতান্ত সংস্পৃষ্ট কার্য্য। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রেই যে এই সকল কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা নহে।

(২) সাধারণ লোকের বুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য দার্শনিক অরিস্ততল মহাত্মা যে ন্যায়শাস্ত্র রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন তাহা মহা মহা বৈজ্ঞানিকের বিচারাধীন হইয়াছে। আর মহর্ষিগণ গভীর ধ্যান দ্বারা যেরূপ ব্যাপ্তিস্থির এবং বর্গবিন্যাস করিয়া গিয়াছেন, অভিনব পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের ব্যাপ্তিগ্রহহেতু তাহারও কিছু কিছু ব্যত্যয় করা আবশ্যক হইতেছে।

(৩) ব্যাপ্তিস্থির যথাযথরূপে হইলে বর্গবিন্যাস করা কঠিন হইবে না এবং বর্গবিন্যাস না করিলে ইদানীন্তন জনসাধারণের সংশয় বিমোচন হইবে না।

(৪) ব্যাপ্তিস্থির করাণার্থ বল, কিম্বা বর্গবিন্যাসপূর্ব্বক লোকসংগ্রহ

করিবার উদ্দেশেই বল, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের নিয়মে ভূয়োদর্শন করা অপরিহার্য্য হইয়াছে।

বর্গবিন্যাসের বিষয়ে যত কথা আছে, তাহা ন্যায়শাস্ত্রের অঙ্গ। অথবা মতান্তরে সমগ্র বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতেই তাহার মূলতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দর্শনের মূলীভূত বলিয়াই এখানে উহার নামমাত্র ব্যক্ত করা গেল। অন্যান্য কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, পরমতত্ত্ব নির্ণয়ার্থে কেবল ভূয়োদর্শন দ্বারা ব্যাপ্তিস্থির করা অসম্ভাবিত। তাহার একমাত্র উপায় প্রত্যক্ষ বিষয়ের বর্গবিন্যাস[illegible] উপর্য্যুপরি সমষ্টিলক্ষণাক্রান্ত বর্গ স্থির করিতে হইবে। এইরূপে পরাপর ও পারম্পর্য্য বিধানে বর্গের সংখ্যা কমাইতে হইবে। মনে কর, বহু বস্তু হইতে এক একটি বর্গ স্থির করিলে; আবার সেইরূপ নানা বর্গের সমবায় করিয়া আর এক বৃহৎ বর্গ অবধারিত করিতে হইবে। পরিশেষে একমাত্র অদ্বৈত বর্গ স্থিরীকৃত হইলে তাহা হইতেই পরম তত্ত্বের উপলব্ধি হইতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অতএব সনাতন ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য পাশ্চাত্য দর্শন উপেক্ষা না করিয়া অভিনব ব্যাপ্তি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞান সংস্থাপন করাই বিধেয়।

ধনুর্ব্বেদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভারতের অধঃপতনের কারণ—দূষিত রাজনীতি।

ভারতের অধঃপতনের তৃতীয় কারণ রাজাদের দূষিত রাজনীতি। কোন রাজ্যের সীমাবর্ত্তী রাজ্য অরিরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। অরিরাজ্যের অপর সীমার রাজ্য মিত্ররাজ্য ছিল। মিত্ররাজ্যের অনন্তর রাজ্য, উদাসীন রাজ্য—(মনু ৭।১৫৮)। মানব-প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে সীমাবর্ত্তী রাজ্য

প্রায়ই অরিরাজ্য হয়। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড, এবং ফ্রান্স ও জর্ম্মনি ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। হিন্দু রাজারা যে পার্শ্বস্থ রাজ্যকে অরিরাজ্য বলিতেন, তাহাতে তাঁহাদের বড় দোষ দেওয়া যায় না। সে দোষ—মানব-প্রকৃতির দোষ; কিন্তু তাঁহাদের রাজনীতির প্রধান দোষ এই যে, তাঁহারা সাধারণ প্রবল শত্রুকে দমন করিবার জন্য অরিকে মিত্র করিয়া লইতে পারিতেন না।

রাজাদের মধ্যে একতা না থাকা ভারতের সর্ব্বনাশের একটি প্রধান কারণ। রহ্‌ঠোর্ রাজপুত, চোহান্ রাজপুতের বশ্যতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধ করিতে চাহেন না। মিব[illegible] রাণাদের এই অভিমান আছে, যে তাঁহারা রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব। সুতরাং পৃথ্বীরাজ দিল্লীশ্বর ও চক্রবর্ত্তী রাজা হইলেও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধ করা রাণাদের পক্ষে বড়ই অবমাননা হয়। পৃথ্বীরাজ আপন মাতামহের সিংহাসনারূঢ় হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন। কনোজের রাজা জয়সিংহ ঈর্ষ্যাপূর্ণ হইয়া রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, এবং যুগপৎ তাঁহার কন্যার স্বয়ম্বরেরও উদ্যোগ হইল। রাজসূয়ের নিয়ম এই যে, রাজচক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সমস্ত করদ ও মিত্র রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞের সমস্ত কার্য্য স্ব স্ব কায়িক শ্রমে নির্ব্বাহ করেন। পৃথ্বীরাজ জয়-সিংহের যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন না। তাঁহার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি দৌবারিক-রূপে যজ্ঞস্থানের প্রবেশদ্বারে সংস্থাপিত হইল। ওদিকে স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে কনোজ-রাজকুমারী পৃথ্বীরাজের স্বর্ণময়ী মূর্ত্তির গলায় মালা দিলেন। পাণিগ্রহণার্থী ভূপালদের মধ্যে মহা গণ্ডগোল উঠিল, এবং কনোজ-রাজ আপন কন্যার ব্যবহারে যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। পৃথ্বীরাজ স্বয়ম্বরের কাণ্ড অবগত হইয়া বলপূর্ব্বক কনোজ-রাজকুমারীকে হরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ সফলমনোরথ হইলেন বটে, কিন্তু কনোজ ও দিল্লী নিঃক্ষত্রিয়প্রায় হইল। দুরাত্মা জয়সিংহ মহম্মদ সাহাব-উদ্দিন গোরীকে আনাইয়া পৃথ্বীরাজ ও দিল্লী সাম্রাজ্যের বিনাশসাধন করিল। পৃথ্বীরাজ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে খড়্গহস্তে ধরাতলে শয়ন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে মুসলমান কুতবউদ্দিন বসিলেন; ভারত ঘোর কলঙ্ক-সাগরে ডুবিলেন।

কেবল পররাষ্ট্র সম্বন্ধে রাজাদের রাজনীতি দূষিত ছিল এমন নহে।

নিজরাজ্য-শাসন সম্বন্ধেও তাঁহাদের নীতি প্রশংসনীয় ছিল না। পুরাণ, মহাকাব্য ও নাটকে তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে ইতিহাসগ্রন্থ অতি বিরল; ইতিহাসে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাও রাজাদের অনুকূল নহে। রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে কাশ্মীরের বহুতর রাজার চরিত্র বর্ণিত আছে। ইহাদের মধ্যে নরেন্দ্রাদিত্য, সন্ধিমতি, গোপাল বর্ম্মা প্রভৃতি কেবল ১০।১২ জনের চরিত্র এমন উৎকৃষ্ট ছিল, যে তাঁহাদের ন্যায় ভূপালদিগের শাসনাধীন থাকিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু অধিকাংশই লোভী, নৃশংস ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ক[illegible]ভট্ট রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গে কতকগুলি রাজাকে গৃধ্রপক্ষীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। চক্রবর্ম্মা দামর জাতির সাহায্যে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, পরে ঐ কৃতঘ্ন নরপতি দামর জাতির প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের বিনাশসাধন করেন।

এই উপলক্ষে কহ্লণ লিখিয়াছেন, "রাজা কাঠুরিয়ার ন্যায়। যে শাখা অবলম্বন করিয়া কাঠুরিয়া বৃক্ষারোহণ করে, নামিবার সময় সেই শাখাই সে কর্ত্তন করে। বিপদের সময় যাহারা রাজার সহায়তা করে, সম্পদের সময় রাজা তাহাদের উপকারিতা ভুলিয়া যান; কিন্তু তাহারা কোন দোষ করিলে, তাহা মনে রাখেন। যাহারা রাজাদিগকে ব্যাধিত, ক্ষুধার্ত্ত ও শত্রুভয়ে ভীত দেখিয়াছে, রাজগণ লজ্জান্বিত হইয়া তাহাদের বিনাশসাধন করেন। রাজা সুমতি হইলেও কুমন্ত্রীর পরামর্শে অনিষ্ট করেন। রাজা দিনমানে যে সুনীতি শিক্ষা করেন, রাত্রে রাজ্ঞীর শিক্ষায় শ্বেত গর্দ্দভের ন্যায় সমস্ত ভুলিয়া যান।"

রাজাদের কতকগুলি কায়স্থ কর্ম্মচারী ছিল। তাহাদের অত্যাচারের উল্লেখ রাজতরঙ্গিণীর অনেক স্থলে আছে। রাজাদের ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া কহ্লণের রাজভক্তির বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছিল। বোধ হয় তিনি একালে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলে আমূলসংস্কারক (Radical) হইতেন, কিন্তু তিনি কোন সম্প্রদায়ের গোঁড়া নহেন। তাঁহার সত্যের প্রতি এমন অনুরাগ যে তিনি অতি ঘৃণিত চরিত্রেও কোন গুণ দেখিলে, সেই গুণের প্রশংসা করিতেন।

মগধেশ্বর বিম্বসার স্বপুত্র অজাতশত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট এবং হত হইয়া-

ছিলেন *। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণে নন্দবংশের উল্লেখ আছে, এবং মৌর্য্যবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের একাধিপত্যের কথা আছে, কিন্তু নন্দ-বংশের পূর্ব্বে বিম্বসারাদি যে সমস্ত রাজা ছিলেন, তাঁহাদের প্রসঙ্গ নাই। বস্তুতঃ বুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের অনেক পরে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণীত হইয়াছিল বোধ হয়। তাহা না হইলে উক্ত পুরাণে অঞ্জন বুদ্ধের পিতা বলিয়া উক্ত হইতেন না। অঞ্জন মায়াদেবীর পিতা এবং বুদ্ধের মাতামহ ছিলেন। কাশ্মীরাধিপতি উন্মত্তাবন্তি ভ্রাতৃগণকে কারারুদ্ধ করিয়া অনশনে তাহাদিগকে বিনাশ করেন; পরে স্বপিতা পার্থ, যিনি জয়েন্দ্রবিহার নামক আশ্রমে ভিক্ষুদের ভিক্ষান্ন দ্বারা প্রাণধারণ করিতেন এবং শিশু সন্তানদিগকে পালন করিতেন, তাঁহার প্রাণ-সংহার সৈনিক, কায়স্থ ও তন্ত্রীদ্বারা সাধন করেন। পার্থ পূর্ব্বে রাজা ছিলেন; কিন্তু তন্ত্রী নামক প্রবল জাতির মনস্তুষ্টি করিতে না পারিয়া পদচ্যুত হইয়াছিলেন। উন্মত্তাবন্তি বেশ্যাদের স্তনে অসিপ্রহার করিয়া অস্ত্রশিক্ষা করিতেন। তিনি গর্ভিণীর গর্ভবিদারণে দেখিতেন—ভ্রূণ কেমন অবস্থায় জরায়ু মধ্যে থাকে। এই নরপিশাচের বৃত্তান্ত যখন স্মৃতিপথে উঠে, তখনই মনে হয়, হিন্দুদিগের স্বাতন্ত্র্য গিয়া ভালই হইয়াছে। কিন্তু উন্মত্তাবন্তি নৃপতি-কুলের অধম ছিলেন। তাঁহাকে হিন্দুরাজবৃন্দের প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করা নিতান্ত ভ্রম। আমার প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, ইতিহাস পাঠে বিদিত হয়, অধিকাংশ হিন্দুরাজা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন; এই স্বেচ্ছাচারিদের মধ্যে উন্মত্তা-বন্তি অধম।

মানবধর্ম্মশাস্ত্র মতে রাজার পাপ প্রজার পাপ অপেক্ষা গুরুতর দণ্ডনীয়। কিন্তু রাজার পাপের দণ্ড রাজা নিজে না করিলে, অন্য কাহার সাধ্য যে দণ্ড করে? বিদ্রোহ ভিন্ন উপায় নাই। সুতরাং রাজাপরাধের দণ্ডের বিধি কেবল শাস্ত্রেই রহিয়া গেল। দণ্ডপ্রদানের উপায় রহিল না। এমন অবস্থায় স্বেচ্ছাচারিতার দমন কিরূপে হইতে পারে? রাজার চরিত্র ভাল হইলে

---

* শাক্য মুনি বুদ্ধ অজাতশত্রুর রাজ্যকালে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য অনেক বৌদ্ধগ্রন্থে অজাতশত্রুর বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। [সিংহলের ইতিহাস মহাবংশ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য]।

সুশাসন হইত, মন্দ হইলে প্রজাগণ পীড়িত হইত। গ্রীক ও রোমীয়গণ গণিত ও দর্শনে হিন্দুদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু রাজনীতিতে তাঁহারা বিশিষ্টরূপে উন্নত ছিলেন। তাঁহারা রাজার অত্যাচার নিবারণ করিতে না পারিয়া রাজতন্ত্র উঠাইয়া দিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইংরেজগণ রাজতন্ত্র না উঠাইয়া, প্রজাতন্ত্রের সহিত তাহা এমনভাবে জড়িত করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের ন্যায় সুশাসিত দেশ পৃথিবীতে অতি বিরল। বস্তুতঃ ইংরাজের রাজনীতি সর্ব্বতোভাবে আমাদের অনুকরণীয়। যাঁহারা হিন্দুর আচার ব্যবহারের নিতান্ত পক্ষপাতী, তাঁহারাও পদে পদে ইংরেজ রাজনীতির অনুকরণ করেন। কোন রাজপুরুষ স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে সংবাদপত্রে তাহার নিন্দা করেন। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদের পদ্ধতি ইহার বিপরীত ছিল। ঘোর অত্যাচারী মুসলমান সম্রাটের সময়েও "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। সত্য যুগের রাজগণ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের অংশে নির্ম্মিত ছিলেন কি না বলিতে পারি না। আধুনিক রাজগণ আমাদের ন্যায় মানুষ। মানুষের অসীম ক্ষমতা থাকিলে প্রায়ই তাহার অপব্যবহার হয়। রাজতন্ত্রের সহিত প্রজাতন্ত্র মিশ্রিত না হইলে, রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতা দমনের উপায় নাই।

যদি ইহলোকে বিধাতা কোন পাপের দণ্ডবিধান করেন, আমাদের পাপের বিলক্ষণ দণ্ড হইয়া গিয়াছে। আমরা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া, কিন্তু বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া বৌদ্ধদের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছি; তদধিক অত্যাচার মুসলমানদের হাতে ৬০০ বৎসর কাল সহ্য করিয়াছি। আমরা মুখে বলিতাম "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ"; কিন্তু কার্য্যে ম্লেচ্ছদের প্রতি যার-পর-নাই অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শন করিতাম। তাহার ফলে ৬০০ বৎসর ম্লেচ্ছপদে দলিত হইয়াছি।

মানুষকে মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য না করা, অথচ আপনাদিগকে "ভূদেব" বলিয়া পরিচয় দেওয়া, দর্পহারী ভগবান্ এই দর্পের বিলক্ষণ শাস্তি দিয়াছেন। এক্ষণে দুঃখ-তিমিরের অবসান হইয়াছে; সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। বাল সূর্য্যের কিরণে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তেজ নাই বলিয়া দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহাতে সৌভাগ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, আইস আমরা তদ্বিষয়ে

যত্নবান্ থাকি। স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত কোন জাতি অত্যুচ্চ পদবীতে আরোহণ করিতে পারে না স্বীকার করিলাম; কিন্তু যদি স্বাতন্ত্র্যের সহিত রাজকীয় স্বেচ্ছাচার ফিরিয়া আইসে, যদি স্বাতন্ত্র্যের সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা না থাকে, যদি স্বাতন্ত্র্যের সহিত স্বদেশরক্ষার ক্ষমতা না থাকে, সে স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন নাই। দেশের কোন কোন অবস্থায় স্বাতন্ত্র্য-নাশই অভ্যুদয়ের কারণ হয়। রোম যদি ব্রিটনের স্বাতন্ত্র্য-নাশ না করিতেন, ইংরেজগণ বহুকাল বন্যবর্ব্বর থাকিতেন। প্রথম কাইসরের সময়ে ব্রিটনবাসিগণ নিতান্ত বর্ব্বর ছিলেন; আমরা তাহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত; কিন্তু যদি আমরা অভিমান ত্যাগ করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, আমাদের শিখিবার অনেক বাকি আছে।

হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গের জীবনী

বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনদেশে বদ্ধমূল হইলে, তদ্দেশীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ আপনাদের দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক সমূহের অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান; কপিলাবস্তু বুদ্ধগয়া, শ্রাবস্তী বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থ। সুতরাং পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের সংগ্রহমানসে চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষে আসিতে উদ্যত হন। চীন হইতে ভারতবর্ষে স্থলপথে আসিতে হইলে অনেক দুর্গমস্থান অতিক্রম করিতে হয়। বৃক্ষলতাশূন্য বিস্তীর্ণ মরুভূমি, অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট পদে পদে পথিকের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু অধ্যবসায়সম্পন্ন চীনদেশীয়গণের অধ্যবসায় বিচলিত হইল না। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণবিসর্জ্জনেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন, পথের এই দুর্গমতা তাঁহাদের নিকট সামান্য বোধ হইল। প্রথমে কয়েকজন স্বদেশ হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। কেহ কেহ মরুভূমিতে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন, কেহ কেহ অগম্যস্থানে উপনীত হওয়াতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। সাহসী পরি-

ব্রাজক চীটেওয়ান্ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আসিলেন বটে, কিন্তু সাধারণের নিকট আপনার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচয় দিতে পারিলেন না। তাঁহার গ্রন্থ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়া গেল। অবশেষে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে একটি ক্ষুদ্র দল বহু কষ্টে বহু বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক সপ্ত সিন্ধুর প্রসন্নসলিলবিধৌত ভূখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এই ক্ষুদ্র দলে পাঁচজন শ্রমণ ছিলেন; ইঁহাদের অধিনায়কের নাম ফাহিয়ান। ফাহিয়ান খ্রীঃ ৩৯৯ অব্দ হইতে খ্রীঃ ৪১৪ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে নানাস্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত। ফাহিয়ানের পর হোয়িসেঙ্গ্ ও সঙ্গ্ জুনের ভ্রমণ-বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই দুই জন শ্রমণ খ্রীঃ ৫১৮ অব্দে চীনের সম্রাটপত্নী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার একশত বৎসর পরে আর একজন ধর্ম্মবীর স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। ইনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিদর্শনে ও নানাশাস্ত্র পাঠে ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহপূর্ব্বক স্বদেশে যাইয়া সাধারণের সম্পূজিত হইয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত গবেষণা ও দূরদর্শিতায় পরিপূর্ণ। ইনি ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থা যথাযথ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সাধনা যেমন বলবতী ছিল, সিদ্ধিও তেমনি মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুদর্শিতা লাভের জন্য বিঘ্ন-বিপত্তি-পূর্ণ-সময়ে রাজার অজ্ঞাতসারে রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধে স্বদেশ হইতে যাত্রা করেন এবং শেষে অভীষ্ট বিষয় সংগ্রহপূর্ব্বক স্বদেশে যাইয়া রাজদত্ত সম্মানে গৌরবান্বিত হন। চীনের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবিচলিতহৃদয় ধর্ম্মবীরের নাম হিউ এন্থ্সঙ্গ।

হিউ এন্থ্সঙ্গ্ চীন দেশের কোন একটি উপবিভাগের নগরে খ্রীঃ৬০৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে চীনসাম্রাজ্য দীর্ঘকালস্থায়ী অন্তর্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, হিউ এন্থসঙ্গের পিতা কোন রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে কাজ ছাড়িয়া আপনার সন্তান-চতুষ্টয়কে শিক্ষা দিতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এই চারি সন্তানের মধ্যে দুইটি বাল্যকালেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সারগ্রাহিতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। ইঁহাদের অন্যতরটি হিউ এন্থ্সঙ্গ্।

হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ প্রথমে একটি বৌদ্ধ মঠে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। এই এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেও তিনি অনেক বিষয় শিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিসমাপ্ত করিয়া হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ বৌদ্ধ যতির শ্রেণীতে নিবেশিত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স তের বৎসর। পরবর্ত্তী সাত বৎসর হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ ভ্রাতার সহিত প্রধান প্রধান তত্ত্ববিৎ ও প্রধান প্রধান অধ্যাপকের উপদেশ শুনিবার জন্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহ থাকাতে তাঁহার নির্জ্জন পাঠের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে তিনি দূরতর স্থানের নির্জ্জন প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অশান্তিতে—বিদ্রোহের এইরূপ বিঘ্ন-বিপত্তি-পূর্ণ সময়েও হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ অধ্যয়ন হইতে বিরত হন নাই। শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার একটি পবিত্র আমোদ ছিল। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই কোন নূতন বিষয় শিখিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন। কুড়ি বৎসর বয়সে হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ বৌদ্ধ পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই নবীন বয়সে তিনি জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় স্বদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনাদের পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক, বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ এবং স্বদেশের দর্শনশাস্ত্র, সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। তিনি চীনের প্রধান প্রধান শাস্ত্রালোচনার স্থানে ছয় বৎসর কাল অবিচ্ছিন্নভাবে প্রধান প্রধান তত্ত্ববিদ্‌গণের পদতলে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে এই সকল তত্ত্ববিৎ তাঁহার সমুদয় প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্থ হইলেন। বুদ্ধ যেমন জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ তেমনি অনেকের ছাত্রত্ব গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কোথাও প্রকৃত তত্ত্বলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না, বরং অনুবাদপাঠে সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হইল। তিনি মূল গ্রন্থ পড়িবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ফাহিয়ান্ প্রভৃতি যে সকল পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। এখন তিনিও এই সকল পরিব্রাজকের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিয়া মূল ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চীনসাম্রাজ্য অন্তর্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ সাম্রাজ্যের সীমান্তভাগ অতিক্রম করিতে পারিত না। এই সময়ে হিউ এন্থ্সঙ্গ্ এবং আর কয়েকজন পুরোহিত পরিভ্রমণে বাহির হইবার জন্য সম্রাটের নিকটে আবেদন করিলেন। আবেদন অগ্রাহ্য হইল। হিউ এন্থ্-সঙ্গের সহযোগিগণ নিরস্ত হইলেন। কিন্তু হিউ এন্থ্সঙ্গ্ ভারতবর্ষে আসিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞাপালনে উদ্যত হইলেন।

খ্রীঃ ৬১৯ অব্দে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে হিউ এন্থ্সঙ্গ্ এইরূপ অবিচলিত হৃদয়ে বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণপূর্ব্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে পীতনদীর (হোয়াংহো) তীরে আসিলেন। এই স্থানে ভারতবর্ষ-যাত্রিগণ একত্র হইয়া থাকে। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা সকলকে রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিউ এন্থ্সঙ্গ্ অপরাপর বৌদ্ধদিগের সাহায্যে শান্তি-রক্ষকগণের দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে চরগণ তাঁহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু এই তরুণবয়স্ক বৌদ্ধ যতি কর্তৃপক্ষের নিকটে এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় ও এরূপ অবিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিদর্শন দেখাইলেন যে, কর্তৃপক্ষেরা আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। এ পর্য্যন্ত দুইজন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিলেন। এই খানে তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। হিউ এন্থ্সঙ্গ্ পরিচালকবিহীন ও বন্ধুবিহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি ভক্তিভাবে উপাসনা করিয়া আপনার বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে একব্যক্তি তাঁহার পথপ্রদর্শক হইতে সম্মত হইলেন। হিউ এন্থ্সঙ্গ্ ইঁহার সঙ্গে নিরাপদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই পথ-প্রদর্শকও মরুভূমির নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। এখন আরও পাঁচটী রক্ষামন্দির অতিক্রম করা বাকী ছিল। প্রতি রক্ষা-মন্দিরে রক্ষিগণ দিবারাত্রি পাহারা দিত। এদিকে সুবিস্তৃত মরুভূমিতে অশ্বের পদচিহ্ন বা কঙ্কাল ব্যতীত পথ-জ্ঞাপক অন্য কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিউ এন্থ্সঙ্গ্ বিচলিত হইলেন না। তিনি মৃগতৃষ্ণিকায় বিভ্রান্ত হইয়াও ধীরভাবে প্রথম রক্ষামন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে রক্ষি-

বর্গের নিক্ষিপ্ত বাণে তাঁহার প্রাণ-বায়ুর অবসান হইতে পারিত, কিন্তু একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সাহসী তীর্থযাত্রীকে যাইতে অনুমতি করিলেন এবং অন্যান্য রক্ষামন্দিরে যাইতে ইঁহার কোনরূপ অসুবিধা না হয় তজ্জন্য তত্রত্য অধ্যক্ষদিগের নামে এক এক খানি পত্র লিখিয়া দিলেন। হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্ রক্ষা-মন্দির সকল অতিক্রম করিয়া আর একটি মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই খানে তিনি পথ-হারা হইয়া পড়িলেন। যে চর্ম্মভাণ্ডে করিয়া তিনি জল আনিতেছিলেন, হঠাৎ তাহা ফাটিয়া গেল। হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ পথহারা হইয়া সেই ভীষণ মরু-ভূমিতে জলের অভাবে বড় কষ্টে পড়িলেন। তাঁহার অটল সাহস ও অধ্য-বসায় এক্ষণে বিচলিতপ্রায় হইল। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল, অকস্মাৎ যেন কেন অভাব-নীয় শক্তির প্রভাবে তাঁহার সাহাস ও অধ্যবসায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্ কহিলেন,—"আমি শপথ করিয়াছি, যাবৎ ভারতবর্ষে উপনীত না হই, তাবৎ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। তবে কেন আমার এমন দুর্ম্মতি হইল? কেন আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম? পশ্চিমে যাইতে প্রাণ যায়, তাও ভাল, তথাপি জীবিতাবস্থায় পূর্ব্বদিকে ফিরিবনা।" হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্ আবার পশ্চিম দিকে ফিরিলেন। এক বিন্দু জল পান না করিয়া চারিদিন পাঁচ রাত্রি সেই ভয়ঙ্কর মরুভূমি দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে কেবল পবিত্র ধর্ম্ম পুস্তক হইতে উপদেশ সকল আবৃত্তি করিয়া হৃদয়ের শান্তি সম্পাদন করিতেন। তরুণবয়স্ক ধর্ম্মবীর, এইরূপে কেবল ধর্ম্মোপদেশের বলে বলীয়ান্ হইয়া, একটি বৃহৎ হ্রদের তটে উপস্থিত হইলেন। এই জনপদ তাতারদিগের অধিকৃত। তাতারেরা হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গকে আদরসহকারে গ্রহণ করিল। একজন তাতারভূপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গকে আপনার লোকদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা করিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্ ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাতার ভূপতি শেষে বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গের হৃদয় বিচলিত হইল না। হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্ দৃঢ়তার সহিত কহি-লেন,—"ভূপতির ক্ষমতা আছে। কিন্তু তিনি আমার মন এবং আমার

ইচ্ছার উপর কোনরূপ ক্ষমতা স্থাপন করিতে পারেন না।" এই রূপে আবদ্ধ হইয়া হিউ এনথ্‌সঙ্গ্ তাহার রাজ্যে আপনার দেহপাত করিবার জন্য আহার পান হইতে বিরত হইলেন। তাতার ভূপতি এই দরিদ্র যতিকে আপনার মতে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। হিউ এনথ্‌সঙ্গ্ এক মাস কাল এই ভূপতির রাজ্যে আবদ্ধ ছিলেন; এক মাস ভূপতি ও তদীয় পারিষদগণ আপনাদের পবিত্রস্বভাব অতিথির নিকটে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছিলেন। এখন তাতার-রাজের আদেশে বহু-সংখ্যক অনুচর হিউ এনথ্‌সঙ্গের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। যে চব্বিশজন রাজার অধিকার দিয়া এই তীর্থযাত্রীর দল যাইবে, তাতার-ভূপতি তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক এক খানি পত্র দিলেন। হিউ এনথ্‌সঙ্গ্ এই অনুচর-গণের সহিত অনেক গুলি তুষারমণ্ডিত দুর্গম গিরি অতিক্রম পূর্ব্বক বক্ট্রিয়া ও কাবুলীস্তান দিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। এই সকল তুষারসমাচ্ছাদিত পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিতে তাঁহার সাত দিন লাগিয়াছিল। ঐ দুর্গম পথ অতিক্রম সময়ে তাঁহার ১৪ জন অনুচর বিনষ্ট হয়।

হিউ এনথ্‌সঙ্গ্ মধ্য এশিয়ায় সভ্যতার উন্নতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। কথিত আছে, এই ভূখণ্ড আদিম আর্য্য জাতির আদি-নিবাস ভূমি। প্রাচীন আর্য্যগণ এই স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশস্থাপনপূর্ব্বক সভ্যতার উৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। লোকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা ব্যবহার করিত। স্থানে স্থানে বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তক সকল অধীত হইত। কৃষিকার্য্যের অবস্থা ভাল ছিল। ধান্য, যব, আঙ্গুর প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে উৎপন্ন হইত। অধিবাসীরা রেশম ও পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিত। প্রধান প্রধান নগরে সঙ্গীতব্যবসায়ীরা গানবাদ্যে আসক্ত থাকিত। এই জনপদে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল। স্থানে স্থানে অগ্নির উপাসনাও হইত। প্রাচীন সময়ে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স্ যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার প্রধান স্থান বলিয়া ইউরোপে সম্মানিত হইত, এ সময়ে মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ নগরেরও তেমনি প্রতিপত্তি ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের

অধিবাসীরা পুরুষপুরবাসীদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিত। বিষয়প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে মধ্য এশিয়ার অবস্থা এখানে বর্ণিত হইল। হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ যেখানে গিয়াছেন, যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তৎসমুদয়েরই বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। দূরদর্শিতার গভীরতায়, ভাবের উচ্চতায় ও বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়াতে ঐতিহাসিক ক্ষেত্র অভিনব প্রশান্ত জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে।

হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ মধ্যএসিয়া অতিক্রমপূর্ব্বক কাবুল দিয়া পুরুষপুরে (পেশাবর) উপনীত হন; এবং এই স্থান হইতে কাশ্মীরে গমন করেন। ইহার পর তিনি পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অতিক্রমপূর্ব্বক মগধে উপস্থিত হন। এত দিনে এই অধ্যবসায়সম্পন্ন ধর্ম্মবীরের বাসনা চরিতার্থ হয়। বিদেশী ধর্ম্মবীর আপনাদের পবিত্র তীর্থ কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, বারাণসী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি দর্শন করিলেন। মধ্য ভারতবর্ষের অনেক স্থান দেখিলেন, বাঙ্গালায় যাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থার অনুসন্ধান লইলেন। দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিলেন। একে একে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় স্থানই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি প্রধান প্রধান স্থানে প্রধান প্রধান লোকের সহিত আলাপ করিয়া এবং প্রধান প্রধান সংস্কৃত ও বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থসকল পাঠ করিয়া ক্রমে জ্ঞানী ও বহুদর্শী হইয়া উঠিলেন। সহায়সম্পন্ন লোকে যাহা করিতে পারেন নাই, একটি অসহায় বিদেশী দরিদ্র যুবক, আপনার সাহস ও উদ্যম—ইহার উপর আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠাবলে তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ সিংহলদ্বীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাঞ্চিপুরে (কঞ্চীবিরম্‌) আসিয়া শুনিলেন সিংহলদ্বীপ আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য তিনি সিংহলে গেলেন না, কঞ্চীবিরম্‌ হইতে করমণ্ডল উপকূল দিয়া কিয়দ্দূর আসিয়া দক্ষিণাপথ অতিক্রম পূর্ব্বক মলবার উপকূলে আসিলেন; এবং সেস্থান হইতে সিন্ধুনদ দিয়া উত্তর-পশ্চিমের প্রধান প্রধান নগর দর্শনপূর্ব্বক মগধে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ এই স্থানে তাঁহার সদাশয় বন্ধুগণের সহিত কিছুদিন একত্র বাস করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করেন, ইহার পর এই পরি-

ব্রাজক স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি পঞ্জাব ও কাবুলীস্তান দিয়া মধ্য এশিয়ার উন্নত ভূখণ্ডে আসিলেন; এবং তুর্কিস্তান, কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোতান নগরে কিছুকাল থাকিয়া, ষোল বৎসর কাল ভ্রমণ, অধ্যয়ন ও বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর খ্রীঃ ৬৪৫ অব্দের বসন্তকালে আপনার গরীয়সী জন্মভূমিতে পদার্পণ করিলেন।

এইরূপে সদাশয় ধর্ম্মবীরের ভ্রমণ-কার্য্য সমাপ্ত হইল, এইরূপে সদাশয় ধর্ম্মবীর গৌরবশ্রীতে সমুন্নত হইয়া দীর্ঘকালের পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্রাট এই প্রতিপত্তিশালী দরিদ্র পরিব্রাজকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটী করিলেন না। এক সময়ে চরগণ যাহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিল, সশস্ত্র রক্ষকগণ যাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ পাইয়াছিল, তিনি এখন প্রভূত সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইলেন। চীনের রাজধানীতে তাঁহার প্রবেশ-সময়ে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রাজপথ সকল কারপেটে আচ্ছাদিত হইল, তাহার উপর সুগন্ধি পুষ্পসকল শোভা-বিকাশ করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে জয়-পতাকা সকল বায়ু-ভরে প্রকম্পিত হইতে লাগিল, সৈনিক পুরুষেরা পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল, প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা আপনাদের বিখ্যাত পরিব্রাজককে অভিনন্দন করিয়া আনিতে গেলেন। দরিদ্র ধর্ম্মবীর আপনার কৃতকার্য্যতার গৌরবে উন্নত হইলেও বিনম্রভাবে এই মহোৎসবের মধ্যে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ বুদ্ধের স্বর্ণ রৌপ্য ও চন্দন কাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি এবং ৬৫৭ খানি গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সম্রাট ইহাতে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়া আপনার সুসজ্জিত প্রাসাদে তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও গুণের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সাম্রাজ্যের একটি প্রধান পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ বিনীত ভাবে ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বুদ্ধের জীবনী ও নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনায় আপনার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন।

সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার জন্য একটি মঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই স্থানে তিনি অপরাপর বৌদ্ধ পুরোহিতগণের সহিত ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত পুস্তক সমূহের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত শীঘ্র লিখিত ও প্রকাশিত হইল; কিন্তু সংস্কৃত পুঁথি সমূহের অনুবাদে তাঁহার অনেক দিন লাগিয়াছিল। কথিত আছে, হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ বহুসংখ্যক সহযোগীর সাহায্যে ৭৪০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই সকল গ্রন্থ ১,৩৩৫ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল। অনুবাদ সময়ে তিনি প্রায়ই দুরূহ অংশের অর্থপরিগ্রহের জন্য নির্জ্জনে চিন্তা করিতেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল হঠাৎ প্রসন্ন হইত, হঠাৎ যেন কোন অচিন্ত্যপূর্ব্ব আলোকে তাঁহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। ঘোর অন্ধকারময় স্থানে পরিভ্রমণ সময়ে পথিক সহসা সূর্য্যের আলোক পাইলে যেমন প্রফুল্ল হয়, হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ চিন্তা করিতে করিতে দুরূহ অংশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া তেমনি প্রফুল্ল হইতেন।

এইরূপে ধর্ম্মচিন্তা, গ্রন্থপ্রণয়ন ও গ্রন্থপ্রচার করিয়া হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গ্‌ ক্রমে ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। তিনি মৃত্যুসময়ে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন; এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলেন। অন্তিম সময়েও তাঁহার প্রসন্নতার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি প্রশান্তভাবে কহিলেন, "সৎকার্য্যপ্রযুক্ত আমি যে কিছু প্রশংসা পাইতে পারি, তাহা কেবল আমার নিজের প্রাপ্য নয়—অপরাপর লোকেও তাহার অংশ পাইবার যোগ্য।" খ্রীঃ ৬৬৪ অব্দে হিউ এন্‌থ্‌সঙ্গের মৃত্যু হয়। প্রায় এই সময়ে বিজয়োন্মত্ত মুসলমানেরা প্রাচ্য ভূখণ্ড নর-শোণিতে রঞ্জিত করিতেছিল, এবং এই সময়ে জর্ম্মনির অন্ধকারময় আরণ্য প্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোক ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতেছিল।

মা

১

আকুল নয়ন-নীর
মুছে দাও।
তাপিত পীড়িত হৃদি
আজি গো জুড়াব ব'লে
মা ব'লে এসেছি কাছে
ফিরে চাও;
আকুল নয়ন-নীর
মুছে দাও।

২

জগতে আসিয়ে কেঁদে
চ'লে যাই,
মা ব'লে ডাকিলে নাহি
সাড়া পাই।
সুখের সংসার-মাঝে
আমায় দুঃখের সাজে
সাজায়ে জননি কিগো
সুখ পাও;
আকুল নয়ন-নীর
মুছে দাও।

৩

ভক্তি-বিহীন হীন
প্রাণ মন,
শক্তি-বিহীন ক্ষীণ
এ জীবন।
অনন্ত বীজ-ভূমি
শক্তি-রূপিণী তুমি
ভক্তি-স্বরূপা মা গো
ফিরে চাও;
আকুল নয়ন-নীর
মুছে দাও।

৪

কর্ম্ম-ফলার্থী এ
দেহ প্রাণ,
জগতে ক'রেছ মোরে
তুমি দান।
শক্তি ভক্তি জ্ঞান ধর্ম্ম
সংযুক্ত পরম কর্ম্ম
কর্ম্মভূমে দিয়ে কোলে
তুলে নাও;
আকুল নয়ন-নীর
মুছে দাও।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

দুইটি হিন্দু পত্নী

পত্নী একমনে পতিকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিবেন—পতির সহস্র অপরাধ সত্ত্বে পত্নী তাঁহাতে অনুরক্তা থাকিবেন এবং তাঁহার তুষ্টিসাধন করিবেন—পতিতে পত্নী সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিবেন—প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ সংহিতা কাব্যাদিতে এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ নয়, আধুনিক বাঙ্গালা গ্রন্থ। এই দুইখানি আধুনিক গ্রন্থে দুইটি পত্নী দেখিতে পাওয়া যায়—বিষবৃক্ষে সূর্য্যমুখী, কৃষ্ণকান্তের উইলে ভ্রমর। সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ পত্নীর সদৃশ কি না একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস দুইখানির প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় যে সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই পতিপ্রেমে মুগ্ধ। সূর্য্যমুখী বলেন—"পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী।"

ভ্রমর বলেন—"আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি।"

আরো দেখা যায় যে সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর পতিতে কেবল মুগ্ধ নন, দেবতা বা গুরুপদারূঢ় ভাবিয়া পতির প্রতি ভক্তের ন্যায় ভক্তিমতী।

সূর্য্যমুখী স্বামীকে বলিতেছেন—"তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড় না আমি বড়?"

ভ্রমর স্বামীকে বলিতেছেন—"আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা।"

পতির প্রতি প্রেম ও ভক্তি সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েরই সমান। প্রেমের কথা এখন ছাড়িয়া দি। প্রকৃত প্রেমের পাত্রের প্রতি যে ভক্তি সর্ব্বত্র

অবশ্যম্ভাবী এ ভক্তি কেবল সে ভক্তি নয়। এ ভক্তি একমাত্র হিন্দু পত্নীর ভক্তি। এ পর্য্যন্ত দেখিতেছি সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই সমভাবে হিন্দু পত্নীর লক্ষণাক্রান্তা।

পত্নীদ্বয় যেমন পতিদ্বয়ে মুগ্ধ, পতিদ্বয়ও তেমনি পত্নীদ্বয়ে মুগ্ধ। কিছুদিন এইরূপে গেল। তাহার পর উভয় পত্নীর ভাগ্যে একই রকম বিড়ম্বনা ঘটিল। নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীতে আসক্ত হইলেন, গোবিন্দলাল রোহিণীতে আসক্ত হইলেন। দুই জনের আসক্তিই প্রবল—উন্মত্ততার তুল্য। এই বিড়ম্বনায় পড়িলে পর দুইটি পত্নীতে বিষম পার্থক্য প্রকাশ পাইল। দুইজনেই মর্ম্মাহত হইলেন সত্য; কিন্তু মর্ম্মাহত হইয়া একজন পতিকে সুখী করিবার সঙ্কল্প করিলেন আর একজন পতির উপর দুর্জ্জয় রাগ ও অভিমান করিলেন। দুইটি পত্নীর দুই প্রকার আচরণের ফল বড় বিভিন্ন হইল।

সূর্য্যমুখী যখন দেখিলেন যে কুন্দনন্দিনীকে না পাইলে নগেন্দ্রনাথের জীবন ক্লেশময় হইবে, হয়ত নগেন্দ্রনাথ দেশত্যাগী হইবেন, তখন নগেন্দ্রনাথের উপর তাঁহার কিছুমাত্র রাগ বা অভিমান হইল না, তখন তিনি নগেন্দ্রনাথকে সুখী করিবার জন্য নিজেই উদ্যোগী হইয়া কুন্দের সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ দিয়া দিলেন। রাগ অভিমানাদি না করিয়া এমন করিয়া স্বামীকে সুখী করিতে এক হিন্দু পত্নী ভিন্ন আর কেহ পারে না। কিন্তু স্বামীকে সুখী করিয়া সূর্য্যমুখী নিজে সুখী হইতে পারিলেন না। ভাবিয়াছিলেন সুখী হইবেন—হিন্দু পত্নী মাত্রই ভাবিয়া থাকেন স্বামীর সুখেই আপনার সুখ। কিন্তু সূর্য্যমুখী সুখী হইলেন না। তাই তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।

কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল। স্বামী সপত্নী লইয়া গৃহে সুখভোগ করিতে লাগিলেন বলিয়া যন্ত্রণা নয়। স্বামী দর্শনে বঞ্চিত বলিয়া যন্ত্রণা। তখন সূর্য্যমুখী বুঝিলেন—তাঁহার নিজের কিছুই নাই, তাঁহার সমস্তই তাঁহার স্বামীর। তখন তিনি আপনাকে আপনি বলিলেন—স্বামীর আর কেহ থাকে থাক্, আমার ত স্বামী বই আর কেহ নাই, আমাতে ত স্বামী বই আর কিছুই নাই। আর বলিলেন—আমাতে যখন স্বামী বই আর কিছুই নাই তখন আমার স্বামীর কুন্দের জন্য আমার জ্বালাই বা কি যন্ত্রণাই বা কি; আমার স্বামীও যেমন আমার, আমার স্বামীর কুন্দও তেমনি আমার। তখন

রাধা যেমন জ্বালা যন্ত্রণা মান অভিমান সব ভুলিয়া কৃষ্ণলাভার্থ প্রভাসে ছুটিয়াছিলেন, সূর্য্যমুখীও তেমনি সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া নগেন্দ্রলাভার্থ গোবিন্দপুরে ছুটিলেন।—যে কুন্দের জন্য স্বামী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, স্বামীর সেই কুন্দকে লইয়া স্বামীতে মিশিয়া থাকিবেন বলিয়া স্বামিলাভার্থ গোবিন্দপুরে ছুটিলেন। সূর্য্যমুখীতে যে একটু 'আমিত্ব' ছিল, তাঁহার প্রেমে যে একটু স্বার্থের ভাঁজ ছিল, তাহা আর রহিল না। তাঁহার প্রেম এখন সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ হইয়া প্রেমের যে চরম, যে আদর্শমূর্ত্তি তাহাই ধারণ করিল। প্রেমের সে মূর্ত্তি অন্য দেশে কেবলমাত্র কবির কল্পনায় বা আকাঙ্ক্ষায় থাকে; এদেশে অনেক পতিপরায়ণা পত্নীতে থাকে। অন্যদেশে পত্নী পতির অনুরোধে নিজের অনেক সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারেন এবং দিয়াও থাকেন। কিন্তু এমন করিয়া সপত্নীর জ্বালা ভুলিয়া সপত্নীকে সঙ্গে লইয়া পতিতে মিশিয়া থাকিতে এক হিন্দু পত্নী বই আর কেহ পারে না*। অন্য দেশে যে প্রেম কল্পনার সামগ্রী মাত্র, এদেশে তাহা নারীজীবনে দ্রষ্টব্য। হিন্দুপত্নীকে না বুঝিলে প্রেমরহস্য পূর্ণমাত্রায় বুঝা যায় না। ইউরোপ কখন প্রেমরহস্য পূর্ণমাত্রায় বুঝে নাই। তাই বিষবৃক্ষের ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়া ইউরোপবাসী সূর্য্যমুখীকে বুঝিল না। আমরা ঘরে ঘরে সূর্য্যমুখী দেখিয়া থাকি। তাই আমরা বুঝিয়া থাকি যে সূর্য্যমুখী প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শানুযায়ী পূর্ণমাত্রায় হিন্দুপত্নী অর্থাৎ প্রেমের চরম মূর্ত্তি।

ভ্রমর যখন জানিতে পারিলেন যে গোবিন্দলাল রোহিণীতে অনুরক্ত, তখন তিনি রাগে এবং অভিমানে যেন আত্মহারা হইলেন। তিনি স্বামীকে লিখিলেন।—

"তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন

---

* হয়ত কোন পাঠক এইখানে মনে করিবেন যে আমি পুরুষের বহুবিবাহের বা সপত্নী প্রথার পক্ষপাতী?

তোমার উপর আমার ভক্তি নাই—বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।"

কুন্দনন্দিনীর উপর পতির অনুরাগ দেখিয়া সূর্য্যমুখী ভাবিয়াছিলেন যে, কুন্দকে না পাইলে পতি যদি অসুখী হন, তবে আমি নিজেই পতিকে কুন্দ-নন্দিনী দিব। ইহা প্রেমের আত্মবিসর্জ্জন। প্রেমের এইরূপ আত্মবিসর্জ্জন অন্যদেশে অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এদেশে হিন্দু পত্নীতে একটি সচরাচর দৃষ্ট লক্ষণ। এ লক্ষণ কিন্তু ভ্রমরে নাই। ভ্রমর যখন জানিলেন যে তাঁহার পতি রোহিণীর আকাঙ্ক্ষী তখন তিনি এমন ভাবিলেন না যে রোহিণীকে গ্রহণ করিতে না পাইলে পতি যদি অসুখী হন, তবে তিনি রোহিণীকেই গ্রহণ করুন। তখন পতির উপর তাঁহার কি বিষম রাগ হইল তাহা তাঁহার উদ্ধৃত কথা গুলিতেই প্রকাশ।

আবার যখন ভ্রমরের নিতান্ত কাতর মিনতিতে কর্ণপাত না করিয়া গোবিন্দলাল তাঁহার নিকট একরকম চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন ভ্রমর গোবিন্দলালকে কি বলিলেন শুন—

"তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।— কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—এক দিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?—দেবতাও সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি একথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী! তুমি যাও আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

"এই বলিয়া ভ্রমর, ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেন্দ্র-গমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।"

সাত বৎসর পরে ভ্রমর যখন প্রায় মৃত্যুশয্যায়, গোবিন্দলাল তখন পেটের

আপনার ভ্রমরের নিকট আসিতে চাহিলেন। "তখন ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্রধারা মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িলেন। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িলেন।" তাহার পর "প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ" এই পাঠে গোবিন্দলালের পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিলেন। প্রত্যুত্তরের শেষ কথা এই :—

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট—আপনিও যে সন্তুষ্ট তাহায় আমার সন্দেহ নাই।"

এখন ও সেই বিষম রাগ! এখন গোবিন্দলালের সে রোহিণী নাই—এখন গোবিন্দলাল লজ্জায়, ঘৃণায় মৃতবৎ, অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট। তথাপি গোবিন্দলালের উপর ভ্রমরের এখনও সেই বিষম রাগ! সূর্য্যমুখী হইলে, এরূপ পত্রলেখা দূরে থাকুক, স্বয়ং স্বামীর নিকট ছুটিয়া গিয়া স্বামীর পায়ে ধরিয়া স্বামীকে গৃহে আনয়ন করিতেন।

তবে কি ভ্রমর হিন্দুপত্নী নন?

স্বামীর উপর ভ্রমরের বিষম রাগ সত্য। কিন্তু এত রাগেও স্বামীর প্রতি ভ্রমরের হৃদয়ভরা ভক্তি—প্রাণভরা প্রেম—স্বামীই ভ্রমরের ধ্যান জ্ঞান উপাসনা আরাধনা। বিষম রাগভরে স্বামীকে তিরস্কার করিতে করিতেও ভ্রমর বলিলেন—"যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে।" বিষম রাগভরে স্বামীকে বিদায় দিয়া চলিয়া যাইবার সময়ও ভ্রমর ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। আবার প্রায় সেই শেষের দিনে, যখন স্বামীর উপর ভ্রমরের তেমনি বিষম রাগ, তখন ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নের সহস্র ধারা মুছিতে মুছিতে, স্বামীর সেই পত্র পড়িলেন। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িলেন। এবং স্বামীর পত্রের প্রত্যুত্তরে যে পত্র লিখিলেন—যাহাতে স্বামীকে বলিলেন, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই আমি সন্তুষ্ট'—তাহা "প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ," এই সম্মান ও ভক্তিসূচক পাঠে লিখিলেন।

এত রাগের সঙ্গে সঙ্গে এত প্রেম, এত ভক্তি—এ রহস্য ভেদ করে কাহার সাধ্য? বিজ্ঞানের অনেক রহস্য আছে, দর্শনের অনেক রহস্য আছে, কাব্যের অনেক রহস্য আছে, জড়জগতের অনেক রহস্য আছে, অন্তর্জগতের অনেক রহস্য আছে। কিন্তু ভ্রমরের হৃদয়ের এই রহস্যের মতন রহস্য বুঝি আর নাই। দেবতারা এ রহস্য বুঝিতে পারেন কি না বলিতে পারি না। ভ্রমর হিন্দুপত্নী বলিয়াই ভ্রমরের হৃদয় এই রহস্য-পূর্ণ। অপরাধী পতির উপর এতরাগ সত্বে এত প্রেম এত ভক্তি এক হিন্দু পত্নী ভিন্ন আর কোন পত্নীর হয় না। ইউরোপ বল, আমেরিকা বল, সর্ব্বত্রই দেখি, যেখানে পতীর উপর বিষম রাগ, সেই খানেই পতির প্রতি বিষম ঘৃণা, বিষম বিরাগ। কিন্তু বঙ্গে হিন্দুর গৃহে অপরাধী পতির উপর বিষম রাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় প্রেম ও পূর্ণভক্তি দেখিতে পাই। প্রেমের এ লক্ষণ, এ মূর্ত্তি এক হিন্দুপত্নী ভিন্ন আর কোন পত্নীতে দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় দেখিতে পাইবারও নয়। হিন্দুপত্নী একটি প্রেম-রহস্য—হিন্দু ভিন্ন সে রহস্য আর কাহারো হৃদয়ঙ্গম হইবার নয়। হিন্দুপত্নীকে যে না বুঝে সে প্রেমতত্ত্ব পূর্ণমাত্রায় বুঝে না, বুঝিতে পারেও না। সে বোধ হয় প্রকৃত ও পূর্ণ প্রেমিকও হইতে পারে না।

দেখিলাম সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই হিন্দুপত্নী—পতির বিষম অপরাধ সত্বেও উভয়েরই পতির প্রতি প্রগাঢ় প্রেম এবং অসীম ভক্তি। কিন্তু পতি অপরে আসক্ত বলিয়া একজনের পতির উপর বিষম রাগ, আর একজন পতির প্রতি শুধু রাগশূন্য তা নয়, স্বয়ং পতির আসক্তি চরিতার্থ করাইবার জন্য প্রয়াসী। এ প্রভেদের কারণ কি? ভ্রমরের প্রেম কি স্বার্থ দুষ্ট? সেই জন্যই কি পতির উপর ভ্রমরের এত রাগ? ভ্রমরের প্রেমে ত স্বার্থ খুঁজিয়া পাই না। যাহার পতিপ্রেম স্বার্থদুষ্ট, পতি তাহার স্বার্থে আঘাত করিলে পতির প্রতি তাহার প্রেম ও থাকে না, ভক্তিও থাকে না। বস্তুত তাহার পতিপ্রেম ও পতিভক্তি প্রকৃত প্রেম ও ভক্তিই নয়। এমন নিদারুণ মর্ম্মাঘাত পাইয়া যে ভ্রমরের পতির প্রতি সমান প্রেম ও সমান ভক্তি সে ভ্রমরের পতি-প্রেম স্বার্থদুষ্ট হইতেই পারে না। তবে কেন পতির উপর ভ্রমরের এত রাগ? বোধ হয় ভ্রমরের একটী কথায় এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।—

গোবিন্দলাল। আমি চলিলাম।

ভ্রমর। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা, তোমার দাসানুদাসী,—তোমার কথার ভিখারী,—আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি? বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর, কিন্তু উপরে দেবতা আছেন।

ভ্রমরের এই শেষ কথাগুলিতে ভ্রমরের রাগ ও অভিমানের কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রমর গোবিন্দলালকে এমন কথা বলেন না যে, আমি তোমার পত্নী, অতএব তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তিনি বলেন—আমি নিরপরাধিনী, আমাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে। অধর্ম্মের উপর ভ্রমরের বিষম রাগ বলিয়া ভ্রমরের পতির উপরও বিষম রাগ। ধর্ম্মরূপিণী পতিপ্রাণা পতিতে অধর্ম্মের সঞ্চার দেখিতে পারে না। ইহা প্রেমধর্ম্মের একটি লক্ষণ।—আমরা বাঙ্গালি, অধঃপতিত অকর্ম্মণ্য অন্তঃসারশূন্য—আমাদের কিন্তু একটি আশা ভরসার কথা এই যে আমরা গৃহে গৃহে এখনও প্রেমধর্ম্মের এই লক্ষণটি দেখিতে পাইতেছি।

সূর্য্যমুখী কি ধর্ম্মরূপিণী পতিপ্রাণা নন? তবে কেন ভ্রমরের ন্যায় তাঁহার পতির উপর রাগ হইল না? গোবিন্দলাল যেমন পাপী, নগেন্দ্রনাথও ত তেমনি পাপী। তবে কেন নগেন্দ্রনাথের উপর সূর্য্যমুখীর রাগ হইল না? কেন হইল না, একথার সম্পূর্ণ আলোচনা করিবার স্থান এ প্রবন্ধ নয়। এ প্রবন্ধে এ প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলিতেছি যে অনেক ধর্ম্মরূপিণী পতিপ্রাণা যেমন পতিতে অধর্ম্মের সঞ্চার দেখিতে পারেন না, অনেকে আবার তেমনি পতির দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ বা যন্ত্রণা দেখিতে পারেন না—পতির দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ বা যন্ত্রণা দুষ্প্রবৃত্তিজনিত হইলেও তাঁহারা তাহা দেখিতে পারেন না, আপনারাই তাহা মোচন করিবার চেষ্টা করেন। ইহাও প্রেমধর্ম্মের একটি লক্ষণ। আমরা বাঙ্গালি—নিতান্ত অসার ও দুর্ব্বৃত্ত, কিন্তু আমাদের বড় কপালের জোর যে এখনও আমরা গৃহে গৃহে প্রেমধর্ম্মের এই লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু অতি বড় কপালও ফাটে।

দেখা গেল যে সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়ে একই ছাঁচের হিন্দুপত্নী। কিন্তু এক ধাতুর নয়। সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর উভয়েই পতিপ্রেমে আত্মহারা—উভয়েরই পতিভক্তি অপরিমেয়। কিন্তু পতি অধর্ম্মাচরণ করিলে সূর্য্যমুখী পতির নিকট তেমনি শান্ত, প্রিয়ভাষিণী ও প্রিয়কারিণী—ভ্রমর পতির উপর রুক্ষ ও রাগান্বিত। ছাঁচ এক বটে কিন্তু ধাতু বড় বিভিন্ন। সূর্য্যমুখী যে ধাতুর পত্নী, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ধাতুর পত্নীই আদর্শ পত্নীরূপে বর্ণিত। ভ্রমর যে ধাতুর পত্নী, সে সাহিত্যে তাহার বড় বেশী প্রশংসা নাই। পূর্ব্বকালে সে ধাতুর পত্নী বেশী ছিল কি না বলিতে পারি না। এখন কিন্তু বেশী বলিয়া বোধ হয়। আমাদের শ্রীমতীরা শান্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ছাড়িয়া দুর্দ্দান্ত ইউরোপীয় চিকিৎসারই বেশী পক্ষপাতিনী। তবে যে তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন এমন কথা বলি না—আমি শ্রীমতীদিগের কলঙ্ক রটনা করিতে বসি নাই, এমন কথা কি আমি বলিতে পারি? তাঁহারা নরম গরম দুই রকম চিকিৎসাই করিয়া থাকেন, তবে কি না গরমের দিকেই যেন একটু ঝোঁক্।

সে যাহাহউক—যে দুই ধাতুর পত্নীত্ব বর্ণনা করিলাম তন্মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট কোন্‌টি নিকৃষ্ট, অথবা দুইটিরই সমান উৎকর্ষ কি না, তাহার বিচার এ প্রবন্ধে করা যাইতে পারে না। সে বিচার বড় কঠিন। অতএব তজ্জন্য একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এস্থলে কিন্তু একটা কথা বলা আবশ্যক। উপরে বলিয়াছি যে একই বিড়ম্বনায় পড়িয়া সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর দুইজনের আচরণ ভিন্নরকম এবং আচরণের ফলও ভিন্ন রকম হইয়াছিল। সূর্য্যমুখীর আচরণে সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র, নগেন্দ্রের যে বংশে জন্ম সকলই রক্ষা পাইল।—সে আচরণের ফলে যে যেখানে ছিল সকলেই শেষে সুখী হইল, নগেন্দ্রও সূর্য্যমুখী সন্তানাদি লাভ করিয়া পরমসুখে পবিত্রভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গেল—দুঃখিনী কুন্দনন্দিনী থাকিলে সেও নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর সঙ্গে তেমনি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইত। কিন্তু ভ্রমরের আচরণের ফলে ভ্রমর গেল, গোবিন্দলাল গেল, হরিদ্রাগ্রামের রায় বংশ লোপ হইল, কৃষ্ণকান্ত রায়ের নাম ডুবিল, একটা সংসার, একটা সম্পত্তি একটা ঐশ্বর্য্য ছারখার হইয়া গেল!

বুঝিবা পরিণামের এই ভীষণ এই শোচনীয় প্রভেদ ভাবিয়া সূর্য্যমুখী যে ধাতুর পত্নী, সংস্কৃত সাহিত্যে সেই ধাতুর পত্নীত্বের এত গৌরব করা হইয়াছে।

বঙ্কিম বাবু প্রাচীন কালের লোক নহেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমাদের সমসাময়িক লোক। এখনও প্রতিভায় দেশ আলোকিত করিতেছেন এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আরো বহুদিন ধরিয়া এই রকম করিয়া দেশ আলোকিত করেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু ইংরাজি শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইংরাজি বিদ্যায় তিনি সুপণ্ডিত। শৈশব হইতে ইংরাজি শিখিয়া হিন্দু ধাৎ রক্ষা করা ভার। তাই আজিকার বাঙ্গালা সাহিত্যে খাঁটি লেখা এত কম। কিন্তু দেখিলাম যে বঙ্কিম বাবুর সূর্য্যমুখী আদর্শানুযায়ী হিন্দুপত্নী এবং তাঁহার ভ্রমর ঠিক আদর্শানুরূপ না হইলেও খাঁটি হিন্দুপত্নী বটে। অতএব বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল, এই দুইখানি পুস্তককে যদি উপন্যাস বল, তবে দুইখানিই হিন্দু উপন্যাস, যদি কাব্য বল, তবে দুইখানিই হিন্দু কাব্য।

এ বড় কম আশা, স্পর্দ্ধা ও আহ্লাদের কথা নয়।

বসন্ত ও বর্ষা

বসন্ত চঞ্চলে উজ্জ্বল। বর্ষা গম্ভীরে মধুর। সৌন্দর্য্য উভয়েরই অতুল। বসন্তের কিন্তু চটুল সৌন্দর্য্য, আর বর্ষার স্থির মাধুর্য্য। বসন্তের সৌন্দর্য্য একটী কুসুমের প্রাণ, বর্ষার সৌন্দর্য্য পূর্ণ কানে কান। বসন্ত বিম্বোষ্ঠা,—বর্ষা গজেন্দ্রগামিনী।

বসন্ত পূর্ব্ব রাগ, বর্ষা মিলন। বসন্ত অনুরাগ,—বর্ষা সম্ভোগ। বসন্ত প্রেমের উন্মত্ততা,—বর্ষা প্রগাঢ় প্রেম। বসন্ত অব্যবস্থিত চিত্ত,—বর্ষা বিজ্ঞ। বিজ্ঞ অর্থে বণিগ্‌বৃত্তি-পরায়ণ নয়।

বসন্ত নবীনা যুবতী; বর্ষা প্রবীণা প্রৌঢ়া। প্রৌঢ়ায় যুবতীভাব আছে; নবযুবতীতে প্রৌঢ়াভাব নাই। প্রৌঢ়া, যুবতীর পূর্ণাবয়ব; নবীনা প্রবীণার 'প্রথম পরিচ্ছেদ' মাত্র। প্রবীণাই প্রেম বুঝেন। নবীনা

"না হলে প্রবীণা প্রেম বুঝেনা"।

বসন্ত, নবীনার ন্যায়, অস্ফুট অর্দ্ধস্ফুট রূপের গৌরবে আত্ম অহঙ্কারে উধাও আকাশে উঠে;—আর বর্ষা, প্রৌঢ়ার ন্যায় প্রস্ফুট, প্রফুল্ল, পূর্ণ রূপরাশি অগ্রাহ্য করিয়া, চতুর্দ্দিকে প্রেম, স্নেহ, করুণা বর্ষণ করে। বসন্ত রূপাভিমানিনী নবীনা, রূপের পসরা করে। বর্ষা রূপ-বৈভবে বিচলিত হয় না, রূপাভিমান করে না।

বসন্ত, পুষ্প; বর্ষা বীজ। বসন্তের বীজ বর্ষারই বক্ষে জন্মে। বসন্তের বিলাস বর্ষায় আছে, কিন্তু বর্ষার বিজ্ঞতা বসন্তে নাই। বসন্তের অনুপম অনন্ত বিলাস বর্ষায় বিবেক-বসনাবৃত। বর্ষার অঙ্গে বসন্ত রাগ মহাশয়েরা দেখেন নাই কি!

বসন্ত বাসনা, বর্ষা বিবেক। বাসনা, বরাবরই বিবেকের সহিত বিবাদ করে। বসন্ত বর্ষার সহিত বিবাদ করে কিন্তু বর্ষা বসন্তকে বর দেয়, বরণীয় করে। বসন্ত অস্ত হয় না,—আসিয়া আশ্রয় লয়,—বর্ষায়। বর্ষা, বসন্তকে বক্ষে ধারণ করিয়া কক্ষে গ্রহণ করিয়া বহুদিন তাহাকে জীবিত রাখে। বর্ষা, বসন্তকে বিশোধিত করে।

তবুও কিন্তু বসন্তের কোকিল কবি কলকণ্ঠে কেঁদে বলেন—

> Oh, not for all the autumn's gold
> Would I forego my spring!

বসন্তের কোকিল, বর্ষার বৈভবের কথা এখনও কেবল শুনিয়াছেন মাত্র, অনুভব ও উপভোগ করেন নাই;—করিলে আর এ কাঁদাকাটা থাকিবে না। বর্ষার বিষয় বৈভব পাইয়া, কোকিল বসন্তকে একেবারেই ভুলিয়া যান, সেটা কিন্তু কোকিলের বড়ই বেজায়।

জীবনে এক একটা নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত সময় আছে,—সে সময় উপস্থিত না হইলে, সংসারের অনেক বিষয়ের গুণানুভব সম্পূর্ণরূপে করা যায় না।

প্রৌঢ়ত্বের মধ্যে যে যুবত্ব, বর্ষার বক্ষে যে বসন্ত তাহা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিবারও, অবশ্য একটা নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত সময় আছে। সে সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যে যৌবনোন্মুখ বালকবৃন্দ বর্ষা-ভীত বসন্ত-বিকারগ্রস্ত হইয়া বসেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। জীবনের কাল বিশেষেই কবিতা-বিশেষ অনুভূত হয়। অকালে "কিলিয়ে কাঁঠাল পাকান" মুস্কিল, বড়ই পাকা কথা। তা যা'ক।

বসন্তের বীজ বর্ষায় আছে; আবার বসন্তের উন্নতি ও বিকাশ বর্ষা, যেমন বাল্যের বিকাশ যৌবন, যৌবনের বিকাশ প্রৌঢ়ত্ব। যদি এমনতর বলা নিতান্ত ব্যাকরণ বা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ না হয় তবে বলা যাইতে পারে বসন্ত অঙ্কুর, বর্ষা উন্নতি; বসন্ত ভ্রান্তি, বর্ষা শান্তি। তুমি বসন্তের অত্যন্ত উষ্ণ শোণিতে উন্মত্ত হইয়াই, বর্ষার শীতলতাকে সর্দ্দি বলিয়া থাক। অত্যন্ত গরমের সময় শীতল সমীরণে সর্দ্দিগর্ম্মি হয়; তা ব'লে সুশীতল সমীরণ কখনই কি তোমার সেবনীয় হইবে না। ছি! বাছা বসন্ত, তুমি বর্ষার সহিত বিবাদ কর কেন! বর্ষা তোমার বয়োজ্যেষ্ঠা তাই কি তাহার উপর তোমার এত বিতৃষ্ণা! তা বসন্ত, বর্ষার বয়স তোমা অপেক্ষা কতই বা বেশী? ভাল বেশীই না-হয় হ'ল; বর্ষায় না হয় বার্দ্ধক্যের বাতাস বেগেই বহিল, তা বাপু বিবাদ কেন? আর এত বড়াইই বা কেন? বার্দ্ধক্য কি এতই বিরক্তিকর। বিজ্ঞতা বহু-দর্শিতা কি এতই বিড়ম্বনা!

বসন্তের কবিতা ও বর্ষার কবিতা,—কবিতা যদি এমন-তর ভাগ করা যায়, আর যদি এমন তর কবিতা কোথায়ও থাকে,—বসন্ত ও বর্ষারই গুণ-সম্পন্না।

বর্ব্বর ব্যতীত বসন্তের কবিতা আস্বাদনে বাসনা নাই কাহার? বসন্তের কবিতা মৃদুমন্দ মলয়ানিল, শীতলতায়, সৌরভে প্রাণ পরিতোষ করে। বসন্তের কবিতায় গন্ধরাজের গন্ধ ছোটে, জুঁই মল্লিকার কোরক ফোটে; সুমন্দ জ্যোৎস্নার মৃদু হিল্লোল তাহাতে হেলিয়া দুলিয়া খেলা করে, তদ্দ্বারা চুম্বিত হয়, তাহাকে চুম্বন করে;—তাহার অস্ফুট আলোক অর্দ্ধস্ফুট ঔজ্জ্বল্য—তাহার সুকোমল ছায়াময়ী, স্বপ্নময়ী মাধুরী মন মোহিত করে। এ সবই সত্য। কিন্তু আমাদের এ কালের বসন্তের কবিতা 'বড় একঘেয়ে। বর্ষার

কবিতার আর যে এবং যত দোষই থাকুক, তাহা প্রায়ই একঘেয়ে হয় না, হইবার অবসর পায় না। বসন্তের কবিতা একঘেয়ে তার এক কারণ আছে। সে কারণ কার্য্যের বা—আরও মুল ধরিয়া বলিলে— কবিতার রক্ত মাংসে জড়িত। কাজেই একঘেয়ে ভাব অপরিহার্য্য। বসন্তের কবিতার গভীরতা যাহাই হউক, তাহার প্রসার সীমা-বদ্ধ, অর্থাৎ বসন্তের কবিতার বর্ণনীয় বিষয় বড় অধিক আছে বলিয়া বোধ হয় না। বসন্তের কবিতা বিষয় বিশেষেরই উপযোগিনী; সংসারের সকল বিষয় বর্ণিত করিবার শক্তি তাহাতে নাই, অন্তত আছে বলিয়া বসন্তের কোকিলেরা আজও প্রমাণ করেন নাই। বসন্তের কবিতার বর্ণনীয় বিষয় বিলক্ষণ উপাদেয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিষয় যতই উপাদেয়,—স্বর-গ্রাম যতই উচ্চ, কবিত্ব যতই সুন্দর হউক না, একই বিষয়ে বৈচিত্র্য জন্মে না। মনুষ্যের সাহিত্য-সম্ভোগ-বৃত্তি স্বভাবতই বৈচিত্র্য চায়; বৈচিত্র্যবিহীনতায় বিরক্ত হয়। যাহা বৈচিত্র্য বিহীন বিরক্তিকর তাহাই এক ঘেয়ে। আজ কাল যাহাকে বসন্তের কবিতা বলা হইতেছে তাহা শব্দ-সংযোজনা ও বিষয়-বর্ণনা উভয় দিকেই অনেক সময়ে এক ঘেয়ে।

এখনকার অনেক বসন্তের কবিতা আমাদের 'স্থির হৃদয়ের উপর দিয়া' 'নীরবে বহিয়া যায়', হৃদয় যেমন তেমনি স্থির থাকে; তাহাতে একটুকুও আঘাত লাগে না বা দাগ পড়ে না। ইহা সত্য কথা, ইহাতে একবিন্দু অত্যুক্তি নাই। উক্ত কবিতা কানের ভিতর দিয়া কানের বাহিরে চলিয়া যায়; "মরমে পশে না"। বসন্তের কবিতায় 'মাতামাতি' যে নেহাত নাই তাহা নয়। মাতামাতিটা হয় সেই সময়, যখন 'বাঁশী' একঘেয়ে বেজে বেজে আর আদপেই বাজে না, বাজিতে চায় না।

বসন্তের কবিতা কিন্তু কুলীন, কি না Aristocrat; আর বর্ষার কবিতা মৌলিক কি না Democrat। সাহিত্যে যাঁদের খুব সূক্ষ্ম রুচি ও মার্জ্জিত অনুভূতি, তাঁরা ভিন্ন অন্যে বসন্তের কবিতা অনুভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। Aristocratic সূক্ষ্ম আহার শ্রমজীবী সহস্রের মুখ-রোচক হয় না। একটু ঝালে লুনে খর-গোছ হইলেই তবে নিম্ন সাধারণের রুচির উপযোগী হয়, তবেই তাহারা বুঝিতে পারে যে দ্রব্যটা কি? বসন্তের কবিতা চাকিয়া

তাহার আভ্যন্তরিক আস্বাদ বাহির করিতে রসনেন্দ্রিয়ের একটা বড় তীক্ষ্ণ তেজ চাই।

বসন্তের কবিতা কাজেই অল্প লোকের মধ্যে বদ্ধ। বর্ষার কবিতা সার্ব্বজনিক, কেন না তাহাতে সব রসের সমাবেশ।

বসন্তের কবিতার কথাগুলি ক্ষুদে ক্ষুদে কিন্তু ভাব প্রায়ই প্রাঞ্জল নয়। উহা সাগুদানা ও চিনির পানার পরদায় মিলান মিশান পিষ্টক। বাহিরটা দেখতে হালকা ভিতরটা বিষম গুরুপাক। বসন্তের কবিতার সূত্রগুলি খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কিন্তু তাহাতে জড়োয়া জিলিপির প্যাঁচ। 'জড়াবটী' খুলিয়া সূত্র সরল করিতে করিতে কবিতা আস্বাদের অর্দ্ধেক সুখই ছাই মাটী হইয়া যায়।

বসন্তের কবিতার আকাশের সঙ্গেই অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা; উহা আকাশেই অধিক উড়ে। আকাশেরও আকাশ আবিষ্কার করিয়া মহা শূন্যে উঠিতে চায়। কিন্তু বর্ষার কবিতা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন-বিহারিণী, ত্রিলোকেই তাহার সমান অধিকার। বসন্তের কবিতা অনেক সময়ে আপনাকেই আপনি চিনিয়া উঠিতে পারে না। অতএব অন্যকে আর চিনিবে কিরূপে! দৃশ্যমান সংসারের সহিত তাহার সহানুভূতি সাধারণতঃ যেন অত্যন্তই অল্প। কিন্তু ভালবাসাও আবার অসীম। পূর্ব্ব বা পর জন্মের মেঘ কুয়াসার মধ্যে, আলো আঁধারের মধ্যে, অনিশ্চিতের মধ্যে অদৃশ্য দর্শনে অত্যন্ত অভিলাষিনী বসন্তের কবিতা। সে

"আধ জানা, আধেক অজানা,"

অনেক সময়ে একেবারেই "অজানা" জগতস্থ হইয়া অদৃষ্টের আবরণ ধরিয়া টানাটানি করে। অদৃষ্ট অচল অনড়, তাহার অনাদি অনন্ত আবরণ, যাহা আদৌ উদ্ঘাটিত হইবার নয়, এক চুলও নড়ে না, বসন্তের কোমলাঙ্গী কবিতা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া, এক অনিশ্চয়তা হইতে আর এক অনিশ্চিতে ঢলিয়া পড়ে। এক কথায় বসন্তের কবিতা ছায়াময়ী, বর্ষার কবিতা অনেক স্থলেই কায়াময়ী। প্রথমোক্ত যেখানে ছায়াময়ী সেখানে তবুও কতকটা স্পষ্ট কিন্তু যেখানে কেবল মাত্র শূন্যময়ী সেখানে একান্ত অস্পষ্ট। তবে অস্পষ্ট বলিলে যদি বলেন তোমার বুঝিবারই শক্তি নাই, তাহাতে আর কথা কি?

বসন্তের কবিতা "বিবাহের বাঁশী"। বিবাহের বাঁশী মধু হইতেও মিষ্ট, তা'তে আদর উছলে পড়ে। আশা ভালবাসা, সাধ আহ্লাদ, প্রেম স্নেহ আরও কত-রকম-কত-কি তা'তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। তা বটে। কিন্তু বারমাস বিবাহের বাঁশীও বিরক্তিকর। অন্ততঃ আশ্বিনে কার্ত্তিকে পৌষে ভাদ্রে ভদ্রের বিবাহ ব্যবস্থা-বিরুদ্ধ। কিন্তু বসন্তের কবিতাকে কেবল বিবাহের বাঁশী বলিলে তাহার সম্যক্ গৌরব করা হয় না, তাহার ন্যায্য প্রাপ্য তাহাকে দেওয়া হয় না। এই জন্য ইহাও বলা আবশ্যক, বসন্তের কবিতায় বিষাদের এমন একটু ভাব, এমন একটু আবল্যময়—উচ্ছ্বাসময় ভঙ্গি আছে, যাহার মূল্য সাহিত্যের হিসাবে এই পুরাণ পৃথিবীর "বিবাহ" অপেক্ষা বিস্তর বেশি।

তা বসন্তের কবিতা বাঁশী বটে। কিন্তু বর্ষার কবিতা যে বাঁশী বীণ মৃদঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সঙ্গীত-শালার সমস্ত যন্ত্র কয়টিরই সমষ্টি! বসন্তের কবিতা বর্ষার কবিতার এক অঙ্গ, না হয় এক অভিনব অঙ্গ, সর্ব্বথা উহা ইহার অন্তর্গত; যেমন এক হিন্দু ধর্ম্মেরই অন্তর্গত অনেক আসল ও উপধর্ম্ম আছে।

বর্ষার কবিতা পাণ্ডিত্য-প্রবণ কিন্তু প্রায়ই প্রাঞ্জল। বসন্তের কবিতা ভাবুকতা-প্রবণ, কিন্তু সে ভাবুকতায় যেন ভরাট কম। প্রায়ই যেন তাহা ভাঙ্গা ভাঙ্গা। আসল কথাটা খুলিয়া বলিতে দোষ কি বসন্তের কবিতায় ভাবুকতা অপেক্ষা ভাবুকতার ভান যেন কিছু বেশি বেশি দেখা যাইতেছে। তা সেটা বোধ করি কোকিল কবিদের কারো কারো কাঁচা হাতের (?) দরুণ। এ ছাড়া বসন্তের কবিতায় বিলাতি সাবানের বাস যেন কিছু বেশি বেশি বোধ হয়।

বর্ষার কবিতা গৃহিণী। বসন্তের কবিতা বিলাসিনী। গৃহিণী গৃহকার্য্য করিয়া সংসার-ধর্ম্ম দেখিয়া, যতটুকু আয়াস আবশ্যক সঙ্গত ও সুখকর, তাহাই সম্ভোগ করেন। বিলাসিনী প্রমোদ উদ্যানে "মল্লিকা ফুলের পাখায় অগুরু মাখিয়া" হাওয়া খান।

বসন্ত বিস্মৃতি; বর্ষা স্মৃতি। ইহা সত্য। কিন্তু মিলন-স্মৃতিতে কি বিস্মৃতিতে? বিস্মৃতিতেই ত বিরহ!

"বর্ষা আমাদিগকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে,"—কারণ তখন আমাদের চিত্ত স্থির, হৃদয় কেন্দ্রীভূত, আত্মা দ্বৈত-ভাব-শূন্য, অদ্বৈত ভাবাপন্ন; তখন গৃহেই জগৎ, জগৎই গৃহ, তখন বাহিরের বস্তু অপ্রয়োজন, কাজেই আমরা, গৃহে প্রতিষ্ঠিত।' বসন্তে আমরা বাহিরে বড়ই বেড়াইয়া বেড়াই,—কারণ তখন আমাদের চিত্ত চঞ্চল, মনটা কেমন উড়ু উড়ু। তখন হৃদয় বাসনার বেগে বিপথগামী, বাহিরের বস্তু লইয়া ব্যতিবস্ত। বসন্তে মধুকর এ ফুল হইতে ও ফুলে, ও ফুল হইতে সে ফুলে দৌড়িয়া বেড়ায়, আত্মার একত্ব অনুভব করিয়া উঠিতে পারে না। অতএব বর্ষা ও বসন্ত উভয়ের কে "অদ্বৈতবাদী" ও কে "দ্বৈতবাদী" তাহা বারেক আবার বিবেচ্য।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সংবাদ।

এবারকার মাসিক সম্বাদ খুব জাঁকাল সম্বাদ। প্রথম নম্বরের সম্বাদ, তিব্বতে খুব যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। তিব্বতীয়েরা হারিয়া গিয়াছে—ইংরেজের কাছে কে না হারে? জেনেরল গ্রেহামের আক্রমণে তাহারা আপনাদের পূর্ব্ব শিবির পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। চারিশত তিব্বতীয় যোদ্ধা যমপুরে গিয়া ব্রিটিশ্ বাহুবলের পরিচয় দিতেছে। তার পর জেনেরল গ্রেহাম দুর্ব্বৃত্তদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চুম্বি অধিত্যকা আক্রমণ করিয়াছেন। জলাপা পাস্ অধিকৃত হইয়াছে। তার পর রিঙ্কাগাঁও হস্তগত হইয়াছে। তিব্বতীয়েরা ক্রমে হটিয়া পলাইতেছে। সিকিমের রাজা, যাঁহার রাজ্য রক্ষার্থে সরকার বাহাদুর এই যুদ্ধ করিতেছেন, তিনিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পলাইতেছেন—কোথায় পলাইতেছেন, তাহার উদ্দেশ নাই। রাজাটি অতিশয় নির্ব্বোধ সন্দেহ নাই, তা নহিলে মিত্রের ভয়ে পলাইবে কেন? আর যেমন তেমন মিত্র

নহে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মিত্র। নদী কি নদীপতি সাগরকে ভয় করে? বরং নদী সাগরাভিমুখে গমন করিয়াই থাকে।

তা যাক, তিব্বতীয়েরা পলাইতেছে, ব্রিটিশ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, পিছু পিছু যাইতে হইবে কতদূর? বেড়াইতে বেড়াইতে লাসা পর্য্যন্ত না কি? ক্ষতি নাই, কিন্তু আমরা আর পাথেয় যোগাইতে পারি না। তাহার একটা উপায় করা যায় না কি? খাঁদা নাকের উপর একটা টেক্‌শ বসে না কি?

***

সম্বাদ নম্বর দুই, কাবুলের আমীর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ইশাক খাঁ বিদ্রোহী হইয়াছেন। আমীরের সময় বড় ভাল নহে। কথাটা উঠিয়াছে, যদি আমীর হারেন, তবে কাবুল নামক রুটিখানাকে দুইটি টুকরা করিয়া এক টুকরা সিংহ, এক টুকরা ভল্লূক মহাশয় উদরসাৎ করিবেন। ইহা না করিলে না কি পৃথিবীর মঙ্গল হইবে না। ভাল, তাহা না হয় করিলেন। কিন্তু জীর্ণ করিবার বন্দোবস্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে। শুনিয়াছি, অনেক রাশি রূপার চাকৃতি নহিলে রাজার উদরে একটা রাজ্য জীর্ণ হয় না। তার ভার আমাদের উপর। তার পর আবার শুনিতেছি, "কালো পাহাড়ে" কোন চুয়াড় জাতি আছে, ইংরেজকে তাদের সঙ্গে ভারি লড়াই লড়িতে হইবে। আমাদিগকে টাকা যোগাইতে হইবে। আমাদের ধনবল নহিলে ইংরেজের বাহুবলে কিছুই হয় না। তোমরা ইংরেজের বাহুবলের প্রশংসা কর, কিন্তু আমরা আমাদিগের ধনবলের প্রশংসা করি। ব্রহ্ম বল, কাবুল বল, তিব্বত বল, আমাদের ধনবল নহিলে জিত হয় নাই। আমরা বড় ধনবান্। তোমরা একবার আমাদের ধনের প্রশংসা কর।

***

ব্রহ্মে বিদ্রোহানল; তিব্বতে যুদ্ধানল; কাবুলে রুষানল, ঘুষানল, এবং হিন্দুকুশানল। চারিদিকে আগুন দেখিয়া, আমাদের চিরহিতাকাঙ্ক্ষী দেবেন্দ্র বন্যায় বাঙ্গালা দেশ ভাসাইয়া দিয়াছেন। দেবতার এটুকু দয়া বটে। অন্ততঃ

আমরা জলে ডুবিয়া মরিতে পারিব। কোন কোন স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি আপত্তি করিতে পারেন বটে যে, ইহাতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে আমরা বাধ্য, যে সময় থাকিতে থাকিতে, বিল খাল পরিপূর্ণ থাকিতে থাকিতে, কাজ নিকাশ করিয়া রাখিতে পারিলে দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। আমাদের বিবেচনায় এই বেলা ঘটি বাটী টেক্সের বাবুকে বুঝ সমুজ করিয়া দিয়া কেবল কলসীটা লইয়া জলে নামিলেই বাঙ্গালি জন্মের সকল জ্বালা হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে।

এই গণ্ডগোলের সময়ে আবার পাষাণের মেয়ে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। মহিষাসুরও নই, বৃষাসুরও নই; কোন প্রকার অসুর বা সুর নই—আমাদের বুকে বর্শা কেন মা? কি অবিচার মা—রাঙ্গা পা খানা সিঙ্গী ভায়ার ঘাড়ে—আর আমাদের বেলা কেউটে সাপ আর তীক্ষ্ণ বর্শা? দেড় পয়সা করিয়া বেগুণটা, বার পয়সা আলুর সের, এই কি অন্নপূর্ণার আগমনের লক্ষণ? এবার তোমাকে দেশের অন্নের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, নহিলে অনেকে পরামর্শ করিয়াছে, বিজয়ার দিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। দুই দিন অগ্র পশ্চাতে তাদের কি আসিয়া যায়?

এই অসময়ে রসময় খাঁ সাহেবেরা কংগ্রেস লইয়া রঙ্গরস বাধাইয়াছেন। ভারতবর্ষের নগরে নগরে কংগ্রেসের দোষোদ্ঘোষণ উপলক্ষে শ্বেত কৃষ্ণ হরিৎ কপিশ প্রভৃতি নানা বর্ণের দাড়ি একত্রিত হইয়া বহুধা আন্দোলিত ও নিষ্ঠীবন-কণানিচয়ে বিভূষিত হইয়াছিল। সেই সকল ছিন্ন, অছিন্ন, এবং বিচ্ছিন্ন শ্মশ্রুরাজির গতি, প্রক্রিয়া, বেগ, আবেগ, সংবেগ, ও উদ্বেগ সন্দর্শনে ভারতবর্ষে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে মুসলমান কংগ্রেসে আসিতে চাহে না। আমরা এ মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আসিলে উপাধিলোলুপের উপাধিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই—অযোগ্যের পদবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আজিকার দিনে, যাহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক নাই, অন্ততঃ তাহাদের রাজানুগ্রহটা

চাই। এ পাদুকা-বৃষ্টির দিনে, নেড়ামাথার পক্ষে অনুগ্রাহকের চরণাশ্রয়ই ভাল। সৌভাগ্যক্রমে সকল মুসলমান এইরূপ দুরবস্থাপন্ন নহেন। যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধির ধার ধারেন, তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষে।

***

এক্ষণে শুনিতেছি, চাচাদিগের কোন দোষ নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন। বালকে কলের পুতুল লইয়া খেলা করে দেখিয়াছি; সে গুলির কল টিপিলেই দাড়ি নাড়ে। শুনিতেছি, পাহাড়ে বসিয়া বড় বড় লোকে না কি কল টিপিতেছে, তাই ইহারা দাড়ি নাড়িতেছেন। কলের পুতুল, কলে দাড়ি নাড়িবে, তাহাতে আর আপত্তি কি?

***

কিন্তু হিন্দু মুসলমানে ঐক্য ঘটিল না—ঐক্য ভিন্ন এরূপ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না বলিয়া, কংগ্রেস সম্প্রদায় কিছু দুঃখিত। কথাটা একটু বিচার করিয়া দেখা যাক। হিন্দু মুসলমানে ঐক্য হইল না, হিন্দুতে হিন্দুতে ঐক্য আছে কি? বাঙ্গালিতে বাঙ্গালিতে ঐক্য আছে কি? ঘরে ঘরে আছে কি? না থাকে, তবে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য খোঁজ কেন? ঐক্য সম্ভবে কি?

আর ইতিহাস হিন্দু মুসলমানে ঐক্য সম্বন্ধে কি বলে? কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের দিন হইতে শিপাহিবিদ্রোহ পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমানের ঐক্যে হিন্দুর পক্ষে কি ফল ফলিয়াছে? হিন্দুর ভাগ্যে বরাবর শূন্য। শিপাহিবিদ্রোহ যদি সফল হইত, তবে আজ দিল্লীতে মুসলমান বাদশাহ এবং লক্ষ্ণৌয়ে মুসলমান বাদশাহ রাজ্য করিত। হিন্দু মুসলমানে আর ঐক্যে কাজ নাই। হিন্দু যদি মুসলমানের সাহায্য ব্যতীত নিজের উন্নতি সাধন করিতে না পারে, তবে আমরা উন্নতি চাহি না।

রসের কথা এই, যে গোটা কত হিন্দু টিকি মুসলমানের দাড়ির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কাশীর রাজা, ভিঙ্গার রাজা, রাজা শিবপ্রসাদ কংগ্রেসের

বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত। ফলে শুধু দাড়ি নয়, টিকিও নড়ে। যে তিনটি নাম করিলাম, তিনটিই রাজা। লোকের মনে থাকে যেন, রাজা হইলে মধ্যে মধ্যে সং দিতে হয়।

***

আমরা একটা অতি আবশ্যক সংবাদ দিব। বিলাত হইতে এ দেশে জিনিস আসিলে তার একটা আমদানী শুল্ক দিতে হয়। মাঞ্চেষ্টরের তাঁতি গায়ের জোরে শুল্কের হাত এড়াইয়াছে, আর এড়াইলেন উনিশতোপী রাজগণ। বিলাত হইতে অতঃপর ইঁহাদের কোন দ্রব্যাদি আসিলে তাহার না কি আর মাসুল লাগিবে না। একুশতোপীদের বেলায় মালের সঙ্গে কিছু কিছু দস্তুরিও পঁহুছিলে ভাল হয় না?

***

জর্ম্মনির নবীন সম্রাট তৃতীয় উইলিয়ম দলীলপত্র না পাওয়ায় মায়ের সহিত বিষম ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন জামাতাকে দেখিতে জর্ম্মনি গিয়াছিলেন, তখন তিনিই না কি সে গুলি সঙ্গে আনিয়াছেন। উইলিয়ম, বিসমার্কের প্রিয় শিষ্য; বিসমার্ক ত ইংরাজের উপর কেমন প্রসন্ন!

***

এ দিকে মিষ্টর ডবলিউ, সি, বানরজি—হায় রে হিন্দু নাম!—বিলাতে গিয়া দাদাভাই নৌরজির যোগে কংগ্রেসের কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত। কাজটা এই—আমাদিগের কি দুঃখ, আমরা কি চাই, তাহা পার্লিমেণ্টে দাঁড়াইয়া কেহ বলা চাই, কেন না পার্লিমেণ্ট ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। পার্লিমেণ্টই প্রকৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা। ফসেট সাহেব দয়া করিয়া ভারতবর্ষের এই উপকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকৃত পক্ষে এ ভার আর কেহ গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণে মিষ্টর বানরজি ও দাদাভাই ব্রাড্‌লা সাহেবকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন।

স্থূল কথা এই যে, কংগ্রেস ভারতবর্ষে বসিয়া গলাবাজি করেন, ব্রাড্‌লা সাহেবকে এখন সেখানে গলাবাজি করিতে হইবে। প্রত্যুত্তরে সার জন গষ্ট প্রভৃতি কিছু গলাবাজি করিবেন। এইরূপ গলাবাজিতে গলাবাজিতে আমাদের উন্নতিসাধন হইবে।

গলাবাজিতে হীরা মালিনীর মত কেহ ছিল না। হীরা মালিনী বলিয়া গিয়াছে, "পরের ছেলে, কথায় টেলে, রাখবে কত দিন?" সেই কথাটা এখন ভাল ইংরেজিতে সাজাইয়া গুছাইয়া পার্লিমেণ্টে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে। ইহাই কংগ্রেস ও ব্রাড্‌লা সাহেবের উদ্দেশ্য।

বোম্বাই সিবিলিয়ান মিঃ আর্থার ক্রফোর্ডকে লইয়া ত দুই মাসেরও অধিক কাল গোলযোগ চলিয়াছে। ক্রফোর্ড এক জন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, মধ্যপ্রদেশের কমিশনর, তাঁহার উপর অভিযোগও তদুপযুক্ত উচ্চ অঙ্গের বটে। জুলুম জবরদস্তি করা, ধার কর্জ্জ লওয়া এ সকল ছোট কথা, তিনি এরূপ অপরাধে অপরাধী নহেন—তাঁহার উপর উৎকোচগ্রহণের দাবী। ইহার উপর সাহেবের আরও একটু প্রশংসার কথা আছে। তিনি "আগতন্তু ভয়ং বীক্ষ্য" পাকা গোঁপ, পাকা দাড়ি পরিয়া গুপ্তবেশে চম্পট দিয়া "প্রতিকুর্য্যাৎ যথোচিতম্" করিতেছিলেন। কিন্তু পারিলেন না। পুলিস বরাবর তাঁহার সঙ্গ লইয়া অবশেষে সময় বুঝিয়া তাঁহাকে ধৃত করে। পরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ফৌজদারি সোপর্দ্দ করিলেন। তার পর গবর্ণমেণ্ট বলিলেন, আমরা মোকদ্দমা চালাইব না। মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলেন। ক্রফোর্ড সাহেব বলিলেন, "না, না, মোকদ্দমা চালাইতেই হইবে। ফৌজদারীতে কি করিবে আমার কর।" এ রঙ্গ রহস্য নূতন প্রকার বটে, কিন্তু সেটা চুকিয়া গেল। এখন কমিশন বসিয়াছে। কমিশন একটা বিলাতী জিনিস; ইংরেজ যখন দেখেন, কিছু একটা করা চাই, অথচ নিতান্ত ইচ্ছা যে কিছু না হয়, তখন একটা কমিশন বসান। "Deccan Mining Commission," "Public Service Commission" ইহার উদাহরণ। ছাগলের যেমন লড়াই না করিলেই নয়, অথচ লড়াই বড় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় করিতে হইবে, ইংরেজি কমিশনটা সেইরূপ জিনিস। কমিশন

বসিল, ভালই হইয়াছে। ভরসা করি, কমিশন ক্রফোর্ড সাহেবের প্রতি একটু কৃপা-কটাক্ষ করিবেন। কেন না ক্রফোর্ড সাহেব প্রাচীন, বোধ করি, অনেক দিনের অভ্যাস! এক জন বুড়া চোর, ধরা পড়িলে পাড়ার লোকে তাহাকে বড় মারপিট করিতেছিল। চোর বলিল, "মার কেন, বাপু?" প্রহারকারীরা বলিল, "বেটা, তুই চোর!" চোর বিরক্ত হইয়া বলিল, "ভারি অন্যায় দেখিতে পাই। আমি এই কাজ করিতে করিতে বুড়া হইয়া গেলাম, দাড়ি গোঁপ পাকিল, দাঁত পড়িল, এখন বলে চোর! এত দিনের পর তোমাদের কথায় আমি তপস্যা করিতে যাব না কি?" ভরসা করি, ক্রফোর্ড সাহেবও সেইরূপে জবাব দিতে পারিবেন।

এত গেল এক দফা তুষারমণ্ডিত উন্নত পর্ব্বতপ্রবাহী দামোদরের কথা। আবার নদ নদীর করদও থাকে ত? হনুমন্ত রাও না কি দামোদরের সেইরূপ একটি করদ। তিনি রাজ্যের জল বুকে করিয়া আনিয়া এই দামোদরে ঢালিয়া দিতেন। আকর ও পদের গুণে ক্রফোর্ডের কমিশন বসিবে বটে, কিন্তু ততক্ষণ প্রকাশ্য ফৌজদারি আদালতে হনুমন্তের প্রাণান্ত হইবার ত আর কিছু আপত্তি নাই? হনুমন্তের বিচার হইয়া গিয়াছে। জজ রায়ে প্রকাশ করিয়াছেন, ক্রফোর্ড সাহেবকে দিবার নিমিত্ত হনুমন্ত দবীরের নিকট ৩ হাজার টাকা ঘুষ লইয়াছেন! বিচারে হনুমন্তের এক হাজার টাকা অর্থ-দণ্ড হইয়াছে এবং এক বৎসর বিনা পরিশ্রমে কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা দিয়া বাকি ২ হাজার টাকার কিনারা করা হইয়াছে। অন্য অভিযোগেও হনুমন্ত এরূপে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহার জন্য হনুমন্তের এই হনু-মন্ত খাটুনি, তাঁহার ভাগ্যে কমিশন মাত্র। ইহা প্রাচীন নজির অনুসারেই হইয়াছে। লঙ্কা-দাহের অপরাধটা খোদ হনুমান্জীর, তাঁর ভাগ্যে কদলি;— মুখ পুড়িল যত বাজে বাঁদরের।

৪র্থ খণ্ড]　　১২৯৫　　[৭।৮ সংখ্যা

প্রচার

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্যবিষয়; তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্ হও। ৪৫ ॥

এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুবাদে তাহার কিছুই পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, "ত্রৈগুণ্যবিষয়" কি? সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিগুণ; ইহার সমষ্টি ত্রৈগুণ্য। এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে। সেই সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশয়িতব্য (Subject) তাহাই "ত্রৈগুণ্যবিষয়।" সংসারই বেদের বিষয়, এইজন্য বেদ সকল "ত্রৈগুণ্যবিষয়।"

শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ।" ইহাও একটু বেদনিন্দার মত শুনায়। অতএব শঙ্করের টীকাকার আনন্দগিরি প্রমাদ গণিয়া সকল দিক্ রক্ষায় রাখিবার জন্য লিখিলেন "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে। তদভ্যাসবতাং তদনুষ্ঠানদ্বারা সংসারধ্রৌব্যাৎ বিবেকা-

বসয়োঽস্তীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ "এখানে বেদ শব্দের অর্থে কর্ম্মকাণ্ড বুঝিতে হইবে। যাহারা তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান দ্বারা সংসারধ্রৌব্য হেতু বিবেকের অবসর থাকে না।" বেদের কতটুকু কর্ম্মকাণ্ড, আর কতটুকু জ্ঞানকাণ্ড, সে বিষয়ে কোন ভ্রম না ঘটিলে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই।

শ্রীধর স্বামী বলেন, "ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যে অধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ"। এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদক হিতলাল মিশ্র বুঝাইয়াছেন যে "ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম অধিকারিদিগের নিমিত্তই (!) বেদ সকল কর্ম্মফল সম্বন্ধে প্রতিপাদক হয়েন।" এবং শ্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এই শ্লোকার্দ্ধের অনুবাদ করিয়াছেন যে—"বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফল প্রতিপাদক।" অন্যান্যেও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

উভয় ব্যাখ্যা মর্ম্মতঃ এক। সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে "হে অর্জ্জুন! বেদ সকল সংসার-প্রতিপাদক বা কর্ম্মফল প্রতিপাদক। তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ে বা কর্ম্মফল বিষয়ে নিষ্কাম হও।" কথাটা কি হইতেছিল স্মরণ করিয়া দেখা যাউক। প্রথমে ভগবান অর্জ্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া তৎপরে কর্ম্মযোগ বুঝাইবেন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই। কেন না, কর্ম্ম সম্বন্ধে যে একটা গুরুতর সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ছিল, (এবং এখনও আছে) প্রথমে তাহার নিরাস করা কর্ত্তব্য। নহিলে প্রকৃত কর্ম্ম কি, অর্জ্জুন তাহা বুঝিবেন না। সে সাধারণ ভ্রম এই, যে বেদে যে সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-প্রথা কথিত ও বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্ম। ভগবান বুঝাইতে চাহেন যে ইহা প্রকৃত কর্ম্ম নহে। বরং যাহারা ইহাতে চিত্তনিবেশ করে, ঈশ্বরারাধনায় তাহাদিগের একাগ্রতা হয় না। এজন্য প্রকৃত কর্ম্মযোগীর পক্ষে উহা কর্ম্ম নহে। এই ৪৫শ শ্লোকে সেই কথাই পুনরুক্ত হইতেছে। ভগবান বলিতেছেন, যে বেদ সকল, যাহারা সংসারী অর্থাৎ সংসারের সুখ খোঁজে তাহাদিগেরই

অনুসন্ধানীয়। তুমি সেরূপ সাংসারিক সুখ খুঁজিও না। ত্রৈগুণ্যের অতীত হও।

কি প্রকারে ত্রৈগুণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অর্দ্ধে তাহা কথিত হইতেছে। ভগবান বলিতেছেন—তুমি নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও এবং আত্মবান্ হও। এখন এই কটা কথা বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয়।

১। নির্দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিকে দ্বন্দ্ব বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। যে সে সকল তুল্য জ্ঞান করে সেই নির্দ্বন্দ্ব।

২। নিত্যসত্ত্বস্থ - নিত্য সত্ত্বগুণাশ্রিত।

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত—যাহা অপ্রাপ্ত তাহার উপার্জ্জনকে যোগ বলে, আর যাহা প্রাপ্ত তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে। অর্থাৎ উপার্জ্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা তদ্রহিত হও।

৪। আত্মবান্—অথবা অপ্রমত্ত।*

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥

এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টীকার ভিতরে অনুবাদ

* আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূলসঙ্গত বোধ হইয়াছে আমি সেইরূপ অর্থ করিলাম। কিন্তু যাঁহারা বেদের গৌরব বজায় রাখিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিতে চান, তাঁহারা কিরূপ বুঝেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ বাবু কেদারনাথ দত্ত কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থই গ্রহণ করিবেন।

"শাস্ত্র সমূহের দুই প্রকার বিষয়—অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টি যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করে, সেই বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। অরুন্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সেস্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্থূল তারা, তাহাই নির্দ্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদ সমূহ নির্গুণ তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করে, কিন্তু নির্গুণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই জন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তম রূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণতত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব লাভ করতঃ নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদ শাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমগুণাত্মক কর্ম্ম, কোন স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্গুণ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ করতঃ কর্ম্মজ্ঞানমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিযোগ সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর।"

পাওয়া যাইবে। কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে দুই একটা আপত্তি ঘটে; সে সকলের মীমাংসা না করিয়া অনুবাদ দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত নহে।

আমি এই শ্লোকের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব।

প্রথম। যে ব্যাখ্যাটি পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাদির অনুমোদিত, তাহাই অগ্রে বুঝাইব।

দ্বিতীয়। আর একটি নূতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাঁহার বিচার জন্য উপস্থিত করিব। সঙ্গত বোধ না হয়, পাঠক তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অনুবাদকেরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইব।

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই :—

১ম। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ। ইংরেজি অনুবাদকেরা এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না।

২য়। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। এই ব্যাখ্যা নূতন।

৩য়। উদপানে যাবানর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবানর্থঃ। এবং সর্ব্বেষু বেদেষু যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত।

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যায় নাই; তদভাবে যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন তাঁহাদের অসুবিধা হইতে পারে, এজন্য প্রচলিত ব্যাখ্যার উদাহরণ স্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলাল মিশ্র কৃত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যাহা হইতে জলপান করা যায় তাহা উদপান শব্দে বাচ্য, অর্থাৎ পুষ্করিণী এবং কূপাদি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু সেই সেই সমস্ত কূপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্ পৃথক্ যে প্রকার স্নান পানাদি প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সে সমুদায় প্রয়োজন, সংপ্লুতোদক শব্দবাচ্য এক মহাহ্রদে একত্র যেমন নির্ব্বাহ হইতে পারে, তদ্রূপ

সমস্ত বেদে কথিত যে কর্ম্মফলরূপ অর্থ, তাহা সমুদায়ই ভগবদ্ভক্তিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির তদ্দ্বারাই সম্পন্ন হয়।"

শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের পথিক হইয়াছেন। শ্রীধর কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি। তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাত্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থ স্তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব।"

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় অনেকগুলিন পরিভ্রমণ করিলে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহ্রদেই তাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। সেইরূপ, সমস্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠায় তাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।"*

আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই ব্যাখ্যা বুঝিতে গিয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছি, প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগের পাদপদ্মবন্দনাপূর্ব্বক আমি তাহা নিবেদন করিতেছি। যে আপনার সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। এবং জন্মিবারও সম্ভাবনাও নাই।

* শঙ্করাচার্য্য ব্যবহৃত ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যোঽর্থো যৎ কর্ম্মফলং সোঽর্থো ব্রাহ্মণস্য সন্ন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতো যোঽর্থ যৎ বিজ্ঞানফলং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিংস্তাবানেব সংপদ্যতে ইত্যাদি। ইহার ভিতর অঙ্ক যে কল কৌশল থাকে, তাহা পশ্চাৎ বুঝাইব। সম্প্রতি "সর্ব্বেষু বেদেষু" ইহার যেরূপ অর্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, তৎপ্রতি পাঠককে মনোযোগ করিতে বলি। "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থ "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু।" যে কারণে আনন্দগিরি বলিয়াছেন "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে," সেই কারণে ইনিও বলিয়াছেন, "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থে "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু।"

'যাবৎ,' 'তাবৎ' শব্দ পরিমাণ বাচক। কিন্তু কেবল যাবৎ বলিলে কোন পরিমাণ বুঝা যায় না। একটা যাবৎ থাকিলেই, তার একটা তাবৎ আছেই। একটা তাবৎ থাকিলেই তার একটা যাবৎ আছেই। এমন অনেক সময়ে ঘটে, যে কেবল "যাবৎ" শব্দটা স্পষ্ট, তাহার পরবর্ত্তী "তাবৎ" কে বুঝিয়া লইতে হয়; যথা—"আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও।" ইহার প্রকৃত অর্থ "আমি যাবৎ না আসি (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও।" অতএব স্পষ্টই হউক, আর উহ্যই হউক, যাবৎ থাকিলেই তাবৎ থাকিবে। তদ্রূপ তাবৎ থাকিলেই যাবৎ থাকিবে।

এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর যাহার সঙ্গে তাবৎ থাকে, উভয়ের পরিমাণ এক বা সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব যাবৎ তাবৎ থাকিলে দুইটি তুল্য বা তুলনার বস্তু আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। "আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও" ইতি বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে "আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবস্থিতি কাল, উভয়ে সমান হইবে।" এখানে এই দুইটি সময় তুল্য বা তুলনীয়।

এইরূপ যেখানে একটি যাবান্ আর একটি তাবান্ আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। যদি তার পর আবার যাবান্ তাবান্ দেখি, তবে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে আবার আরও দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। ইহার অন্যথা কদাচ হইতে পারে না।

এখন, এই শ্লোকের মূলে মোটে একটি যাবান্ আর একটি তাবান্ আছে; অতএব বুঝিতে হইবে দুইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে অর্থাৎ, (১) উদপানে বা সঙ্কীর্ণ জলাশয়ে অবস্থা বিশেষ যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন (২) সমস্ত বেদে অবস্থা বিশেষে তাবৎ প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন টীকাকারদিগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখি যে দুইটা যাবান্ এবং দুইটা তাবান্।* অতএব বুঝিতে হইবে যে প্রথমে দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইলে 'পর, আবার দুইটা বস্তু পরস্পর

* বড় বড় অক্ষরে এই চারিটা শব্দ ছাপিয়াছি, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।

তুলিত হইয়াছে। প্রথম, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত না হইয়া, মহাহ্রদের সঙ্গে তুলিত হইতেছে। তার পরে আবার সমস্ত বেদ সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কোন অর্থবিপর্য্যয় ঘটিতেছে কি না?

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর, যে কোন অর্থবিপর্য্যয় ঘটিতেছে না। কেন না, যাবান্ তাবান্ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়া লইতে হয়; তাহার উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। এ কথার এখানে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হইতেছে।

প্রথম আপত্তি এই। মানিলাম যে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু যাবান্ কাটিয়া তাবান্ করিতে, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিতে পারেন কি? আমি যদি বলি, আমি যাবৎ না আসি তুমি এখানে থাকিও, তাহা হইলে ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়া 'তাবৎ তুমি এখানে থাকিও' বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ করেন, যদি বলেন যে এই বাক্যের অর্থ 'আমি তাবৎ না আসি যাবৎ তুমি এখানে থাকিও' তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে।

আরও একটা উদাহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক।

"যাবৎ তোমার জীবন, তাবৎ আমার সুখ।" (ক)

এই বাক্যটি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তার পর, উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ কর। তাহা হইলে বাক্য এইরূপ দাঁড়াইতেছে।

"তাবৎ তোমার জীবন, যাবৎ আমার সুখ।" (খ)

এখন দেখ বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিল। (ক)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ যে "তুমি যতদিন বাঁচিবে, ততদিনই আমি সুখী, তার পর আর সুখী হইব না। (খ)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ "যতদিন আমি সুখী থাকিব ততদিনই তুমি বাঁচিবে, তার পর আর তুমি বাঁচিবে না।" অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিল।

অতএব টীকাকার, কখনও যাবান্ কাটিয়া তাবান্, তাবান্ কাটিয়া যাবান্

করিবার অধিকারী নহেন। কিন্তু এখানে টীকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বুঝিবার জন্য শ্লোকের চারিটি চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ গ, ঘ, চিহ্ন দেওয়া যাক্। তাহা হইলে শ্লোকস্থ "যাবানের" গায়ে (ক) এবং "তাবানের" গায়ে (গ) চিহ্ন পড়িতেছে।

(ক) যাবানর্থ উদপানে

(খ) সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে

(গ) তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু

(ঘ) ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

তদ্ব্যাখ্যায় টীকাকার করিয়াছেন—

(ক) যাবানর্থ উদপানে

(খ) তাবান্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে

(গ) যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু

(ঘ) তাবান্ ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

এক্ষণে পাঠক (গ)তে (গ)তে মিলাইয়া দেখিবেন তাবান্ কাটিয়া যাবান্ হইয়াছে কি না।*

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন মতে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে বসাইতে পারেন কি? যেখানে নূতন যাবান্ তাবান্ না বসাইয়া লইয়া সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়, সেখানেও কি যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে হইবে? এখানে কি নূতন যাবান্ তাবান্ না বসাইলে অর্থ হয় না? হয় বৈ কি। বড় সোজা অর্থই আছে।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

ইহার সোজা অর্থ আমি এইরূপ বুঝি;—

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ।

---

* সত্য বটে, শঙ্করাচার্য্য তাবান্ শব্দের স্থানে যাবান্ শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে "যৎ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই এক কথা।

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন।

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন ঋষিতুল্য ভাষ্যকার টীকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয়, যে তাঁহারা এই অর্থের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি করিয়াছেন এবং অতিশয় দূরদর্শী দেশকালপাত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই এই সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। দুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কি? সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে? কোন প্রয়োজনই থাকে না। কেন না, সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত—সকল ঠাঁইই জল পাওয়া যায়। ঘরে বসিয়া জল পাইলে কেহ আর বাপী কূপাদিতে যায় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে সমস্ত বেদে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এখন, বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজের শিষ্য, আমরা না হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে পারিতেন? বেদ স্বয়ম্ভূব, অপৌরুষেয়, নিত্য, সর্ব্বফলপ্রদ। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা বেদকেই একটা ঈশ্বর স্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতি বা শাক্যসিংহ প্রভৃতি যাঁহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করাচার্য্য কি শ্রীধর স্বামী হইতে এমন উক্তি কখন সম্ভবে না যে, ব্রহ্মজ্ঞানীই হউক বা যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ নিষ্প্রয়োজনীয়। কাজেই তাঁহাদিগকে এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে বুঝায় যে ব্রহ্মজ্ঞানেও যা বেদেও তা, একই ফল। তাহা হইলে বেদের মর্য্যাদা বাহাল রহিল। শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান অতি তুচ্ছ। এক্ষণে সেই "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থে "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু" "বেদ শব্দেনাত্র কর্ম্ম কাণ্ডমেব গৃহ্যতে।" ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। প্রাচীন টীকাকার দিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে পাঠকের বিচার্য্য এই যে দুইটা ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মূল কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে হয় না, যেমন আছে তেমনি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই। আর একটা ব্যাখ্যার জন্য কিছু নূতন কথা বসাইয়া কিছু কাটকুট করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমস্ত টীকাকার, ভাষ্যকার ও অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে। কোন্ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত? আমার কোন দিকেই অনুরোধ নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছি সেইরূপ বুঝাইলাম। দুই দিকই বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন। অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জন্য আরও কিছু বলা যাইতে পারে, কিন্তু ততটা প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখা যায় না। বৈদিক ধর্ম্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা বুঝিলেই হইল। সে সম্বন্ধ কি পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি।

তৃতীয়; ইংরাজি অনুবাদকেরা এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানার্থঃ এরূপ না বুঝিয়া তাঁহারা বুঝেন সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ "সংপ্লুতোদকে" পদ "উদপানের" বিশেষণ মাত্র। অন্য ইংরাজি অনুবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে। তিনি এই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

"To the instructed Brahmana there is in all the Vedas as much utitily as in a reservoir of water into which waters flow from all sides."

দুঃখের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না। কিছু তাৎপর্য্য নাই। অনুবাদকও তাহা অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের একটি টীকা লিখিয়া তাহাতে বলিয়াছেন—

"The meaning here is not easily apprehended. I suggest the following explanation:—Having said that the Vedas are concerned with actions for special benefits, Krishna compares them to a reservoir which provides water for various special purposes drinking, bathing &c. The Vedas similarly prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven, or destroying an enemy, &c. But,

says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires forthe special benefits named."

তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অনুবাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে Davis ও Thomson প্রভৃতি সাহেবেরা তেলাঙ্গের ন্যায় অর্থ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু একটু টীকা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে। Thomson কৃত টীকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"As a tank full of fresh water may be used for drinking, bathing, washing one's clothes, and numerous other purposes, so the text of the Vedas may be turned to any object of self-interest by a Brahman who is well aequainted with them and knows how to wield them. We may exemplify this general fact by the uses made of texts from our scriptures in the mouths of the Puritans on the one hand, and of the Cavaliers on the other. Our author must not, however, be understood to reject the use of the Vedas by what he here says. He merely advises a careful use of them. Kapila himself admits them as a last source of proof of the truth when others fail."

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গীতার মর্ম্মার্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তবে "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য" ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়াই স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে পারি বা না পারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের যে সকল মহদ্বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিবেন এমত ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুন বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই নিবেদন করি, যে ইংরেজের কাছে, যেন গীতার্থ বুঝিবার জন্য না যান। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতানুবাদ পড়িতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি। এবং সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যই এতটা ইংরেজি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রবাদ আছে যে পুরাণাদি প্রণয়ণের পর ব্যাসদেব একদিন সমুদ্রতীরে উপবেশন করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রের বৃহৎ বৃহৎ উর্ম্মি-মালার মত তাঁহারও মানস-সমুদ্রে গুরুতর চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন, বলেন—প্রভু, জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের দুর্ব্বোধ্য বেদোক্ত ধর্ম্মকে সহজ করিয়া প্রচার করিয়াছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়া পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে বুঝি আমার কর্ত্তব্য কিছুই করা হয় নাই, অথচ আর আমি কি করিব নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এই জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে—অশান্ত মনে সমুদ্রতীরে আসিয়াছি—দেব! কোথায় আমার কর্ত্তব্যের ক্রটি হইয়াছে, আরও আমার কি কর্ত্তব্য বাকি আছে, নির্দ্দেশ করিয়া আমার এই অশান্ত মনে শান্তি প্রদান করুন। "ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন ভক্তি জগতে প্রচার কর" এই উপদেশ দিয়া দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন। কথিত আছে যে ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদ্গীতা প্রণয়ণ করেন, আরও দুই এক খানি পুরাণে ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত গীতার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল*, অনুমান করেন।

গীতা ও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ। ব্যাসদেব বুঝিয়াছিলেন ভক্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য, পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

* ধর্ম্মতত্ত্ব ১২৭ ও ৩৩৭ পৃঃ দেখ।

বঙ্কিম বাবু কৃত ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থের ১১টি অধ্যায় (১০ম হইতে ২০শ পর্য্যন্ত) এই ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইতে নিঃশেষিত হইয়াছে। "ভক্তি হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। ইহা পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতি জন্য"।* যখন মনুষ্য-হৃদয়ে ভক্তি প্রবল হয়, অর্থাৎ "মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তি গুলি ঈশ্বরমুখী হয়" তখন মানব-হৃদয়ে কোন প্রকার সংগ্রাম থাকে না। দেববৃত্তি পশুবৃত্তিকে পরাজিত করিয়া দাসভাবে কার্য্য করাইতে থাকে। মনুষ্য তখন কাল অতিক্রম করিয়া যায়, বিনাশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। কেহ "কর্ম্মমার্গ" কেহ বা "জ্ঞানমার্গ" দ্বারা এই ভক্তি যোগ সাধন করিয়া থাকেন। সংসারে ভক্তের সংখ্যা অল্প হইলেও একবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। একটি ভক্তের জীবন, এক একটি প্রতিভাশালী মহাপুরুষের জীবন, কোটি কোটি সাধারণ মনুষ্যজীবনের সমান। একটির রক্ষায় কোটি কোটি জীব অমরতা লাভ করে। বাল্মীকি ব্যাস, হোমার, এস্কিলস, কপিল, ডাণ্টে, প্লেটো, গৌতম, এরিষ্টটল, মিল্টন, সেক্ষপিয়ার, কালিদাস, গেটে, শিলার, ক্যাণ্ট, হেগেল, যিশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য—ইহারা কি মৃত? ইহারা কালের আক্রমণ অতিক্রম করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। পৃথক্ পৃথক্ পথ ধরিয়া ইহারা সকলেই প্রকৃতির লীলাময়ী সন্তাপহারিণী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন। কাল এখানে প্রকৃতির সংগ্রামে পরাস্ত। কাল ইহাদিগকে বিনাশ করিতে পারে নাই "কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু" ইহাদের পক্ষে খাটে না। কাল ইহাদিগকে "পাক" করিতে পারে না, ইহাদের অবস্থান্তরও সম্ভব নহে।

শতাধিক বৎসরব্যাপী এক এক জাতির বৃত্তির অনুশীলনের ফল এক একটি প্রতিভাশালী ব্যক্তি। যদি কোন অন্ধকার রাত্রিতে শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক জ্বালিয়া দেওয়া যায় এবং উহারা এরূপ ভাবে জ্বলিতে থাকে যে একটি দেখিলে অন্য একটি দেখা যায় না; যদি কেহ এমন স্থানে উঠিতে পারেন যেখান হইতে সমস্ত আলোক লক্ষ্য করা যায়—যদি তিনি বিক্ষিপ্ত আলোকমালা একত্র করিতে পারেন তবে হয় ত সেই আলোকে রজনীর অন্ধকার দূর হয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তি যুগ ধরিয়া এইরূপ জ্ঞানালোক সংগ্রহ করিবা সেই সংগৃহীত আলোক-মালা হৃদয়ে জ্বালিয়া সংসারে অবতীর্ণ

হন। তাঁহার অনন্ত জীবন দিয়া এমন কি জড় পদার্থকেও জীবিত করিয়া তুলেন।*

আবার ইহাদের এক এক জনের জীবনে কোটি কোটি জীব জন্তু জীবিত, কোটি কোটি সৃষ্ট পদার্থ অবিনশ্বর। সেক্ষপিয়ারের জীবন দেখ। ব্রহ্মাণ্ডের মত এ জীবন অনন্ত। এখানে সু কু, সুখ দুঃখ, পুরুষ স্ত্রী, প্রণয় ঘৃণা, সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্য, পুষ্প, বিদ্যুৎ, জীবন মৃত্যু, ঝড় তুফান, দেবযোনি প্রেতযোনি, পর্ব্বত সাগর, আকাশ, নক্ষত্র, চেতন অচেতন সমস্তই রহিয়াছে। এখানে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, বীর কাপুরুষ, সুন্দরী, হত্যাকারী, এরিয়ান, ক্যালিবেন, ভূত, পরি, স্বর্গ নরক সকলি রহিয়াছে।† একের রক্ষায় কত কোটি জীব অমরত্ব লাভ করিয়াছে, কত কোটি কোটি সৃষ্ট পদার্থ কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। এজন্য বলিতেছিলাম "ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা" "কা চ বার্ত্তা" প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর নহে।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে মনুষ্যহৃদয়ে কাল ও প্রবৃত্তির সংগ্রাম কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে কাল কি বিবেচনা করা উচিত।

সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ জগতের প্রধান ক্রিয়া। সৃষ্টি ও স্থিতিকে প্রকৃতির ক্রিয়া এবং বিনাশকে কালের ক্রিয়া বলা হইয়াছে।

ঈশ্বর এক। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় একের ক্রিয়া। এক হইয়াও তিনি আমাদের পক্ষে তিন।

* Blushed—to sweet sweet life, the marble grown
* * * * *
How fair was then the flower—the tree
How silver sweet the mountain's face
The soulless had a soul to me
My life, its own life lent to all.
Schiller.

† Shakespere is as great as creation and what is creation? It is good and evil, joy and sorrow, man and woman, eagle and vulture, bees and drone, love and hate, beauty and its ugliness, high and low. The antithesis of Skakespere is universal, always and everywhere. It is life and death, angel and demon, flower and lightning, ocean and envy, hurricane and whistle. *Victor Hugo.*

ঈশ্বর অসীম অনন্ত। সীমাবদ্ধ জীব পূর্ণ ঈশ্বরের ক্রিয়া অনুভব করিতে অসমর্থ ইহাই তাহার সঙ্কীর্ণতা, ইহাই তাহার অসম্পূর্ণত্ব।

মনুষ্য এক সময়ে দুটি বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে না। পাখীর গান এবং পুষ্পের আঘ্রাণ এক সময়ে মানব মনে সমান স্থান অধিকার করিতে পারে না। যখন একটি বিষয় চিন্তা করি, তখন অন্য বিষয় বিস্মৃত হই। এই সঙ্কীর্ণতার জন্য মনে করি যিনি এক সময়ে কোন জননীর হৃদয়ে পুত্রস্নেহ উৎপাদন করিয়া তাহাকে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করাইতেছেন, তিনি ঠিক সেই সময়ে অন্য মাতার ক্রোড় হইতে সন্তানরত্ন অপহরণ করিয়া কিরূপে তাহাকে যমযন্ত্রণায় জ্বালাতন করিতে পারেন! মনুষ্য মনের অহঙ্কার করিয়া থাকে, এই মনের সাহায্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্য্যবেক্ষণ করিতে চায়, কিন্তু এক সময়ে দুটিমাত্র ক্রিয়াও ধারণা করিতে সক্ষম নহে! আর তুমি? অনন্ত মন! অনন্ত শক্তি! এক নিমেষে অনন্ত ক্রিয়া করিতে করিতে তুমি কোথায় চলিয়াছ? একই সময়ে অনন্ত মনের সহিত অনন্তভাবে ক্রীড়া করিতে করিতে কোথায় ছুটিয়াছ? এক সময়ে কোটি কোটি মনে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন ক্রিয়া কিরূপে ধারণা করিতেছ? যে মুহূর্ত্তে তুমি—সুকৃত সন্তান জননীর লালন পালন ভারে অতি ক্লান্ত হইয়া তাঁহাকে পৃথক স্থানে রাখিয়া পৃথক্ আহারাদির পন্থা খুলিতেছ, সেই মুহূর্ত্তে হয় ত স্নেহময়ী জননী সাক্ষাৎ ভগবতীর মত জগৎজননীর পদে তোমারই কল্যাণার্থ অর্ঘ্য দিতেছেন। যে মুহূর্ত্তে প্রণয়িণী-প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া, বিদেশে বসিয়া তুমি তাহার বিরহযন্ত্রণা স্মরণ করিয়া দুঃসহ যাতনা অনুভব করিতেছ, সেই মুহূর্ত্তে হয় ত সোহাগিনী স্ত্রী তোমার অন্যের সহিত রহস্যালাপে স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছে। যে মুহূর্ত্তে তুমি সংসার-শঙ্কটে জর্জ্জরিত হইয়া অতি ব্যাকুল হৃদয়ে জগন্মাতার মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া উৎপীড়িত মনে শান্তিলাভ করিতেছ, সেই মুহূর্ত্তে হয় ত কোন বক্তা সভাগৃহে তারস্বরে তোমার শান্তিদায়িনীকে সবলে কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ করিতেছে। যে মুহূর্ত্তে তুমি তোমার ক্ষুদ্র পরিবারের সুশৃঙ্খলা করিতে গিয়া হতাশ হইয়া মৃত্যু কামনা করিতেছ, সেই মুহূর্ত্তে হয় ত কোন সমাজবিৎ শত সহস্র পরিবারের কুশলোপায় উদ্ভাবন করিয়া নৃত্য করিতেছে, হয় ত কোন দেশহিতৈষী শত সহস্র সমাজের হিতকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করিতেছে,

হয় ত কোন রাজমন্ত্রী সমস্ত মানবজাতির মঙ্গল-পথ অঙ্কিত করিয়া দিতেছে। হয় ত কোন যোগী সেই মুহূর্ত্তে অনন্ত প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া ভগবানের সন্দর্শন করিতেছেন, আর মানবের দুরাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। হয় ত সেই মুহূর্ত্তে কোথাও একটি লতিকা বহুদিনের পর একটি মাত্র ফুল ফুটাইয়া আপনি দেখিতেছে আপনি বিভোর হইতেছে, হয় ত কোথাও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে কোটি কোটি তরু লতা, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, নর বানর অগ্নিমুখে ভস্মসাৎ হইয়া যাইতেছে। অনন্ত শক্তি! তোমার এ অনন্ত ক্রীড়া কে বুঝিবে? অনন্ত ঈশ্বরের কার্য্যও অনন্ত। অনন্ত কার্য্য এক সময়ে চিন্তা না করিলে পূর্ণ ঈশ্বর চিন্তা করা হইল না। পূর্ণ ঈশ্বরচিন্তা মানব মনের সাধ্যাতীত। খ্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর কেবলমাত্র সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা। যিনি এত যত্নে জগৎ সৃজন করিলেন তিনিই আবার কিরূপে সংহার করিবেন? এই বিনাশের কর্ত্তা আর একজন। তিনি সয়তান। সয়তান ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। জোর করিয়া তাঁহার আদরের সংসার লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছে, তথাপি বিনাশশক্তি ঈশ্বরে অর্পিত হয় নাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্পূর্ণ অবস্থায় আজও উঠিতে পারে নাই।

হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর শুদ্ধ সৃজন ও পালন করিতেছেন বলিলে তিনি অসম্পূর্ণ। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তিনি সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিত, তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। তিনি এক হইয়াও আমাদের জন্য তিন।

একটি ক্রিয়ায় মনঃসংযোগ করিলে অন্য ক্রিয়া হইতে মন স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিবে। পুষ্পের গন্ধে মন একাগ্র করিলে, আপনা হইতে পুষ্পের বর্ণ, আকার প্রভৃতি হইতে মন বিচ্ছিন্ন হয়, নহিলে একাগ্রতা হইল না।*

এই সঙ্কীর্ণতা হেতু কালের পৃথক্ সত্বা কল্পনা হইয়াছে। এবং সুবিধার

* Kant recognises that abstraction is not the becoming unconscious of dissimilar elements but the concentration of consciousness on the similar—that is the essential thing in what is called the process of abstraction. *Ueberweg.*

জন্য এই প্রবন্ধে সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্রীকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মানবপ্রকৃতিতে যে সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই সংগ্রামে যাহার প্রবলতায় মনুষ্য পশুত্বে পরিণত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কালের ক্রিয়া বলা হইয়াছে ;—আর যাহার প্রবলতায় ভক্তি, প্রীতি, দয়া,—জ্ঞানের ক্রিয়া হইতে থাকে, তাহাকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

জড়প্রকৃতির কথা আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মানব-প্রকৃতি ও ক্রিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়, সংসার এক মহা সমরক্ষেত্র। সমষ্টিভাবে কিম্বা ব্যষ্টিভাবে—যেদিক দিয়া দেখ সৃষ্টির আদি হইতে এপর্য্যন্ত যেন এক এক মহাসমর চলিয়া আসিতেছে। সত্যযুগে দেবাসুরের যুদ্ধ, ত্রেতায় রাম-রাবণের যুদ্ধ, দ্বাপরে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ও কলিকালে উনবিংশ শতাব্দীর নানা সংগ্রাম পুরাণেতিহাসে সাক্ষ্য দিতেছে। এক একটি করিয়া মনুষ্য লও, সেখানেও দয়া দাক্ষিণ্য, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি দেবভাবের সহিত কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের সংগ্রাম। একের আধিপত্যে প্রকৃতির জয়, অন্যের আধিপত্যে কালের জয়।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয়, যেন কাল সর্ব্বত্র জয়ী,—যেন কালপুরুষ অদৃশ্য হস্তে জীবজন্তু তাড়াইয়া কোন এক রাজ্যে লইয়া চলিয়াছে। ঐ রাজ্যের নাম মৃত্যু। কাল আপনি তাহার রাজা। মানব জীবনপথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম ভিক্ষা করিতেছে; রোগে শোকে কাতর হইয়া, বন্ধু স্বজন-বিয়োগে ভগ্নহৃদয় হইয়া, শত সহস্র অভাবনীয় চিন্তাস্রোতে ওতঃপ্রোত হইতে হইতে মানব বলিতেছে—আর সহ্য করিতে পারি না, বৃশ্চিকবৎ চিন্তাদংশন হইতে আমায় রক্ষা কর! আমায় একটু বিশ্রাম করিতে দাও! কিন্তু বিরাম কোথায়? কে যেন শূন্যে শূন্যে বলিয়া উঠিতেছে—চল!

মানব সজলনয়নে কাতরবচনে বলিতেছে—সংসারে আমায় কেহ কি রক্ষা করিবার নাই? অসহায়ের সহায়, দীনের বন্ধু, দুর্ব্বলের বল, পীড়িতের প্রতিকারক, কাতরের ত্রাতা, কাঙ্গালের হরি কেহ কি নাই? যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি একবার দাঁড়াইতে পারি? আতুরের কাতরোক্তিতে কেহ কি কর্ণপাত করে না—কালের উৎপীড়ন হইতে কেহ কি ত্রাণ করে না?

করে বৈ কি? যখন জগৎ-সংগ্রামে কাঁদিতে কাঁদিতে, সংসারে ফকির হইয়া উর্দ্ধে হস্ত তুলিয়া কাহার কাছে যেন মর্ম্মবেদনা জানাইতে থাকি, কাহার আশ্বস্ত বাক্যের জন্য যেন হাপ্রত্যাশ করিয়া থাকি, কাহার পদপ্রান্তে যেন জ্বালাময় মস্তক লুকাইতে চাই—তখন কে আমায় আশ্বাসপ্রদান করে, কে আমার অন্তরের অন্তরে বসিয়া অভয় দেয়, কে আমার নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করে—কে আমার হইয়া সংহারকর্ত্তার সহিত সংগ্রাম করে? আমি কি তখন অসহায়?

তবে কালের প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের সহায় একজন আছে। কি জড় প্রকৃতি, কি মানবপ্রকৃতি, সর্ব্বত্রই ইহার হস্ত জীবগণকে রক্ষা করিতেছে। তবে কেমন করিয়া সংসারে সংহারমূর্ত্তির ক্রিয়াই গুরুতর?

যদি বলা যায় যে পরিণামে কালের জয় হইতেছে, ইহাও সঙ্গত নহে। যে একবার কালনাশিনী কালীর দেখা পাইয়াছে—কর্ম্মমার্গে জ্ঞানমার্গে অথবা ভক্তিমার্গে উঠিয়া যে একবার তাঁহার শরণ লইয়াছে, তাহার কি আবার কালের ভয়? প্রবন্ধের প্রথমেই আমরা ইহা দেখাইয়াছি।

যুধিষ্ঠির শোকে, দুঃখে, বিপদে অভিভূত—তাঁহার উত্তরটি তাঁহার অবস্থোচিত। যদি ভক্তিচক্ষে জগতের ক্রিয়া একবার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, তবে বোধ হয় কালের ক্রিয়াকে জগতের গুরুতর বার্ত্তা বলিতেন না।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার।

.যোগভাষ্য

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা। চিত্তস্য বৃত্তয়শ্চিত্তবৃত্তয়স্তাসাং নিরোধো যোগ ইত্যর্থঃ। সংশয়নিশ্চয়গর্ব্বস্মরণরূপবৃত্তিভেদেন চতুর্ব্বিধস্যান্তঃকরণস্য যাবল্লক্ষ্যমাণাঃ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতিরূপা বৃত্তয়স্তাসাং নিরোধো লয়াখ্যশ্চিত্তস্যৈব বহির্ম্মুখতয়া পরিণতিবিচ্ছেদাদন্তর্ম্মুখতয়া প্রতিলোমপরিণামেন স্বকারণরূপতয়া অবস্থানং যোগ ইত্যাখ্যায়তে। নিরুধ্যন্তে যস্মিন্ প্রমাণাদিবৃত্তয়োঽবস্থাবিশেষে চিত্তস্য সোঽবস্থাবিশেষো যোগ ইতি অবয়বার্থঃ ॥

তাৎপর্য্যার্থঃ। প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতিরূপ চিত্তের বৃত্তি সমস্ত প্রতিলোম অর্থাৎ বিপরীত ক্রমে যে অবস্থাবিশেষে লীন হয়, তাহাকে যোগ বলে। যেমন একই মানব ধর্ম্ম, কার্য্য বা সম্বন্ধভেদে সুন্দর, স্থূল, দীর্ঘ, পুরোহিত, উপদেষ্টা, পাচক, পিতা, পুত্র প্রভৃতি নানারূপে অভিহিত হয়, তদ্রূপ একই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে চতুর্ব্বিধ রূপে কথিত হয়; সংশয় বৃত্তিতে মনঃ, নিশ্চয় বৃত্তিতে বুদ্ধি, অভিমান বৃত্তিতে অহঙ্কার ও স্মৃতিরূপ বৃত্তিতে চিত্তরূপে অভিহিত হয়। "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরং। সংশয়োনিশ্চয়োগর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" এই অন্তঃকরণসামান্যের বিষয়াকারে প্রমাণাদি যে সমস্ত বৃত্তি কথিত হইবে, তাহার নিরোধ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ রূপে অন্তর্ধান করার নাম যোগ ॥

ভাষ্যম্

সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগইত্যাখ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং, প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টং ঐশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি। তদেব তমসানুবিদ্ধং অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেব প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতমানমনুবিদ্ধং

রজোমাত্রয়া ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেব রজোলেপমলাপেতং স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্ম্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি ; তৎ পরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। চিতিশক্তিরপরিণামিন্য প্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধাচানন্তা চ সত্ত্বগুণাত্মিকা চেয়ং, অতোবিপরীতা বিবেকখ্যাতি-রিত্যতস্তস্যাং বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি, তদবস্থং সংস্কারোপগং ভবতি, স নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ, ন তত্র কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়তে ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ। দ্বিবিধঃ সযোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি॥

ব্যাখ্যা। যোগ দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। অতএব যোগ লক্ষণের লক্ষ্যও দুইটি হইল। যদি সমস্ত লক্ষ্যে লক্ষণের প্রবেশ না হয়, তবে তাহাকে অব্যাপ্তি দোষ বলে। এইরূপ যদি কোন অলক্ষ্যে লক্ষণের গতি হয়, তবে তাহাকে অতিব্যাপ্তি দোষ বলে। সম্প্রজ্ঞাত যোগ অবস্থায় ধ্যেয়বিষয়াকারে চিত্তের সাত্ত্বিকী বৃত্তি থাকিয়া যায়, তাহার নিরোধ হয় না বলিয়া উক্ত যোগলক্ষণে অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা করিয়া ভাষ্যকার তাহার সমাধান করিতেছেন—"সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগইত্যাখ্যায়তে।" অর্থাৎ সূত্রে "যোগঃ সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এই রূপে সর্ব্ব শব্দের গ্রহণ না থাকায় সম্প্রজ্ঞাত অবস্থাকেও যোগ বলা যাইতেছে। যদিচ তাহাতে ধ্যেয়াকারে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় না, তথাপি তদতিরিক্ত রাজস তামস সমস্ত বৃত্তিরই নিরোধ হইয়া থাকে। এইক্ষণ প্রকারান্তরে পুনর্ব্বার আশঙ্কা হইতে পারে যদি পূর্ব্বোক্ত অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কায় "সর্ব্ব" শব্দের গ্রহণ করা না হইল, সামান্যাকারে চিত্তের বৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলা হইল, তবে ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থাকে যোগ না বলা হইল কিসে? কেন না, ইহাতেও অসংখ্যবৃত্তির নিরোধ আছে। একদা নানাবিধ বৃত্তির উদয় হয় না এইটি চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সুতরাং যে কোনরূপ বৃত্তিরই উদয় হউক না কেন, তদতিরিক্ত সমস্ত বৃত্তির নিরোধ, আপনা হইতেই সেই সময়ের নিমিত্ত হইয়া থাকে। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় এই দুইটি অবস্থা যোগলক্ষণের লক্ষ্য নহে, অথচ ইহাতে লক্ষণের গতি হইতেছে ; সুতরাং অতিব্যাপ্তি রূপ দোষ হইয়া উঠিল। ইহাকেই "উভয়তো পাশারজ্জুঃ" বলিয়া থাকে। সূত্রকার ও ভাষ্যকারের অভিপ্রায় অনুসারে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর উভয় রূপে হইতে

পারে। "তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং" এই অগ্রিমসূত্রের সহিত এই সূত্রকে একত্র করিয়া "দ্রষ্টৃস্বরূপাবস্থিতিহেতুশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধোযোগঃ" এইরূপ লক্ষণ করিলে কোন দোষের সম্ভাবনা থাকে না; অর্থাৎ যেরূপ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ দ্রষ্টার (আত্মার) স্বরূপে অবস্থানের কারণ হয় সেই রূপ নিরোধই যোগ, সামান্যাকারে বৃত্তিনিরোধ যোগ নহে। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থায় যেরূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধ হয়, তাহাতে আত্মস্বরূপে অবস্থানের কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাহাতে যোগের এই লক্ষণের গতি হইল না। সম্প্রজ্ঞাত অবস্থা অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থাতে উৎপন্ন করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থানের কারণ হয় বলিয়া এটিও যোগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারিল। অপর, "ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্" ইত্যাদি প্রথম সূত্রভাষ্যের তাৎপর্য্যমতে "ক্লেশকর্ম্মাদিপরিপন্থী চিত্তবৃত্তি-নিরোধো যোগঃ"। অর্থাৎ যাহাতে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ এবং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম প্রভৃতির সমূলোচ্ছেদের হেতু যে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ তাহাই যোগ। এ পক্ষেও পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থাকে পরিত্যাগ ও সম্প্রজ্ঞাত অবস্থাকে সংগ্রহ করিতে হইবে।

কিরূপে একই অন্তঃকরণসামান্যের ক্ষিপ্তাদি পঞ্চভূমির সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া প্রথমতঃ চিত্তের স্বরূপ বলা হইতেছে। চিত্ত প্রখ্যা অর্থাৎ প্রতিবিম্বগ্রহণরূপ বিষয় প্রকাশ প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম এবং স্থিতি অর্থাৎ বৃত্তিরূপ গতিরাহিত্য এই ত্রিবিধ স্বভাব অবলম্বন করে। ভাষ্যের প্রখ্যা শব্দে প্রসাদ লাঘব প্রীতি প্রভৃতি সমস্ত সাত্ত্বিক গুণ, প্রবৃত্তি শব্দে পরিতাপ শোক প্রভৃতি সকল রাজসিক গুণ এবং স্থিতিশব্দে গৌরব আবরণ প্রভৃতি সমস্ত তামস গুণের গ্রহণ করিতে হইবে। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক না হইলে, এই ত্রিবিধ গুণও তাহার হইতে পারিত না। কেন না কারণের গুণই কার্য্যে সঞ্চারিত হয়; "কারণগুণাঃ কার্য্যগুণানারভন্তে"। চিত্তাকারে পরিণত সত্ত্বগুণকে চিত্তসত্ত্ব বলে। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক হইলেও তাহাতে সত্ত্বগুণের অংশ অধিক তাহাই বলা হইতেছে প্রখ্যারূপং অর্থাৎ প্রকাশার্থভাব এই চিত্তে যখন সত্ত্বগুণ হইতে রজঃ ও তমোগুণের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হয়, অথচ তাহারা উভয়ে পরস্পর সমান থাকে, তখন অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে ও শব্দাদি বিষয়ে অনুরক্তি হয়, এইটি ক্ষিপ্তাবস্থার ভেদ। যে সময় তমোগুণ, রজোগুণকে অতিক্রম করে,

তখন অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই সকল বিষয়ে চিত্তের আসক্তি হয়। এইটি মূঢ়াবস্থার ভেদ। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তমোরূপ মোহাবরণ নষ্টপ্রায় হইয়া যায়, তখন সত্বের আবির্ভাব হওয়ায় সমস্ত বিষয়েরই প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু রজোগুণের অল্পপরিমাণে সংযোগ থাকায়, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে থাকে। ঐ চিত্ত হইতে যখন রজোলেশমাত্রেরও অপগম হয়, তখন তমঃ ও রজোগুণের অপনোদননিবন্ধন চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ সত্বগুণের বিশেষরূপে আবির্ভাব হয় বলিয়া স্বরূপপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ স্বভাবে অবস্থিত বলা যায়। তখন কেবল সত্ব (বুদ্ধি) ও পুরুষের ভেদজ্ঞান এই বিষয়টিকে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হয়। এইটিই বুদ্ধির চরম কার্য্য ও মুক্তির একমাত্র কারণ। এইরূপে চিত্ত ধর্ম্মমেঘধ্যান প্রিয় হয়, ইহার স্বরূপ অগ্রে বিশেষ রূপে প্রকাশ হইবে। ঐ ধর্ম্মমেঘকে যোগিগণ পরম প্রসংখ্যান বা তত্বজ্ঞান অর্থাৎ বিবেকখ্যাতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া থাকেন, উক্ত অবস্থাটি একাগ্রভূমিতে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বুদ্ধিতত্ব হইতে পুরুষকে অর্থাৎ আত্মাকে ভিন্ন করিয়া জানাই একমাত্র মুক্তির কারণ, এবং সমস্ত শাস্ত্রেই নানারূপে ইহারই উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একটি পদার্থ হইতে অপর পদার্থকে ভেদ করিয়া বুঝাইতে হইলে অগ্রে উভয়ের গুণ দোষ পৃথক্ পৃথক্ রূপে উল্লেখ করা আবশ্যক; নতুবা কেবলমাত্র ইহা হইতে উহা পৃথক্ এইভাবে লক্ষবার চীৎকার করিলেও উদ্দেশ্য সাধন হয় না বলিয়া প্রথমতঃ পুরুষ ও বুদ্ধির স্বরূপ, সাধুতা অসাধুতা প্রভৃতি বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে। চিতিশক্তি অর্থাৎ পুরুষ (জীবাত্মা) অপরিণামী নির্লেপ। প্রকৃতি যেমন পূর্ব্বধর্ম্ম (স্বস্বরূপ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহত্তত্বাদিরূপ ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া পরিণত হয়, তাদৃশ পরিণাম পুরুষের নাই বলিয়াই চিতিশক্তি "অপ্রতিসংক্রমা" অর্থাৎ বিষয়াকারধারণরূপ সঞ্চাররহিত হয়। যেরূপ বুদ্ধি ঘটপটাদিবিষয়দেশে গমন করিয়া বিষয়কে প্রকাশ করে, পুরুষ তাহা করেনা। কিন্তু বুদ্ধিই বিষয়াকারে পরিণত হইয়া শুদ্ধ-চৈতন্তে তাহা প্রদর্শন করায়; সুতরাং চিতিশক্তিকে দর্শিতবিষয়া (অবুদ্ধি যাহাকে বিষয় দর্শন করায়) বলা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে পুরুষ শুদ্ধ বিকারাদিদোষরহিত ও অনন্ত অর্থাৎ ক্ষয়রহিত সুতরাং ইহার উৎপত্তিও নাই

জানিতে হইবে বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদবিষয়ক চিত্তবৃত্তি সত্ত্বগুণের কার্য্য বলিয়া ইহাকে সত্ত্বগুণাত্মিকা বলা হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দোষ চিতিশক্তি অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত; কারণ ইহাতে অনিত্যতা প্রভৃতি বহুল দোষ আছে, একারণ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকচিত্ত ইহা হইতেও বিরক্ত হইয়া পরিশেষে ঐ খ্যাতি (সত্ত্ব পুরুষভেদজ্ঞান) পর্য্যন্ত নিরোধ করে, তখন কেবল নিরোধস্বভাব হইয়া চিত্ত সংস্কার মাত্র রূপে প্রশান্তভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থায় ক্লেশাদি সমস্ত বীজ তিরোহিত হয় বলিয়া ইহাকে নির্ব্বীজসমাধি এবং কোন বিষয় প্রকাশ পায় না বলিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলিয়া থাকে; এইটিই নিরোধভূমি বা যোগের শেষ সীমা. মুক্তির অনর্গল দ্বার। নিরোধরূপ এই যোগ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাতরূপে বিভক্ত হয়।

মন্তব্য। প্রথম সূত্র ভাষ্যে যে ক্ষিপ্ত,মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পঞ্চ চিত্ত ভূমির উল্লেখ করা হইয়াছে, দ্বিতীয় সূত্র ভাষ্যে তাহাই প্রকারান্তরে যথাক্রমে বিশদরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রজোগুণের সম্পূর্ণ আবির্ভাবের নাম ক্ষিপ্তাবস্থা, ইহাতে জীবগণ উন্মত্তের ন্যায় বাহিরের বিষয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে, ক্ষণকালও পরমার্থপথে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে না। মূঢ় অবস্থা ইহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট, তখন তমোগুণের সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় বলিয়া চিত্ত মোহজালে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া সদসৎ বিচার করিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন মানবে ও পশুপক্ষীতে কিছুই প্রভেদ লক্ষিত হয় না। বিক্ষিপ্ত অবস্থা পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট। এই অবস্থায় মনোরূপ ভবসমুদ্রবিহারী মৎস্য, ক্ষণকালের জন্য সমাধি-জালে আবদ্ধ হইবার উপক্রম করে, কিন্তু পরক্ষণেই লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক (রজোগুণের আবির্ভাবই ইহার কারণ) নিজের বিহার-দেশে গমন করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকে। যেমন বৃহৎ জলাশয়ে মৎস্য শিকার করিতে হইলে, জালের আয়তন যত বড় হয় ততই সুবিধাজনক, আয়ত জালে একবার মৎস্য আবদ্ধ করিতে পারিলে ক্রমশঃ জাল গুটাইয়া মৎস্যের সঞ্চারক্ষেত্র কমাইয়া দেওয়া যায়, পরিশেষে হস্তদ্বারাও তাহাকে ধরা যাইতে পারে; তদ্রূপ চিত্তকে জয় করিতে হইলে, অগ্রে তাহার বিষয় অর্থাৎ সমাধির আলম্বন, (দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি) স্থূল পদার্থকেই করা কর্ত্তব্য, পরে যত সঙ্কোচ করিতে পারিবে ততই

সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, এমন কি পরিশেষে বিষয় না থাকিলেও চলিতে পারে। যেমন মৎস্যকে একবার হস্তগত করিতে পারিলে শেষ জালেও আবশ্যক থাকে না, তদ্রূপ চিত্তকেও জয় করিতে পারিলে শেষ উপাস্য বিষয়েরও আবশ্যক নাই। মনোমীনকে তখন বিষয়-জলাশয় হইতে উপরে উত্তোলন করা হইয়াছে, ছাড়িয়া দিলেও সহসা যাইতে পারিবে না।

একাগ্র অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে সাত্ত্বিক বৃত্তির উদয় হয়, তাই বলিয়া রাজসিক বা তামসিক ব্যাপার একেবারে তিরোহিত হয় এরূপ নহে। কেন না যে কোনও গুণের বৃত্তি আবির্ভূত হউক না কেন, তাহাতে ইতর গুণদ্বয়ের সহায়তার সম্পূর্ণ আবশ্যক; যেমন রজোগুণের ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবর্ত্তনা, তাহা না থাকিলে কাহারই কার্য্য হইতে পারে না। সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত আছে—

"অন্যোঽন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বত্রগামিনঃ।
রজসোমিথুনং সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনং রজঃ॥
তমসশ্চাপি মিথুনে তে সত্ত্ব রজসী উভে।
উভয়োঃ সত্ত্বরজসোর্ম্মিথুনং তম উচ্যতে॥
নৈষামাদিঃ সম্প্রয়োগো বিয়োগো চোপলভ্যতে॥"

অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয় পরস্পর সহচর, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, ইহারা সকলেই সকল স্থানে বিরাজ করিতেছে। ইহাদের পরস্পর সংযোগ বা বিয়োগ নাই।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু।

আজকাল কেমন আছি

ঘাটে পথে, রেলগাড়ীতে ট্রামগাড়ীতে, যথা তথা, পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কেমন আছেন? এরূপ জিজ্ঞাসা করা সভ্যতার লক্ষণমাত্র। কারণ অনেক স্থলেই দেখিতে পাই যিনি আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বড় একটা উত্তরের অপেক্ষা করেন না, প্রশ্ন করিয়াই অন্য ব্যক্তির সহিত কথা আরম্ভ করেন অথবা সংবাদপত্র পড়িতে থাকেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিও, নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি বা ঘ্যানঘেনে লোক না হইলে, "ভাল; মহাশয় ভাল আছেন?" এই বলিয়া সভ্যতা রক্ষা করেন। বলিতে কি, আমরাও এইরূপ করিয়া থাকি, কিন্তু "আজকাল কেমন আছি," এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গেলে একটু ভাবিতে হয়। ভাবিয়া যে প্রকৃত উত্তর বাহির করিতে পারিয়াছি, বোধ হয় না। কিন্তু এই বিষয়ের মনে মনে চর্চ্চা করিতে করিতে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু বলিতেছি।

বয়স, শিক্ষা, প্রকৃতি ও সংসর্গ অনুসারে এবং অন্যান্য নানা কারণে কোন কোন ব্যক্তি ইহজগতের এমন কি পরজগতেরও ব্যাপারপরম্পরা ভাল চক্ষুতেই দেখিয়া থাকেন। যাহা দেখেন তাহাতে তাঁহাদের আনন্দ হয়, আশা জন্মে, উৎসাহের ও বলের সঞ্চার হয়। এই সকল লোক জগতের কঠিন ও অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তননিয়মে কেবল অবিমিশ্র উন্নতির ও উৎকর্ষেরই কল্পনা করেন। সময়স্রোত অনন্ত মঙ্গলমহাসাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, আপনারাও সেই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, কেবল নিশ্চেষ্ট ও স্রোতোবেগতাড়িত হইয়া নয়, সচেষ্ট ও আপন আপন কার্য্য-বলেই অগ্রসর হইতেছেন, এইরূপ ভাবিয়া সুখী ও অধিকন্তু উদ্যমশীল হন। ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। আমাদের দেশেও আজকাল অনেককে এই শ্রেণীর অন্তর্গত দেখিতেছি। অর্থাৎ ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবকের এইটিই সাধারণ ভাব।

আবার আর একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা পরিবর্ত্তনমাত্রই অমঙ্গলের কারণ বিবেচনা করেন এবং যাঁহারা বর্ত্তমান অপেক্ষা অতীত কালেরই অধিক পক্ষপাতী ও যাহা হইবার তাহাই হইবে, চেষ্টায় ও চীৎকারে কিছু হইবে না, এই বলিয়া নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া থাকেন। আমাদের দেশের অধিক লোকেরই, বিশেষতঃ প্রাচীন ও ইংরাজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এই ভাব দৃষ্ট হয়। এই উভয় শ্রেণীর লোকই এক একটি ভাবের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। স্ব স্ব পোষিত মতই ঠিক ও তদ্বিপরীত মতে কিছুই সত্য নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু 'আজকাল কেমন আছি' বিবেচনা করিতে গেলে কোন মতেরই গোঁড়ামী না করিয়া বাঙ্গালীর এক্ষণকার অবস্থার বিষয়ে যথাসাধ্য নিরপেক্ষ ভাবে কিঞ্চিৎ চিন্তা করা আবশ্যক।

বঙ্গবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিতে হইলে প্রথমেই বাঙ্গালীর কায়িক অবস্থার ও পরে যথাক্রমে বৈষয়িক, ইহার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, রাজনীতিক ও মানসিক এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষাসম্বন্ধীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থার বিচার করা চাই। সমুদায় কথা বিস্তৃতভাবে বিচার করিতে হইলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হয়, অতএব দুই চারিটি কথামাত্র বলাই উচিত। বিচার্য্য বিষয়টি ভাগ ভাগ করিয়া বিচার করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালীর কায়িক অবস্থা যে বাঙ্গালীর বৈষয়িক, সামাজিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন, তাহা নহে। ঐ সকলগুলিই সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ ও পরস্পর সাপেক্ষ। সকল ব্যক্তিরই, সকল জাতিরই শারীরিক অবস্থানুসারে অধিক পরিমাণেই উহাদের সামাজিক, বৈষয়িক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা নিয়মিত হয়। আবার সামাজিক নিয়মে অনেক সময়েই লোকের ব্যবসায় ও বিষয়কর্ম্মাদির এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষাপকর্ষসংসাধন এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশপ্রভাবে উহাদের মনোবৃত্তির উন্নত বা অবনত অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

আজকাল বাঙ্গালীর দৈহিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। অনেকের পক্ষেই দেহধারণ বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। সহর ও সহরের নিকটবর্ত্তী লোকের—আবালবৃদ্ধবনিতার—প্রায় সকলেরই, দেহ বৎসরের অনেক সময়েই পীড়িত থাকে। অজীর্ণ ও অম্লরোগ, বহুমূত্র, হাঁফানী-কাশী চক্ষু ও দন্তরোগ এবং

দৌর্ব্বল্য এ সকলের বড়ই প্রাদুর্ভাব। পল্লীগ্রামেও পূর্ব্বের ন্যায় সবল ও সুস্থকায় লোক এক্ষণে প্রায় দৃষ্ট হয় না। ভদ্রলোকের অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন লোকের ত কথাই নাই, কৃষকেরাও ম্যালেরিয়া জ্বরে শীর্ণকায় হইয়া পড়িয়াছে। শতকরা ৫০ জনের পেট প্লীহা ও যকৃদ্দূষিত। মোট কথা প্রায় সর্ব্ব-বিষয়েই মতভেদ থাকিলেও, বাঙ্গালী যে আজকাল অসুস্থকায়, দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সকলেই একমত। যদি বাঙ্গালীর বর্ত্তমা[ন] দৈহিক অবস্থা মন্দ বলিয়াই স্বীকৃত হয় এবং কায়িক স্বাস্থ্যের উ[পরে] প্রত্যেক ব্যক্তির ও জাতির সাংসারিক ভদ্রাভদ্র নির্ভর করে এই কথা সত্য [হয়] তবে বাঙ্গালীর কি হইবে? দৈহিক উন্নতিসাধনের নিমিত্ত বাঙ্গালী [কি] করিতেছে? বিশেষ কিছু করিতেছে বলিয়া বোধ হয় না, তবে আমাদে[র] জাতীয় স্বভাবসুলভ বিবাদ বিতণ্ডার অভাব নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম অভ্যাস কর, ভাত খাইওনা, রুটী ও মাংস খাও, তৈল মাখিও না, সাবান ব্যবহার কর, গরম কাপড় ও মোজা বার মাসই পরিধান কর, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ব্রত, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য স্বাস্থ্যের অন্তরায় অতএব তাহা ত্যাগ কর, কুস্তী কর, পরি-ষ্কৃত জল ও বায়ু সেবন কর, এইরূপ নানা প্রকার হিত, অহিত, উপযোগী ও অনুপযোগী উপদেশ সাধারণকে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু দেশের ত কই বিশেষ কিছু স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে না। ওলাউঠা, বসন্ত ও জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমে নাই। উপদেশের অভাব নাই, উপদেশানুযায়ী কার্য্য করে কে? রাজপুরুষেরা— বাঙ্গালী নিশ্চেষ্ট, পুরুষানুক্রমে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মানভিজ্ঞ, উন্নতিপরাঙ্মুখ, পরমুখাপেক্ষী, আমাদিগের প্রতি এইরূপ কতকগুলি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া ও কলিকাতার এ বৎসরের মৃত্যু-সংখ্যা ও সমগ্র বঙ্গদেশে গত ছয়মাসের মৃত্যু-সংখ্যা জনসংখ্যার গড়পড়তা হিসাবে ইউরোপখণ্ডের এই কালের মৃত্যু সংখ্যার অপেক্ষা দাশমিক অনুপাতানুসারে অনেক কম এবং এই সন্তোষজনক ফল রাজকীয় চেষ্টায় ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের গুণেই প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য কথার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আর বাঙ্গালী আপনার চেষ্টায় কি করিবে? রোগ হয় ঔষধ খায়, একেই নিঃস্ব তাহাতে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে ডাক্তর বাবুকে দেয়, রোগ ভাল হয় না, মরিয়া যায়। বাঙ্গালীর আজকাল

দৈহিক অবস্থা এইরূপ। ইহাতে ত আশাজনক কিছুই দেখি না। যাঁহারা উৎসাহপূর্ণ ও আমাদের ক্রমেই ভাল হইতেছে এইরূপ দেখেন, তাঁহারা বলেন এক্ষণে শিক্ষাবিস্তার হইতেছে, লোকে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী অবগত হইতেছে ও আত্মনির্ভর শিখিতেছে এবং বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসারও আদর বাড়িতেছে, সুতরাং আর ভাবনা নাই, ক্রমেই বাঙ্গালী সুস্থকায় ও দীর্ঘায়ু হইবে। আমরা তাই সমুদয় কথাই স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাশাস্ত্রের দোহাই দিলেই কি চলিবে? উপযুক্ত চিকিৎসা, পথ্য, শারীরিক ও মানসিক শ্রম, উপযোগী বিষয়কর্ম্ম, হিতকর সামাজিক নিয়ম, এগুলি আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে? ইউরোপীয় অজ্ঞানবিৎ, কুসংস্কার বশতই হউক আর অক্ষমতা হেতুকই হউক, আমাদের সুব্যবস্থা দিতে পারেন না। আমাদের নিজের চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহাদের আমাদের সহিত, আমাদের ইতিহাস ও রীতিনীতির সহিত সহানুভূতি আছে, যাঁহাদের জ্ঞান ও বিবেচনাশক্তি আছে, যাঁহারা দেশের অবস্থা জানেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, অগ্রসর হইয়া বাঙ্গালীর কায়িক অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে সহায় হন। এই বিষয়টির যেরূপ চর্চ্চা হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ হইতে দেখি না। রাজনীতি সমাজনীতি, ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা—সবই বড় কথা। কিন্তু এ সকলের কার্য্যতঃ চর্চ্চা করে কে? শয্যাগত সহস্ররোগপ্রপীড়িত বাঙ্গালী, মনের তেজে দৈহিক যাতনাকে দমন করিয়া "Liberty, Equality, Fraternity" লাভ করিতে পারে কৈ? (ক্রমশঃ)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পিতৃমেধ যজ্ঞ

পুরাকালে হিন্দুসমাজে মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ত্রিবিধ পদ্ধতিক্রমে সম্পাদিত হইত। অরণ্য বা শ্মশানক্ষেত্রে শবনিক্ষেপ, বা শব ভূগর্ভে নিহিত করণ, অথবা চিতাগ্নি দ্বারা ভস্মাবশেষে পরিণত করণ—এই ত্রিবিধ ব্যবস্থাই বেদানুমোদিত। অধিকন্তু বৈদিককালে পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের অস্থি সমাহিত করিবার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে কিরূপে সেই ব্যবস্থা তিরোহিত ও অপ্রচারিত হইয়া গিয়াছে, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুসাধ্য নহে। অধুনা সন্ন্যাসী বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়বিশেষমধ্যে অস্থি সমাধিস্থ করিবার প্রথা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বৈদিক কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সর্ব্বশ্রেণী মধ্যেই এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত এবং তৎকালে ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য পুণ্যকর্ম্মরূপে পরিগণিত ছিল। এই ক্রিয়ার নাম পিতৃমেধ যজ্ঞ। যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখা মধ্যস্থ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে এই কর্ম্মের মন্ত্রাদি সমস্ত লিখিত আছে। তৎকালে ইহা যেরূপ পদ্ধতিক্রমে অনুষ্ঠিত হইত, নিম্নে তাহা লিখিত হইতেছে।

এতদ্‌যজ্ঞানুষ্ঠানকারিগণ পূর্ব্বেই মৃত আত্মীয়ের অস্থি সংগৃহীত করিয়া বাসগ্রামসন্নিহিত অরণ্যমধ্যে কলসপাত্রে স্থাপিত করিয়া রাখিতেন। নিয়মিত দিবসে যজমান, পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয় স্বজনগণ সমভিব্যাহারে, নিরূপিত অরণ্যমধ্যে গমন করিতেন এবং সেই অস্থিপূর্ণ কলস বস্ত্রাচ্ছাদিত ও শয্যারূঢ় করিয়া, নানাবিধ বাদ্যোদ্যম সহকারে, সমাধিক্ষেত্রে আনয়ন করিতেন। শ্মশান বা জলাশয়সন্নিহিত তৃণগুল্মাদিযুক্ত রমণীয় ক্ষেত্রই এই কার্য্যের পক্ষে প্রশস্তরূপে পরিকীর্ত্তিত। অস্থি সমানয়ন দিবসে ভূরিভোজ ও নৃত্যগীতাদি হইবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। অস্থি সমানীত হইবার পর, যথানির্দ্দিষ্ট রাত্রিশেষে, তৎসমস্ত সমাধিস্থ করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ অধ্বর্য্যু (১)

(১) অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা, এবং ব্রহ্মা এই চতুর্ব্বিধ ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক যাবতীয় যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই ঋত্বিক্ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেরই তিনজন করিয়া সহকারী থাকেন। অধ্বর্য্যুর প্রথম সহকারীর নাম প্রতিপ্রস্থাতা, দ্বিতীয় সহকারীর নাম নেষ্টা, এবং তৃতীয়

মহাশয় পলাশশাখার দ্বারা মন্ত্রসহকারে সমাধির স্থান মার্জ্জন করিবেন (২) এবং তদনন্তর সেই মার্জ্জিত স্থানে মন্ত্র পাঠ করিয়া অস্থিপূর্ণ কলস সংস্থাপিত করিবেন। পরে চারিদিকে চারিটি শঙ্কু অর্থাৎ খোঁটা পুতিয়া রজ্জু দ্বারা বেষ্টন করিবেন। ঐ বেষ্টিত স্থানের দক্ষিণে বা উত্তরে কিয়ৎপরিমিত স্থান, ৬টি বৃষভ সংযুক্ত হলযন্ত্র দ্বারা, কর্ষিত করিতে হইবে। তদনন্তর হলযন্ত্র বিদূরিত করিয়া সেই কৃষ্টস্থানে সর্ব্বৌষধি (৩) বপন করিতে হইবে। সেই কর্ষিত ও উপ্ত ভূমিতে কলসস্থ মৃতাস্থি সমূহ ঢালিতে হইবে এবং এক নিশ্বাসে দৌড়িয়া ঐ শূন্য কলস দক্ষিণদিকে কোন স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। তাহার পর সেই অস্থি গুলির দ্বারা মৃত ব্যক্তির হস্ত পদাদি সমস্ত অঙ্গ কল্পনা করিয়া সজ্জীভূত করিতে হইবে এবং তদুপরি ইষ্টক স্থাপিত করিতে হইবে। পরে পূর্ব্বদিক্ ব্যতীত সন্নিহিত অপর কোন স্থান হইতে মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া উক্ত মৃতাস্থি ও ইষ্টকোপরি এক সমাধিবেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই বেদীর পরিমাণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোন মতে ব্রাহ্মণের সমাধিবেদী মুখপ্রমাণ, ক্ষত্রিয়ের বক্ষ প্রমাণ, বৈশ্যের উরু প্রমাণ, স্ত্রীগণের যোনি প্রমাণ, এবং শূদ্রের জানু প্রমাণ উচ্চ হওয়া আবশ্যক। অপর মতে সমাধিবেদী সাধারণতঃ জানু প্রমাণ উচ্চ হওয়াই আবশ্যক।

সহকারীর নাম উন্নেতা। এইরূপ হোতার প্রথম সহকারীর নাম মৈত্রাবরুণ, দ্বিতীয় সহকারীর নাম আচ্ছাবাক এবং তৃতীয় সহকারীর নাম গ্রাবস্তুৎ। উদ্‌গাতার প্রথম সহকারীর নাম প্রস্তোতা, দ্বিতীয় সহকারীর নাম প্রতিহর্ত্তা এবং তৃতীয় সহকারীর নাম সুব্রহ্মণ্য। ব্রহ্মার প্রধান সহকারীর নাম ব্রাহ্মণাচ্ছংসি, দ্বিতীয় সহকারীর নাম আগ্নীধ্র এবং তৃতীয় সহকারীর নাম হোতা। যজ্ঞীয় ব্যাপারে অধ্বর্যু মহাশয় যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র সহকারে অধ্বর ক্রিয়া অর্থাৎ বেদীনির্ম্মাণাদি প্রাথমিক কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করেন। হোতা মহাশয় ঋগ্বেদীয় মন্ত্রসহকারে হোমাদি সম্পন্ন করেন এবং উদ্‌গাতা মহাশয় তৎকালে উদ্‌গানকর্ম্ম অর্থাৎ সামগানাদি দ্বারা ঈশ্বর স্মরণ করেন। যজ্ঞস্থলে এই ত্রিবিধ বেদজ্ঞ ব্রহ্ম নামক অপর এক মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া সকলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও সংশোধনাদি করিয়া থাকেন।

(২) এস্থলে এই যজ্ঞসংক্রান্ত মন্ত্রাদি সংগ্রহ করা হইল না। যাঁহার তত্তাবৎ দর্শনে কৌতূহল জন্মিবে তিনি পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের প্রকাশিত ও অনুবাদিত যজুর্ব্বেদ সংহিতা পাঠ করিবেন। ইহা জ্ঞাতব্য যে প্রত্যেক কার্য্যেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে। এই যজ্ঞীয় কোন অনুষ্ঠানই মন্ত্রহীন নহে।

(৩) কুশমাংসী হরিদ্রা বচা শৈলেয় চন্দন চম্পক মুরা কর্পূর মুস্তা এই কয় ওষধি বৃক্ষ সর্ব্বৌষধি নামে খ্যাত।

মৃতাস্থির উপর বেদী রচিত হইলে তদুপরি শৈবাল ও কুশা সংস্থাপিত করিতে হইবে এবং বেদীর দক্ষিণে দুইটি গর্ত্ত করিয়া একটিতে জল ও অপরটিতে দুগ্ধ স্থাপিত করিতে হইবে। বেদীর উত্তরে, নিকটে নিকটে সাতটি গর্ত্ত খনন করিয়া জলপূর্ণ করিতে হইবে। সেই গর্ত্তে অধ্বর্য্যু, যজমান ও তদীয় স্বজনসমূহ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া সমস্বরে মন্ত্রবিশেষ পাঠ করিতে করিতে পরিক্রমণ করিতে থাকিবেন।

এইরূপে গোর সমাপ্ত করিয়া যজমানের বন্ধুগণ যজ্ঞোপবীতী (৪) হইয়া অপামার্গ অর্থাৎ আপাঙ্গ বৃক্ষের দ্বারা আপন আপন শরীর বিশোধিত করিবে, অর্থাৎ হয় আপাঙ্গ গাছ দেহের সর্ব্বত্র বুলাইয়া দিবে, নয় তাহার বীজ বাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিবে। তদনন্তর সকলেই স্নাতক হইয়া নববস্ত্র পরিধান করিবে ও বৃষভপুচ্ছ স্পর্শ করিবে। সংকারের পরেও এবম্বিধ কার্য্য সমস্ত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

যজমান স্নাতক ও নববস্ত্রপরিহিত বন্ধুবর্গ পরিবৃত হইয়া শ্মশান ক্ষেত্রে মর্য্যাদালোষ্ট অর্থাৎ প্রকাণ্ড পাষাণ বা মৃত্তিকা খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং সকলে অঞ্জ অর্থাৎ কজ্জল চক্ষে দিয়া ও অভ্যঞ্জন অর্থাৎ তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন।

এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন হইলে অধ্বর্য্যু মহাশয় যজমানের মঙ্গল কামনায় পরিদা অর্থাৎ রক্ষণমন্ত্র পাঠ করিবেন এবং হোমাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দিবেন।

এই পিতৃমেধ যজ্ঞীয় সমস্ত অনুষ্ঠান আলোচনা করিলে হিন্দুসমাজে মৃতাস্থি সমাধিস্থ করিবার প্রথা বিদ্যমান ছিল তৎপক্ষে কোনই সংশয় থাকে না। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে বৈদিককালে যে সকল ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, প্রস্তাবান্তরে তাহা বিশেষরূপে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

(৪) শাস্ত্রে উপবীত ধারণের ত্রিবিধ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। (১) যজ্ঞোপবীত—দেবকার্য্য কালের ব্যবস্থা। (২) প্রাচীনাবীত—পিতৃকার্য্য কালের ব্যবস্থা। (৩) নিবীত—কোন কার্য্যাদি বিহীন সময়ে শোভার্থ মালার ন্যায় ধারণের ব্যবস্থা।

কবিত্ব

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই বিজ্ঞানের উন্নতি সময়ে কবিতার অধিকার লুপ্ত হইবে। যেন বনে আর পাখী ডাকিবে না, আকাশে আর মেঘ উঠিবে না, যেন ফুল-কলির জীবনের শেষ হইয়াছে—বসন্ত কাল যেন এ সভ্য জগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করিবে। যেন মানব চিত্তে এখন দয়া প্রীতির সৌন্দর্য্য অবসান হইবে, চক্ষু প্রেমের কটাক্ষসন্ধান ভুলিয়া যাইবে, শিশু বিজ্ঞানের ভয়ে আর হাসিতে সাহস করিবে না।

কবিতা এ জগতে অমর। নর-হৃদয় যে পর্য্যন্ত সুখ দুঃখে ঝঙ্কার করিবে, সে পর্য্যন্ত কবিতা জগতে অক্ষয় থাকিবে। কারণ সেই সুখ দুঃখে ঝঙ্কারের নামই কবিতা। পূর্ব্বে বলিয়াছি হিন্দুকবি শান্ত; তিনি গৃহে দারিদ্র্য, মৃত্যু, রোগ, শোক দেখিয়া ভীত. গৃহ তাঁহার মহান্ আত্মার পক্ষে অতি সঙ্কীর্ণ স্থান। তিনি যখন বাহিরে দাঁড়ান, দেখেন—বিপুল মহিমান্বিত স্বর্গরাজ্য। নিম্নে যাহা দেখেন—তাহাও সুন্দর, অনন্ত এবং গৌরবপূর্ণ। গৃহ হইতে সেই অনন্তাকাশতলে তাঁহার কল্পনা এক বৃহত্তর সুখকর রঙ্গভূমি দেখিতে পায়। এইজন্যই তাঁহার মানবচরিত্রে দৃষ্টি অল্প, এই জন্যই তাঁহার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে দৃষ্টি অধিক। বাল্মীকি, বেদব্যাস দূরে থাকুন—তাঁহারা মানবচরিত্রে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহাদের কাব্যে পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্য, চরিত্র এবং ঘটনার সংমিশ্রণ; কিন্তু তাঁহারা সংসারের সৌন্দর্য্যে মোহিত হওয়া অপেক্ষা বৈরাগ্য ভালবাসিতেন। যিনি উক্ত দুই গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তিনি সে বিষয় জানেন।

তাঁহাদের পদধূলি শিরে গ্রহণপূর্ব্বক বিদায় লইলে, আর যাঁহাদিগকে দেখি, তাঁহাদিগের অধিকাংশেরই বাহ্য সৌন্দর্য্যে দৃষ্টি অধিক—মানবচরিত্রে দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত অল্প। কালিদাস হিন্দুর প্রিয়তম কবি। কি মেঘদূত, কি কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, রঘুবংশ যে রাজ্যেই কবি আমাদিগকে লইয়াছেন, সেই স্থানেই প্রকৃতির উপমার সৌন্দর্য্য মনোবিমোহনকারী। যেন তাহা স্বপ্নশ্রুত বংশীধ্বনি, যেন পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে কুসুমের ঘ্রাণ, শত শত ভ্রমরঝঙ্কার।

কালিদাসের গ্রন্থ হীরার খনি, সৌন্দর্য্যের খনি,উপমার খনি। কিন্তু কালিদাসের সৃষ্টিতে মানবচরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি কম। তিনি বাহ্য প্রকৃতি দেখিয়াছেন, মানব-চরিত্রে যাহা অতি স্পষ্ট উপরিভাগ তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাপসকুমারীর অপ্রস্ফুট সলজ্জ সৌন্দর্য্য, গিরিবিহারিণী পার্ব্বতীর মধুর বালিকামূর্ত্তি তাঁহার সুন্দর লাগিয়াছে, সুন্দর নিপুণ লেখনী তাহা গ্রন্থের পত্রে লইয়া আসিয়াছে। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ ব্যাপিয়া এক শান্তির সৌন্দর্য্য। হৃদয়ের গভীর মর্ম্মস্পর্শী আলোড়ন, আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, ভাবের দ্রুত উত্থানপতন, কালিদাসের গ্রন্থে নাই।

বিদেশে প্রকৃতি শীতের ভয়ে ভীত। শীতপ্রধান দেশের লোক অপেক্ষাকৃত অধিক কর্ম্মঠ, জীবনের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি বেশি। শীতে ম্রিয়মাণ প্রকৃতি দেখিবার তাহাদের অবসর নাই। তাহারা সময়ের গতির দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখে, ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় অবিরত কর্ম্মশীল জীবনই তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান, একমাত্র সাধনা, একমাত্র ভাবনার বিষয়। পশ্চিমদেশ হইতে সেক্ষপীর, গেটে, শিলার, ভিক্টার হিউগো, ইউজেনস্যু, ট্যাসো প্রভৃতি স্ব স্ব জাতির চরিত্রের প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন।

সেক্ষপীর ইংলণ্ডের কবি, তিনি জগতের কবি। বিলাতের চতুর্দ্দিকে সমুদ্রের বারিরাশি, নগোচ্চ উর্ম্মিসঙ্কুল সমুদ্র ইংলণ্ড ভূমির প্রাচীর। য়ুরোপের এক সীমায় থাকিয়াও ইংলণ্ড সমস্ত য়ুরোপবাসী অপেক্ষা স্বাধীনপ্রকৃতি। প্রকৃতি তাহাদিগকে "এক ঘ'রে" করিয়া দিয়াছে। "That independence Britons' pride" এ ছত্র অভ্রান্ত সত্য। এই স্বাধীন জাতির স্বাধীন ওজস্বী ভাষা—সেক্ষপীর। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি সেক্ষপীর, ইংরেজ জাতি সেক্ষপীর-শূন্য হইলে শিরঃশূন্য হয়।

এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংরেজ জাতি সমৃদ্ধির শীর্ষপ্রদেশে উঠিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনের চরিত্রগত বিশেষত্ব, স্বাধীন ভাবের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। ইংরেজ অদম্য সাহসে স্পেনিস্ আর্ম্মাডা জয় করিয়া সমস্ত জাতিতে নূতন শক্তির আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তাহার বিক্রম নব আবিষ্কৃত সুদূর ভূখণ্ডে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। স্বাধীন জাতির এই বিপুল স্ফূর্ত্তির সময় ইংরেজ জাতির ভাষা বাহির হইল। তাহাতে স্বীয় চরিত্রের

ভয়ঙ্কর শক্তি—স্বাধীন তেজস্বী প্রকৃতি প্রকাশিত হইল। কিন্তু প্রথম সে ভাষা কেহ বুঝিল না।*

সে হৃদয়ের আমূল উচ্ছাস উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষিত হইল। সেক্ষপীর ৪০ বৎসর এলিজাবেথের রাজত্বে বর্ত্তমান ছিলেন, বিদ্যোৎসাহিনী রাণী এই দীর্ঘকালমধ্যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে যে সেক্ষপীর প্রাণী আছে, তাহা জানিতেন না। ইংরেজেরা বহুদিন পর্য্যন্ত সেক্ষপীরকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল, তাৎকালিক লব্ধযশাঃ সমালোচকগণ কেহ তাঁহাকে "শিখিপুচ্ছশোভমান কাকদেহ" কেহ বা "হিংস্র ব্যাঘ্র" ইত্যাদি উপাধি প্রদান করিয়াছেন। "তিনি সুখশেষ নাটক লিখিতে অক্ষম"—"যাহা কিছু ভাল হইতে পারিত তাঁহার বিদূষক গুলি তাহাও নষ্ট করিয়াছে" ইত্যাদি কত কথাই বড় বড় সমালোচকদিগের দ্বারা সাহিত্যসমাজে রটিত হইল। সাহিত্যরাজ জন্‌সন্ পর্য্যন্ত সেক্ষপীরের কোন প্রতিভা দর্শন করিতে পান নাই। জন্‌সন্ শিক্ষিতসমাজে হস্তিবিশেষ; সেই প্রকাণ্ড দেহে প্রকাণ্ড শিক্ষা, ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বারা তিনি জমকালো করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতি দৃষ্টি তাঁহার অতি সামান্য ছিল। এই জন্য বিপুল দেহের ভারে এখন তিনি মৃতপ্রায়।

অধুনা জার্ম্মেন এবং ফরাসি দেশের দৃষ্টিপাতে কবিত্বের রাজা সেক্ষপীর জগৎসমক্ষে বাহির হইয়াছেন। জার্ম্মেন এবং ফরাসিদিগের কথায় ইংরেজ জাতি আজ কাল তাঁহাকে স্বজাতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্ভ্রমে সিংহাসন প্রদান করিতেছেন। প্রথম বয়সে সেক্ষপীর ভিনাস এডনিস এবং লুক্রিস নামক দুই খানি কবিতা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহা পৃথিবীর অতুল্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। অত সঙ্কীর্ণ স্থানে ভাবের অত্যধিক উচ্ছাসস্ফুরণ এবং উষ্ণতা অতি অল্পসংখ্যক

* আধুনিক ইংরাজ লেখকগণ স্বজাতির কলঙ্ক অপনয়ন করিতে উৎসুক হইয়া সেক্ষপীর যে তাঁহার সময় আদর পান নাই, তাহা গোপন করিয়া থাকেন। এলিজাবেথ তাঁহাকে যথেষ্ট খাতির করিতেন, এরূপও আধুনিক কোন কোন লেখক রটনা করিতেছেন। আমরা যে মত প্রকাশিত করিলাম, তাহা Victor Hugo হইতে সংগৃহীত। Victor Hugo ফরাসী লেখক। তিনি এবং অন্যান্য লেখকেরা ইংরেজজাতিকে সেক্ষপীরের প্রতি তাচ্ছিল্য-প্রকাশহেতু মিষ্ট ভৎর্সনা করিয়াছেন এবং বিদেশীর যত্নে যে তাঁহাদের দেশের কবিত্ব খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তজ্জন্য গৌরব লইয়াছেন। বোধ হয় এই লজ্জাতেই ইংরেজ জাতি আজকাল ঐরূপে সংবাদ প্রলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

খণ্ডকাব্যে দৃষ্ট হয়। নবীন বয়সেই শ্রেষ্ঠতম কবির ন্যায় তাঁহার প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার ক্ষমতা দৃষ্ট হইবে। কিন্তু তৎসঙ্গে মানবহৃদয়ের প্রগাঢ় ভাব সংমিশ্রিত। উক্ত দুই খানি সামান্য গ্রন্থেও আমরা মহাকবি সেক্ষপীরকে হৃদয়ের অন্তস্তলের ধ্বনিতে চিনিতে পারি।

সেক্ষপীরের চারিখানি নাটক, হ্যামলেট, ওথেলো, লিয়ার, ম্যাকবেথ প্রতিভার অদ্ভুত ভাষা। এরূপ ভাষা জগতে আরও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে অধিক জীবন্ত, অধিক অন্তরস্পর্শী কথা এ রাজ্যে অসম্ভব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিস্তারিত সমালোচনা দুঃসাধ্য। ওথেলোর চিত্রটি পাঠকের চক্ষে আনিতে চেষ্টা করিব।

কবি সন্দেহ দেখাইবেন। ওথেলো যোদ্ধা—কালা আদমি। তিনি স্বজাতিতে রাজবংশজাত, যুদ্ধে এবং অদ্ভুত ঘটনায় যৌবন প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন। ভয়াবহ সমরক্ষেত্রে শত্রুনিপাতে তাঁহার জীবনের সুখ, আশা এবং ইহাই তাঁহার একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

"অন্বেষে সৈনিক যশঃ কামানের মুখে"—যুদ্ধব্যবসায়ী লোক মাত্রই উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ভ্রূক্ষেপে প্রাণ দিতে পারে। ওথেলো যোদ্ধৃদলনেতা—সর্ব্বদা বিজয়ী, জীবনের সঙ্কট সময়ে তিনি শত ভীষণ যুদ্ধে—শত বিপদে অশনির মুখ হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার আশা, উদ্যম, সাহস অপ্রমেয়। ওথেলোর চরিত্রে নবীন যোদ্ধার চাঞ্চল্য নাই, কিন্তু দৃঢ় অধ্যবসায়—দৃঢ় আকাঙ্ক্ষার পুরুষোচিত গর্ব্বে তাঁহার চরিত্র উন্নত এবং সারবান্।

ওথেলো বীরপুরুষ, ওথেলো কালা আদমি। সাহারার উত্তপ্ত নিশ্বাসে আফ্রিকার অঙ্কে মুর জাতির আদি জন্মস্থান। সেস্থানের লোক সহজে নড়ে না, সহজে অভিভূত হয় না—পাহাড়ের ন্যায় অটল ও স্থির। সে দেশের মেঘ বৃষ্টি ভয়ঙ্কর; এ দেশের মত মৃদু মন্দ হাওয়ার সহিত জলক্রিয়া নহে। সে মেঘ বৃষ্টি আমরা অনুভব করিতে পারি না, তাহা সৃষ্টির মূল ধরিয়া আকর্ষণ করে। সে দেশের দৃঢ় পাহাড় ভিন্ন অন্য দেশের পাহাড় তাহার বেগ সহ্য করিতে পারে না। —সে দেশে নীল নভ যখন শান্ত, তখন তাহাতে মেঘলেশ নাই। মেঘ হইলেই তাহা বড় ভীষণ হয়। ওথেলোর চরিত্র সেই প্রকৃতির প্রতিকৃতি। আফ্রিকার যে পরিষ্কার প্রগাঢ় নীল নভঃ, ওথেলোর হৃদয়ও সেইরূপ নির্ম্মল। কুয়াসার

আধ অন্ধকার আকাশ সে দেশে কচিৎ দৃষ্ট হয়, ওথেলোর চিত্তেও ক্ষুদ্র ভাব, হীন সন্দেহ থাকিতে পারে না। To be once in doubt is to resolve. তাঁহার হৃদয়ে তবে যদি সন্দেহ হয়, তাহা অল্পকালব্যাপী, কিন্তু ঝড়ের ভীষণ ভাবগ্রাহী।

কবি এই যোদ্ধৃপুরুষের চরিত্রকে সন্দেহের অন্ধকার প্রতিফলিত করিয়া দেখাইলেন। সেই পাষাণময় শূরের চিত্তক্ষেত্রে লৌহরেখায় ডেসডিমনার সুন্দর প্রতিকৃতি খুদিলেন। একবার যাহা অঙ্কিত হইল, তাহা আর উঠিবার নহে—তাহা পাষাণে রেখা পড়িল। ওথেলো উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য সব ত্যাগ করিতে পারিতেন, কিন্তু ডেসডিমনাকে ভালবাসার পর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভাবনার নিম্ন সোপান অধিকার করিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি মুরের চরিত্র স্থির, গম্ভীর; বিপদে সে পাহাড় টলে নাই।

এই দৃঢ় চিত্তে ভালবাসা প্রগাঢ় আন্দোলন তুলিল, তাহার শক্তি মুরের প্রতি অস্থিমজ্জায় অনুভূত হইল। ডেসডিমনা তাঁহার নিকট লাবণ্যের খনি, প্রীতির সুধাপূর্ণ ক্ষেত্র। তিনি ডেসডিমনার মুখ দেখিয়া নরজন্ম বিস্মৃত হইলেন, ভীষণ ঝটিকায় বিপদগ্রস্ত হইয়া যখন ওথেলো তরণী হইতে অবশেষে কূলে নামিলেন, তখন ডেসডিমনাকে দেখিয়া তাঁহার যে প্রীতির উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল তাহা আফ্রিকা দেশের ঝটিকা—বিশ্ব আলোড়নকারী!—

"O my soul's joy!
If after every tempest come such calms,
May the winds blow till they have awaken'd death!
And let the labouring bark climb hills of seas,
Olympus high; and duck again as low
As hell's from heaven! If it were now to die,
'Twere now to be most happy; for, I fear,
My soul hath her content so absolute,
That not another comfort like to this
Succeeds in unknown fate."

এই সাধু প্রেমিকচিত্তে ইয়াগো পত্নীর প্রতি সন্দেহ জন্মাইয়া দিল। ওথেলোর সহজে সন্দেহ হয় নাই—তাহা স্পষ্ট প্রমাণীভূত হইল। ধূর্ত্ত ইয়াগো কৌশলে এরূপ ষড়যন্ত্র করিল, তাহাতে কে অলিকবিশ্বাস না হইবে? ওথেলো

ক্ষমা শান্তির পর্ব্বতবৎ। এই পর্ব্বতে প্রতিহত ভালবাসা ঝড় উঠাইল। ভালবাসা ভীষণতা প্রাপ্ত হইল, ওথেলো উন্মত্ত হইয়া বলিতেছে।

"O, now, for ever,
Farewell the tranquil mind : farewell content !
Farewell the plumed troop, and the big wars,
That make ambition virtue ! O, farewell !
Farewell the neighing steed, and the shrill trump,
The spirit-stirring drum, the ear-piercing fife,
The royal banner ; and all quality,
Pride, pomp, and circumstance of glorious war !
And O you mortal engines, whose rude throats
The immortal Joves dread clamours counterfeit,
Farewell ! Othell's occupation's gone !"

যাহার আজন্ম যুদ্ধ ব্যবসা, যুদ্ধের প্রতি শব্দে—প্রতি দৃশ্যের স্মৃতিতে যাহার অন্তঃকরণ বীরোচিত গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠে, তিনি একে একে সেই সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিদায় দিতেছেন।—এক একটি দৃশ্য—সেনানীর সজ্জা, কামান, গোলা, বিজয়নিনাদ স্মরণ করিয়া তৎসহ চিরগ্রথিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে তাঁহার যে ভীষণ চিত্তবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যোদ্ধা ভিন্ন কে বুঝিবে? আজন্ম যিনি কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষার সেবক, তিনি এ দুঃখ কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

এ বিপ্লবের মূল ভালবাসা—ভালবাসার নৈরাশ্য! ভালবাসা পর্ব্বত ভাঙ্গিতেছে,—চূর্ণ বিধ্বস্ত পাষাণখণ্ড রূপে তাঁহার জীবনরক্ষার উপাদান খসিয়া পড়িতেছে।

তিনি ডেসডিমনাকে যতদূর ভালবাসিতেন, এ সংসারে তাহা হইতে অধিক ভালবাসা অসম্ভব। ডেসডিমনাকে দেখিয়া শিশুর ন্যায়, কঠোর যোদ্ধৃনেত্র অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল, গর্ব্বিত বীরপুরুষ অদ্য রমণীর ন্যায় দুর্ব্বল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন—

"Had it pleased Heaven
To try me with affliction ; had he rain'd
All kinds of sores, and shames, on my bare head ;
Steep'd me in poverty to the very lips

Given to captivity me and my utmost hopes ;
I should have found in some part of my soul
A drop of patience : but (alas !) to make me
A fixed figure, for the time of scorn
To point his slow unmoving finger at,—
O ! O !
Yet could I bear that too ; well, very well:
But there, where I have garner'd up my heart ;
Where either I must live, or bear no life ;
The fountain, from the which my current runs,
Or else dries up ; to be discarded thence !"

সেই ডেসডিমনাকে কেসিও উপপত্নীভাবে ব্যবহার করিয়াছে শুনিয়া বিশ্বস্ত প্রেমিকের কণ্ঠরুদ্ধ হইল। তাঁহার চক্ষে সমস্ত হুলস্থূল, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। "When I love thee not chaos is come again.' যোদ্ধার ভীষণ আবেগে বাকাস্ফুরণ কষ্ট হইল, কেবল 'রক্ত' 'রক্ত' বলিয়া ভয়ানক অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন। কেসিওর একটিকে বধ করিয়া তাঁহার প্রতিহিংসার নির্ব্বাণ হইবে না।

"Had all his hairs been lives, my great revenge
Had stomach for them all."

যখন ডেসডিমনাকে দেখিলেন, তখন লাবণ্যময়ীর সরল অকপট চক্ষু দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস ফিরিল –

"If she be false, O, then Heaven mocks itself !—
I'll not believe it."

"স্বর্গ যদি মিথ্যা তবে কপট এ ছবি" ওথেলো দৃঢ় মুষ্টিতে ইয়াগোর গ্রীবা ধরিয়া বলিলেন—

"If thou dost slander her and torture me,
Never pray more : abandon all remorse :
On horror's head, horrors accumulate :
Do deeds to make heaven weep, all earth amazed,
For nothing canst thou to damnation add
Greater than that."

"ইহার নিশ্চয় প্রমাণ দেও" বলিয়া ওথেলো রুখিয়া উঠিলেন। ইয়াগো কৌশলে মিথ্যাকে সত্য করিল—ধ্রুব প্রমাণ দিল। সেই হইতে লৌহ-গন্ধের ন্যায় ওথেলোর চিত্ত আন্দোলিত হইল।

ডেসডিমনাকে বধ করিয়া যখন জানিতে পারিলেন তাহার পাপ ছিল না, সে সময় তাঁহার গভীর নৈরাশ্য কি ভীষণ ভাব ধারণ করিল! "হায় আমি মূর্খ কাফ্রিমত, ফেলাইয়া দিনু মণি করেতে তুলিয়া।"

যখন গ্রেসিয়ানো, ডেসডিমনার হত্যার পরে ওথেলোকে নিরস্ত্র হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে কহিতেছে, তখন মুর উচ্চ অথচ খেদপূর্ণ স্বরে কহিল—

"Behold! I have a weapon;
A better never did itself sustain
Upon a soldier's thigh : I have seen the day,
That, with this little arm, and this good sword,
I have made my way through more impediments
Than twenty times your stop :—But, O vain boast
Who can control his fate ? 'tis not so now.—
Be not afraid though you do see me weapon'd ;
Here is my journey's end, here is my butt,
And very sea-mark of my utmost sail.
Do you go back dismay'd ? 'tis a lost fear ;
Man but a rush against Othello's breast,
And he retires :—Where should Othello go ?
Now, how dost thou look now ? O ill-starr'd wench !
Pale as thy smock !'

মৃতা ডেসডিমনাকে দেখিয়া বলিতেছেন—

"Whip me, ye devils,
From the possession of this heavenly sight !
Blow me about in winds ! roast me in sulphur !
Wash me in steep down gulfs of liquid fire !"

"When we shall meet at compt,
This look of thine will hurl my soul from heaven,
And fiends will snatch at it."

ওথেলোর ভীষণ আত্মহত্যার সহিত পুস্তক সম্পূর্ণ।

ওথেলো আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক অদ্ভুত উদ্যমে রচিত। পাঠকের নিশ্বাস রুদ্ধ হয়, আফ্রিকা দেশের উষ্ণ তেজে তাঁহার পাদ হইতে শিরঃ পর্য্যন্ত উষ্ণ—অগ্নিময় হইয়া উঠে। রাত্রিকালে লৌহশকট ভীষণ অন্ধকার তোরণে ঠেকিয়া ঘোর বেগে স্খলিত ও বিধ্বস্ত হইলে যেমন হয়, নাটকের শেষাংশ পাঠে চিত্তে সেইরূপ ভয়ঙ্কর ঘাত প্রতিঘাতের ক্রিয়া হয়। ভাষা ও ভাবের এরূপ উন্মত্ত যুদ্ধ মানবজাতির অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থে আছে।

সেক্ষপীরের আকৃতি প্রতিভাব্যঞ্জক। আমরা তাঁহার সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলে অপার্থিব মনস্বিতার আভাস পাই। উন্নত এবং প্রশস্ত ললাটে তাঁহার উদার চিত্তের এবং ভাবুকতার ছায়া বিভাসিত; অধর সুচিক্কণ এবং প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক। কিন্তু নেত্রে যে তেজোবহ্নি অপ্রাণপ্রতিকৃতিতেও জাজ্বল্যমান, তাহাই তাঁহার প্রতিভা। পরিষ্কার মুখমণ্ডলে সরলতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এই ত্রিগুণমিশ্রিত স্বর্গীয় স্ফূর্ত্তির আভাস স্থূলচক্ষেও প্রতীয়মান হইবে। সমস্ত মুখের ভঙ্গী ঈষৎ দুঃখব্যঞ্জক। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে, সেই দুঃখদমনক্ষম আভ্যন্তরিক ইচ্ছাশক্তি স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

বলিয়াছি সেক্ষপীর ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি—তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। যে দেশেই যে প্রতিভা জন্মিয়াছেন, কি জন্মিবেন, তিনি সেক্ষপীরের তুল্য হইতে পারেন, কিন্তু উঁহার উর্দ্ধে মানবচক্ষুর দৃষ্টি যায় না—উঁহার উর্দ্ধে মানবকণ্ঠের ধ্বনি পৌঁছে না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

আওরঙ্গ্‌জেবের দরবার

(বৈদেশিক চিত্র)

আওরঙ্গ্‌জেব দিল্লীর শেষ প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট্। বাবর যে সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন, হুমায়ুন যাহার দৃঢ়তাসম্পাদনে যত্নশীল হন, আকবর যাহা সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করিয়া তুলেন, শাহজহাঁ যাহা সুব্যবস্থিত করিতে থাকেন, আওরঙ্গ্‌জেবের সময়ে সেই চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত বিশাল সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইবার সূত্রপাত হয়। আওরঙ্গ্‌জেব যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন মোগলের বিজয়পতাকা কাবুল হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত উড়িতেছিল; জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি রাজপুত-শ্রেষ্ঠেরা মোগলের জন্য এই সুবিস্তৃত রাজ্যরক্ষণ করিতেছিলেন; জনসাধারণ মোগলসম্রাট্‌কে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অংশস্বরূপ ভাবিয়া, যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ে অভিভূত হইতেছিল; কাবুলের পার্ব্বত্যপ্রদেশে, দিল্লীর দেওয়ানি-খাসে, দক্ষিণাপথের সমৃদ্ধস্থলে মোগলের গৌরব প্রকাশ পাইতেছিল। আওরঙ্গ্‌জেব এইরূপ বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া, শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার যেমন অসাধারণ গুণ, সেইরূপ অসাধারণ দোষও ছিল। যিনি বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, চিরকাল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, এক ভ্রাতাকে তরবারির আঘাতে ও অপরকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া নিষ্ঠুরতার একশেষ দেখাইয়া-ছিলেন, তাঁহার দুর্গতির সময়েও ইতিহাস তৎপ্রতি সমবেদনা প্রকাশে উন্মুখ হয় নাই। আওরঙ্গ্‌জেব যে কপটতাপ্রকাশ করিতেন, বাহিরে সৌজন্য প্রকাশ করিয়া ভিতরে ভিতরে অপরের সর্ব্বনাশসাধনের চেষ্টা পাইতেন, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্যে বিসর্জ্জন দিয়া দুরাচারের একশেষ দেখাইতেন, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, তিনি কোনও অপকর্ম্ম করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। এ অংশে দয়া ধর্ম্ম তাঁহার নিকট অপদস্থ ও অবমানিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, সহোদরই হউক, বা অন্য কেহ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হউক, আত্মসাধনার পথ নিষ্কণ্টক করিবার

জন্য তিনি অকাতরে তাহাদের শোণিতপাত করিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, তখন তাঁহার কার্য্যপ্রণালীও অন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তিনি, নিরুপদ্রব ও নিষ্কণ্টক হইয়া, সুনীতির সম্মান রক্ষায় তৎপর হইয়াছেন। গার্হস্থ্যধর্ম্মে তিনি নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। মহম্মদের প্রবর্ত্তিত নিয়মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কখনও অমিতাচারের বশীভূত হন নাই। সিরাজের যে সুপেয় মদিরায় জাহাঁগীরের প্রাসাদ নিরন্তর উল্লাসে পরিপূর্ণ থাকিত, যে মদিরা বাবরের ঘোরতর কষ্ট ও যাতনার উপশম করিত, আওরঙ্গজেব কখনও সে মদিরায় আকৃষ্ট হইতেন না। তিনি এক এক সময়ে ধার্ম্মিক মোল্লাদিগের সহিত আলাপে বা কোরাণপাঠে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মনিষ্ঠা বলবতী ছিল। তিনি প্রত্যহ পাঁচবার নিয়মিতরূপে উপাসনা করিতেন। আহারাদির সম্বন্ধেও তাঁহার কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না। তিনি অতি সামান্য আহার পানে পরিতৃপ্ত থাকিতেন। তিনি নিজ হস্তে টুপি প্রস্তুত করিতেন, নিজে আবেদনকারীদিগের সমস্ত আবেদন পড়িতেন এবং নিজে তাহাতে আপনার অভিপ্রায় লিখিয়া দিতেন। তাঁহার যেমন লিপিকুশলতা সেইরূপ শ্রমশীলতা ছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান বিষয় সকল তিনি স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিতেন। শাসনসংক্রান্ত কোনও সামান্য বিষয়ও তাঁহার অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হইত না। তিনি সকল বিষয়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার মিতাচারিতা, তাঁহার কার্য্যপটুতা, তাঁহার তীক্ষ্ণদর্শিতা ও তাঁহার অভিজ্ঞতা তদানীন্তন সময়ে প্রশংসার অদ্বিতীয় বিষয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। অনেক বিষয়ে সম্রাট্ আগষ্টসের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। আগষ্টসের ন্যায় তিনি চতুর, কপট, উন্নতাকাঙ্ক্ষ ও ক্রূরপ্রকৃতি ছিলেন। আত্মবাসনার পরিতৃপ্তি হইলে সম্রাট্ আগষ্টসের ন্যায় তিনিও সহিষ্ণুতা, নম্রতা ও লোকহিতৈষিতার পরিচয় দিতেন। তাঁহার মনোবৃত্তি সকল যদি সংযতভাবে থাকিত, তাহা হইলে তিনি ইতিহাসে অধিকতর উচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারিতেন। যৌবনে তিনি যেরূপ দুঃশীলতা ও ক্রূরতার পরিচয় দিয়াছেন এবং বার্দ্ধক্যে যেরূপ সন্দিগ্ধতা ও অসমদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রে গভীর কলঙ্কের ছায়াপাত হইয়াছে। দুর্নিবার লোভের বশীভূত হইয়া নানাবিধ

অপকর্মের অনুষ্ঠান না করিলে আওরঙ্গজেব সম্রাট আকবরের পার্শ্বে স্থানপরিগ্রহ করিতে পারিতেন। কেবল দুর্নিবার আত্মলোভের পরিতৃপ্তি-বাসনাতেই তিনি অনেকবার দয়া ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এই লোভ যদি সংযত হইত, তাহা হইলে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্ব ইতিহাসে অধিকতর সম্মান ও অধিকতর গৌরবের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিত।

এই পরাক্রান্ত সম্রাটের রাজত্বের সম্বন্ধে এক্ষণে কতিপয় বিষয় লিখিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ দুইটি প্রধান নগরের উল্লেখ করা আবশ্যক। আকবর ও শাহজহাঁর সময়ের ন্যায় আজও এই দুই নগর ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মোগলের আধিপত্যের সময়ে উহা শিল্পচাতুরীতে, সৌভাগ্য শ্রীতে এবং ধনসম্পত্তিতে সমগ্র ভারতে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রতাপান্বিত মোগল উহার মণিমাণিক্যবিভূষিত সুভামণ্ডপের সুসজ্জিত রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া যে আদেশ প্রচার করিতেন, তাহাতে কাবুল হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত সমগ্র সাম্রাজ্যের জনসাধারণ নতশির হইয়া থাকিত। ঐ দুই নগরের একটি আগ্রা ও অপরটি দিল্লী।

আওরঙ্গজেব কখনও কোনও স্থানে স্থায়ীরূপে বাস করিতেন না। তিনি সময় মত কখনও আগ্রা বা কখনও দিল্লীতে থাকিতেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মোগলের সময়ে আগ্রা ধনসম্পত্তির মহিমা ও সুদৃশ্য প্রাসাদ সমূহের গরিমায় সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা লোহিত প্রস্তরের প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল, এবং ইহাতে সত্তরটি মসজিদ, আটশতটি স্নানাগার, পনরটি বাজার, আশিটি পান্থনিবাস সর্ব্বদা লোকারণ্যের অপূর্ব্বশোভা বিকাশ করিয়া দিত। এতদ্ব্যতীত ইহাতে আমীর-উমরাহদিগের সুদৃশ্য সৌধাবলী ছিল। আগ্রা এই সকল সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া পারস্যের চিরপ্রসিদ্ধ ইস্পাহান-কেও গৌরবে ও সমৃদ্ধিতে অধঃকৃত করিত। যমুনার তীরে সম্রাটের প্রাসাদ ছিল। এই প্রাসাদ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ইহাতে প্রবেশের জন্য চারিটি প্রধান দ্বার সর্ব্বদা রক্ষিবর্গে সুরক্ষিত থাকিত। প্রাসাদের এক অংশে একখানি সুদৃশ্য স্বর্ণসিংহাসন ছিল। দিল্লীর দেওয়ানি খাসের চির-প্রসিদ্ধ ময়ূরসিংহাসনের ন্যায় এই সিংহাসনও শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব্ব বিকাশ ক্ষেত্র ছিল। ৪। ৫টি প্রধান পথ ব্যতীত আগ্রার অন্যান্য ভাগে অতি সঙ্কীর্ণ

পথ থাকিলেও এবং ঐ সকল সঙ্কীর্ণ পথের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহসকল অতি সামান্য হইলেও, তাজমহল প্রভৃতিতে আগ্রার গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল।

আগ্রা হইতে দিল্লীতে যাইতে হইলে পথিককে একটি সরল সুপ্রশস্ত পথ অবলম্বন করিতে হয়। এই প্রশস্ত রাজপথ সম্রাট জাহাঁগীরের আদেশে প্রস্তুত হইয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্ব অশ্বত্থ নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষাবলীতে সুশোভিত। আগ্রার ন্যায় দিল্লীও প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের বহির্ভাগে যমুনার তীরে একটি প্রশস্ত উদ্যান ছিল। এই স্থলে সম্রাটের অশ্বসমূহের চালনাকৌশল প্রদর্শিত হইত। নগরে দুইটি সুপ্রশস্ত পথ ছিল। এতদ্ব্যতীত ৫।৬টি শাখাপথ বাহির হইয়া নগরপরিবেষ্টনের সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। লোহিত প্রস্তরের মস্‌জিদ ও শাহজঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগম সাহেবের পান্থনিবাসই দিল্লীর প্রধান অট্টালিকা বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই মস্‌জিদে সম্রাট্ প্রতি শুক্রবার উপাসনার্থ গমন করিতেন। ঐ সময়ে পথিপার্শ্বে সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ থাকিত। এবং বহুসংখ্যক ভিস্তিদ্বারা পথের ধূলিরাশি নিঃশেষিত করা হইত। পান্থনিবাস প্রধানতঃ পারস্য প্রভৃতি দেশের বণিক্‌গণে পরিপূর্ণ থাকিত। এই সকল বণিক্ বাণিজ্যব্যবসায়প্রসঙ্গে মধ্য এসিয়া হইতে দিল্লীতে উপনীত হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেন।

প্রতিদিন সম্রাটের দরবারে যেরূপ আড়ম্বর হইত, সেরূপ আড়ম্বর ও সাজসজ্জা চতুর্দ্দশ লুইর দরবারেও দেখা যাইত না। প্রাতঃকালে সম্রাট্ গবাক্ষদ্বারে উপনীত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাদিগের বাসনা চরিতার্থ করিতেন। ১১টা এবং ৬টার সময় অধিরাজবর্গ দরবারগৃহে সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত কেহই রাজকার্য্যে অনুপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। যদি কেহ অনুপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এক মাসের মাহিনা দণ্ড হইত। দরবারে সুসজ্জিত হস্তিসকল পরিদর্শনার্থ শ্রেণীবদ্ধ রাখা হইত। কাবুল ও আরব হইতে যে সকল সুদৃশ্য অশ্ব আসিত, তৎসমুদায় ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাকিত। এতদ্ব্যতীত এসিয়া বা ইউরোপ হইতে যে সকল আগন্তুক অভ্যাগত আসিতেন, তাঁহারাও অভিবাদনজন্য উপস্থিত থাকিতেন। এই সকল ব্যতীত রাজকার্য্য উপলক্ষেও প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইত। ভিন্ন ভিন্ন সুবার কার্য্যপরি-

দর্শনার্থ ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। সোমবার লাহোর, দিল্লী এবং আগ্রার কার্য্য হইত। মঙ্গলবার কাবুল, বুধবার বাঙ্গালা এবং পাটনা, বৃহস্পতিবার গুজরাট, শনিবার দক্ষিণাপথের রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা হইত। শুক্রবার বিশ্রাম দিন ছিল। এই পবিত্র দিনে সম্রাট্ উপাসনার্থ পারিষদবর্গের সহিত মস্‌জিদে গমন করিতেন। দরবারের দৃশ্য অতি হৃদয়াকর্ষক ছিল। বিদেশী পর্য্যটক বর্গ এই দৃশ্যে এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা উহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে আপনাদের লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিতে বিমুখ হন নাই। দরবারে অধিরাজগণের প্রত্যেকের বহুসংখ্যক অনুচর শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিত। অদূরে সুসজ্জিত হস্তী, সুদৃশ্য ঘোটক ও সুরম্য পাল্কি সকল শোভা বিকাশ করিত; বিচারপ্রার্থী বহুসংখ্যক লোক নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সুবিচারের প্রতীক্ষা করিত এবং আগন্তুকবর্গ বিনীতভাবে সিংহাসনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া উপহারসমর্পণপূর্ব্বক সম্মান প্রদর্শন করিত। মধ্যে মধ্যে বাদকদল মধুরস্বরে বাদ্য করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের চিত্তবিনোদন করিত। দরবারে ভারতবর্ষের সকল অংশ হইতেই এবং ইউরোপ ও মধ্য এসিয়ার প্রধান প্রধান দেশ হইতে লোক সকল উপস্থিত হইত।

প্রতিবৎসর একবার করিয়া সম্রাটের তুলা হইত। প্রকাশ্য দরবারে সমবেত জনগণের সমক্ষে মোগল সম্রাট্ তুলাদণ্ডের একদিকে বসিতেন. অপরদিকে স্তূপাকার স্বর্ণ রৌপ্য রাখা হইত। প্রতিবর্ষে তুলার সময়ে সম্রাটের দেহের গুরুত্ব যদি অধিকতর হইত, তাহা হইলে তাঁহার আহ্লাদ ও সন্তোষের অবধি থাকিত না। এতদ্ব্যতীত আমীর উমরাহ ও অধিরাজবর্গের অন্তঃপুরবাসিনী সুন্দরীগণ নৌরজার বাজারে 'আপনাদের সৌন্দর্য্যগরিমার পরিচয় দিতেন। সুন্দরীবর্গের সুসজ্জিত বিপণিতে উপনীত হইয়া সম্রাট্ প্রতি দ্রব্যের দর জিজ্ঞাসা করিতেন। বিক্রয়কারিণী আঁটা আঁটি করিয়া মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিত। এই ক্রয় বিক্রয়ের প্রসঙ্গে সুন্দরীগণের কোমল কণ্ঠধ্বনির সহিত সম্রাটের গম্ভীর স্বর মিশিয়া সমস্ত বাজার এক অপূর্ব্ব ধ্বনিতে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিত। সম্রাট্ ও অতি বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত আর কেহই এই বাজারে প্রবেশ করিতে পারিতেন না।

এক সময়ে পাঁচ জন দূত বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন উপায়ন লইয়া

সম্রাটের সভায় সমাগত হন। মক্কার সেরিফ আরবের কতিপয় সুদৃশ্য অশ্ব ও একগাছি অতি পবিত্র সম্মার্জ্জনী পাঠাইয়া দেন। এই সম্মার্জ্জনী মক্কার প্রসিদ্ধ মস্‌জিদে ব্যবহৃত হইত। ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের নিকট এই স্থান অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। এই পবিত্র স্থানের সম্মার্জ্জনীও পবিত্রতায় ধার্ম্মিক মুসলমানের নিকট আদরণীয়। এতদ্ব্যতীত আরব এবং বসোরার ভূপতি কতকগুলি সুন্দর ঘোটক প্রেরণ করেন। চতুর্থ উপায়ন আবিসিনিয়ার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভূপতির নিকট হইতে উপস্থিত হয়। সুগন্ধদ্রব্যপূর্ণ বৃষশৃঙ্গ, সুদৃশ্য হস্তিদন্ত, একটি জীবিত জেব্রা ও ২৫ জন ক্রীতদাস এই সকল উপহারের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যাহারা এই উপহার লইয়া আসিতেছিল, পথে তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। কয়েকজন ক্রীতদাস সুরাটে আসিতে পরলোক গত হয়। জেব্রাটিও মরিয়া যায়। এই সময়ে শিবজি দক্ষিণাপথে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। তিনি সুরাট আক্রমণ করিয়া আবিসিনীয় ভূপতির প্রেরিত লোকদিগের অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লন। এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া আবিসিনীয় দূতগণ জেব্রার চর্ম্ম, ৬টি ক্রীতদাস ও শূন্য বৃষশৃঙ্গ লইয়া দিল্লীতে উপনীত হয়। কিন্তু সম্রাট্ ইহাদের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেন নাই। দরবারের এক জন অমাত্য অনেক চেষ্টা করিয়া সম্রাটের সহিত ইহাদের একবার দেখা মাত্র করিয়া দেন। তিনি ইহাদিগকে শিরোপা একখানি মণিখচিত অস্ত্র ও নগদ ৬ হাজার টাকা দিয়া বিদায় করেন। সর্ব্বশেষ উপহার দ্রব্য পারস্যের শাহ হইতে সমাগত হয়। সম্রাট এই উপহার অতি আদরের সহিত গ্রহণ করেন। যাঁহারা এই উপহারদ্রব্য লইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অনেক আয়োজন হয়। ইহাঁরা যে যে রাস্তার অতিবাহন করিয়া যাইবেন, তৎসমুদয় সুসজ্জীভূত করা হয়। অশ্বারোহিগণ ইহাঁদের গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে থাকে। অমাত্যগণ ইহাঁদিগকে অভিনন্দন করিয়া আনিবার জন্য গমন করেন। ইহারা উপস্থিত হইলে কামানধ্বনি হইতে থাকে। এদিকে দেওয়ানি খাস নানাবিধ মণিমুক্তাসুশোভিত হয়। প্রতীচ্য ভূখণ্ডের শিল্পচাতুরী ও প্রাচ্য রাজ্যের সমৃদ্ধি উভয়ই একত্র হইয়া দরবারের অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করে। দরবার গৃহের ৩২টি মার্ব্বল প্রস্তরের

স্তম্ভ বিবিধ কারুকার্য্যে খচিত হয়। মধ্যস্থলে সুবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রাচ্ছাদিত এক খানি কৌচের উপর সম্রাটের যুদ্ধাস্ত্র সকল স্থাপিত হয়। অমাত্য ও অধিরাজগণের নির্দ্দিষ্ট স্থানের সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভে পর্য্যায়ক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র সকল সাজাইয়া দেওয়া হয়। সম্রাটের সিংহাসনপ্রান্ত হইতে ৬ ইঞ্চ প্রশস্ত একটি কৃত্রিম জলপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে। এই জলপ্রবাহের এক প্রান্তে দর্শনার্থী ব্যক্তি নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন। ইঙ্গিতপ্রাপ্তি মাত্র ইহাকে সিংহাসনপ্রান্তে উপনীত হইয়া অভিবাদন করিতে হয়। পারস্যের দূত ২৫টি অশ্ব, ২০টি উষ্ট্র ও বহুমূল্য কার্পেট এবং মৃগনাভি লইয়া এই অপূর্ব্ব সভামণ্ডপে সম্রাট্ সকাশে সমুপস্থিত হন। পারস্যাধিপতির পত্র সম্রাট্ স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করেন। দরবারে অমাত্যগণ উপহার দ্রব্যের মনোহারিত্বে চমৎকৃত হন। সম্রাট্ দূতগণকে সমুচিত আদর করিয়া বিদায় দেন।

অক্টোবরের শেষভাগ হইতে মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সম্রাটের যুদ্ধ ও মৃগয়াযাত্রার সময় ছিল, ইহাতেও আড়ম্বরের একশেষ হইত। এই সময়ে আগ্রা ও দিল্লী প্রায় লোকশূন্য হইয়া পড়িত। সম্রাট যেন একটি চলিষ্ণু নগর লইয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেন। সর্দ্দার ও অমাত্যগণ আপনাদের হস্তী, ঘোটক অনুচর সমস্ত সঙ্গে লইতেন। মহাজনেরা যত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিত, সমস্ত লইয়া যাত্রা করিত। মুদী আপনার দ্রব্যসম্ভার লইয়া এই অপূর্ব্ব যাত্রীর দলে মিশিত। যখন সম্রাট্ একস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমনে উদ্যত হইতেন, তখন সহস্র সহস্র লোক শৃঙ্খলারক্ষার জন্য নিয়োজিত হইত। পূর্ব্বে একজন প্রধান কর্ম্মচারী, সম্রাটের শিবিরসন্নিবেশের স্থান নির্দ্দেশ করিতেন। যদি সম্রাট্ কোনও স্থানে ২।৩ দিন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে অবস্থিতিস্থল অতি যত্ন ও মনোযোগের সহিত নির্দ্দিষ্ট হইত। রোমকেরা এই অংশে আপনাদের কৌশলের যেরূপ পরিচয় দিত, মোগল সম্রাটের শিবিরনির্দ্দেশের কৌশলও তদপেক্ষা ন্যূনতর ছিল না। পূর্ব্বে এক দল অস্ত্রধারী লোক যাইয়া উন্নতাবনত ভূমি সকল সমধরাতলে পরিণত করিত। তাহার পর সহস্র সহস্র কুলি তাম্বুসন্নিবেশে নিযুক্ত হইত। সম্রাটের তাম্বুসমূহের বিভিন্ন অংশে দরবারের স্থান, গোশল খানা, গোপনীয় মন্ত্রণাস্থান সমস্তই

নির্দ্দিষ্ট থাকিত। ইহার কিছু দূরে সম্রাটের বাসের জন্য তাম্বু সন্নিবেশিত হইত। এই তাম্বুর চারিদিক ফুলকরা সাটিনের কানাতে এবং মৎস্যপত্তনের প্রসিদ্ধ বস্ত্রে পরিবেষ্টিত থাকিত। এই তাম্বুর পার্শ্বে সম্রাটের বেগমদিগের মহল নির্দ্দিষ্ট হইত। ইহার কিছুদূরে অমাত্যদিগের তাম্বু এবং সম্রাটের অশ্বশালা থাকিত। সুদৃশ্য অশ্বশালায় সম্রাটের ঘোটক সকল সাটিনের রজ্জুতে আবদ্ধ করা হইত। অশ্বশালার পার্শ্বে পশুশালা থাকিত। পশুশালা ব্যাঘ্র, মহিষ, নীলগাভি, চিতাবাঘ, প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ থাকিত। এই সকল তাম্বুর পার্শ্ব দিয়া একটি প্রশস্ত পথ নির্দ্দিষ্ট হইত। পথের পার্শ্বে বাজার বসিত। এতদ্ব্যতীত আমীর ও মন্‌সবদারদিগের তাম্বু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজার সকল যথাযোগ্যস্থলে থাকিত। পথ ও তাম্বু চিনিয়া লইবার জন্য স্থানে স্থানে রক্তবর্ণের পতাকা ও তিব্বত দেশীয় বৃষের চামর সকল বংশযষ্টির উপর বাঁধিয়া রাখা হইত। সন্নিবেশিত তাম্বুসমূহের চারিদিক গড়খাই করা থাকিত। মৃণ্ময় প্রাচীরের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামান সকল সন্নিবেশিত হইত। সমস্ত সন্নিবেশভূমির পরিমাণ তিন হইতে ছয় মাইল পর্য্যন্ত হইত, এবং অন্যূন দুইলক্ষ লোক এই অপূর্ব্ব নগরে বাস করিত। স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, রাত্রিপ্রভাতের অনেক পূর্ব্বে তাম্বু তোলা হইত। প্রথমে বড় বড় কামান সকল প্রকাশ্য পথ দিয়া লইয়া যাওয়া হইত। কিন্তু সম্রাট আপনার পরিষদবর্গ এবং শিবিরের অন্যান্য লোক ও ছোট ছোট কামান লইয়া গ্রামসমূহের পার্শ্বস্থ ময়দান দিয়া যাইতেন। ইহাতে শস্যাদি সমূলে বিধ্বস্ত হইত। কোন জঙ্গল অতিক্রম করিতে হইলে, অবিলম্বে উহার মধ্য দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইত। নদী অতিক্রম করিতে হইলে, নৌসেতু প্রস্তুত হইত। এইরূপ বহুসংখ্যক লোক ও বহুবিধ দ্রব্য লইয়া যাইবার সময় সময়ে সময়ে সাতিশয় গোলযোগ ঘটিত। অশ্বারোহিদিগকে সময়ে সময়ে ৬।৭ ফুট উচ্চ তৃণের জঙ্গল ভাঙ্গিয়া যাইতে হইত; উট, টাটু, গোরু, নদী পার হইবার সময়ে চোরা বালিতে পড়িয়া মরিয়া যাইত; হাতী সকল কখন কখন কর্দ্দমে পড়িয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত। অন্তঃপুরসুন্দরীগণ বিপুল লোকারণ্যের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। এই ভাবে যাত্রার পর যখন আবার শিবির সন্নিবেশের আদেশ ঘোষণা হইত, তখন বিশৃঙ্খলা গোলযোগ

পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইত। প্রথমে সম্রাট্ ও বড় বড় আমীর উমরাহ-দিগের তাম্বু সন্নিবেশিত হইত। অশ্ব প্রভৃতির আগমনে ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত, বড় বড় কামানধ্বনিতে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইত, এবং উহার ধূমরাশিতে নির্দ্দিষ্ট স্থান বা নির্দ্দিষ্ট লোক চিনিয়া লওয়া ভার হইত। রাশি রাশি পাল্কি হাওদা ইত্যাদি পড়িয়া থাকিত। সন্ধ্যাসমাগমে অসংখ্য আলোক জ্বালা হইত। নির্দ্দিষ্ট স্থল চিনিয়া লইবার জন্য বিভিন্ন বর্ণের আলোক সন্নিবেশিত হইত। প্রসিদ্ধ ফরাসী ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তিনি এক সময়ে তাম্বুর কানাত ও রজ্জুরাশি চাপা পড়িয়া গিয়াছিলেন। বৎসরের পাঁচ মাস প্রতি সপ্তাহে সাম্রাজ্যের অনেক স্থলে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শকবর্গের নয়নগোচর হইত। ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ ইহার চিত্তবিমোহিনী বর্ণনায় স্বদেশীয়দিগকে চমৎকৃত করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহারা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন আপনাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, তখন অনেকেই মোগলের অতুল সমৃদ্ধির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। প্রাসাদে, লোকালয়ে, বাজারে সর্ব্বদা আন্দোলন হইত যে, ভারতের প্রতাপান্বিত মোগল যখন মৃগয়ায় বহির্গত হন, তখন তাঁহার বহুসংখ্যক স্ত্রী, বহুসংখ্যক সন্তান, বহুসংখ্যক পারিষদ, বহুসংখ্যক গৃহপালিত ও বন্যপশু এবং এক লক্ষ অনুচর সমভিব্যাহারে যান। বিদেশী ভ্রমণকারিদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে বিদেশের জনসাধারণ এইরূপ চমকিত ও বিস্মিত হইয়াছিল। অসাধারণ ক্ষমতাশালী মোগল আপনার অসাধারণ সমৃদ্ধির মহিমায়, ইউরোপবাসিদিগকে এইরূপ স্তম্ভিত ও মোহিত করিয়াছিলেন। ফলত, দিল্লীর মোগল সম্রাট্ এক এক সময়ে যেরূপ আড়ম্বরের পরিচয় দিতেন, তাহাতে ফ্রান্সের চিরপ্রসিদ্ধ বিলাসী ভূপতিদিগের বিলাসসজ্জাও অধঃকৃত হইত। এইরূপ ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি-বলেই লোকে দিল্লীর চিরস্মরণীয় মোগলের সহিত সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অভেদ কল্পনা করিয়া "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনিতে চারিদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত।

ক্রমশঃ।

অমর-সঙ্গীত

[এলাহাবাদে জাতীয় মহাসমিতির চতুঃ
অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত ।]

এখনো কে আছ অবসন্ন প্রাণ,
উঠ, জাগ—শোন ভারত-সন্তান,
মর্ত্ত্যভূমে আজি কি অমর গান
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায় ;
দেখহ চাহিয়া কিবা অনুরাগে,
কি সিদ্ধি লভিতে, কোন্ মহাযাগে,
শত শত প্রাণী মিলিয়া প্রয়াগে
প্রমত্ত আজি এ মহাপূজায় !

ভেদিয়া নিবিড় অভেদ্য আঁধার,
অনন্ত আকাশে যেন পূর্ব্বাশার
ভাতিবে কি রবি তেজঃপুঞ্জাকার—
সমগ্র ভারতে কাঁপিছে গান ;
শত শত প্রাণী বৈষম্য ভুলিয়া,
অপূর্ব্ব বিস্ময় পুলকে পূরিয়া,
প্রতীক্ষায় তাই আছে দাঁড়াইয়া
সে পদে কি অর্ঘ্য করিবে দান।

বুঝি সে আলোকে ঘুচাতে বিষাদ
স্বর্গ হ'তে ঝরি আসে আশীর্ব্বাদ,
সমগ্র ভারতে ছুটিছে সংবাদ,
চরাচর সুখী হইবে তায়—
এখনো কে আছ অবসন্ন প্রাণ,
উঠ, জাগ—শোন ভারত-সন্তান,
মর্ত্ত্যভূমে আজি কি অমর-গান
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায়!

ব্যাপিয়া অনাদি অনন্ত সময়,
দেখ কত জাতি এই বিশ্বময়,
এ শুভ মুহূর্ত্ত করিয়া আশ্রয়
জাগিল, গাহিল অমর-গান;
দিব্য মুখজ্যোতি অমনি হেরিয়া,
কোটি কোটি প্রাণী বিস্ময়ে পূরিয়া,
সসম্ভ্রমে সবে চাহিল ফিরিয়া—
দেখিয়া হইল মোহিত প্রাণ।

অমর-দুর্লভ অনন্ত সুরস
নরকণ্ঠে উঠি অমর সুযশ
ছাইল অবনী ব্যাপি' দিক্‌দশ
প্রতিধ্বনি ল'য়ে খেলিল বায়;
সন্তান-নিকর অমর-বাঞ্ছিত
জয়-মাল্য গলে হাসিল ত্বরিত,
অপূর্ব্ব আলোকে দিক্ বিভাসিত—
দীপ্ত-গ্রহ-বিভা মলিন তায়।

অতুলিত স্নেহ প্রকাশি' জননী—
ফল-ফুল-শস্তে শোভিত ধরণী—
ল'য়ে সুতচয়ে বুকেতে আপনি
পোষিলা—জগত আনন্দময় ;
দিব্যালোক ব্যাপ্ত হইল এ ভুবি,
দীপ্ত গ্রহ গেল সে আলোকে ডুবি,
ভুতলে ধ্বনিল অমর-দুন্দুভি,
ভূলোকে ঘোষিল দ্যুলোক জয়।

মহিমা-মণ্ডিত বৃটনের বরে,
'আসে কি সেদিন ভারত ভিতরে,
শত শত প্রাণী তাই যোড়করে
দাঁড়াইয়া সবে রোমাঞ্চ কায়—
এখনো কে আছ অবসন্ন প্রাণ,
উঠ, জাগ—শোন ভারত-সন্তান,
মর্ত্তাভূমে আজি কি অমর-গান
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায় !

ক্ষুদ্র তন্ত্রীগত ক্ষীণপ্রাণ বীণে,
নীরব কেন রে এ মহান্ দিনে,
ক্ষুদ্র কণ্ঠে ডাকি' নবীন প্রবীণে
গাহিতে কি নাহি বিপুল আশ ;
সম্মিলিত-তন্ত্রী মধুর ঝঙ্কার
নাহি কি শুনিতে বাসনা তোমার,
কেন তবে ক্ষুণ্ণ হৃদয়ের ভার,
কেন তবে প্রাণে এ হেন ত্রাস ?

এস ডাকি তাই হিন্দু মুসলমান,
এস বৌদ্ধ জৈন পারসী খৃষ্টান,
এ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে করি' গাত্রোত্থান
বন্ধুভাবে মিলি' সবে দাঁড়াই ;
এ প্রাণ পূরিয়া অপূর্ব্ব আশায়
করি স্তুতিগান অমর ভাষায়,
তমঃপুঞ্জ ভেদি' যদি এ উষায়
সে রবি উদয় দেখিতে পাই !

এ জীবন তবে করিবারে জয়
মুহূর্ত্তে পারিব, কি আছে সংশয়,
প্রাণের ঔদাস্য হইবে বিলয়,
লভিব জগতে নবীন প্রাণ ;
সে রবি-কিরণে মোহিয়া ভূতল,
মাতৃ-প্রেমোচ্ছ্বাস-পূর্ণ শতদল
ফুটিবে হৃদয়-সরসে নির্ম্মল—
জগতে ছুটিবে সুরভি ঘ্রাণ।

অষ্টাবিংশ কোটি কণ্ঠে তুলি' লয়
গাহিতে পারিলে জননীর জয়,
জাগে কি জীবনে মরণের ভয়,—
অসার সংসার ভাবনা ছার—
মহাযজ্ঞ মাতৃ-ক্লেশ-বিমোচন,
মাতৃপূজা কোটি কোটি দেবার্চ্চন,
ইহ-পর-লোকে কি আছে তেমন
বাঞ্ছিত নরের বল না আর ?

এস ডাকি তাই পারসী খৃষ্টান,
এস বৌদ্ধ জৈন হিন্দু মুসলমান,
ভুলি' জাতিগত দ্বেষ্য অভিমান
এ মহা উৎসবে ডুবিয়া যাই ;
একই মাতৃগর্ভে জনম লভিয়া,
রাজ-কুল-রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া
একচ্ছত্র রাজ্যে শাসিত হইয়া,
একত্র কেন না হইব ভাই ?

শুভক্ষণে দেখি সুমঙ্গলময়
আজি এ ভারতে মহা অভিনয়,
প্রফুল্ল বদনে বলি' জয় জয়
জাগ নারী নর পুলক-প্রাণ ;
রাখি পূর্ণ কুম্ভ, রচি আম্রসার
সুশোভিত কর গৃহ—গৃহদ্বার,
প্রীতি-নীরে ধুয়ে কর পুনর্ব্বার
পবিত্র মাতার পূজার স্থান।

অষ্টাবিংশ কোটি কণ্ঠে তুলি' লয়
এস সবে গাহি জননীর জয়,
জীবনে না'রবে মরণের ভয়,
অসার সংসার ভাবনা ছার—
মহাযজ্ঞ মাতৃ-ক্লেশ-বিমোচন,
মাতৃপূজা কোটি কোটি-দেবার্চ্চন,
ইহ-পর-লোকে কি আছে তেমন
বাঞ্ছিত নরের বল না আর ?

গাঢ় তমঃপুঞ্জ সমাচ্ছন্ন দিশি,
কাটিয়াছে বহু সুপ্ত ঘোর নিশি,
আঁধারের সাথে গিয়াছিল মিশি
প্রাণের সাধনা, কামনা, বল;
পূরবে নিরখি কনক কিরণ,
জাগিয়া আবার আজি কত জন;
মেলিয়া নবীন প্রফুল্ল নয়ন
হেরিছে সমগ্র ধরণী তল।

মহিমা-মণ্ডিত বৃটনের বরে
আসিছে সুদিন ভারত ভিতরে,
দাঁড়াইয়া আজি তাই যোড় করে
দেখ কত প্রাণী রোমাঞ্চ কায়;
এখনো কে আছ অবসন্ন প্রাণ,
উঠ, জাগ,—শোন ভারত-সন্তান,
মর্ত্তাভূমে আজি কি অমর-গান
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায়!

ভারতে দাসত্ব প্রথা

দাসত্বপ্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই জগতে বর্ত্তমান আছে। উহা ১৮৩৩ খৃঃ অব্দ হইতে মহাত্মা উইল্‌বারফোর্সের যত্নে ইংরেজাধিকৃত প্রদেশ হইতে উঠিয়া যায়। ক্রমে এক্ষণে ইউরোপীয় কোন জাতিই আর ঐ প্রথার অনুমোদন করেন না, বরং সুযোগ পাইলে উহা যাহাতে একেবারে তিরোহিত হয়, তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এমন কি, কনস্তান্তিনোপলের যবন সম্রাট্ ও তাঁহাদের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া আর প্রকাশ্যরূপে ঐ প্রথার প্রতি পক্ষপাতিতা দেখাইতে পারেন না। এইত গেল ইউরোপের বৃত্তান্ত। আফ্রিকা প্রদেশে মিসর ও ইউরোপীয়দিগের অধিকৃত প্রদেশ ব্যতীত সর্ব্বস্থলেই উহা অতি ভীষণরূপে বিরাজমান। অনেক চেষ্টা যত্ন হইতেছে, কিন্তু উহা তিরোহিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব। আমেরিকা ও আসিয়া মহাদ্বীপে উহা এখনও অনেক স্থলে বর্ত্তমান। ভারতবর্ষে এখন উহার প্রচার নাই বটে, কিন্তু এককালে ছিল। কিন্তু কিরূপে ছিল, কত কাল ছিল ও কোন্ সময়ে ছিল ইত্যাদি বিষয়ের বিচারের নিমিত্ত আমরা অদ্যকার প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। বারান্তরে এ বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করা যাইবে।

"দাস" এই শব্দটি অতি প্রাচীন। এমন কি ঋগ্‌বেদেও উহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্তকারেরা বলেন যে, উহা দানার্থক 'দাস' ধাতু হইতে উৎপন্ন। যাহা হউক, উৎপত্তির কথা এখন থাকুক, উহার প্রয়োগের বিচার করা যাউক। দাস এক্ষণে ধীবরজাতিবাচক ও "দাসী' এই শব্দের সহিত (অর্থাৎ দাস, দাসী) ব্যবহৃত হইলে কর্ম্মকর অর্থাৎ বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কর্ম্মকারী ব্যক্তিকে বুঝায়। প্রাচীনেরা শুশ্রূষক (he who serves any person) দিগকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সেই পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে চারি শ্রেণীর লোকেরা শুভকর্ম্মকর। অবশিষ্ট এক

শ্রেণীর লোক অশুভকর্ম্মকর এবং তাহারাই দাস বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এখনকার "খানসামা" প্রভৃতি লোকেরা যে সকল কর্ম্ম করে, প্রাচীনেরা সেই সমস্ত কর্ম্মকে "অশুভ" ও তদতিরিক্ত কর্ম্মকে "শুভ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। যাহারা তখন এখনকার ন্যায় বেতন গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করিত, তাহারা 'ভৃত্য' বলিয়া অভিহিত হইত।

"শুভকর্ম্মকরা হেতে চত্বারঃ সমুদাহৃতাঃ।
জঘন্যকর্ম্মভাজস্তু শেষা দাসা স্ত্রিপঞ্চকাঃ॥
কর্ম্মাপি দ্বিবিধং প্রোক্তমশুভং শুভমেব চ।
অশুভং দাসকর্ম্মোক্তং শুভং কর্ম্মকৃতঃ স্মৃতং।*

প্রাচীনদিগের মতে 'দাস' পঞ্চদশ প্রকার।

নারদ বলেন—

"গৃহজাত [১] স্তথা ক্রীতো [২] লব্ধো [৩] দায়াদুপাগতঃ [৪]।
অন্নাকালি ভৃত [৫] স্তাবদাহিতঃ [৬] স্বামিনা চ যঃ॥
মোক্ষিতো [৭] মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধে প্রাপ্তঃ [৮] পণেজিতঃ [৯]।
তবাহ মিত্যুপগতঃ [১০] প্রব্রজ্যাবসিতঃ [১১] কৃতঃ [১২]॥
ভক্তদাসশ্চবিজ্ঞেয় [১৩] স্তথৈব বড়বাকৃতঃ [১৪]।
বিক্রেতা [১৫] চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ (১) গৃহজাত, গৃহে উৎপন্ন, নিজদাসীগর্ভজাত ; (২) ক্রীত, মূল্যদ্বারা স্বীকৃতঃ, ; (৩) লব্ধ, দানাদিদ্বারা প্রাপ্ত ; (৪) দায়সূত্রে প্রাপ্ত অর্থাৎ কুলক্রমাগত দাস ; (৫) দুর্ভিক্ষকালে (নিজ) অন্নদ্বারা রক্ষিতপ্রাণ ; (৬) আহিত— যাহাকে তাহার স্বামী বন্ধক দিয়াছে, (আধিশব্দের অর্থ বন্ধক, বন্ধকী দ্রব্য) (৭) মহৎ ঋণদায় হইতে মোক্ষিত ও সেই সূত্রে মোচয়িতার 'দাস্য' করিতে স্বীকৃত ; (৮) যুদ্ধে প্রাপ্ত ; (৯) পণে জিত—'যদি এই বিচারে আমি পরাস্ত হই তাহা হইলে আমি তোমার দাস হইব' এই প্রতিজ্ঞাসূত্রে দাসীকৃত ব্যক্তি ;

* এই চারি প্রকারের লোক শুভকর্ম্মকর বলিয়া খ্যাত এবং অবশিষ্টেরা দাস ও জঘন্য কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা ১৫ শ্রেণীতে বিভক্ত। কর্ম্ম দুই প্রকার ; শুভ ও অশুভ। শিষ্যাদি চতুষ্টয়েরা শুভ কর্ম্ম ও দাসেরা অশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে।

(১০) আমি তোমার—তুমি আমাকে পালন কর—এইরূপ বলিয়া উপস্থিত ব্যক্তি; (১১) প্রব্রজ্যা—আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট, কর্ম্মদোষে স্খলিত; (১২) কৃত—আমি তোমার নিকট এতকাল দাস থাকিব ইত্যাদি সময়বন্ধপূর্ব্বক স্বীকৃত-দাস্ত ব্যক্তি; (১৩) ভক্তদাস, গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত স্বীকৃতদাস্থ; (১৪) বড়-বাকৃত, কোন ব্যক্তির দাসীকে উপভোগ করিবার লোভে দাসত্ব করিতে স্বীকৃত ব্যক্তি (১৫) আত্মবিক্রয়ী—এই পঞ্চদশ প্রকার ব্যক্তি দাস নামে অভিহিত।

উপরি উক্ত নারদবচনপাঠে স্পষ্টই বোধ হয় যে, পূর্ব্বে দাসক্রয়প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। যৎকালে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা একচক্রা নগরে বাস করেন, সেই সময় তাঁহারা যে ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন পূর্ব্বকৃত সময়ানুসারে বক রাক্ষসের নিকট সেই ব্রাহ্মণের একটি মনুষ্য প্রেরণ করিবার পালা উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজের পরিবার বর্গের মধ্য হইতে কাহাকে রাক্ষসের মুখে প্রেরণ করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল ও অনুতাপ করিয়া বলিতে লাগিল—'হায়! যদি অর্থ থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য ক্রয় করিয়া পাঠাইতে পারিতাম' ইত্যাদি (মূল মহাভারত দেখ) ব্রাহ্মণের এই কথায় স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, তৎকালে ভারতবর্ষের স্থলবিশেষে মনুষ্য ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

পাশ্চাত্য দর্শন

ব্যাপ্তি স্থির করিবার উপায়।

ভূয়োদর্শন—প্রতীক্ষা ও পরীক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ন্যায় বাক্যের মধ্যে যে দুইটি ব্যাপারের কথা বলিয়াছি, এখন তাহার কিঞ্চিৎ ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। ভূয়োদর্শন দ্বারা ব্যাপ্তি স্থির করিতে হয়, তদ্ব্যতীত লিঙ্গপরামর্শ কিম্বা সদৃষ্টান্ত উদাহরণ কিছুই প্রয়োগ করা যায় না, এবং অনুমিতির উদ্দীপনা করাও অসাধ্য হয়। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এস্থলে ভূয়োদর্শন কার্য্যের প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহাদিগের উপায়ান্তরও ছিল না। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তদ্বিষয়ে নিয়ম পূর্ব্বক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং পাঠক যতই কেন প্রাচীন মতের পক্ষপাতী হউন না, সেই সকল উপায়ের কথা শ্রবণ করিলে, তৎপ্রতি কখনই তাচ্ছল্য করিতে পারিবেন না। কেন না উদ্দিষ্ট কার্য্য অর্থাৎ ব্যাপ্তিস্থিরকরণ বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিশেষ উপায় এবং যুক্তিসঙ্গত নিয়ম প্রদর্শিত হইলে স্বভাবতই তাহা অপরিত্যাজ্য হইবে। বিশেষতঃ ভূয়োদর্শনই যখন সেই উপায়ের অঙ্গ, তখন তাহার প্রতিও কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। অতএব এখনকার কথা এই, যে ভূয়োদর্শনের মধ্যে বিশেষ কোন ব্যবস্থা হইতে পারে কি না।

ব্যাপ্তি বিষয়ে স্বয়ং শাস্ত্রকারেরাই বলিয়াছেন, যে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক দর্শন করিয়া ব্যাপ্তিস্থির করিতে হইবে। বহ্নি এবং ধূমের অন্বয় দেখিয়া উভয়ের অন্বয়ব্যাপ্তি স্থির হয়, এবং হ্রদ ও ধূমহীনতা দেখিয়া স্থির করা যায় যে উহাতে ধূমও নাই অগ্নিও নাই। এইটি ব্যতিরেকব্যাপ্তির অঙ্গ। কিন্তু প্রাগুক্ত অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি একত্রিত করা দুষ্কর। হ্রদের বাষ্পকে ধূম বলিয়া সংশয় হইতে পারে। অতএব তাহার মীমাংসা কিসে হইবে? ন্যায়শাস্ত্রের উত্তর ভূয়োদর্শন। কিন্তু আর একটুকু

বিস্তার করিয়া বিবেচনা করিলে বলিতে পারা যায়, যে প্রকাণ্ড হ্রদে নৌকা-রোহণপূর্ব্বক গমন কর, এবং এইরূপ করিয়া ধূমাকার বাষ্প মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিবে, যে গাত্রের বস্ত্র বাষ্পদ্বারা আর্দ্র হইয়াছে। তখন অনায়াসেই বুঝিবে যে হ্রদে সত্যই ধূমের অভাব হইতেছে বটে। পরন্তু এস্থলে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলেন, যে পাকশালাতে যেরূপ করিয়া দেখা হয়, আর হ্রদোত্থিত বাষ্প যে প্রকারে দেখিবার প্রস্তাব করা গেল, তন্মধ্যে বিভেদ আছে। এক স্থলে তুমি কেবল দর্শনক্রিয়া সম্পাদন কর, অন্যত্র তোমাকে দর্শনোদ্দেশে আর কতকগুলি প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমোক্ত ক্রিয়াতে যে অন্বয় বা ব্যতিরেকের স্থল দেখা যায়, শেষোক্ত প্রক্রিয়াতে তাহার নিত্যানিত্যতা পরীক্ষা করিতে হয়। একটির দ্বারা ব্যাপ্তি প্রতীক্ষা করা হয়, অন্যটির দ্বারা অর্থাৎ প্রক্রিয়াবিশিষ্ট, দর্শনস্থলে ব্যাপ্তি পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হয়। জগতের নানা স্থানে দর্শন করিতে করিতে স্বভাবসিদ্ধ অন্বয়ব্যাপ্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ ব্যতিরেকব্যাপ্তি দুইই দেখা যায় বটে, কিন্তু সেই ভূয়োদর্শনকে চেষ্টাধীন করিতে পারিলে ব্যাপ্তিপরিগ্রহের কাল সংক্ষেপ করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ কোনস্থলে যদি অন্বয় ব্যাপ্তির মধ্যে কারণের জটিলতা থাকে, তবে উল্লিখিত মতে চেষ্টা করিলে এক একটি কারণ ব্যতিরিক্ত করিয়া দেখিতে পারা যায় এবং তাহার দ্বারা অন্বয় ও ব্যতিরেক বিষয়ক নিয়ম শীঘ্রই প্রতীয়মান হয়। তাদৃশ চেষ্টা অভাবে কখন যে ব্যতিরেকব্যাপ্তি স্বভাবতঃ দৃষ্টিপথে পড়িবে, তাহার স্থিরতা থাকে না। আর প্রতীক্ষা ও পরীক্ষা মধ্যে কালের ব্যবধান বাহুল্য হইলে আবার স্মৃতি-বিস্মৃতি-জনিত অবরোধ আসিয়া বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অতএব ব্যাপ্তিস্থির করিবার জন্য ভূয়োদর্শন করিবার যে আদেশ আছে, তাহা দুই প্রকারে নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য; যথা—প্রতীক্ষা ও পরীক্ষা। উভয় কার্য্যেই প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হয়। কেবল পরীক্ষা স্থলে দর্শক স্বকীয় চেষ্টার দ্বারা কারণ, বিশেষের অন্বয় বা ব্যতিরেক সংঘটনপূর্ব্বক কার্য্য পরিদর্শন করেন। ডাঃ ব্যালান্টাইন সাহেব ইংরাজি Observation শব্দের পরিবর্ত্তে প্রতীক্ষা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং আমি তাঁহারই অনুসরণ করিলাম। বাঙ্গালা ভাষাতে প্রতীক্ষাশব্দে "অপেক্ষা" বা কালবিলম্ব বুঝায়। কিন্তু এ স্থলে লক্ষ্য বিষয়ের লক্ষণ বা অবস্থা ও গতি বা

পরিবর্ত্তন যত্নপূর্ব্বক দর্শন করাকেই প্রতীক্ষাপদে ব্যক্ত করা গেল। প্রত্যক্ষ করণ, নিরীক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ, প্রভৃতি শব্দ সমূহ অপেক্ষা "প্রতীক্ষণ" শব্দই ইংরাজি Observation শব্দের সন্নিহিত বোধ হইতেছে। আর সচেষ্টা পরীক্ষাকরণ অর্থে ইংরাজী Experiment শব্দের পরিবর্ত্তে "পরীক্ষা" শব্দই যথাযোগ্য হইবে। ব্যালান্টাইন সাহেবও উক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। রজ্জুদর্শনে সর্পভ্রম জন্মিলে সেই ভ্রম কেবল প্রতীক্ষা দ্বারা সুচারুরূপে বিমোচিত হইতে পারে না বলিয়া যে পরীক্ষা করিবার বিধান আছে, সেই পরীক্ষার সহিত উল্লিখিত পরীক্ষার কোন বিভেদ নাই। ফলতঃ ভূয়োদর্শনের দুই অঙ্গ— প্রতীক্ষা ও পরীক্ষা। এতদ্বয় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে ভূয়োদর্শন হইবে। তদভাবে ব্যাপ্তিস্থির হইতে পারে না।

তর্কসংগ্রহকার অন্নভট্ট লিখিয়াছেন—

"২৭। আদ্য পতনাসমবায়ি কারণং গুরুত্বং পৃথিবী জলবৃত্তি।"

আদ্য পতনের অসমবায়ী কারণ গুরুত্ব। উহা পৃথিবী এবং জলের বৃত্তি।

গুরুত্ব বিধায় পতন হয় বটে। কিন্তু পতন ব্যতীত অন্য ঘটনার দ্বারাও গুরুত্ব জানিতে পারা যায়। গুরু বস্তু ধারণ করিলেই গুরুত্ব অনুভূত হয়। উহার পতনশীলতা সহজে ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া পড়ে। ইহা অভ্যাস জন্যও নহে, ভ্রমসঙ্কুলও নহে। প্রত্যুত, কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন, যে মাংসপেশীর স্বধর্ম্ম হইতেই গুরুত্ব বোধ হইয়া থাকে। পেশীমধ্যে এইরূপ যে গুণ আছে, তাহা ইন্দ্রিয় বৃত্তির অনুরূপ। ফলতঃ সে কথার বিচার না করিয়াও বলিতে পারা যায়, যে প্রস্তাবিত প্রত্যক্ষ বিষয় ত্বগেন্দ্রিয়সংসৃষ্ট কার্য্য বিশেষ। কিন্তু এই প্রকারে যে গুরুত্ব জ্ঞান হয়, তাহাতে গুরুত্বের পরিমাণ পরিস্ফুটরূপে উপলব্ধ হয় না। দুইটি গুরু বস্তুর মধ্যে অল্প প্রভেদ থাকার স্থলে, ঐরূপ তুলনার দ্বারা কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত ভারবিশিষ্ট, তদ্বিষয়ক জ্ঞান সহজে উৎপন্ন হয় না। ত্বগিন্দ্রিয় বল কি পেশীজাত ইন্দ্রিয়ই বল, কিছুতেই ঐ কথা বুঝা যায় না এবং গুরু বস্তুর পতনকার্য্য দ্বারাও প্রস্তাবিত জ্ঞানলাভ হয় না। কেন না, পতন কার্য্যের দ্বারা গুরুত্বের তারতম্য অবধারণ কেহই করে না। করিতে হইলে পতনের কাল মাপিতে হয়। কিন্তু তাহার বিষয়েও পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা অভিনব কথা বলিয়াছেন। এই বিষয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা

সংক্ষেপতঃ একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, যে একটি পালক ও একটি মুদ্রা সমান গতিতে তুল্য সময়ে নিপতিত হয়। প্রাচীন অধ্যাপকগণ বলিবেন, যে ইহাতে উল্লিখিত যন্ত্রঘটিত কোন অবরোধ আছে। বাস্তবিক তাহা নহে। তাহার কথা পরে বলিব। পরন্তু এখন তাহার বিচার না করিয়াও এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে প্রাগুক্ত পরীক্ষা প্রত্যক্ষ ব্যাপার বটে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে বায়ুর অবরোধ হেতু পতন কালের তারতম্য ঘটে, সেই অবরোধ না থাকিলে লঘু গুরু সকল বস্তু সমান গতিতে ভূপতিত হইবে। আর মনে কর যে প্রাচীন অধ্যাপকের মতে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ ব্যাপারে এক-প্রকার বাধজনিত। কিন্তু যন্ত্রের অবরোধই মনে কর, কি বায়ুর অবরোধই স্বীকার কর, প্রস্তাবিত তর্ক দ্বারা অগত্যা সংশয়চিত্ত হইতে হইবে। সুতরাং গুরুত্ব বিচার স্থলে পতনকার্য্য দর্শন দ্বারা কোনও ফলোদয় হইবে না। এইরূপ স্থলে তুলাযন্ত্র দ্বারাই গুরুত্বের ন্যূনাতিরেক প্রত্যক্ষ করিতে হয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইবে, যে সহজ উপায়ে গুরুত্বের যে ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান হয়, তাহা ব্যাপ্তি প্রতীক্ষা হইতে লঘু বটে, অথচ অসম্পূর্ণ দর্শন। তুলাযন্ত্র ব্যবহার রূপ পরীক্ষা বা চেষ্টাধীন প্রক্রিয়া নিয়োগ ব্যতীত এস্থলে ব্যাপ্তিস্থির হয় না। এতাবতা ভূয়োদর্শনার্থ প্রতীক্ষা, পরীক্ষা উভয়ই প্রয়োজন হইতেছে।

অন্নভট্ট লিখিয়াছেন, গুরুত্ব পৃথিবী ও জলের বৃত্তি। অর্থাৎ বায়ুর গুরুত্ব নাই। পাশ্চাত্যগণ পরীক্ষাদ্বারা এই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি অপ্রামাণ্য করিয়াছেন এবং বায়ুরও গুরুত্ব আছে এই অন্বয়ব্যাপ্তি সপ্রমাণ করিয়াছেন। এ স্থলে পরীক্ষার আধিক্য বিশিষ্টরূপে বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এই পরীক্ষার বিষয়ে পাশ্চাত্য গ্রন্থে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাহা না শুনিলে অধ্যাপক মহাশয়দিগের বিশ্বাস প্রগাঢ় হইবে না।

এতদ্বিষয়ে প্রথমতঃ আরিস্ততলের মনেই সংশয়ের উদয় হইয়াছিল। তিনি এক চর্ম্মের থলি (স্থলী) বায়ুপূর্ণ ও বায়ুশূন্য করিয়া তৌল করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ পরীক্ষাকার্য্য হইতে সমান ফল দেখিয়া সংশয় ত্যাগ করিলেন। এবং প্রাচীন সংস্কারে যে বায়ুর গুরুত্ব নাই, তাহাই প্রচলিত থাকিল। এই কার্য্য পরীক্ষা শ্রেণীতে গণনীয় বটে। চর্ম্মের থলি বায়ুশূন্য করাতে ব্যতিরেকব্যাপ্তি অন্বেষণ করা হইল। কিন্তু ইহাতে একটি ভুল

থাকিয়া গেল। সচরাচর তুলাযন্ত্র দ্বারা যে ওজন করা হয়, তাহাতে উভয় দিকের তুলিত বস্তুর সঙ্গে অগত্যা কিয়ং পরিমাণে বায়ুও তৌল হইয়া যায়। বাটীর উপর যে কেবল তুলিতব্য বস্তু থাকে, তাহা নহে; তদ্ব্যতীত বায়ুও থাকে। এখন একটি বাটীতে একটি বায়ুপূর্ণ থলি এবং আর এক বাটীতে একটি সমান-ভার থলি বায়ুশূন্য করিয়া দিলে, আপাততঃ মনে হয় বটে যে একদিকে মাত্র বায়ু থাকিল, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাটীর উপরিস্থিত বায়ু উভয়দিকেই সমান থাকে। এক বাটীতে থলির অভ্যন্তরে যতটুকু বায়ু থাকে, আর একটিতে থলির বহির্ভাগে তাহাই থাকে। সুতরাং থলি দুইটি সমান হইলে বায়ুপূর্ণ ও বায়ুশূন্য থলির মধ্যে ওজনের প্রভেদ হয় না।

আরিস্ততলের পরে গালিলিও উল্লিখিত সংশয় নিবন্ধন আর একটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি একটি শূন্যগর্ভ বর্ত্তুল সামান্যরূপ বায়ুপূর্ণ অবস্থাতে তৌল করেন। আবার তদন্তর্গত বায়ু চাপন দ্বারা ঘন করিয়াও ওজন করেন। ইহাতে ওজনের প্রভেদ অবশ্যই হইয়া থাকিবে। কিন্তু কোন অপরিজ্ঞাত কারণ বশতঃ গালিলিও এই পরীক্ষাফলের বিষয়ে কোন আন্দোলন করেন নাই। অবশেষে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ অটোগেরিক Otto Guericke নামক এক ব্যক্তি বায়ুশোষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। এবং তাহা হইতেই বায়ুর গুরুত্ব সপ্রমাণিত হয়। সেই পরীক্ষার বৃত্তান্ত বলিবার পূর্ব্বে বায়ুশোষণ যন্ত্রের বিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

পিচকারির গঠন ও কৌশল সকলেই অবগত আছেন। অতএব যদি বলা যায় যে দমকল ও জলতোলা কল পিচকারির রূপান্তর মাত্র, তাহা হইলে জ্ঞানের বাধ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ থাকিবে না। তদনন্তর ইহাও উপলব্ধি হইতে পারিবে, যে বায়ুশোষণ যন্ত্র কেবল জলতোলা কলের রূপান্তর মাত্র। অতএব এই মাত্র বলিয়াই অটোগেরিকের পরীক্ষা এবং তৎসংসৃষ্ট বায়ুর গুরুত্ব বিষয়ক বিচার করা যাইতে পারে।

তথাচ প্রাগুক্ত বিষয় আরও কিঞ্চিৎ পরিষ্কারভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। পিচকারীতে কি কি আছে? প্রথম, একটি ছিদ্র—যদ্দ্বারা জল পিচকারিতে প্রবেশ করে। উহার নাম থাকুক প্রবেশদ্বার। দ্বিতীয়তঃ, পিচকারির নল আছে, উহাতে প্রবিষ্ট জল ধারণ করে। তৃতীয়তঃ,

একটি দণ্ড থাকে, তাহা টানিলে প্রবেশদ্বার দিয়া জল প্রবেশ করে; আর উহা চাপিলে, উক্ত দ্বার দিয়া জল নির্গত হয়। এখন পিচকারির একটি রূপান্তর ভাবনা কর; নলের তলদেশে যেমন প্রবেশদ্বার নামক ছিদ্র আছে, মনে কর, যেন দণ্ডের তলদেশে ঐরূপ আর একটি ছিদ্র থাকিল। তাহার নাম থাকুক উত্তোলনদ্বার। আর দুইখণ্ড চর্ম্ম দুইটি ছিদ্রের মুখে এমন করিয়া আঁটিয়া দেও, যেন চর্ম্ম দুইখানি পুস্তকের পত্রের ন্যায় এক দিকে আবদ্ধ থাকিয়া উঠিতে পড়িতে পারে। আর প্রবেশদ্বারটি নিম্ন ভাগে থাকে এবং দণ্ড উপরিভাগে থাকে এমন করিয়া পিচকারি লম্বভাবে স্থাপন করিলে যাহাতে চর্ম্মের পাতা দুখানা উপরের দিকে খুলে এবং নীচে পড়িলে ছিদ্র দুইটি বন্ধ হইয়া যায় এইরূপ ব্যবস্থা কর। অনন্তর কোন পাত্রস্থিত জলের * মধ্যে পিচকারির প্রবেশদ্বার সংস্থাপন করিয়া উহার দণ্ড টান। টানিলে প্রবেশদ্বারের চর্ম্ম খুলিয়া যাইবে, কিন্তু উত্তোলনদ্বার বন্ধ থাকিবে। আর দণ্ড যত উপরে উঠিবে, নলটি নিম্নস্থ জল * দ্বারা ততই পূর্ণ হইতে থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, দণ্ড চাপ। এখন প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইবে ও উত্তোলনদ্বার খুলিয়া যাইবে এবং নলস্থিত জল * দণ্ডের উপরে উঠিবে। তৃতীয়তঃ, দণ্ড আবার টান। এখন দণ্ডের উপরে যে জল * আছে, তাহা উপরে উঠিতে পারিবে। এখন এই জল * অন্য কোন পথ দিয়া অনায়াসে নির্গত করা যাইতে পারে এবং ইহাই জলতোলা কলের কৌশল।

পরন্তু উপরে যে জলতোলা কলের বিবরণ দেওয়া গেল, উহা দ্বারা বায়ুশোষণ বুঝিবার নিমিত্ত আর কিছুই করিতে হইবে না। বায়ুনিকাশন যন্ত্র কেবল এই মনে করিতে হইবে, যে কেবল যে পাত্রের বায়ু শোষণ করিতে হইবে, তাহা সর্ব্বতোভাবে আবরিত আছে, এবং প্রবেশদ্বার ব্যতীত সেই পাত্রে বায়ু চলাচলের আর কোন পথ নাই। তাহার পর মনে কর পিচকারি উপরিলিখিত মতে স্থাপিত করা গেল। এখন উপরিলিখিত বিবরণে যে যে স্থানে 'জল' শব্দ (* চিহ্ন দেখ) প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে 'বায়ু' পাঠ করিলে বায়ুশোষণ যন্ত্রের কার্য্য বুঝা যাইবে।

পরিশেষে মনে কর যে একটি বোতলের মুখে একটি চর্ম্মের নল সংযুক্ত করা গেল, আর সেই চর্ম্মের নলের শেষভাগে প্রাগুক্ত বায়ুর গুরুত্ব-নির্ণয়-

কৌশল বিশিষ্ট একটি পিচকারি স্থাপন করা গেল। এতদ্দ্বারা বোতলের বায়ু সর্ব্বতোভাবে আবরিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত চর্ম্মের থলি বায়ুপূর্ণ কিম্বা বায়ুশূন্য হইলে উহার কলেবর যেরূপ হ্রাস বৃদ্ধি পায়, বোতলে বায়ু পূর্ণ কিম্বা শোষিত হইলে সেরূপ ঘটনা হইবে না। বাস্তবিক দেখা গিয়াছে যে এইরূপ কৌশল দ্বারা হাপিস করিলে কিয়ৎকাল পরে পিচকারির দণ্ড উত্তোলন করা বহু আয়াসসাধ্য হয়। তখন বোতলের মুখের চর্ম্মনল রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া বায়ুশোষণ যন্ত্র স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। আর দেখা গিয়াছে যে এতাদৃশ বায়ুশূন্য বোতলের ওজন বায়ুপূর্ণ অবস্থা অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বায়ুর ঘনত্ব হ্রাস বৃদ্ধি না হইয়া বায়ু সাধারণ অবস্থাতে থাকিলে, ঘন ১ ফুট পরিমাণ বায়ুর ওজন ১¼ ঔন্স অর্থাৎ ২॥ কাঁচ্চা মাত্র। ইহাও ঐরূপ পরীক্ষাফলন্ত হইতে প্রতীক্ষিত হইয়াছে।

নৈয়ায়িক মহাশয় অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, যে বায়ুর গুরুত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য বায়ুপূর্ণ ও বায়ুশূন্য পাত্র ওজন করা আবশ্যক, কিন্তু সতর্ক থাকিতে হইবে, যে বায়ুর ন্যূনাতিরিক্ত হইবার সঙ্গে পাত্রের কলেবরও সঙ্কুচিত বা স্ফীত না হয়। অর্থাৎ কোন কঠিন বস্তু নির্ম্মিত পাত্র আবশ্যক। কিন্তু তাদৃশ পাত্রকে বায়ুশূন্য করা সহজ নহে, যন্ত্র ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। অথচ প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া ব্যতীত বায়ুশূন্য বোতলের গুরুত্ব বিষয়ে ব্যতিরেকব্যাপ্তি স্থিরীকৃত হয় না। সুতরাং উল্লিখিত যন্ত্রের প্রক্রিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

এতদ্দ্বারা কএকটি কথা স্থিরীকৃত হইতেছে, কেবল প্রতীক্ষারূপ ভূয়োদর্শন দ্বারা প্রাগুক্ত জ্ঞানলাভ হইতে পারে না, পরীক্ষা আবশ্যক। পরীক্ষার নিমিত্ত যন্ত্রাদি নির্ম্মাণও আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং এইরূপে ভূয়োদর্শন দ্বারা বায়ুর গুরুত্বের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এই তথ্য দ্বারা এক অভিনব ব্যাপ্তি স্থির হইয়াছে এবং প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের একটি ভ্রম ব্যক্ত হইয়াছে।

আর বায়ুর গুরুত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য যে যন্ত্রের কথা প্রকাশ করা গেল, তদুপলক্ষে আর একটি কথা ব্যক্ত হইবে। বলা গিয়াছে, যে পালক ও মুদ্রার পতনশীলতা সমান, অথচ গুরুত্ব সমান নহে। ইহা বায়ুনিষ্কাসন যন্ত্রের পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। এবং উক্ত যন্ত্রে যদি কোন বাধ না থাকিল, তবে মানিতে হইবে এস্থলেও একটি নূতন ব্যাপ্তি স্থির হইয়াছে। বায়ু

ব্যতিরেকেই সমান পতনশীলতা ঘটনা হয়। অসমান পতন কেবল বায়ুজন্যই ঘটে।

ভূয়োদর্শনের দ্বিবিধ অঙ্গ; যথা—প্রতীক্ষা এবং পরীক্ষা। একথাটি পাশ্চাত্য দর্শনের অঙ্গ হইলেও ইহা অবলম্বনের প্রতি সম্ভবতঃ আর আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু এতদ্বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলে অভিনব হেতুবাদ ব্যক্ত হইবে। পরীক্ষার লক্ষণ এইমাত্র, যে পরীক্ষাস্থলে মনুষ্যের স্বকৃত আয়োজন দ্বারা প্রতীক্ষার উদ্ভাবন করা হয়। ইহাতে দুইটি উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। এক স্বভাবতঃ প্রতীক্ষা কার্য্যের দ্বারা অগ্রে যে কোন ব্যাপ্তিলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার অন্বয় বা ব্যতিরেক স্থল সংঘটন করিতে হয়। করিয়া ঐ ব্যাপ্তির পরীক্ষা করিতে হয়। কিন্তু এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। অনেক স্থলে পরীক্ষার প্রক্রিয়াদিতে আবার নূতন পরীক্ষার স্থল উদ্ভূত হইয়া থাকে। মনে কর বায়ুর গুরুত্ব নাই এই ব্যাপ্তিমূলক কথার পরীক্ষা হইতে প্রাচীন সংস্কার অপ্রামাণ্য হইয়া নূতন ব্যাপ্তি স্থির হইল বটে, কিন্তু আবার সেই সঙ্গে তৃতীয় কথা একটি স্থিরীকৃত হইয়া গেল; যথা—ঘন এক ফুট পরিমিত বায়ুর ওজন সামান্য অবস্থাতে ২॥ কাঁচ্চা মাত্র হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বে কোন সংশয় বা ব্যাপ্তিজ্ঞান ছিল না। কেহ কখন এমন মনে করে নাই, যে যদি বায়ুর গুরুত্ব থাকে, তবে তাহার পরিমাণ কত। অধিক কি, যদি বায়ুশূন্য বোতলের লঘুত্ব দেখিয়াই দর্শকেরা নিশ্চিন্ত হইতেন, তাহা হইলেও উল্লিখিত কথা নির্দ্ধারিত হইত না। কিন্তু প্রস্তাবিত পরীক্ষাদ্বারা পূর্ব্বকালীন ব্যাপ্তিজ্ঞান পরিত্যক্ত হইয়াই আবার এই নূতন প্রতীক্ষার স্থল উদ্ভব হইল, যে বায়ুর আয়তন ও গুরুত্বের সমবায় অমুক প্রকার। এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিলে ব্যক্ত হইবে, যে ভূয়োদর্শনার্থে যেরূপ পরীক্ষা করা আবশ্যক বলিয়াছি, সেই পরীক্ষাতে বাধের সংশয় থাকিতে পারে বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে পরীক্ষাতে বাধের অভাব স্বীকার করিলে ভূয়োদর্শনের অভিনব স্থলও উপস্থিত হইতে থাকে। আর যদি এইরূপ প্রতীক্ষালব্ধ জ্ঞান অন্যত্র অভিনব প্রত্যক্ষ বা ভূয়োদর্শন দ্বারা সপ্রমাণিত হয়, তবে প্রাগুক্ত বাধের প্রাথমিক পরীক্ষাতে যে সংশয়াভাব স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ় হইয়া উঠিবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

সমালোচন

গীতারহস্য। শ্রীনীলকণ্ঠ মজুমদার প্রণীত, মূল্য এক টাকা এক আনা মাত্র। বিজ্ঞাপনে গ্রন্থপ্রকাশক গিরীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন—"গীতা শাস্ত্র-সিন্ধুমথনোত্থিত অমৃতস্বরূপ। শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শনাদি শাস্ত্রে যে সকল তত্ত্ব নিরূপিত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে, একমাত্র গীতা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই সে সমস্ত অবগত হওয়া যায়।" আমরা ঠিক তাহা বলি না, কিন্তু ইহা স্বীকার করি, যে ঐ সকল তত্ত্বের মধ্যে যাহা জানিবার যোগ্য, তাহা একমাত্র গীতা শাস্ত্রেই পাওয়া যাইতে পারে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে গীতা সকল হিন্দুর অধ্যয়নীয় বটে। কিন্তু অধ্যয়ন পক্ষে অনেক বিঘ্ন, তাহা গিরীন্দ্র বাবু এইরূপে বুঝাইয়াছেন—"শব্দবোধ মাত্র হইলেই গীতার মর্ম্মবোধ হয় না। গীতার অর্থবোধ অতি দুরূহ। এই জন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ গীতার মর্ম্মব্যাখ্যার্থে ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী করিয়া গিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্য ও স্বামিকৃত টীকার ভাবার্থ বোধ হইলে, নিশ্চয়ই গীতারহস্য উদ্ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আজ কাল ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে অনেকেই সংস্কৃত বুঝেন না, বা বুঝিতে পারেন না। তাহার উপর আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শিক্ষার স্রোত ভিন্নমুখে প্রবাহিত হওয়ায় ইংরাজি দর্শনাদির সহিত কথঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য দেখিলেই তাঁহারা শাস্ত্রীয় কথার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতে সাহস পান। এটি বড় কুলক্ষণ। প্রধানতঃ তাঁহাদের এই ভ্রম নিবারণ করিবার উদ্দেশেই শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয় গোপীমোহন ভট্টাচার্য্য ন্যায়-লঙ্কার এম, এ, ও বিনোদবিহারী বসু এম, এর কথোপকথনচ্ছলে গীতার প্রকৃত মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এক এক দিনে এক এক অধ্যায়ের সুগভীর তত্ত্ব সকল অতি সরল ভাষায় ও সহজ কথায় ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।"

গীতারহস্যে গীতার মর্ম্মার্থ কিরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহা আমরা দু এক কথায় বলিতে অনিচ্ছুক এবং দু এক পাতা উদ্ধৃত করিলেও তাহা বুঝান যাইবে না; পাঠক নিজে না এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন না।

BHAGAVADGITA, BEING A LECTURE DELIVERED AT A MEETING OF THE HIMALAYA UNION CLUB, SIMLA. BY RADHANATH BASAK, B. A. PRICE EIGHT ANNAS.

নীলকণ্ঠ বাবুর গীতারহস্য বাঙ্গালা ভাষায়, আর রাধানাথ বাবুর গীতা-রহস্য ইংরাজিতে। রাধানাথ বাবু প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিকা লিখিয়া গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের একে একে পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পরে ঈশ্বরস্বরূপ, প্রকৃতি, সত্ত্বাদি তিন গুণ, মানবপ্রকৃতি, মুক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বুঝাইয়াছেন। রাধানাথ বাবুর ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত হইলেও অতিশয় বিশদ। যাঁহারা ইংরাজিতে না পড়িলে কিছুই বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে রাধানাথ বাবুর এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পড়িতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করি। তাঁহারা দেখিবেন, যে ইংরেজ ব্যাখ্যাকারদিগের অপেক্ষা রাধানাথ বাবুর ব্যাখ্যা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। ইহার উপসংহারভাগ বিশেষ মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয়। তাঁহার প্রবন্ধের শেষ কয় ছত্র আমরা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যে রাধানাথ বাবুর ব্যাখ্যা অতি বিশদ, অথচ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

"The process of spiritual culture, commencing with the state when a man appears to be busy in all the affairs of the world, and ending with the state when the mind is fitted to hold constant communion with God, consists in the direction of the mind being turned from the external to the internal. A man who has attained to this state, is said, in the Gita, to be above works. From the commencement of spiritual culture, with the first glimpse of faith, to the state of constant communion with God, there are clearly two peculiar phases; to external appearance the first is a busy life; the second, a comparatively secluded life. In regard to the internal state, the first shows the state of war with passions, their subjugation, the predominance of the highest motives in the performance of works tending to the welfare of men in general, a view of all mankind with an equal eye in regard to the relationship of God as father, and a state of increasing happiness in consequence of internal peace. The second shows constant equanimity of mind and entire devotion to God.

During the whole period of these stages, there is only one force at work—that of faith, holding God always in view. Man has to do nothing more than to leave himself to God and then God does the rest in drawing man towards Himself. A man with faith appears to be doing wonders—all done by God. He is the instrument in the hand of God in performing them, and this is no wonder to him. He sees the process of spiritual advancement to be natural and regular, like any other process of development in nature, such as that from childhood to youth, and from youth to manhood."

মহিলা। কাব্য, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থের কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মৃত্যুর পর গ্রন্থখানি প্রকাশক কর্তৃক দুই অংশে বিভক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মহিলা ভিন্ন কবির 'সবিতা সুদর্শন' প্রভৃতি আরও কয়েক খানি গ্রন্থ আছে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা সাহিত্য পল্লীতে সে গুলি তেমন পরিচিত নহে। সুরেন্দ্রনাথের লেখার সম্যক্ সমালোচনা করিতে গেলে এই সকল গ্রন্থেরও সমালোচনা করিতে হয়। প্রচারে সে স্থান নাই, এবং বিস্তৃত সমালোচন প্রচারের প্রথাও নহে। তবে মহিলা সম্বন্ধে নিতান্ত বক্তব্য দুই চারিটা কথা আমরা এখানে বলিব।

মহিলার অনেক কবিতা বেশ প্রাণময়ী, বিশদ ও মর্ম্মস্পর্শী। আমরা প্রথমাংশেরই এক স্থানে একটু উদ্ধৃত করিতেছি। গিরি-নদী-লতা-পাদপ-শোভিত ভৃঙ্গ-বিহঙ্গ-কূজিত আলোকময় উৎসাহময় সর্ব্বপ্রাণীর আনন্দময় সুন্দর সংসারে মানব কেবল নিরানন্দ শূন্যমনা—কি এক অননুভূতপূর্ব্ব অস্পষ্ট অথচ মহান্ অভাবের অনুভবকারী। সেই প্রথম সৃষ্ট মানবকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য বিধাতার প্রথম ললনাসৃষ্টির বর্ণনাটি বড় সুন্দর—

"বিকচ পঙ্কজ-মুখে শ্রুতি পরশিত
সলাজ লোচন ঢলঢল,
চাঁচর চিকুর চারু চরণ চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল!
কাতর হৃদয় ভরে,
স্বচ্ছ মুক্তা কলেবরে,
ঢল ঢল লাবণ্যের জল!
পাটল কপোল কর চরণের তল!
পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায়,
হৃদি-কল পরশে পাণীতে,
মুগ্ধমুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধমুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে।
পর্ণে পদ্ম রাগ-ভরা,
অশোক লভিল ধরা;
এল কেশে কে এল রূপসী!
কোন্ বনফুল কোন্ গগনের শশী।"

মহিলার কবি অলঙ্কার প্রয়োগে নিপুণ। আমরা দুই একটি উপমার উদাহরণ দিই—

"কোন দুখ স্বপ্ন কথা,
অন্তরে জাগিছে যথা,
ধীরে ধীরে হর্ষ শোচ সংশয়ের সনে ;
যেন বা প্রবাস বাসে,
দূর হতে ভেসে আসে,
দেশপ্রিয়গীতখণ্ড সন্ধ্যা সমীরণে ;
বৃদ্ধকালে অন্বেষিয়া,
পুষ্পস্মৃতি মিলাইয়া,
ধ্যান সন্ধান বা কিশোর সন্ন্যাসীর ;
জাতিস্মর হৃদে হেন,
প্রথম প্রকাশ যেন,
বিয়োগী বিষন্ন মুখ পূর্ব্ব-প্রেয়সীর ;
তুল্য এবে এ সব সে শৈশবস্মৃতির !"

"সবিলাস বিগ্রহ মানস সুষমার,
আনন্দের প্রতিমা আত্মার,
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,
মুগ্ধমুখী মুরতি মায়ার ;
যত কাম্য হৃদয়ের,
সংগ্রহ সে সকলের,
কি বুঝাবো ভাব রমণীর ;—
মণি মন্ত্র মহৌষধি সংসার ফণীর !"

উপমা কেমন সহজ, বিশুদ্ধ, সম্পূর্ণ এবং সুন্দর ! এইরূপ "মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার" প্রভৃতি অনুপ্রাসগুলিও সুন্দর। পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে হয়, যে অনুপ্রাসের অনুরোধে স্থানে স্থানে জোর করিয়া বাক্যবিন্যাস করা হইয়াছে। উহাতে কোথাও অর্থকৌটিল্য ঘটিয়াছে, কোথাও বা লালিত্য কমিয়াছে। স্থানে স্থানে কবিত্বের উপর দর্শনের গাঢ় ছায়া পড়িয়াছে, সেখানে ভাব সহজে উপলব্ধ হয় না, ভাবাও কঠোর।

সুরেন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। কে নয়? অনেকে MISS কামিনী M. A. কে দেখাইয়া স্ত্রীশিক্ষায় ধিক্কার দেন। বিজ্ঞান ইতিহাস না শিখিলে কি শিক্ষার আর উপায় হইতে পারে না? ব্রত নিয়মে শিক্ষা নাই? শাস্ত্রপ্রসঙ্গ শ্রবণে শিক্ষা নাই? মহাভারত রামায়ণ হইতে যে অনেক 'উচ্চশিক্ষিত'ও শিক্ষা লাভ করিতে পারেন; এ সকল হইতে হিন্দু-নারী শিক্ষালাভ করিতে ভুলিল কেন? হিন্দুর যখন অধঃপতন হয় নাই, তখন হিন্দুললনাকে কে শিক্ষা দিত?

কবি পূর্ব্বরাগের ভাবে ভোর। হিন্দুবিবাহপ্রথার এই পূর্ব্বরাগের অত্যন্ত অভাবনিবন্ধন কবি এ বাল্যবিবাহপ্রথা উঠাইয়া দিয়া কোর্টশিপ চালাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমে কবি এক পূর্ব্বরাগজ্ঞান-শূন্যা বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র

হৃদয়ের পূর্ব্বরাগবর্জ্জিত প্রণয়ের উৎসে মহিলার জন্ম। তবে আর কোর্টশিপ কেন?

বিধবাবিবাহেরও কবি একজন প্রধান পক্ষপাতী। প্রণয়িনীকে উপদেশ দিয়াছেন—

"তব অগ্রে আমি যদি ছাড়ি এ ধরায়,
দেহ-সুখ সম্ভোগিতে,
বাঞ্ছা যদি বাসো চিতে,
কুণ্ঠিত না হবে কভু সমাজ শঙ্কায় :—
করিবে বিবাহ পুন আপন ইচ্ছায়।"

যে হিন্দুবিধবা স্বর্গীয় পতিকে ভুলিয়া "দেহসুখ সম্ভোগিতে" ইচ্ছা করেন, তিনি অশৌচান্তে স্বয়ম্বরা হউন, কে তাঁহাকে আটকাইবে? কিন্তু হিন্দু সমাজ এ অহিন্দু বিবাহ কখন অনুমোদন করিবে না। এরূপ বিধবার সমাজ স্বতন্ত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এমন হইতে পারে, এই কয় ছত্র কেবল কবিত্ব—স্নেহের উচ্ছ্বাস। "আমার স্মৃতির জন্য তুমি তোমার সুখের ক্রটি করিবে কেন?" যদি এ কবিতার এই তাৎপর্য্য হয়, তবে কবির সঙ্গে কাহারও কোন বিবাদ নাই।

মহিলার প্রধান দোষ, আদিরসের প্রাবল্য। অবতরণিকাতেই ইহার নমুনা পাওয়া যায়। জায়ার বর্ণনে ইহার খুব বাড়াবাড়ি। গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণকালে ইহার অনেক স্থান পরিত্যক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লালিত্য, পদবিন্যাস-কৌশল,অলঙ্কারচ্ছটা ভাষার সম্মার্জ্জন এবং ভাবের উদারতা প্রভৃতি গুণ সত্বেও জয়দেব পড়িবার সময় "হরিস্মরণে সরসং মনঃ" করিতে হয়।

অশ্রুজল। কবিতা পুস্তক, গ্রন্থকারের নাম নাই, মূল্য ৵ আনা। অশ্রুজলে প্রশংসার কিছু নাই। সহজেই সোজা কথা।

মানস কুসুম। প্রথমভাগ, শ্রীকালিদাস মজুমদার প্রণীত, মূল্য ।৵ আনা। দুই একটি কবিতা নিতান্ত মন্দ নহে।

বনবাসিনী। প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী প্রণীত। পুস্তক খানি স্ত্রীলোকের লেখা। গ্রন্থকর্ত্রীর বিধবার কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় উপদেশ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

কংস-বিনাশ। নাটক, শ্রীসানুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত, মূল্য ৫০ আনা মাত্র। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের সমালোচন নিষ্প্রয়োজনীয়।

রমণী। সমর্থকোষ প্রেসে সেন এণ্ড সর্ব্ব দ্বারা মুদ্রিত। পুস্তক খানি অতি ক্ষুদ্রকার, গ্রন্থকারের নামও ইহাতে নাই। তাহা হইলেও, আমরা এটুকু পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। লেখাটি বেশ সরল, মধুর ও সদ্ভাবপূর্ণ। উপসংহারে কবি লিখিয়াছেন—

"তোমার সৌন্দর্য্যরাশি উঠুক ফুটিয়া,
মলিন হউক রবি শশী;
প্রতি মানবের প্রাণে পড়ুক টুটিয়া.
কেটে যাক্ সংসারের মসি;
তুমি ঢাল প্রেমধারা,
ভেবে মর হ'ক সারা,
এত প্রেম কেমনে বহিবে;
এত সুখ এ জীবনে কোথায় রাখিবে।"

"যত দিন বাঁচি গো এমনি যেন থাকি,
তুমি মোরে কাছে কাছে ডাক!
আমি আঁখি হৃদয় শোভায় ভ'রে রাখি,
তুমি মোরে স্নেহ দিয়ে ঢাক!
যতন করিয়ে আমি,
আঁকি তব ছবি খানি,
তুমি তারে ঢেলে দাও প্রাণ।
প্রাণময়ী, ধরণী হউক প্রেমগান!"

প্রচার।

৪র্থ খণ্ড] ১২৯৫ [৯।১০ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কি কথাটা হইতেছিল, এক্ষণে একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ অর্জ্জুনকে জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া, এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন, যে এখন তোমাকে কর্ম্মযোগ শুনাইব। তখন কর্ম্মযোগের কিছু প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ একটা সাধারণ প্রচলিত ভ্রান্তির নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ভ্রান্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্যকর্ম্ম সকলেই লোকের চিত্ত নিবিষ্ট, তাদৃশ লোক ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন যে বেদসকল "ত্রৈগুণ্যবিষয়" তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও, বা বেদবিষয়কে অতিক্রম কর। কেননা, যেমন সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে বাপী কূপ তড়াগাদিতে কাহারও প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। কর্ম্মযোগের সহিত বৈদিক কর্ম্মের সম্বন্ধরাহিত্য এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া, ভগবান্ এক্ষণে কর্ম্মযোগ কহিতেছেন;—

> কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। ৪৭

কর্ম্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে কদাচ (অধিকার) না হউক। তুমি কর্ম্মফলহেতু হইও না; অকর্ম্মে তোমার আসক্তি না হউক। ৪৭

এই শ্লোক বুঝিতে গেলে, "কর্ম্ম" কি, "কর্ম্মফলহেতু" কি, "অকর্ম্ম" কি বুঝা চাই।

"কর্ম্ম কি" কি, বুঝিলে, আর দুইটা বুঝা গেল। কর্ম্মফল যাহার প্রবৃত্তি হেতু, সেই "কর্ম্মফলহেতু"। কর্ম্মশূন্যতাই, অকর্ম্ম। কর্ম্ম কি তাহা পরে বলিতেছি।

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম্ম করিও, কিন্তু, কর্ম্মফল কামনা করিও না। কর্ম্মফল প্রাপ্তিই যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয়। কিন্তু কর্ম্মের ফলের প্রত্যাশা না থাকিলে কেহ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য শ্লোক শেষে তাহাও নিষিদ্ধ হইতেছে। বলা হইতেছে, ফল চাহি না, বলিয়া কর্ম্মে বিরত হইও না। অর্থাৎ কর্ম্ম অবশ্য করিবে কিন্তু ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবে না।

বোধ হয় এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বুঝা গিয়াছে। ইহাই সুবিখ্যাত নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব। এরূপ উন্নত, পবিত্র, এবং মনুষ্যের মঙ্গলকর মহামহিমাময় ধর্ম্মোক্তি জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভগবৎপ্রসাদাৎই হিন্দু এরূপ পবিত্র ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে।

কিন্তু লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই। তাহার কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধিবিভ্রংশ বশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমরা আজিও ভাল করিয়া ইহা বুঝিতে পারি নাই।

আমি এমন বলিতেছি না, যে আমি ইহা সম্পূর্ণ রূপে বুঝিয়াছি, বা পাঠককে সম্পূর্ণ রূপে বুঝাইতে পারিব। ভগবান্ যাঁহাকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝাইতে পারিবেন। তবে যত টুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই।

ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে। যাহা করা যায়, বা করিতে হয়, তাহাই কর্ম্ম, কর্ম্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ। কিন্তু কতকগুলি হিন্দু শাস্ত্রকার, বা হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপায় এসকল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি। কর্ম্ম মাত্রেই কর্ম্ম নহে—বেদোক্ত (অথবা শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞই কর্ম্ম।

যদি তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই বুঝিতে হয়, যে বেদোক্তাদি যজ্ঞাদি করিবে ; কিন্তু সেই সকল যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই স্বর্গাদির কামনা করিবে না।

এই রূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বলিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজিনবিশেরাও এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন। সুপণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্ ইহার পূর্ব্ব শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, "The Vedas...prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven or destroying an enemy &c. But says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires for the special benefits named."

যদি কর্ম্মশব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযোগে পড়িতে হইবে। পাঠক বলিবেন যে, যে কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই কামনা না করিলাম, তবে সে কর্ম্মই করিব কেন? নিষ্কাম কাম্য কর্ম্ম কিরূপ? কাম্যকর্ম্ম নিষ্কাম হইয়াই বা করি কেন?

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্তাদি কাম্যকর্ম্ম বুঝিলে আমরা কোন বোধগম্য তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারি না। আর বেদোক্ত কাম্যকর্ম্ম গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দিষ্ট নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ তৃতীয় অধ্যায়ের নামই "কর্ম্মযোগ"। ইহাতে কর্ম্ম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ। ৫

"কেহ কখন ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, কেন না প্রকৃতিজ বা স্বাভাবিক গুণে সকলকেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে।"

এখন, দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না। কেবল সচরাচর যাহাকে কর্ম্ম বলি—যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরেজিতে action বলে, তাহা সম্বন্ধেই কেবল একথা বলা যাইতে পারে। কেহ কখন কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না, অন্য কোন কাজ না করুক স্বভাব বা প্রকৃতির (Nature) বশীভূত হইয়া কতকগুলি কাজ অবশ্য করিতে

হইবে। যথা, অশন বসন শয়ন শ্বাস প্রশ্বাস, ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই কর্ম্মশব্দে বাচ্য, যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহাই; যজ্ঞাদি নহে।

পুনশ্চ ঐ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে কথিত হইতেছে

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

"তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর; কর্ম্ম অকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; অকর্ম্মে তোমার শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না।"

এখানেও, নিশ্চিত কর্ম্ম শব্দ, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বা "কাজ";—যজ্ঞাদি নহে। যজ্ঞাদি ব্যতীত সকলেরই শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা action, যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহা ভিন্ন শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না।

এবম্বিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।* প্রমাণ নির্দ্দোষ হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ট। অতএব আর নিষ্প্রয়োজনীয়।

অতএব ইহা সিদ্ধ, যে কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যায় কর্ম্ম অর্থে সচরাচর যাহাকে কর্ম্ম বলা যায়, অর্থাৎ কাজ, বা action, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত;—বৈদিক যজ্ঞাদি নহে।

তাহা হইলে, এই ৪৭ শ্লোকের অর্থ এই হইতেছে, যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিতে হইবে। কিন্তু তাহার ফল কামনা করিবে না, নিষ্কাম হইয়া করিবে। এক্ষণে এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

ইহার ভিতর দুইটি আজ্ঞা আছে—প্রথম, কর্ম্ম করিতে হইবে। দ্বিতীয়,

* পক্ষান্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ" ইতি বাক্যও আছে। তাহার প্রচলিত অর্থ যজ্ঞপক্ষে বটে। কিন্তু সেই প্রচলিত অর্থও যে ভ্রমাত্মক বোধ করি পাঠক পশ্চাৎ বুঝিতে পারিবেন। আমি বুঝাইব এমন কথা বলি না—পাঠক সহজেই বুঝিবেন। এবং ইহাও স্বীকার করিতে আমি বাধ্য, যে কখন কখন গীতাতেও কর্ম্ম শব্দে বৈদিক কাম্য কর্ম্ম বুঝায়, যথা, এই যে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে, "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম"। কিন্তু এখানেও স্পষ্টই বুঝা যায়, এ "কর্ম্মের" সঙ্গে কর্ম্মযোগের বিরুদ্ধভাব। গীতায় অনেকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সকল কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া করিতে হইবে। এক একটি করিয়া বুঝা যাউক। প্রথম, কর্ম্ম করিতে হইবে।

কর্ম্ম করিতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ে যে দুই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেই উহা বুঝান হইয়াছে। কর্ম্ম আমাদের জীবনের নিয়ম Law of Life—কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না—সকলেই প্রকৃতিজগুণে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। কর্ম্ম না করিলে শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। কাজেই সকলকে কর্ম্ম করিতে হইবে।

কিন্তু সকল কর্ম্মই কি করিতে হইবে? কতকগুলি কর্ম্মকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি? অসৎকর্ম্মও করিতে হইবে?

অসৎকর্ম্ম আমাদের জীবন নির্ব্বাহের নিয়ম নহে—ইহা আমাদের Law of Life নহে। অসৎকর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, এমন নহে;—অসৎ কর্ম্ম না করিলে কাহারও শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের বিঘ্ন হয় না। চুরি, বা পরদার না করিয়া কেহ যে বাঁচিতে পারে না, এমন নহে। সুতরাং অসৎ কর্ম্ম করিতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত ঐ দুই শ্লোক হইতে উহা বুঝা যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা যাইবে।

পক্ষান্তরে, ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, যে যাহাকে সৎকর্ম্ম বলি, তাহাই কি আমাদের জীবন যাত্রার নিয়ম? আমরা কতকগুলিকে সৎকর্ম্ম বলি, যথা পরোপকারাদি;—আর কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি, যথা পরদারাদি;—আর কতকগুলিকে সদসৎ কিছুই বলি না, যথা শয়ন ভোজনাদি। ভাল, বুঝা গিয়াছে, যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি, করিবার প্রয়োজন নাই; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি না করিলে নয়, সুতরাং করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমশ্রেণীর কর্ম্মগুলি করিব কেন? সৎকর্ম্ম মনুষ্যজীবনের নিয়ম কিসে?

একথার উত্তর আমার প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি, যে যাহাকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মনুষ্য জীবন নির্ব্বাহের নিয়ম।

বস্তুতঃ, কর্ম্মের এই ত্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাকে সৎকর্ম্ম বলি, আর যাহাকে সদসৎ কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতদুভয়ই

মনুষ্যত্ব পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই জন্য এই দুইকে আমি ধর্ম্মতত্ত্বে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়াছি। এই টীকাতেও বলিতে থাকিব।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহার মীমাংসা কে করিবে? মীমাংসার মূল নিয়ম, এই গীতাতেই কথিত হইয়াছে, পশ্চাৎ দেখিব; এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমি উক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে এ তত্ত্ব কিছু দূর মীমাংসা করিয়াছি।

এই শ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, "কর্ম্ম করিবে," তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দ্বিতীয় বিধি সামান্যতঃ বুঝাইব। দ্বিতীয় বিধি এই যে, যে কর্ম্ম করিবে তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

পরোপকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। অনেকে পরোপকার এইরূপ অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে, যে আমি যাহার উপকার করিলাম, সে আমার প্রত্যুপকার করিবে। ইহা সকাম কর্ম্ম। ইহা এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদির দ্বারা পরোপকার করে, যে ইহাতে আমার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া তৎফলে স্বর্গাদি লাভ হইবে। ইহাও সকামকর্ম্ম, এবং এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপকার করিয়া থাকেন, যে ঈশ্বর ইহাতে আমার উপর প্রসন্ন হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল করিবেন। তাহা হইতে পারে; ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই, এবং পরোপকারীর মঙ্গলও করিতে পারেন; কিন্তু ইহা নিষ্কাম কর্ম্ম নহে। ইহা সকাম, এবং এই বিধির বহির্ভূত।

নিষ্কামকর্ম্মী তাহাও চাহে না, কিছু চাহে না, কেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতে চাহে। পরোপকার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—এই জন্য আমি করিব, কোন ফলই চাই না। ইহা নিষ্কাম চিত্তভাব।

ধর্ম্মতত্ত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই নিষ্কাম হইতে পারে। অতএব পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে এইটি প্রথম কথা। এ তত্ত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট ও বিশদ হইবে।

পাশ্চাত্য দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্যাপ্তিস্থির করিবার জন্য প্রতীক্ষা ও পরীক্ষা এই দ্বিবিধ প্রকরণে ভূয়োদর্শন করা কর্ত্তব্য। এবং পরীক্ষার নানাবিধ প্রয়োজন মধ্যে এই একটি কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, যে উহার সহিত প্রতীক্ষার সান্নিধ্য না থাকিলে স্মৃতিদোষ বশতঃ ভ্রম আশ্রয় করে। ফলতঃ এই কথা যে কেবল পরীক্ষাতেই বর্ত্তে, তাহা নহে। পরীক্ষাই বল কিম্বা প্রতীক্ষাই বল উভয়ের অন্বয় করাও যেমন আবশ্যক, তেমনি আবার প্রত্যেক কার্য্য পুনঃপুনঃ দর্শন না করিলেও ব্যাপ্তি স্থির হয় না। বারম্বার ব্যাপ্তি প্রতীক্ষা করা এবং বারম্বার ব্যাপ্তি পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক. অস্থির ভূয়োদর্শন সুসিদ্ধ হয় না। কিন্তু উপর্য্যুপরি দর্শন করিতে হইলে অগত্যা কাল ব্যবধান হয়। প্রতীক্ষা ও পরীক্ষার সান্নিধ্য সংঘটন দ্বারা তাহার যৎকিঞ্চিৎ উপকার হয় মাত্র। অতএব ভূয়োদর্শনক্রিয়ার কাল ব্যবধান জন্য যে অবশ্যম্ভাবী স্মৃতিদোষ ঘটে, তাহার প্রতীকার নিমিত্ত বিশেষ উপায় করাও নিতান্ত আবশ্যক। প্রতীক্ষা ও পরীক্ষা এই ক্রিয়াদ্বয়ের তথ্য সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করাই ইহার একমাত্র উপায়। এতদ্দ্বারা দর্শক আপনার স্মৃতির পুনঃসংস্কার করিতে সক্ষম হন, আর নানা স্থানের ও বিভিন্ন সময়ের দর্শকগণের প্রত্যক্ষিত ব্যাপারও এইরূপে সমন্বিত হইতে পারে।

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে স্মৃতি বা সংস্কার এক প্রকার প্রত্যক্ষের বাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সংস্কার, বাক্য দ্বারা প্রকটিত না হইলে পরীক্ষাধীন হইতে পারে কি না এবং কোন স্থলে সংস্কার প্রত্যক্ষ বা অনুমিত না হইলেও গ্রাহ্য হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করা এখন অভিপ্রেত নহে। কিন্তু একটি স্থূল কথা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। মনে যে সকল সংস্কারের আবির্ভাব হয় সেই সংস্কারের মূলীভূত ব্যাপার কেবল স্মৃতি নহে; স্মৃতিদোষ বা বিস্মরণ হেতুও সংস্কারের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, অতএব স্মৃতির স্থলে বিস্মরণকেই বাধ বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য। এবং তন্নিমিত্ত স্মৃতি লিপিবদ্ধ করাই বিধেয়। আমি শাস্ত্রে তাহার কোন প্রসঙ্গ দেখি না। অথচ কথাটি সহজ বুদ্ধিতে

অনায়াসেই প্রতীত হইবে। আর এস্থলে এই কথা প্রকারান্তরে সপ্রমাণ করিবার চেষ্টাই প্রধানত দৃষ্ট হইবে।

প্রত্যক্ষীকৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে বিধান করিলাম, পাঠক তাহা হইতে অন্বয়ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি স্থির করিবারই আশা করিবেন। অর্থাৎ যদি কোন প্রকারে একটি অন্বয়ব্যাপ্তি কিম্বা ব্যতিরেকব্যাপ্তির কথা প্রকাশ হয়, তবে তাহা লিপিবদ্ধ তথ্যের সহিত সমন্বিত করিলে ব্যাপ্তি বিকাশ হইয়া অনুমান কার্য্যের সদুপায় হইবে। কিন্তু প্রতীক্ষা ও পরীক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য আছে। আর সৌভাগ্যের বিষয় এই যে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে যে অসাধারণ মতভেদ আছে, আমরা তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি।

কার্য্য কারণের নিয়ত সাহচর্য্য হইতেই ব্যাপ্তি স্থির হইয়া থাকে। তর্ক-সংগ্রহকর্ত্তা লিখিয়াছেন—"অনন্যথা সিদ্ধ কার্য্য নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তি কারণ" (৩৪ সূত্র)। ভাষাপরিচ্ছেদকার লিখিয়াছেন—"অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়ত পূর্ব্ব বর্ত্তিতা কারণত্বং" (১৫ শ্লোক)। অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ মধ্যে পূর্ব্ব ও অপর এই মাত্র সম্বন্ধ। আর সেই সম্বন্ধ অন্যথাসিদ্ধিরূপ ব্যতিরেকবিহীন এবং নিয়ত সমন্বিত। ব্যাপার বা ঘটনা মধ্যে এই পারম্পর্য্যই কার্য্য কারণত্ব বিষয়ের নিদান। আর কার্য্য কারণের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য উল্লিখিত পারম্পর্য্যের ব্যাপ্তি স্থির হইলেই যথেষ্ট। এস্থলে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা অনর্থক এক মহা বিতণ্ডা উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, কার্য্য কারণ মধ্যে প্রাগুক্তরূপে যে নিয়ত সাহচর্য্য কি নিয়ত পারম্পর্য্য দৃষ্ট হয়, তাহার হেতু কি? তাঁহাদের অনেকে সগুণ ক্রিয়াবান্ ঈশ্বরের উপাসক, সুতরাং বলেন যে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ সহজ নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে আমাদিগের লক্ষিত ব্যাপ্তি ব্যর্থ করিতে পারেন। অনন্তর, ঈশ্বরের এতাদৃশ অসীম শক্তি আছে কি না? পাশ্চাত্যগণ মধ্যে এই বিষয়ের ঘোরতর বিতণ্ডা হইয়া থাকে। আমরা ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলাতে প্রাগুক্ত বিতণ্ডার স্থল একবারে বিনষ্ট হইতেছে। দার্শনিকেরা ব্যাপ্তি স্থির করিতে পারিলে আর কোন প্রকার দ্বিধা করেন না। কার্য্য কারণের যে ব্যাপ্তিলক্ষণ অবধারিত হইয়াছে, তাহা হইতে দুইটি কথা স্থিরীকৃত হইতেছে। অন্যথাসিদ্ধিশূন্য নিয়ত

পূর্ব্ববর্ত্তিতা জানিতে পারিলেই কারণ স্থির হয় এবং কারণ জানিতে পারিলেই তাহার কার্য্য অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অবধারণ করিতে পারা যায়। কার্য্য-কারণ, সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বরূপ। এবং সেই প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা ভবিতব্য নির্ণয় করাও সাধ্যায়ত্ত। সুতরাং ভবিতব্য লক্ষ্য করিয়াই বর্ত্তমান কালের কর্ত্তব্য স্থির করা বিধেয়। আমি অসীম ন্যায়শাস্ত্র লইয়া যে এতদূর লিখিতে সাহসী হইয়াছি, তাহাতে কোনমতেই পণ্ডিত মণ্ডলীর সমীপে মার্জ্জিত হইতে পারি না। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রবেত্তারাও দেখিতেছেন যে শাস্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ত্তমান কালে দিন দিন অলক্ষিতভাবে নিবিয়া যাইতেছে। আমি এই বিপদের অবস্থাতেই বলিতে সাহসী হইয়াছি যে শাস্ত্রকারেরা যে সনাতন ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা কেবল প্রাগুক্ত ন্যায় সূত্রানুযায়ী মাত্র। সেই সূত্র রক্ষা করিয়া ব্যাপ্তিগ্রহ করিতে হইবে এবং সেই সূত্রানুগত ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি বস্তুবিচার স্থলে নিরর্থক বাগ্‌বিতণ্ডাতে মগ্ন থাকেন তবে শাস্ত্র ও ধর্ম্ম উভয়ের লোপ হওয়াই সম্ভাবিত বলিতে হইবে। পাশ্চাত্য বস্তুবিচার কিছুতেই নিবারিত হইবে না। কিন্তু যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কল কৌশলের অনুরোধে প্রাচীন ধর্ম্মের অবমান এবং যথেচ্ছাচার প্রবল হয় তবে তাহার জন্য এখনকার প্রাচীন শাস্ত্রবেত্তারাই দোষার্হ হইবেন। কেন না তাঁহারা কার্য্যকারণ অনুযায়ী ভবিতব্য লক্ষ্য করিতে অসম্মত, সেই ভবিতব্য বিচারের সূত্র ছাড়িয়া তদ্বিষয়ে যে সকল অনুমান, পুরাকালে গ্রন্থকারেরা করিয়া গিয়াছেন কেবল তাহার আন্দোলনেই তাঁহারা ব্যাপৃত।

কার্য্য ও কারণের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে ইহার বিষয়ে আর একটি কথা আছে। ভূয়োদর্শন দ্বারাই এই সম্বন্ধ বা পারম্পর্য্য জানিতে হয় বটে। কিন্তু ভূয়োদর্শন দ্বারা কি দেখা যায়? এ স্থলে তিনটি জিজ্ঞাসার বিষয় লক্ষিত হইবে। কার্য্য নামক পরবর্ত্তী ঘটনা, কারণ নামক পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা এবং এই দুই ঘটনার পারম্পর্য্যের অন্যথা বিহীনত্ব। এখন প্রশ্ন এই যে ভূয়োদর্শন আশ্রিত কোন পারম্পর্য্য প্রতীক্ষা স্থলে, একবার যাহা কারণ বলিয়া লক্ষিত হয়, বারান্তরে যদি তাহার অভাব সত্ত্বে কার্য্যের সদ্ভাব ঘটে, তবে কি সপ্রমাণিত হয়? প্রস্তাবিত কার্য্য-কারণ আশঙ্কিত ঘটনাদ্বয়মধ্যে নিয়তসম্বন্ধ রূপ ধর্ম্মের অভাব, বা তাদৃশ কারণ সর্ব্বতোভাবে কার্য্য বিহীন, অথবা

তাদৃশ কার্য্য নিতান্ত কারণ বিহীন বলিয়া সপ্রমাণিত হয়। প্রাচীন দর্শন-শাস্ত্রে ইহার বিষয়ে কিরূপ কতদূর বিচার আছে তাহা আমার অপরিজ্ঞাত। কিন্তু এতদ্বিষয়ে অনেক পাশ্চাত্যগণের পরিষ্কার মত আছে। তাঁহারা বলেন যে জগতে যত ঘটনা নরগণের দর্শনে পতিত হয় তাহার মধ্যে একটি নিয়ত-সাহচর্য্য স্থির থাকেই থাকে। কার্য্য কারণের সম্বন্ধ যে কেবল ভাষার লক্ষণ মাত্র তাহা নহে। কার্য্যকারণের নিয়ত পারম্পর্য্য আছেই আছে। আমরা ভূয়াদর্শনদ্বারা কেবল এই পর্য্যন্ত দেখি যে, যে গুলি পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া একবার দেখা যায়, বারান্তরে সে সমুদায় গুলি বিদ্যমান ছিল কি না। যদি বারদ্বয় দর্শন করিলে কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তবে তাহাতে কখনই কার্য্যের কারণাভাব, বা কারণের কার্য্যরূপ ফলাভাব সংশয় হয় না; কেবল এই সংশয় থাকে যে লক্ষিত ঘটনাগুলিই কারণ কি অন্য কোন ঘটনা কারণ হইবে। অর্থাৎ যদি কোন প্রকারে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনাবলি এমন করিয়া সীমাবদ্ধ করিতে পারা যায় যে তাহাতে সীমাবহির্ভূত ঘটনা প্রবিষ্ট হইবে না, তবে এক-বার মাত্র পারম্পর্য্য দর্শন করিলেই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ঘটনার মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ অবধারিত হইতে পারে। সীমাবদ্ধ ঘটনাবলির মধ্যে প্রতীক্ষিত পারম্পর্য্য ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন প্রকার অতীন্দ্রিয় বিষ-য়ের অস্তিত্ব সন্দেহ করিবার আবশ্যকতা নাই। পাশ্চাত্যগণের মধ্যে আর কেহ কেহ বলেন যে পারম্পর্য্যের নিয়তি স্বীকার করিলেও তাহা যে সর্ব্বকালের জন্য অন্যথাসিদ্ধিশূন্য একথার প্রমাণ নাই। আর বিজ্ঞান শাস্ত্রে যে প্রণালীতে ব্যাপ্তিস্থির হইয়া থাকে তাহা একপ্রকার অনুমিতি মাত্র; অর্থাৎ প্রাগুক্ত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের বিধানকে লিঙ্গ-পরামর্শ জ্ঞান করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা অনুমিতি করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই পরামর্শ কেবল কল্পিত ব্যাপ্তি মাত্র ব্যক্ত করে, সুতরাং বৈজ্ঞানিকের কথায় যত আড়ম্বর করুন, তাহাতে পরমপুরুষের স্বেচ্ছাধীন ব্যাপার যে প্রাকৃ-তিক নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে না এরূপ মনে করা যায় না। অপর-পক্ষ বলেন পারম্পর্য্য বিষয়ক প্রাগুক্ত বিধান মনুষ্যের অভিজ্ঞতা হইতে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এমন কি অন্যান্য ব্যাপ্তি স্থিরীকরণ উপলক্ষে ইহা মূলীভূত ব্যাপ্তি। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে এই রূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু

প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে কার্য্যকারণের যে লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে প্রকারান্তরে সেই ব্যাপ্তিই স্বীকৃত হইতেছে বলিতে হইবে। এস্থলে আমরা প্রাগুক্ত লক্ষণ অবলম্বন করিলে এই দুরূহব্যাপ্তিগ্রহ কার্য্যের দায় হইতে বিমুক্ত হইতে পারি। আমরা শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ অনুসারেই অনুমিতি করিতে পারি, তদ্বিষয়ে আর নূতন করিয়া ভূয়োদর্শন ও ভূয়োদর্শনমূলক লিঙ্গ-পরামর্শ প্রদর্শন করিতে হইবে না। অন্ততঃ ইহার বিষয়ে আমাদিগের মধ্যে পূর্ব্বপক্ষতা করিবার আবশ্যকতা নাই। এতদ্বিষয়ে দৈব ও পুরুষকার সংক্রান্ত একটি তর্ক আছে বটে, স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে। এখন এই মাত্র বলাই যথেষ্ট যে প্রাকৃতিক ব্যাপারে কার্য্যকারণের পারম্পর্য্য সম্যকপ্রকারে স্থির করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ভূয়োদর্শনের শ্রম অনেক সুলভ হইয়া যায়। অর্থাৎ পূর্ব্বাপর ঘটনাগুলি সমস্ত যদি অমিশ্রভাবে দেখিতে পাওয়া যায় তবে সময়ান্তে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি দৃষ্ট হইবে কি না তাহার আশঙ্কাতে অভিভূত থাকিতে হয় না। একবার পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে প্রতীক্ষা করিতে পারিলেই ভূয়োদর্শনের কার্য্য প্রায় উদ্ধার হয়। সত্য বটে যে ব্যতিরেকব্যাপ্তির স্থল আছে কি না তাহা স্থির করিতে না পারিলে অমিশ্রভাবে কার্য্য কারণের পারম্পর্য্য প্রতীক্ষা করাও অসাধ্য হয়। কাল সহকারে এমন অদ্ভুতরূপে সাধ্যসাধনের ব্যতিরেক ঘটিতে পারে যে তাহা চিন্তারদ্বারা কল্পনা করাও অসাধ্য। তাদৃশ স্থলে প্রত্যক্ষীকৃত ব্যাপ্তিও অপ্রমাণিত হইয়া যায়। বায়ুর গুরুত্ব বিষয়ে যে সকল কথা বলা গিয়াছে তাহা এই কথারই উদাহরণ বটে। কিন্তু এতাদৃশ ঘটনা হইতে পারে বলিয়া কার্য্য কারণের নিয়ত পারম্পর্য্য বিষয়ের মূলীভূত ব্যাপ্তির কথা কখনই অসিদ্ধ হইতে পারে না। কালসহকারে প্রতীক্ষার অসম্পূর্ণতা ব্যক্ত হইতে পারে, কার্য্য কারণের অবিনাভাব অপ্রমাণিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রাকৃতিক ঘটনার পারম্পর্য্য পরিচ্ছিন্নভাবে একবার নির্দ্দেশ করিতে পারিলেও তাহা হইতে কার্য্যকারণসম্বন্ধমূলক অবশ্যম্ভাবিতা অনেক দূর স্থিরীকৃত হইতে পারে। তবে সতর্কতার জন্য এইরূপ করা আবশ্যক যে প্রত্যক্ষীকৃত পারম্পর্য্যকে একবারে অন্যথাসিদ্ধিশূন্য রূপে অবধারণ না করিয়া প্রথমতঃ তৎসংসৃষ্ট (hypothesis) কল্পিত কারণ ধার্য্য করা বিধেয়।

অনন্তর সেই কল্পিত কারণ অনুসারে পরবর্ত্তী কার্য্যের অনুমান বা ভাবিদর্শন হইতে পারিবে। এইরূপ ভাবিদর্শন পুনঃ পুনঃ সুসিদ্ধ হইলে কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিতা এবং কল্পিত কারণের স্বরূপ কারণত্ব বা ব্যাপ্তি সহজেই নির্দ্দিষ্ট হইবে।

এই স্থলে পরীক্ষার যে দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের কথা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। পরীক্ষাদ্বারা যেমন প্রতীক্ষাজনিত ব্যাপ্তির বিশেষ পরিচয় লাভ করা যায়, তেমনি আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিনব প্রতীক্ষার স্থলও উদয় হয়। আর এতাদৃশ প্রতীক্ষার স্থলও ভূয়োদর্শনের অঙ্গ বটে। সুতরাং স্বভাবতঃ প্রতীক্ষা দ্বারা যেরূপ ব্যাপ্তিস্থির করা যায়, পরীক্ষা-রূপ নূতন প্রক্রিয়ার দ্বারা নূতন প্রতীক্ষার উদয় হইলে সেই সঙ্গে উল্লিখিত সহজ প্রতীক্ষার মিলন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য হইবে। আর এই আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়া, প্রতীক্ষিত তথ্য হউক কিম্বা পরীক্ষিত তথ্য হউক সমস্তই সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কেবল ভূয়োদর্শনের উপর নির্ভর করিলে মনে হইতে পারে যে, যাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ, তাহার তথ্য লিপিবদ্ধ করা অতিরিক্ত কার্য্য। কিন্তু লিপিবদ্ধ করণের প্রতি এখানে কএকটি বিশেষ প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ নানা ব্যক্তি কৃত নানাস্থানে লব্ধ ভূয়োদর্শনের সমন্বয় করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষাজনিত ঘটনা স্বতঃ প্রতীক্ষা করা যায় না, সুতরাং সহজ প্রতীক্ষা ও পরীক্ষাজাত প্রতীক্ষার সমন্বয় করিবার জন্য তথ্য লিপিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। আর তৃতীয় প্রয়োজন এই যে, যেখানে একবার প্রতীক্ষা করিলেই ব্যাপ্তিস্থির হইবার প্রত্যাশা আছে সেখানে অতি সতর্কভাবে তাদৃশ প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যেন সময়ান্তে নূতন তথ্যবিকাশকল্পিত কারণকে প্রকৃত কারণ গণ্য করিয়া সেই তথ্য পরিত্যাগের সম্ভাবনা না ঘটে। ফলতঃ লিপিবদ্ধ করিবার যে নিয়ম বলিলাম তাহা কেবল সেই সতর্কতার অঙ্গ মাত্র।

যেখানে পরীক্ষাদ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিচার করিতে হয়, সেখানে অন্বয় ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি স্বভাবতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং পরীক্ষা অবলোকন করাই যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু উল্লিখিত তৃতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অধিক সতর্কতা আবশ্যক হইবে।

এতাদৃশ পরীক্ষার বা প্রতীক্ষার মর্ম্ম এই যে কার্য্যকারণের অন্যথা সিদ্ধি-শূন্য সম্বন্ধ জানাই আছে অতএব বক্ষ্যমাণ ব্যাপারে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। (১) যে স্থলে পরীক্ষা নির্ব্বাহ হইতেছে তাহাতে যেন তদ্বহির্ভূত ব্যাপার প্রবিষ্ট না হইতে পারে। (২) সেই সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী ঘটনা যেন সামুদায়িক প্রতীক্ষা, করা হয়। আর (৩) ঘটনাবলীর সাহচর্য্য ও পারম্পর্য্য যেন বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয়। এই তিনটি নিয়ম রক্ষা করিলে শাস্ত্রকারের বিধানমতে কার্য্যকারণসম্বন্ধ একবারেই স্থিরীকৃত হইতে পারিবে। কেন না যখন স্বকীয় চেষ্টাদ্বারা পরীক্ষা করা যাইতেছে, তখন সেই চেষ্টাই প্রথমোক্ত বিষয়ের নিয়ামক হইবে। সেই চেষ্টার মর্ম্মই এই যে অমুক অমুক ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলি সংগৃহীত হইবে, আর কিছু থাকিবে না। সুতরাং তাহার পরবর্ত্তী ব্যাপার অমিশ্রভাবে প্রতীক্ষা করা তত কঠিন হয় না। কঠিন কার্য্য এই যে যেন পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা কার্য্য স্বরূপত বা সামুদায়িক লক্ষ্য করা হয়। ইহার জন্যই লিপিবদ্ধ করিবার উপদেশ দেওয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য গণের গ্রন্থে এই নিয়মের উপদেশ দানে বড় আড়ম্বর নাই কেন না তাঁহাদের মধ্যে ইহার প্রথাই আছে। কিন্তু আমাদিগের শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। অথচ প্রত্যক্ষ ব্যাপক মধ্যে কতটুকু যথার্থতঃ প্রত্যক্ষ স্থিরতা থাকে না। এরূপ অবস্থার নানা কারণও আছে, কিন্তু তাহার আন্দোলন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। ফলতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত হয় না। সুতরাং একজনের প্রত্যক্ষ অন্যের গোচর করিবার জন্য প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন করা যার পর নাই প্রয়োজন।

এই প্রকারে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে, তাহার সার্থকতার হেতু কিঞ্চিৎ গূঢ়। প্রাগুক্ত পরীক্ষাস্থলে অতীন্দ্রিয় বিষয় লক্ষ্য করিবার আবশ্যকতা নাই। সনাতন ধর্ম্মানুসারে যে একমাত্র অতীন্দ্রিয় বিষয় আছেন তিনি নিষ্ক্রিয়, সুতরাং পরীক্ষান্তর্গত পূর্ব্ববর্ত্তী কি পরবর্ত্তী ঘটনার কোথাও তাঁহার হস্তক্ষেপণের আশঙ্কা নাই। স্বভাবতঃ যে ভূয়ো-দর্শন করা যায় তাহাতে নানাবিধ ঘটনা মিশ্রিত থাকে; কিন্তু পরীক্ষা স্থলে একমাত্র পরীক্ষকের কর্ত্তৃত্বাধীন ব্যতীত সেরূপ কোন ঘটনার স্থল

থাকে না। শাস্ত্রকারেরা ইহা বুঝিয়াই কার্য্যকারণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর তাঁহারা এইরূপে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া আমরা পাশ্চাত্যগণের বাদবিতণ্ডা হইতে অব্যাহতি পাইতেছি। আমাদিগের পক্ষে আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল প্রতীক্ষা ও পরীক্ষার তথ্য স্থির করাই আবশ্যক; তাহা হইলে ব্যাপ্তিস্থির করিবার বিষয়ে শাস্ত্রগত কোন অযথা প্রতিবন্ধক থাকিবে না।

পরীক্ষা-ফল-লিপিবদ্ধ করিয়া যে প্রকারে ব্যাপ্তিস্থির করিতে হয়, বায়ুর গুরুত্ব পরিমাণ করিবার প্রসঙ্গে তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি। আর একবার মাত্র প্রতীক্ষা করিলেই যে স্থলবিশেষে ব্যাপ্তিস্থির করা যাইতে পারে, তাহার উদাহরণস্থলে পাঠক মনে করুন যে পম্পিয়াই নামক যে নগরী আগ্নেয় গিরির উৎপাতে ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছিল দুই সহস্র বৎসর পরে তাহার পুনরুদ্ধার হইল। এই পুনরুদ্ধৃত শরীরে যদি কোনও বীজ পাওয়া যায়, আর সেই বীজ বপনদ্বারা যদি অঙ্কুর কি ফল উৎপন্ন হয়, তবে এই একমাত্র প্রতীক্ষা দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়া যায় যে অত দিনের বীজও ফলবান হইতে পারে। এবং সেইরূপ কোন বীজ অফলা হইলে কেহই আর দুই সহস্র বৎসরের ন্যূনবর্ষীয়তাকে তাহার হেতু বলিতে পারেন না।

পরীক্ষার দ্বিবিধ অঙ্গ বুঝা গেল। প্রথমতঃ ভূয়োদর্শনের অঙ্গরূপ প্রতীক্ষার প্রসারণার্থে পরীক্ষা করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ কার্য্যকারণের স্বধর্ম্ম অনুসারে ব্যাপ্তিস্থির করিবার জন্যও সীমাবদ্ধ পরীক্ষা এক মহৎ উপায়। এই প্রণালীতে প্রতীক্ষা করিবার জন্য পাশ্চাত্যগণ অসংখ্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা কতই যে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে, কতপ্রকার শিল্পনৈপুণ্যের যে উদ্ভব হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ফলতঃ উল্লিখিত প্রকরণে ব্যাপ্তিস্থির হইয়াই পাশ্চাত্য প্রদেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের এই উন্নতি হইয়াছে। অনন্তর সেই উন্নতি সহকারে এখন মনুষ্যের সামাজিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ব্যাপ্তি অন্বেষণ হইতেছে। এতদ্বিষয়ে অভিনব সমাজশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। এবং সমাজশাস্ত্র বস্তুবিচার প্রণালিবিশিষ্ট বিজ্ঞান অভিধেয় হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের দেশস্থ নৈয়ায়িকেরা সম্ভবতঃ তাহা স্বীকারই করিবেন না।

কিন্তু আমি যখন সমগ্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতে প্রবর্ত্তিত হই নাই তখন তাহার বিষয়ে আর অধিক বলা বৃথা। তবে শ্রুতির তথ্য প্রতীক্ষা ও পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সহিত সামাজিক তথ্যের সমন্বয় প্রামাণিকতা বিষয়ে ইহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা গিয়াছে। * এবং এস্থলে তাহার বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ গাঢ় বিবেচনা করিতে হইবে।

যাঁহারা মনে করেন যে আমাদিগের শ্রুতি ও ইতিহাসের লিখিত তথ্য পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তের সহিত সমতুল্য তাঁহারা দুইটী তিনটী ভ্রমে নিপতিত হন। তাঁহারা পাশ্চাত্য তথ্যবাদের বিধান যথাযথরূপে লক্ষ্য করেন না। প্রাচীন ইতিহাসের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া পড়েন এবং পরিশেষে অযথা দেশানুরাগ বশতঃ শ্রুত্যুক্ত তথ্য ও দর্শন-শাস্ত্রোপযোগী তথ্যমধ্যে অযথা সমন্বয় করিয়া উভয়ের বিকৃতি উৎপাদন করেন। পুরাকালে কোন দেশেই সামাজিক তথ্যের গূঢ় উদ্দেশ্য লক্ষিত হইত না। কেন না জনসমাজের প্রাথমিক অবস্থাতে তাহা লক্ষ্য করিবার স্থলই ঘটে নাই। শ্রুতি শাস্ত্র ও ভারতবর্ষের ইতিহাস আদিতে যে নানা আখ্যায়িকা দেখা যায়, মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিধি নির্দ্দেশ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কর্ত্তব্য-কর্ম্ম কি তাহা জ্ঞানী ব্যক্তিরা অলৌকিক ধী-শক্তি দ্বারা মনে মনে স্থির করিতেন। করিয়া উপদেশ দানের অভিসন্ধিতে আখ্যায়িকা বলিতেন। বর্ত্তমান কালে ইহার বিপরীত অবস্থা ঘটিয়াছে. নানা জাতির সমাবেশ হেতু কর্ত্তব্যতা বিষয়ে বিভিন্ন মতও দ্বিধার উদয় হইয়াছে। সুতরাং এখন তথ্যবাদ দ্বারাই কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে প্রামাণিক তথ্য স্থিরীকৃত না হয় সে পর্য্যন্ত তথ্যবাদ দ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা স্বভাবতঃই অসাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের কোনও দোষ নাই। তাঁহারা অল্প পরিমাণ পুরাবৃত্ত হইতে সামাজিক ব্যাপারের যে ব্যাপ্তি স্থির করিয়াছিলেন তাহাতে অগত্যা যথাযথ প্রতীক্ষা ও পরীক্ষার সুবিধা ছিলনা। এবং ভূয়োদর্শনের

* এই অংশ প্রচারে প্রকাশিত হয় নাই। লেখকের মূল গ্রন্থ ২য় পরিচ্ছেদ প্রথমাংশ প্রাচীন শাস্ত্র বিচার মধ্যে আলোচনা আছে।

প্রাচুর্য্য অভাবে এক প্রকার কষ্ট করেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা-বিধান-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ এতদ্দেশের ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য ছিলেন। বিধি ও উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে গ্রীকদিগের ন্যায় জন-সাধারণের মনোরঞ্জনার্থে ব্যাকুল হইতে হইত না এবং তথ্যের প্রামাণিকতা লইয়া বাদানুবাদও করিতে হইত না। সুতরাং যদিও তথ্যের অপ্রাচুর্য্য ছিল বটে কিন্তু তথ্য বিষয়ক সংশয় নিরসনের গুরুতর আবশ্যকতাও তখন উপস্থিত হয় নাই। এবং তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টাও ঘটে নাই। তথ্যের বিষয়ে সংশয় এবং সাপক্ষীয় বিশ্বস্ততা অবিশ্বস্ততা নিতান্ত সংসৃষ্ট বিষয়। জন-সমাজের আদিম এবং অসভ্য অবস্থাতে মনুষ্যপরম্পরা মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধই স্থিরীকৃত হয়। পরস্পরে সমকক্ষতা এবং তজ্জনিত বিরোধ ও মতান্তর অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক অবস্থার লক্ষণ। সুতরাং প্রথমোক্ত অবস্থাতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা বলেন তাহাই সত্য হয় এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা অনৃতোক্তি করিতে সাহসী হয় না। ইহাতে তথ্যানুসন্ধান কার্য্যের গূঢ় লক্ষণ বুঝা যাইবে। সত্য যুগ এবং নিদর্শন-তত্ত্বের আড়ম্বর দুই একাধারে একত্রিত দেখিবার আশা করিলে কলিযুগের উদয় ও অস্ত হওয়া আবশ্যক। অতএব বিগত সত্যযুগের জন্য ক্ষোভ করা বৃথা। আর পাশ্চাত্য গণের নিকট আমরা কিছুতেই খর্ব্ব নহি এরূপ আস্ফালন করিয়া যাঁহারা শ্রুতি ও ইতিহাসাদিকে প্রামাণিক তথ্য মনে করেন তাঁহারা শ্রুতি ও তথ্য বাদের লক্ষণ ও উদ্দেশ্য দুই বিস্মৃত হইয়া থাকেন। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা সামাজিক তথ্য লিপিবদ্ধ করা দূরে থাকুক অপেক্ষাকৃত বিশদ প্রাকৃতিক তথ্যও লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই। আর সামাজিক তথ্য হইতেও যে ব্যাপ্তি সংগ্রহ করা যাইতে পারে ইত্যাকার বুদ্ধি পাশ্চাত্য প্রদেশে অতি অল্পকাল হইল উদয় হইয়াছে মাত্র। কিন্তু পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তের গৌরব দেখিয়া যাঁহারা অপ্রতিভ হইয়া থাকেন তাঁহারা তাহা মনে করেন না। পক্ষান্তরে প্রাগুক্ত অভিনব বুদ্ধি অনুযায়ী পুরাবৃত্ত রচনা এখনও ইউরোপ অঞ্চলে আরম্ভ হইয়াছে কিনা তাহাও তর্কস্থল। কেবল এই মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে এক রাজ্যের বিভিন্ন দলের মধ্যে, এবং পরস্পরের ইষ্টানিষ্ট অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে, যে দলাদলি ঘটিয়া থাকে এখনকার পাশ্চাত্য পুরা-

বৃত্তে সেই দলাদলির উপকরণই বাহুল্য পরিমাণে আছে। আমাদের দেশের দলাদলি ও রাজকার্য্য সমস্তই শাস্ত্র ও শাস্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণের পরামর্শাধীন। সুতরাং তথ্যবাদের আড়ম্বর নাই বুলিয়া দুঃখ করিবার তত প্রয়োজনও নাই, এবং সেই দুঃখ অপনয়ন করিবার নিমিত্ত বৃথা গৌরব বা কাল্পনিকতা আশ্রয় করাও নিতান্ত অবৈধ। বরং সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের বিধানস্থলে প্রতীক্ষা ও পরীক্ষা লিপিবদ্ধ করার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করাই প্রয়োজন। তাহা হইলেই সামাজিক ব্যাপার যে দর্শনশাস্ত্রাধীন এবং সেই কারণে যে তদ্বিষয়ক ব্যাপ্তিস্থির করিবার আবশ্যকতা আছে, এই উদ্দেশ্য সম্যক্‌প্রকারে উপলব্ধ হইবে এবং সামাজিক ও রাজকীয় ঘটনার তথ্য লিখিবার প্রণালীও প্রাগুক্ত উদ্দেশ্যের অনুগত হইতে পারিবে।

অতএব এই পর্য্যন্ত বুঝা গেল যে ব্যাপ্তিস্থির করিবার নিমিত্ত তথ্যপ্রতীক্ষা ও তথ্যপরীক্ষা করা আবশ্যক। প্রত্যক্ষীকৃত তথ্যাবলী প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত যথাকালে অর্থাৎ স্মৃতিভ্রম হইবার পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। প্রাকৃতিক ও সামাজিক তথ্য সমস্তই এই নিয়মাধীন করা আবশ্যক। এই সমস্তই শাস্ত্রোক্ত ভূয়োদর্শনের অঙ্গ হইতেছে এবং ইহার যৌক্তিকতা সহজেই উপলব্ধ হইবে।

যোগভাষ্য

তদবস্থে চেতসি বিষয়াভাবাদ্‌বুদ্ধিবোধাত্মা পুরুষঃ, কিংস্বভাব ইতি। উত্তর সূত্রাবতার ভাষ্যম্।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্ ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা। তদা সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপায়াং সম্প্রজ্ঞাতাবস্থায়াং দ্রষ্টুশ্চিতিশক্তেঃ পুরুষস্য, স্বরূপে স্বকীয়স্বভাবে, পারমার্থিকে চৈতন্যমাত্রে অবস্থানং স্থিতি-র্ভবতীতি শেষঃ।

তাৎপর্য্যার্থ। বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিকে প্রকাশ করাই পুরুষের স্বভাব, বিষয়াকার অন্তঃকরণের বৃত্তি না থাকিলে কেবল বুদ্ধিকে প্রকাশ করা পুরুষের স্বভাব নহে। সচরাচর দেখা যায়, যেমন সূর্য্যের স্বভাব প্রকাশ করা অগ্নির স্বভাব দাহকরা, সূর্য্য বা অগ্নি, প্রকাশ বা দাহরূপ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া কখনই থাকিতে পারে না, কেন না যেটি যাহার স্বভাব তাহাকে ত্যাগ করিয়া ভাব (পদার্থ সকল) কিরূপে থাকিবে, ও এরূপ না হইলে সেটি তাহার স্বভাবই হইতে পারে না। যদি প্রকাশরূপ স্বভাব ত্যাগ করিয়া সূর্য্যের স্থিতি সম্ভব হয়, তবে প্রকাশ সূর্য্যের স্বভা-বই নহে। "স্বভাবস্তু যাবদ্দ্রব্যভাবিত্বাৎ" অর্থাৎ দ্রব্যের যতকাল স্থিতি, স্বভাবও অবশ্যই ততকাল থাকিবে। অতএব বুদ্ধিবোধাত্মা অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি প্রকাশস্বভাব পুরুষ, নিরোধাবস্থায়, আপনার স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে অবস্থিত হইবে। উক্ত নিরোধাবস্থায় চিত্তের উচ্ছেদ হয় না বটে, কিন্তু বিষয় না থাকায় বৃত্তি হইতে পারে না। কেবল বুদ্ধিপ্রকাশ করা পুরুষের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিকেই প্রকাশ করা তাহার স্বভাব একথা অগ্রেই বলা হইয়াছে। ইহাই অবতরণিকার উক্ত হইয়াছে "তদবস্থে চেতসি বিষয়াভাবাৎ ইত্যাদি"। ভগবান্ সূত্রকার উক্ত আশঙ্কার উত্তর করিয়াছেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সময়ে পুরুষের স্বরূপে যথার্থরূপে অবস্থিতি হয়।

ভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা তদানীং চিতিশক্তির্যথাচৈতন্যে, ব্যুত্থানচিত্তে তু সতি তথাপি ভবন্তী ন তথা।

ব্যাখ্যা। নিখিল অন্তঃকরণ বিষয়াকারে আপন আপন বৃত্তিপরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থিত হইলে, সেই সময়ে পুরুষও স্বরূপে অর্থাৎ আপনার যথার্থরূপ চৈতন্যমাত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্ত অবস্থায় চিত্তের ধর্ম্ম পুরুষে আসিতে পারে না বলিয়া যেমন পুরুষ স্বরূপে থাকে ইহাও তদ্রূপ। চিত্ত ব্যুত্থিত অর্থাৎ বিষয়াকারে পরিণত হইলে পুরুষ উক্তরূপে থাকিতে পারে না, তখন চিত্তের বৃত্তি সমস্ত পুরুষে প্রতিফলিত হয়. সুতরাং তদ্রূপ গ্রহণ করে বলিয়া শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র স্বরূপে অবস্থিত না হইয়া আরোপিত ধর্ম্ম অর্থাৎ সুখদুঃখাদি সমস্ত চিত্তের ধর্ম্মগুলিকে আপনার বলিয়া অনুভব করে।

মন্তব্য। পূর্ব্বে যে আশঙ্কা করা হইয়াছে, বুদ্ধিবৃত্তিপ্রকাশরূপ আপন স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া নিরোধ অবস্থায় পুরুষ কিরূপে অবস্থিত হইতে পারে? একটু বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত আশঙ্কা আপনা হইতেই দূর হইবে। পদার্থমাত্রই নিজ নিজ ধর্ম্ম কখনই পরিত্যাগ করে না, ইহা সত্য; কিন্তু যেটি যাহার পারমার্থিক ধর্ম্ম, সেইটিই তাহার স্বভাব যেমন অগ্নির স্বভাব দাহকরা। যেটি অন্য বস্তুর সন্নিধানে আরোপিত ভাবে উৎপন্ন হয়, সে ধর্ম্মটি কখনই স্বভাব হইতে পারে না। যেমন জবাকুসুমের সন্নিধানে নির্ম্মল শুভ্রস্ফটিকে রক্তিমা জন্মায়, এই রক্তিমা (লাল রঙ্) স্ফটিকের স্বভাব নহে, আরোপিত ধর্ম্মমাত্র, সেইরূপ বিষয়াকারে পরিণত অন্তঃকরণের সন্নিধানে পুরুষেও বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, উহাকেই পুরুষকর্ত্তৃক বিষয়প্রকাশ বলা যায়। যেমন আরোপিত রক্তিমা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও শুদ্ধ শুভ্ররূপে স্ফটিকের অবস্থিতি অনায়াসেই হইতে পারে, তদ্রূপ চিত্তের ধর্ম্ম সুখদুঃখাদি যাহা জাগ্রত অবস্থায় পুরুষে আরোপিত হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিরোধ অবস্থায় চিতিশক্তি পুরুষ আপনরূপে চৈতন্যভাবে অবস্থান করিবে, তাহাতে আর বাধা কি? আরোপিত ধর্ম্মের অপগমে যেমন বস্তুর স্বরূপের কোন বৈপরীত্য হয় না, তদ্রূপ আগমেও জানিবে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ব্যুত্থান চিত্তে তু

সতি তথাপি ভবন্তী ন তথা।” যেটি যাহার পারমার্থিক স্বভাব তাহাই তাহাতে চিরকাল থাকে, আরোপিত ধর্ম্ম কখনও উদিত হয়, কখনও বা লীন হয়, তাহাতে বস্তু স্বভাবের কোন হানি হয় না।

কথন্তর্হি দর্শিত বিষয়ত্বাৎ। সূত্রাবতার ভাষ্যম্।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥৪॥

ব্যাখ্যা। ইতরত্র, সমাধেরন্যস্মিন্ কালে ব্যুত্থানাবস্থায়মিত্যর্থঃ যাঃ সুখদুঃখমোহরূপা বক্ষ্যমাণা পঞ্চধা চিত্তস্য বৃত্তয়ো ভবন্তি, তাঃ পুরুষেঽপি উপচর্য্যন্তে, তাভিরবিশিষ্টা অবিলক্ষণা বৃত্তয়ঃ পুরুষস্য ভবন্তীত্যর্থঃ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত সমাধি অবস্থা হইতে ভিন্ন যে ব্যুত্থান অর্থাৎ জাগরণাদি অবস্থা, তাহাতে পুরুষ ও চিত্তের একরূপ বৃত্তি হয়।

অর্থাৎ চিত্ত যেমন যেমন বিষয়াকারে পরিণত হইয়া বৃত্তিমতী হয়, পুরুষও তত্তদ্রূপে বৃত্তিমান্ হইতে থাকে। বিষয়াকারে পুরুষের পৃথক্ কোন বৃত্তি নাই, চিত্তের বৃত্তিই পুরুষে প্রতিফলিত হয় বলিয়া তাহাকেও বৃত্তিমান্ বলা যায়।

ভাষ্যম্ ॥ ৪ ॥

ব্যুত্থানে যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ, তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ, তথাচ সূত্রং “একমেব দর্শনং” “খ্যাতিরেব দর্শনং” ইতি। চিত্তময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারী, দৃশ্যত্বেন স্বম্ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ, তস্মাচ্চিত্তবৃত্তিরোধে পুরুষস্যানাদিঃ সম্বন্ধো হেতুঃ।

ব্যাখ্যা। “কথন্তর্হি দর্শিত বিষয়ত্বাৎ,” পূর্ব্বোক্ত এই ভাষ্য, পরসূত্রের উপস্থিতির বীজ ও অনুক্ত অংশের পূরণ। কতন্তর্হি অর্থাৎ ব্যুত্থান অবস্থায় যদি পুরুষ স্বরূপে অবস্থিতি করিতে না পারে, তবে কোনরূপে অবস্থিত হয়, এই অংশ, “বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র” এই উত্তর সূত্রের উপস্থিতির বীজ। দর্শিত বিষয়ত্বাৎ, এই টুকু সূত্রে অনুক্ত হেতুভাগের পূরণ। যেহেতু পুরুষ দর্শিত বিষয় দর্শিতোবিষয়ো যস্মৈ স ইতি বিগ্রহ, অর্থাৎ বুদ্ধি কর্ত্তৃক বিষয় প্রদর্শিত হয়। এজন্যই ব্যুত্থান অবস্থায় বৃত্তিসারূপ্য অর্থাৎ বুদ্ধির যেমত বৃত্তি পুরুষও তাদৃশ বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। ভগবান পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন, “একমেবদর্শনম্” ‘খ্যাতিরেবদর্শনম্” । একমেব

দর্শনম্ ইহারই ব্যাখ্যা খ্যাতিরেবদর্শনমিতি। পুরুষ ও বুদ্ধির খ্যাতি অর্থাৎ বিষয়প্রকাশরূপ এক ধর্ম্ম হয়, সাধারণতঃ পুরুষ ও বুদ্ধি অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। যদিচ বুদ্ধি ও পুরুষের খ্যাতি একরূপ নহে—বুদ্ধির খ্যাতি (বৃত্তি) পুরুষদ্বারা প্রকাশিত হয়, সুতরাং জড়; পুরুষের এতাদৃশ বৃত্তি নাই, তাহার বৃত্তি চৈতন্য স্বতঃপ্রকাশ—তথাপি এস্থলে খ্যাতি শব্দে লৌকিক জন্যজ্ঞান গ্রহণ করিতে হইবে। পুরুষের স্বরূপ যে নিত্যজ্ঞান, খ্যাতিশব্দে এস্থলে তাহার গ্রহণ হইবে না।

যেমন অয়স্কান্তমণি (চুম্বক পাথর) লৌহের সহিত সংযুক্ত না হইয়াই তাহাকে আকর্ষণ করে চিত্তও সেইরূপ পুরুষের সন্নিধানে অবস্থিত থাকিয়া তাহাকে বিষয়-প্রদর্শন করায় বলিয়া তাহার উপকারী হয়। পুরুষে চিত্তবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়াই স্বং ভবতী অর্থাৎ পুরুষের স্বকীয় (নিজের) হয় বলিয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন জবাকুসুম স্ফটিকের সন্নিধানে থাকিয়া নিজের লৌহিত্য গুণ স্ফটিকে সঞ্চারিত করে, চিত্তও সেইরূপ পুরুষের সন্নিধানে থাকিয়া সুখদুঃখাদি নিজের সমস্ত ধর্ম্ম তাহাতে প্রতিফলিত করে। এইরূপ বৃত্তি-সঞ্চারের কারণ অজ্ঞানজন্য বুদ্ধি ও পুরুষের স্ব-স্বামিভাব সম্বন্ধরূপ সংযোগ। পুরুষ স্বামী, ভোক্তা, অর্থাৎ দ্রষ্টা + চিত্ত স্ব, ভোগ্য অর্থাৎ দৃশ্য হয়। পুরুষের অদৃষ্টই বুদ্ধির ব্যাপারের প্রয়োজক, পুরুষের প্রয়োজন ভোগ ও অপবর্গ, সুতরাং বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানরূপ অপবর্গের কারণ, জন্মাইয়া পরে আর ব্যাপারান্তরে বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয় না। উক্ত বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ অনাদি, এই সংযোগ হইতে বাসনা অর্থাৎ সংস্কাররূপ অজ্ঞান জন্মে, পুনর্ব্বার ঐ অজ্ঞান হইতে সংযোগ হয়, বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় উল্লিখিত সংযোগ ও অজ্ঞানের প্রবাহ অনাদি, ও উভয়ই উভয়ের প্রতি কারণ।

মন্তব্য। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সমস্ত বিষয়ের মধ্যে এই অংশ (বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র) অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, অথচ অবশ্য জ্ঞাতব্য। পুরুষের কোনই ধর্ম্ম নাই, সমস্তই চিত্তের ধর্ম্ম, কেবল প্রতিবিম্বস্বরূপে পুরুষে সংক্রমিত হয় বলিয়াই আমি সুখী আমি দুঃখী এইরূপ ভ্রমজালে পুরুষ আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহার মর্ম্ম সহজে অবগত হওয়া বড়ই দুষ্কর। জগতে আমি (কর্ত্তা) ভিন্ন সমস্ত পদার্থই তর্ক বিতর্ক বা সমালোচনার বিষয় হইতে পারে। আমাকে আমি কিরূপে

সমালোচনা করিব, সমালোচ্য ও সমালোচক উভয়ই যে আমি! সমালোচক আমা ভিন্ন হইলে সে সমালোচনা আমা কর্ত্তৃকই বা কেন হইবে? আমি কে? আমার স্বরূপ কি? সুখদুঃখাদি সাংসারিক ধর্ম্ম আমাতে আছে কি না, ইত্যাদি বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, চিন্তাতরঙ্গ যেন ততই উদ্বেলিত হইতে থাকে। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "নৈষা তর্কেণ-মতিরাপনীয়া" অর্থাৎ কেবল তর্কদ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে, তবে এই দুর্ব্বোধ তত্ত্ব কথঞ্চিৎ ভাসমান হইতে পারে।

প্রথমতঃ, এমত আশঙ্কা হইতে পারে—আমি সুখী দুঃখী, দেখিতেছি, শুনিতেছি, পিপাসিত হইতেছি, এইরূপ সুখদুঃখাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অহরহ, সর্ব্বদা আমাদিগের আত্মা, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতেছে। শাস্ত্ররূপ পরোক্ষ প্রমাণ প্রতিপন্ন করিতেছে যে, আত্মার কোনই ধর্ম্ম নাই। এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিরুদ্ধ প্রমাণদ্বয়ের বিষয় বিচার করিতে গেলে আপাততঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই প্রবল বলিয়া বোধ হয়। কারণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞায়মান বিষয়ে কাহারই বিপ্রতিপত্তি থাকে না এবং অনুমানাদি সমস্ত পরোক্ষ প্রমাণ প্রত্যক্ষের সাহায্য ব্যতিরেকে উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণই অপর প্রমাণ অপেক্ষা প্রবল। এখন বিচার করা যাউক, প্রকৃতস্থলে কোনটির প্রবলতা সম্ভব হয়। প্রত্যক্ষ যদি প্রমাণ হয়, তবে তাহা প্রবল সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি প্রমাণ অর্থাৎ প্রমা (যথার্থ জ্ঞান) জনক না হইয়া প্রমাণাভাস অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানজনক হয়, তাহা হইলে সে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে, সুতরাং দুর্ব্বল। প্রত্যক্ষ হইলেই যে প্রবল হইবে এমত নিয়ম হইতে পারে না। বিষয়ের সত্যতা মিথ্যাত্ব লইয়াই প্রমাণের প্রবলতা দুর্ব্বলতা ব্যবহার হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষতা বা পরোক্ষতা, প্রবলতা দুর্ব্বলতার প্রয়োজক নহে।

দিক্‌ভ্রমস্থলে অনেকেরই পূর্ব্বদিক্‌কে উত্তর দিক্ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেও এটি উত্তর দিক্ নহে, কিন্তু পূর্ব্বদিক্, এইরূপ পরোক্ষ শব্দরূপ প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইয়া যায়। অতএব সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলেই যে অবাধিত হইবে, এমত বলা যায় না। যে প্রমাণের বিষয় বাধিত নহে, তাহাই প্রবল।

প্রস্তাবিত স্থলে একটি উদাহরণ উপন্যাস করিলে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে। এই যে হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট স্থূলদেহ, উহা আত্মা নহে, একথা আস্তিক ব্যক্তিমাত্রেই অঙ্গীকার করিবেন। অথচ আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি সুন্দর ইত্যাদি আত্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ ব্যবহার সকলেই করিয়া থাকেন। স্থূলতা, কৃশতা বা সুন্দরতা প্রভৃতি কোন ধর্ম্মই আত্মার নহে; হইতেও পারে না, উহা সমস্তই দেহের ধর্ম্ম। তথাপি যেমন আত্মার না হইয়াও আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হয়, তদ্রূপ সুখদুঃখাদি সমস্ত সূক্ষ্ম দেহের ধর্ম্মও আত্মার না হইলেও তাহাতে প্রতিভাস হইয়া থাকে। যেমন আমি স্থূল ইত্যাদি জ্ঞান, প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা "অস্থূলমণব্রহ্রস্বম্" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যজাত রূপ পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারায় বাধিত হইয়া যায়, তদ্রূপ আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান উক্ত পরোক্ষ প্রমাণদ্বারা বাধিত হইবায় বাধা কি? সূত্রকার তাই বলিতেছেন, "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" আত্মার কোন বৃত্তি স্বতঃ নাই, সমস্তই বুদ্ধিবৃত্তি, কেবল প্রতিবিম্বরূপে আত্মায় ভাসমান হয়। উহা সমস্তই মিথ্যা ইত্যাদি।

সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গশরীর সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট যথা—

"পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥"

অর্থাৎ প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ও ব্যান, এই আধ্যাত্মিক পঞ্চবিধ বায়ু; মনঃ, বুদ্ধি, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ, অপঞ্চীকৃত ভূত, অর্থাৎ ভূতান্তরের সহিত অমিশ্রিত পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতের এক একটি সূক্ষ্ম অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা সৃষ্টির আদিতে প্রত্যেক পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক একটি উপাধি রূপে সৃষ্ট হইয়া প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থিত হয়। যেমন স্ফটিকের উপাধি জবাকুসুম, মুখের উপাধি দর্পণ, সূর্য্য ও চন্দ্রের উপাধি জলাশয়, তদ্রূপ এই লিঙ্গশরীর, পুরুষের উপাধি। যেমন উপাধি স্বরূপ জবাকুসুমের রক্তিমা (লাল রঙ) গুণসন্নিহিত স্ফটিকে আরোপিত হয়, তদ্রূপ পুরুষের উপাধি পূর্ব্বোক্ত দেহদ্বয়ের ধর্ম্ম সন্নিহিত পুরুষে সঞ্চারিত হয়। তাই আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি সুখী ইত্যাদি নানারূপে আবদ্ধ হইয়া পুরুষ সংসারী হয়। যেমন জবাকুসুমকে দূরে রাখিলে আর তাহার গুণ স্ফটিকে

আসিতে পারে না, তখন স্ফটিক আপনার স্বচ্ছ শুভ্র পরিশুদ্ধ রূপেই অবস্থান করিতে পারে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত দেহদ্বয়ের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ নাশ করিতে পারিলে পুরুষ আর বদ্ধ থাকে না, তখন আপনি নির্ম্মলরূপে অবস্থিত হইয়া মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয়।

আকাশের ন্যায় আত্মাও বিভু অর্থাৎ সকল স্থানে অবস্থান করিতেছে সুতরাং তাহার গত্যাগতি কোন রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। যে বস্তু স্থান-বিশেষে না থাকে, তাহারই সেস্থানে গমন সম্ভব হয়। সর্ব্বত্র বর্ত্তমান বস্তুর গতিই বা কি, আগতিই বা কি? সুতরাং পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গশরীরই মরণকালে স্থূল শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া স্বর্গনরকাদি গমন করে, জন্মকালে পুনর্ব্বার শুক্র-শোণিতাদিতে প্রবিষ্ট হয়, উহাকেই আত্মার গত্যাগতি বা মৃত্যু জন্ম বলে। যেমন আকাশের উপাধি ঘট পট ইত্যাদি স্থানান্তরিত হইলে সেই সঙ্গে যেন আকাশও চলিতেছে বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ লিঙ্গশরীর গমনাগমন করিলে আত্মাও চলিতেছে বলিয়া ভ্রম হয়।

ব্যবহার দশাতে এই লিঙ্গশরীরই পরলোকগামী জীব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মহাভারতে যমকর্ত্তৃক সত্যবানের দেহ হইতে পুরুষ আকৃষ্ট হইবার যে উল্লেখ আছে, তাহাও এই লিঙ্গশরীরের বলিয়া জানিতে হইবে; যথা—

"ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতং।
অঙ্গুষ্ঠ মাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ॥"

যম সত্যবানের শরীর হইতে পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। অঙ্গুষ্ঠমাত্রে সূক্ষ্ম বলিয়া জানিতে হইবে। লিঙ্গ শরীরের পরিমাণ অতি সূক্ষ্ম, অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত নহে। উক্ত বাক্যে পুরুষ শব্দে আত্মার গ্রহণ করিলে আকর্ষণ সম্ভব হয় না, সুতরাং লিঙ্গশরীরকেই পুরুষ বলিয়া জানিতে হইবে। এই লিঙ্গশরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ রূপে জানিতে পারিলেই সমস্ত অনর্থের শান্তি হয়। এই বিয়োগকেই যোগ বলে—"পুম্প্রকৃত্যোর্ব্বিয়োগোঽপি যোগইত্যভিধীয়তে"।

চণ্ডী

বড় অদ্ভুত গ্রন্থ—মার্কণ্ডেয় ঠাকুরের এই চণ্ডী খানি। শূকরভোজীদের হাতে সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের রাজা সুরথ অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া বনে যাইতেছিলেন—পথে সমাধি নামক বৈশ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনিও তাঁহার স্ত্রীপুত্রের কাছে অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়া একই পথ অনুসরণ করিতেছেন। দুজনেই মেধস ঋষির আশ্রমে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর! এরূপ অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়াও আমার রাজ্যের প্রতি এবং বৈশ্যজের এমন আদর্শ স্ত্রীপুত্রের প্রতি মমতা হইতেছে কেন?"

তখন ঋষি ঠাকুর, একটি দিগ্‌গজ দার্শনিক, উত্তর দিলেন—

"পতিত মমতাবর্ত্তে, মোহ-গর্ত্তে জীব যত,
সংসার স্থিতিকারীর মহামায়া প্রভাবতঃ।" ১মা, ৪০

সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন মহামায়াটা কে?

উত্তর—

"নিত্য সে জগত মূর্ত্তি ব্যাপ্ত আছে চরাচর।" ১মা, ৪৭

আবার—

"সেই নিত্যা অভিহিতা, হন আবির্ভূতা যবে
দেবকার্য্য সিদ্ধি তরে, উৎপন্না কহে তবে।" ১মা, ৪৮

তখন এই কথা বুঝাইতে মেধস ঠাকুর কতকগুল আষাঢ়ে গল্প ছাঁদিলেন। সমস্ত বিশ্ব একার্ণবে পরিণত। ভগবান নিদ্রার শেষ-শয্যায় শয়িত। তাঁহার কাণের ময়লা হইতে মধু আর কৈটভ নামক দুই অসুর জন্মিয়া তাঁহার নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মপ্রজাপতিকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তখন প্রাণের দায়ে ব্রহ্মা নিদ্রাদেবীর কাছে মহা কান্না আরম্ভ করিলেন। খোসামুদিটি কেবল হালে প্রচলিত হয় নাই। তিনি নিদ্রাদেবীকে জগৎ-সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া স্তব করিলেন, নিদ্রাপ্রিয় বাঙ্গালীর পক্ষে এতদপেক্ষা সুখকর আর কি হইতে পারে?—দেবী নারায়ণের সর্ব্বশরীর হইতে নির্গতা হইলেন। "নিদ্রামুক্ত জগন্নাথ" দুরাত্মা মধু-কৈটভের

সঙ্গে পঞ্চসহস্র বৎসর বাহুযুদ্ধ করিলেন। অসুর দুটা বড় Noble fellows ছিল। যখন দেখিল যে নারায়ণ কিছুতেই কাণ্ডটার কিনারা করিতে পারিতেছেন না, তখন তাহাদের মনে লোকটার প্রতি দয়া হইল। তাহারা বলিল—"আচ্ছা বর লও।" নারায়ণ বলিলেন—"আর কি ছাই বর লইব। আমার বধ্য হও।" একেবারে প্রাণ ধরিয়া টান—তখন অসুর দুটা কিঞ্চিৎ Diplomacy (কূটনীতি) খাটাইয়া বলিল—"জল নাই এমন স্থানে আমাদিগকে বধ কর।" সর্ব্বত্র জল, অতএব হরি নিজ উরুর উপর রাখিয়া তাহাদের মাথা চক্রে কাটিয়া ফেলিলেন। চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্য শেষ হইল।

[দ্বিতীয় মাহাত্ম্য]

অসুররাজ মহিষে এবং দেবরাজ পুরন্দরে শতাব্দ ব্যাপিয়া যুদ্ধ। বলা বাহুল্য, দেবরাজ পরাজিত হইলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের উপাসকেরা যেরূপ Political agitation, বা রাজনৈতিক্ আন্দোলন অবলম্বন করেন, দেবতারাও তাহাই করিলেন। তাঁহারা এক Deputation (দল) বাঁধিয়া ঈশান এবং বিষ্ণুর কাছে গিয়া এক Memorial বা দরখাস্ত করিলেন। গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে, গৃহিণীর সান্নিধ্যে, কেবল আমরা, বাঙ্গালীরা যে মহাতেজস্বী, তাহা নহে—আমাদের দেবতাদেরও তখন তেজ উথলিয়া পড়ে। সকল দেবতাদের অঙ্গ হইতে এক একটি তেজ বিনিঃসৃত হইয়া একটি অতি জাঁকাল তেজের তিলোত্তমা সৃষ্টি হইল। দেবতারা সকলে তাঁহাকে স্ব স্ব অস্ত্র অর্পণ করিলে, তিনি সিংহে চড়িয়া প্রথমে চিক্ষুরাখ্য বিড়ালাখ্য মহাহনু প্রভৃতি মহিষাসুরের Monster সেনাপতিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

[তৃতীয় মাহাত্ম্য]

তাহাদিগকে বধ করিলে খোদ মহিষাসুর যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন, সে সত্য সত্যই একটি প্রকাণ্ড মহিষ—তুণ্ডে, খুরে, লেজে তোলপাড় করিয়া ফেলিল। মহীতল খুরক্ষুণ্ণ করিল, শৃঙ্গেতে উচ্চ অচল ছুড়িয়া

মারিল, লেজের বাড়িতে সমুদ্রের সম্যক্ জল ডাঙ্গায় ফেলিয়া দিল, শৃঙ্গে মেঘসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহিষটা আবার বহুরূপীও সাজিল। মাথা কাটিলে খড়্গপাণি মহাবীর হইয়া দেখা দিল। তার পর মহাগজমূর্ত্তি ধারণ করিল। তার পর নিজ মহিষমূর্ত্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী একেবারে Exhausted বা অবসন্না হইয়া পড়িলেন। হাজার হউক মেয়ে মানুষ। তখন কিঞ্চিৎ Stimulent বা সুরাসেবা করিতে করিতে বলিলেন—

"গর্জ্জ গর্জ্জ, মূঢ়! মধু পান করি যতক্ষণ।
তোমাকে বধিলে শীঘ্র গর্জ্জিবেন দেবগণ।" ৩মা, ৩৬

তার পর একেবারে দুর্গোৎসব—

"ইহা কহি এক লম্ফে আরোহিয়া ক্রোধাকুল
অসুরে আক্রমি, পদে কণ্ঠে হানিলেন শূল। ৩৭
তখন সে পদাক্রান্ত হ'লে অর্দ্ধ বিনিষ্কৃত
নিজ মুখ হ'তে হ'লো, দেবীর বীর্য্যে সংবৃত। ৩৮
যুঝিলেক মহাসুর হয়ে অর্দ্ধ বিনির্গত,
অসিতে কাটিয়া শির দেবী করিলেন হত।" ৩৯

দেবতারা তখন খুব নাচ গান করিয়া বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব Inaugurate বা প্রচলিত করিলেন।

[চতুর্থ মাহাত্ম্য]

দেবতারা মহা সমারোহে একটি লম্বা চৌড়া Thanksgiving service বা ধন্যবাদপর্ব্ব সম্পাদন করিলে, দেবী বিপদের সময় দেখা দিবেন বলিয়া পেট ভরিয়া খোসামুদি খাইয়া গা-ঢাকা দিলেন।

[পঞ্চম মাহাত্ম্য]

দেবতাগণের আবার বিপদ। শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই অসুর তাঁহাদিগকে একেবারে বেদখল করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা আবার একটি Monster meeting করিয়া

Resolution (প্রতিজ্ঞা) করিলেন যে, এবার আর ঈশান বিষ্ণুর কাছে একেবারে Directly না গিয়া সেই বিষ্ণুমায়া ঠাকুরাণীর কাছে যাইবেন। নাগেশ্বর হিমাচলে—তখনও সিমলা দার্জিলিঙ্গ তবে ছিল—Her Excellency বা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা আর একটি দীর্ঘ Memorial বা দরখাস্ত পাঠ করিলেন। এইটি আমাদের খাটি দরবারের ধরণের—আগা গোড়া খোসামুদি ও সেলাম। "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ"—খোসামুদিটা অমোঘ অস্ত্র, কখনও বিফল হয় না। কবিরা যে রমণীগণকে ভুজঙ্গের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন, কথাটা নিতান্ত কবি-কল্পনা নহে। দেবী আপনার দেহ-কোষ হইতে কালিকা ঠাকুরাণীকে বিনিঃসৃত করিয়া বেদখল দেবতাদিগকে দখল দেওয়াইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি একটুক Humourous procedure বা রসিকা কার্য্যপ্রণালী করিলেন। কালোরূপে হিমাচলটা আলো করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিয়া চণ্ড মুণ্ডের মুণ্ড ঘুরিল। তাহারা যাইয়া শুম্ভকে বলিল—

"প্রভো, তোমরা দেবতাদের—

"এরূপে সমস্ত রত্ন করিয়াছ আহরণ,
কল্যাণী স্ত্রীরত্ন কেন কর না তবে গ্রহণ?" ৫৩

"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"—শুম্ভ তাহা জানিতেন। প্রীতিতে মেয়ে মানুষকে আনিতে সুগ্রীব দূতকে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুরাণীটি রসিকা। তিনি বলিলেন—"কথাটা ঠিক। শুম্ভ ও নিশুম্ভ এমন বীর্য্যবান্‌ই বটে। কিন্তু পূর্ব্বে অত্যল্পবুদ্ধিহেতু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—

"যে আমাকে জিনে রণে, করে দর্প চূর্ণ মম,
যে আমার প্রতিযোগী—ভর্ত্তা হবে সেই জন।" ৬৯

শুম্ভ নিশুম্ভের সঙ্গে লড়াই! সুগ্রীব বুঝিল মেয়ে মানুষটা পাগল। সে তখন কিঞ্চিৎ গরম হইয়া ধমকাইল। মিষ্টি মুখে না যান, ত চুলে ধরিয়া নিবে। কিন্তু ঠাকুরাণীটি তাহাতে টলিলেন না

[ষষ্ঠ মাহাত্ম্য]

শুম্ভ শুনিয়া চটিয়া লাল। ধূম্রলোচনকে ডাকিয়া বলিলেন—

"হে ধূম্রলোচন! তুমি বেষ্টিত স্বসৈন্যগণে
আন বলে সে দুষ্টাকে বিহ্বলা কেশাকর্ষণে। ৩
পরিত্রাণকারী তার থাকে যদি কোন জন,
হউক অমর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব—করি' হনন।" ৪

তখন ধূম্রলোচন দেবীর কাছে গিয়া কহিল—"ওগো ভাল মানুষের মেয়ে!—

"প্রীতিতে প্রভুর কাছে না যাও যদি, অবলা,
নিব তবে ধরি বলে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা।" ৭

দেবী বলিলেন, তাহা হইলে নাচার—

"বলে যদি নেও তুমি, কি আর করিব আমি।" ৮

ধরিতে হাত বাড়াইবামাত্র ধূম্রলোচন এক হুঙ্কারে ধূম্র হইয়া গেল। তখন দেবীর সিংহ মহাত্মাও যথেষ্টরূপে উদরপূরণ করিলেন। শুনিয়া প্রস্ফুরিতাধর শুম্ভ চণ্ড মুণ্ডকে হুকুম দিলেন—"সিংহটাকে মারিয়া স্ত্রীলোকটিকে চুলে ধরিয়া আন।" বামাঙ্গিনীদের চিরকালই চুল লইয়া দুর্গতি।

[সপ্তম মাহাত্ম্য]

চণ্ড মুণ্ড আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল। তখন-

"অম্বিকা করিলা অতি কোপ অরিগণ প্রতি,
ক্রোধে মসীবর্ণ মুখ হইল ভীষণ অতি। ৪
ললাট-ফলক হ'তে ভ্রূকুটি-কুটিলাননী
করালবদনা কালী জন্মিলা অসিপাশিনী। ৫
চিতাকাষ্ঠ করে ধরি, নরমালা বিভূষণা,
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানা শুষ্ক মাংস বিভীষণা। ৬
কি ভীষণ লোল জিহ্বা কিবা মুখ বিস্তারিত,
নিমগ্ন রক্ত নয়ন দিঙ্মুখ নাদে পূরিত। ৭

ইনি মাহুত ও ঘোধঘণ্টাসমন্বিত আস্ত হাতীগুলো গিলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। শুধু তাহা নহে, হাতি তবু খাদ্য- কাষ্ঠের রথগুলো পর্য্যন্ত খাইতে লাগিলেন। অতএব চণ্ড মুণ্ডের ভবলীলা শীঘ্র শেষ হইল। তিনি তাহাদের মুণ্ড লইয়া কল্যাণী চণ্ডিকাকে উপঢৌকন দিলে, চণ্ডিকা তাঁহাকে চামুণ্ডা Title বা উপাধি দিলেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টও যদি রাজ্যশূন্য ব্যক্তিগণকে রাজা ও রাণী উপাধি না দিয়া চামুণ্ড ও চামুণ্ডা উপাধি দেন, তাহা হইলে, উপাধিটি উভয়বিধ অর্থ ও শাস্ত্রসঙ্গত হয়।

[অষ্টম মাহাত্ম্য]

শুম্ভ তখন নানাজাতীয় বিকৃতনামা দৈত্য-সৈন্য-সহ রক্তবীজকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। এমন সময় আবার দেবীদেহ হইতে "শতশিবা-নিনাদিনী" আর এক সংস্করণ নির্গত হইল। নাম শিবদূতী। তখন দেবতাদের শরীর হইতেও ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী নির্গত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংস্করণ-প্রসবে রক্তবীজ দেবতাদের অপেক্ষাও পটু। তাহার এক একটি রক্তবিন্দু ভূমিতে পড়িলে এক একটি রক্তবীজ জন্মায়। বড় বিভ্রাটের কথা। তখন এ বন্দবস্ত হইল যে, রক্ত মাটিতে না পড়িতে কালীঠাকুরাণী গিলিয়া ফেলিবেন। চণ্ডিকা এইরূপে এই পৌরাণিক পুরুভুজকে ধ্বংস করিলেন।

[নবম মাহাত্ম্য]

খবর শুনিয়া শুম্ভ নিশুম্ভ অতুল কোপ করিলেন। দেবতারা দেবীকে In anticipation of জয়—বা জয় হইবার পূর্ব্বেই জয়া উপাধি দিলেন। ভরসা করি, উপাধিব্যাধিগ্রস্তেরা এই নূতন প্রণালীটি গবর্ণমেণ্টের গোচর করাইবেন। চণ্ডিকা শূলে নিশুম্ভের বুক বিদ্ধ করিলে—

"শূল-ভিন্ন বক্ষ হ'তে জনমি' পুরুষ আর—
মহাবল মহাবীর্য্য কহে 'তিষ্ঠ' বারংবার।" ৩৩

দেবী সেই "নিক্রান্ত ও শব্দায়িত শির" কাটিয়া ফেলিলে আর পাঁচ ঠাকুরাণীরা মিলিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিলেন।

[দশম মাহাত্ম্য]

শুম্ভ তখন বলিল যুদ্ধটা কিছু Unfair (অন্যায়) হইতেছে—

"বলোন্মত্তা দুষ্টে! দুর্গে! হইও না গরবিণী।
অন্য বলাশ্রয়ে তুমি যুঝিছ অভিমানিনী। ২॰

দেবী একটু Diplomacy বা কূটনীতি খাটাইয়া বলিলেন—"বা! অন্য বল কোথায়?—

"এ জগতে একা আমি, কে মম দ্বিতীয় আর?
আমাতে পশিছে দেখ বিভূতিচয় আমার।" ৩

তখন ঠাকুরাণীরা সকলে গা-ঢাকা দিলেন। দেবী শূলের দ্বারা শুম্ভেরও বক্ষ বিদীর্ণ করিলে—

"মরিল সে পড়ি ভূমে—দেবী-শূলাগ্র-বিক্ষত।
কাঁপিল সকল পৃথ্বী সসিন্ধু-দ্বীপ-পর্ব্বত। ২৩
হত হ'লে দুরাত্মন প্রসন্ন হইল ভব।
জগত লভিল স্বাস্থ্য, নির্ম্মল হইল নভ। ২৪
উল্কা সহ মেঘোৎপাত হ'ল সব প্রশমিত,
নিরাপদ নদী পথ হইলে সে নিপাতিত। ২৫
বহিল পুণ্য-বাতাস, সুখপ্রভ আখণ্ডল,
জ্বলিল শান্ত অনল, শান্ত দিক কোলাহল। ২৭

বাপ! কি কাণ্ডখানা! বলা বাহুল্য যে ভীরু দেবতাগুলো তখন খুব নাচ গান আরম্ভ করিল। তাঁহারা যুদ্ধ কার্য্য গৃহিনীদের দ্বারা নির্ব্বাহ করাইতেনই, নাচ বাদ্যটাও গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরার উপর বরাদ্দ ছিল। আমাদের মত সে শ্রমটুকুও তাঁহারা নিজে স্বীকার করিতেন না।

[একাদশ মাহাত্ম্য]

তার পর দেবতারা সকলে মিলিয়া আর একটি লম্বা চৌড়া Thanks-

giving service বা ধন্যবাদপর্ব্ব নির্ব্বাহ করিলেন। এই কাপুরুষ দেবতারা একটা মুস্কিলে পড়িলেই দেবী নানা বিকট অদ্ভুত রূপ ধরিয়া তাহাদের রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতা হইলেন।

[দ্বাদশ মাহাত্ম্য]

শুধু তাহা নহে। দেবী তাহার পর একটি দীর্ঘ বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁহার উপর্য্যুক্ত চরিতাবলী পাঠের যেরূপ ফল ব্যাখ্যা করিলেন তাহার কাছে হল্‌-ওয়ের বটিকা কোথায় লাগে? সকল রোগ ত প্রশমিত হইবেই, তাহা ছাড়া ভূভারতে এমন কিছু নাই, যাহা উহার দ্বারা পাওয়া যাইবে না। ইহা কহিয়া তিনি চলিয়া গেলে, দেবতারা অবশিষ্ট অসুরগণকে পাতালে প্রেরণ করিয়া—তখনও Transportation ছিল—আপন আপন অধিকার দখল করিলেন। মেধস ঋষি কহিলেন—

"এইরূপে ভগবতী পুনঃ পুনঃ সর্ব্বক্ষণ
জগত-পালন তরে লভেন, ভূপ! জনম।
বিশ্বের প্রসূতি তিনি, তাঁহাতে বিশ্ব মোহিত,
করেন পূজিতা হ'লে জ্ঞানোন্নতি প্রদানিত।
মহামারী স্বরূপেতে মহাকালী চরাচর
করেন সকল ব্যাপ্ত মহা কালে নৃপবর।
তিনি কালে মহামারী, তিনি সৃষ্টি প্রসবিনী,
রক্ষেন সকল ভূত কালে সেই সনাতনী।
নরের উন্নতি-কালে লক্ষ্মী-বৃদ্ধি-প্রদায়িনী।
বিনাশ সময়ে তথা অলক্ষ্মী ধ্বংসকারিণী।
পুষ্প, ধূপ গন্ধাদিতে করিলে পূজা তাঁহার,
প্রদানেন বিত্ত পুত্র, ধর্ম্মরতি শুভ আর।" ৩৫—৪১

বেশ কথা! কিন্তু দুর্গাপূজার সময়ে যে মহিষাসুরের এবং অজাসুরের গরিব বাছাদিগকে সবংশে বিনাশ করা হয়, কই তাহার ত কোনও বিধান

এখানে নাই। উপরে একস্থানে পশু কথাটা আছে বটে, তেমন আর এক স্থানে চণ্ডমুণ্ডকে "মহাপশু" বলা হইয়াছে। পশুহননের কথা কোথাও নাই।

[ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য]

এই সকল গল্প শুনিয়া সুরথ রাজা আর বৈশ্যজ—

"দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি পুলিনে সৃজি উভয়ে,
দেবী সূক্ত জপি' তপে রহিলেন লীন হ'য়ে।
কভু মিতাহার করি, কভু নিরাহার-ব্রত
সাধি' থাকিলেন তাঁর ধ্যানে মগ্ন অবিরত।
পুষ্প-ধূপ-হোম-দানে করিলেন পূজা তাঁর,
স্ব স্ব দেহজাত রক্ত দিয়া বলি-উপহার।" ১৩মা, ১২

ও হরি! তবে 'বলি' শব্দের অর্থ অজ ও মহিষমুণ্ডচ্ছেদন নহে? আর আমরা কি "নিজ গাত্ররক্তের" পরিবর্ত্তে পাঁঠার রক্ত দিয়া থাকি? এই সম-শ্রেণীকতা তবে অজপুত্রদের গৌরবের বিষয়।

সুরথ রাজা ইহজন্মে নিজ রাজ্য ও অন্য জন্মে অক্ষয় রাজ্য চাহিলেন, আর—

"দুঃখিত মানসে বৈশ্য মাগিলেন বরদান
আমার কি? আমি কিবা? আশক্তি নাশক জ্ঞান।" ১১

রাজজাতীয় লোকগুলা কি চিরকালই ঘোরতর স্বার্থপরায়ণ? দেবী উভয়কে বর দিয়া চলিয়া গেলেন। সুরথ অন্য জন্মে সাবর্ণি মনু হইলেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য এখানে শেষ হইল।

এখন কথাটা হইতেছে, মার্কণ্ডেয় ঠাকুর যে নিতান্ত গণ্ডিকা দেবীর সেবক ছিলেন, চণ্ডীখানি পড়িয়াও এমন বোধ হয় না। তিনি স্থানে স্থানে অতি উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব ও দার্শনিকত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে যে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসলেখকের ন্যায়ও একটি গল্প ছাঁদিতে পারিতেন না, এমনও বোধ হয় না। তবে এরূপ আষাঢ়ে গল্প লিখিলেন কেন? ইহার ভিতর কি আর কোন অর্থ আছে? আজ কালের দিনে যাঁহারা পুরাতন শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যবসায় করিতেছেন, মনে করিলাম

তাঁহাদের কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইব। এমন সময়ে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি উপস্থিত, আমি মেজাজটি পঞ্চমে চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— "তুমি কে?" সে মেজাজটি একেবারে সপ্তমে তুলিয়া উত্তর করিল—"মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী—উপাধি তর্কভিন্দিপাল।"

প্র। মহাশয়ের নিবাস?

উ। আপাততঃ তোমার বাড়ীতে।

প্র। প্রয়োজন?

উ। ভিক্ষা।

আমার হার হইল। অমি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

ব্রা। তোমার সঙ্গে শ্রী শ্রীমান কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আলাপ আছে?

উ। যৎকিঞ্চিৎ।

ব্রা। আমি তাহার নাতি।

আমি মনে করিলাম, সে ত আফিমখোর—এ গুলখোর না হইয়া যায় না। তখন একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভিন্দিপাল ঠাকুর! চণ্ডী আপনার পড়া আছে?"

গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল—"শর্ম্মার পড়া না থাকে, এ ভূভারতে কোন্ মূর্খের পড়া আছে?

আ। ভাল ভাল, অন্য মূর্খের পড়া না থাকুক, আপনার থাকিলেই হইল। আচ্ছা ঠাকুর! এসব আষাঢ়ে গল্পের অর্থ কি?

ব্রা। বানর হইতে মানুষ জন্মিয়াছে। উহা কি আষাঢ়ে গল্প নহে?

আ। উহা যে Theory of evolution—বিবর্ত্তনবাদ।

ব্রা। বাপু হে! ইহাও সেই বিবর্ত্তন, আবর্ত্তন, সংবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনবাদ। একথা কয়টি পাষণ্ড এমনি সুরুচিবিরুদ্ধ মুখভঙ্গির সহিত ও হাত নাড়া দিয়া বলিল যে আমি তাহাতে কতই চটিলাম। বলিলাম—"সাবধান ঠাকুর, বেয়াদপি কর ত তাড়াইয়া দিব।"

ব্রা। মূর্খে সর্ব্বত্র পণ্ডিতকে তাড়াইয়া দিয়া থাকে। তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু কথাটা আগে শুন। দশ অবতার বাদের মূলে যে বিবর্ত্তনবাদ রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ?

আ। শুনিয়াছি।

ব্রা। চণ্ডীর মূলেও তাই। তুমি গীতা পড়িয়াছ?

আ। এই গীতা যুগে কেমন করিয়া বলিব পড়ি নাই?

ব্রা। তবে একবার গীতার সৃষ্টিপ্রকরণটা মনে কর—

"কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূত আমার প্রকৃতি পায়।
কল্পারম্ভে তাহাদের সৃজি আমি পুনরায়। ৭
অবলম্বি' স্ব প্রকৃতি সৃজি আমি বারম্বার।
প্রকৃতি-বশে অবশ অখিল ভূতসংসার। ৮
সেই সব কর্ম্মে বদ্ধ নহি আমি, হে ভারত!
অনাসক্ত সেই কর্ম্মে থাকি উদাসীন মত। ৯
প্রকৃতি অধ্যক্ষে মম সৃজে এই চরাচর।
এই হেতু জগতের বিপর্য্যয় বীরবর।" ১০

এখন চণ্ডীর প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ।

"বিশ্ব একার্ণব করি যখন শেষে শয়ান
ভজিলেন যোগনিদ্রা কল্প-অন্তে ভগবান্, ৪৯
বিখ্যাত মধু-কৈটভ তখন অসুর দ্বয়,
বিষ্ণু-কর্ণ-মলে জন্মি' ব্রহ্মা বধোদ্যত হয়। ৫০
বিষ্ণু-নাভিপদ্মেস্থিত সেই ব্রহ্মা প্রজাপতি
দেখিলা অসুর উগ্র, জনার্দ্দন সুপ্ত অতি। ৫১
স্তুতিলা যোগনিদ্রায় হরি-নেত্র-নিবাসিনী
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী, স্থিতি-সংহার-কারিণী, ৫২
বিষ্ণুর তেজে অতুলা নিদ্রাদেবী ভগবতী,
হরির চেতনা তরে এক চিত্তে প্রজাপতি।" ৫৩

অহো. কি মহাদৃশ্য! কল্পারম্ভে সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান স্বপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিবশে অবশ হইয়া অখিল-সংসার সৃষ্টি করিতেছেন। জল পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্ব একার্ণব—ঐশশক্তি সেই অনন্ত সলিল ব্যাপিয়া বিরাজিত। ভগবান্ অনন্ত শয্যায় শয়িত—তিনি "প্রকৃতির বশে অবশ" বা যোগনিদ্রাগত উদাসীন!

"জন্মে সত্ত্ব রজ তমে করি পার্থ! অভিভূত,
রজ—সত্ত্ব তমে; তম—সত্ত্ব রজে কুক্ষিসুত।" গীতা ১৪অ-১০

ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছে। ব্রহ্মা রজোগুণ তাঁহার নাভিপদ্ম-স্থিত। কিন্তু সমুদ্রমন্থনে বা বিবর্ত্তনে মধু ও কৈটভ, সত্ত্ব ও তম, অমৃত ও বিষ, অম্লজান ও জলজান সমুৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা প্রবল। তাহাদিগকে অভিভূত করিতে না পারিলে রজঃ শক্তির কার্য্য হইতে পারে না—সৃষ্টিকার্য্য অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ভগবান প্রকৃতির বশে অবশ বা নিদ্রাগত। ব্রহ্মা প্রকৃতির স্তুতি করিলেন। ভগবান সেই নিদ্রামুক্ত হইয়া মধুকৈটভরূপী সত্ত্ব ও তমঃ গুণকে অভিভূত করিলেন। তখন সৃষ্টিকার্য্য রজোগুণের দ্বারা অপ্রতিহত ভাবে চলিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে সলিলে মৎস্য, কর্দ্দমে কূর্ম্ম ও পরে কর্দ্দম দৃঢ়ীভূত হইয়া অরণ্যময় হইলে বরাহ সৃষ্টি হইল। চণ্ডীকার কেবল চিক্ষুরাখ্য বিড়ালাখ্য মহাহনু প্রভৃতি রাক্ষসসৃষ্টির দ্বারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সৃষ্টির এই তিন যুগের পর একবারে চতুর্থ যুগে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চণ্ডীর মহিষাসুর অবতারবাদের নরসিংহ—নিম্নার্দ্ধ পশু, উপরি অর্দ্ধ নর। বানর হইতে বা পশু হইতে মানুষের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে।

তাহার পর একদিকে বামন ও পরশুরাম, অন্যদিকে নিশুম্ভ শুম্ভ। দেহ মানবের, হৃদয় পশুর। বিবর্ত্তন-নীতিতে ক্রমে পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টি হইল। বর্ত্তমান যুগ আরম্ভ হইল। চণ্ডী এখানে শেষ হইয়াছে।

এখন বুঝিলে বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব অনেক সময়ে আষাঢ়ে গল্প। চণ্ডীকার এরূপ গল্পের দ্বারা সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও বিবর্ত্তনবাদ বুঝাইতে বুঝাইতে Illustration বা উদাহরণের দ্বারা গীতার আরও কয়েকটি মহান্ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। দুটির উল্লেখ করিব। ভগবানের সেই মহদ্বাক্য স্মরণ কর—

যখন যখন ঘটে, ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন,

স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ। গীতা, ৪অ, ৭। ৮

চণ্ডীতে দেখি দুষ্কৃত দানবেরা সাধু দেবতাদিগের নিগ্রহ করিলে ভগবানের প্রকৃতি 'মহামায়া' রূপে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের বিনাশসাধন করিতেছেন। গীতায় ভগবানের ভাষা যাহা, চণ্ডীতে ভগবতীর ভাষাও তাহা—

"এরূপে দানবগণ ঘটাবে বাধা যখন,
অবতীর্ণা হ'য়ে আমি বিনাশিব শত্রুগণ।" ৫০

দ্বিতীয়তঃ—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।"

আবার—

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণি গণা ইব।"

গীতার এ সকল মহদ্বাক্য স্মরণ করিয়া চণ্ডীর প্রথম, পঞ্চম ও একাদশ মাহাত্ম্যের সুললিত অমৃতস্যন্দিনী স্তবমালা পাঠ কর, এবং গীতার দশম অধ্যায়ের বিভূতিযোগ, একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপের স্তবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখ। গীতার উপর্য্যুক্ত জটিল দার্শনিক তত্ত্বটি চণ্ডীকার তিনটি দীর্ঘ স্তবের দ্বারা জলের মত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গীতার সেই—

"প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস!"

আর চণ্ডীর—

"প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।"

গীতার সেই—

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।"

আর চণ্ডীর —

"যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ ১৪ নমস্তস্যৈ ১৫ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ১৬
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ ১৭ নমস্তস্যৈ ১৮ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥" ১৯

আবার—

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥" ২৪

গীতার সেই—

"কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।"

আর চণ্ডীর—

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গং গৃহীতে পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥ ১১ মা, ১৬

এখন বুঝিলে কি চণ্ডীখানি গীতার কয়েকটি সূক্ষ্মতত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যা মাত্র। স্থূলবুদ্ধি লোকের জন্যে—জগতে তাহাদের সংখ্যাই অধিক—এরূপ আষাঢ়ে গল্পের দ্বারা জটিল তত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বেলা হইল—এখন আমায় বিদায় দেও।

আমি বলিলাম কিছুই হইল না। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইল কই? এই দেখ শাস্ত্রপ্রকরণের তর্কভূষণ মহাশয় কি বলিতেছেন—"অন্য পার্থিব পদার্থের সাহায্য ব্যতিরেকে, তখন ' (অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে) কত শত গৃহস্থ কেবল দেবীমাহাত্ম্যের কৃপায়, ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইত, তাহা গণিয়া উঠা যায় না। আর অদ্য সভ্যতাভিমানী হিন্দু, দেবীমাহাত্ম্য কাহাকে বলে জানেন না—মায়ের সন্তান হইয়া মায়ের পরিচয় জানেন না, ও জানিতে ইচ্ছা করেন না। হিন্দু বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু হিন্দু কাহাকে বলে বুঝেন না। দুঃখে পড়িলে, কাঁদিয়া দিন কাটাইবেন, তবু

একবার সর্ব্বসন্তাপহারিণী জননীকে ডাকিবেন না। না ডাকিবার কারণ আর কিছুই নহে, ইহা ইংরেজী স্কুলে পঠিত হয় না—সাহেবী রুচির বিমল জলে ইহার কোন পঙ্‌ক্তিই ধৌত নহে।"

পাঠসমাপন করিয়া বলিলাম—"তোমার এই সাহেবী রুচির বিমল জলে ধৌত" অর্থ করিয়া চণ্ডী পাঠ করিলে কি কেহ "ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে?"

ভিন্দিপাল ঠাকুর তখন তিন গ্রাম ব্যাপিয়া সপ্তস্বরে একটি Sartor Resartor গোছের হাসি আরম্ভ করিলেন। নানাবিধ মূর্চ্ছনা খেলিয়া হাসি প্রায় ১৫ মিনিট পরে শেষ হইলে, বেল্লিকটা বলিল—"কথাটা ঠিক! হিন্দু কাহাকে বলে বুঝি না? হিন্দু তর্কভূষণ মহাশয় কোন্ অভিধানে পাইয়াছেন, কোন্ ব্যাকরণ মতে হিন্দু শব্দ প্রতিপ্রন্ন করিয়া তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন, তাহা বুঝা বড় সহজ নহে। যবনবিপ্লব হইতে তর্কভূষণ মহাশয়েরা হিন্দুনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুনিয়াছি যাবনিক ভাষায় তাহার অর্থ গোলাম। তর্কভূষণ মহাশয়েরা ধর্ম্মগ্রন্থের এরূপ "ভয়ঙ্কর বিপদভঞ্জন" অর্থ করিয়াই আজ পুণ্যভূমি আর্য্যস্থানকে, হিন্দুস্থান বা গোলামের স্থান এবং সনাতন আর্য্যধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বা গোলামের ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছেন।"

একজন মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যাকারকের নিগূঢ় অর্থপূর্ণ কথার প্রতি এরূপ শ্লেষ শুনিয়া আমি ভয়ঙ্কর চটিয়া বলিলাম—"ঠাকুর আমি তোমাকে কিছুই দিব না।" বেল্লিকটা বলিল—"না দেও ক্ষতি নাই। আমার ব্যাখ্যাটি ছাপাইব।"

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

গিরিজায়া

বিরহ-দুঃখ-কাতরা মর্ম্ম-পীড়িতা রাজরাণী মৃণালিনীর পার্শ্বে, মিলন-লালসাবতী আনন্দময়ী ভিখারিণী গিরিজায়া বড়ই সুন্দর শোভা পাইতেছে। যেন স্থির, অচঞ্চল, অগাধ সমুদ্রের পার্শ্বে, একটি মধুরনাদিনী লীলাময়ী তরঙ্গিণী বিরাজ করিতেছে। সমুদ্রে করাল কাদম্বিনীর ছায়া পড়িয়াছে, দুই একবার প্রবল বায়ুতে তাহার তরঙ্গমালা গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তবু যেন সমুদ্র সে 'আপনার বলে আপনি স্থির'—আর তাহারই পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সুখ-মলয়-হিল্লোলে রঙ্গময়ী হইয়া তরঙ্গ-ভঙ্গে দিগ্বিভাসিত সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বহিয়া যাইতেছে। দৃশ্য সুন্দর। কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে, উহার পার্শ্বে মনোরমার চিত্রটিও কল্পনা করিয়া লইতে হয়। মৃণালিনী-সমুদ্রের বায়ুবিক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার গভীর গর্জ্জন শ্রুতিপথে সমাগত হয়, তাহার ইতস্ততঃ সঞ্চালন নেত্র-পথের স্পষ্ট পথিক হয়, তাহার অন্তরস্থ করাল ছায়া সূর্য্যকিরণে ক্ষণে ক্ষণে অপসারিত হয়, কিন্তু মনোরমা-সমুদ্রে স্থূলশ্রুতিগোচর তরঙ্গ-গর্জ্জন নাই, স্থূলদৃষ্টিগোচর বীচিবিক্ষেপ নাই, তদন্তরস্থ করাল ছায়ায় প্রখর সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়াও প্রবেশ লাভ করিতে পারে না; তাহার উপরে সুন্দর আলোক—অভ্যন্তরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। গিরিজায়া প্রফুল্লতার সুন্দর প্রতিবিম্ব, মনোরমা বিষাদের করাল ছায়া; আর মৃণালিনী উভয়ের সুন্দর মিশ্রণ। একদিকে মনোরমা, অপরদিকে গিরিজায়া, মধ্যে গ্রন্থাধিকারিণী মৃণালিনী! মানবচরিত্রের কি সুন্দর স্তর-সমাবেশ, কাব্যের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

গিরিজায়ার সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ লক্ষ্মণাবতীতে হৃষীকেশ শর্ম্মার বাড়ী। সে সাক্ষাৎটি এইরূপে সঙ্ঘটিত হয়।

আমরা একদিন হৃষীকেশ শর্ম্মার অন্তঃপুরে মৃণালিনী ও মণিমালিনী-লিখিত আলেখ্যদর্শনে ও তাহাদের কথোপকথন শ্রবণে নিবিষ্টচিত্ত আছি; এরূপ সময়ে দূর হইতে শুনিতে পাইলাম—কে গাইতেছে—

'মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি—রে;

সে স্বর অপূর্ব্ব—সে সঙ্গীত অপূর্ব্ব। সেই মৃণালিনী ও মণিমালিনীর কার্য্যের ও কথোপকথনের সঙ্গে সে লয়ও অপূর্ব্ব! আমরা শুনিতে লাগিলাম—

'কহলো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী—রে।'

সে গায়কের সহিত এক প্রকার পরিচয় ইহাতেই হইয়া গেল। কবি অতি সুন্দর কৌশলে, অতি সুন্দর সময়ে, গিরিজায়াকে সঙ্গীতস্বরে আমাদিগের নিকটে ভাসাইয়া আনিলেন। গিরিজায়ার প্রথম পরিচয়ে শেষ পরিচয়ের ইঙ্গিত নাহি কি?

যাহা হউক, এ পরিচয় লাভ করিয়া আমরা উৎসাহের সহিত তাহার আগমনপ্রতীক্ষায় রহিলাম। ক্ষণপরে দেখিতে পাইলাম, দূর হইতে গায়িকা যেন কি খুঁজিতে খুঁজিতে, কি শুনিতে শুনিতে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে গান শুনিয়া পূর্ব্বেই তাহার বয়স অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম, পূর্ব্বেই তাহার চক্ষু দুইটির চিত্র মানস-চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলাম, সমস্ত আকারেরও যেন একটা অস্পষ্ট ধারণা মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল। যাহা বাকি ছিল, তাহাও এখন দেখিলাম—দেখিলাম, সম্মুখে একটি খর্ব্বাকৃতি, ষোড়শী, প্রফুল্লা, স্মিতনেত্রা, তিলকধারিণী ভিখারিণীর মেয়ে। মুখে গাহিতেছে—

'মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি—রে!'

লোকের কণ্ঠস্বরেও তাহার চিত্তচরিত্রের ছবি থাকে।

বেঁটে কালো ভিখারিণীকে দেখিয়াই যেন তাহাকে বড় দুষ্ট বলিয়া বোধ হইল। বস্তুত কবির সেরূপ বর্ণনা আমাদিগের নেত্রোপরি যেমন একটি সজীব মূর্ত্তি আনিয়া স্থাপন করে, সেইরূপ তাহার চিত্তচরিত্রও যেন আমাদিগকে ইঙ্গিতে ব্যাখ্যা করিয়া দেয়।

দ্বিতীয় পরিচয় শেষ হইল। তৃতীয় পরিচয়ে তাহার নাম, ধাম, ব্যবসা সমস্ত জানিতে পারিলাম। এখন এই পরিচিতা রমণীটির চরিত্র পর্য্যালোচনা করা যাউক।

গিরিজায়া বড়ই প্রগল্‌ভা। ভিখারিণীর মেয়ে কিছু প্রগল্‌ভা হইবারই সম্ভব। ভিক্ষার উপর যাহার জীবিকা নির্ভর করে, ভিক্ষার জন্য যাহাকে দশ দ্বারে

বেড়াইতে হয়, কথা বলিতে না পারিলে তাহার চলিবে কেন? কাজেই গিরিজায়া বিশেষ বাক্‌পটু।

গিরিজায়া চিরানন্দময়ী চঞ্চলপ্রকৃতি। যাহাকে ইংরাজীতে Gay and light-hearted বলে, গিরিজায়া ঠিক তাহাই। ভিখারিণীর মেয়ে, হয়—প্রলুব্ধা, বিষণ্ণচিত্তা ও গম্ভীরা হয়, নইলে—প্রায়ই চিন্তাশূন্য, প্রফুল্লচিত্ত ও চঞ্চলপ্রকৃতির হইয়া থাকে। যাহার কিছু নাই, হয় সে পরম দুঃখী, নইলে সে পরম সুখী। গিরিজায়ার কিছুই নাই—মাতা, পিতা, বন্ধু, বান্ধব, দাঁড়াইবার স্থান, উচ্চ আশা—কিছুই নাই—তাই গিরিজায়া সদানন্দ, চিন্তাশূন্য, চঞ্চলপ্রকৃতি। মনোরমার অবস্থার সঙ্গে গিরিজায়ার অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদিগের উপরি উক্ত কথার দুই দিকই দেখিতে পাওয়া যায়। মনোরমারও কেহই নাই কিন্তু মনোরমা সংসারীর মেয়ে। এক দিন তাহার সকলই ছিল—এখনও তাহার পশুপতি আছে। তাই, মনোরমা গিরিজায়ার ঠিক অপরপৃষ্ঠ নহে সত্য—মনোরমা প্রলুব্ধা নহে সত্য, তবু মনোরমা গিরিজায়ার অপরপৃষ্ঠ বটে। একটি সুখের, অপরটি দুঃখের চিত্র। গিরিজায়া ভিখারিণীর মেয়ে, তাই গিরিজায়া নিশ্চিন্ত, সুতরাং পরমসুখী। মনোরমা সংসারীর কন্যা, আশৈশব চিন্তাভারপ্রপীড়িতা, সুতরাং পরমদুঃখী। একদিকে, চিন্তার মূর্ত্তি মনোরমা বিষণ্ণবদনে সেই বাপীকূলে উপবেশন করিয়া আমাদিগের মর্ম্মস্থল আলোড়িত করিতেছে—অপরদিকে, চিন্তাশূন্যা গিরিজায়া প্রফুল্লবদনে বায়ুর ন্যায় সৌরভ বিতরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কি সুন্দর যুগল চরিত্র!

গিরিজায়া অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী। তাহার বুদ্ধি দেখিলে, তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—তাহার বাক্য-কৌশল দেখিলে, বিমলা ও কমলমণিকে মনে পড়ে। ফলতঃ গিরিজায়াই যদি তদ্রূপ উচ্চঘরে জন্মিয়া শ্রীশচন্দ্রের ন্যায় পুরুষের পত্নী হইতে পারিত, তাহা হইলে গিরিজায়াতে ও কমলমণিতে কোন প্রভেদ থাকিত না।

গিরিজায়া অতি সুরসিকা। এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। গ্রন্থশেষ হইলে কবির রহস্যোদ্ভাবিনী শক্তির স্থল সমালোচিত হইবে, তখন গিরিজায়ার এ গুণটি পর্য্যালোচনা করিব। এখন এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, গিরিজায়ার এ রসিকতা তাহার অন্তরের সহিত জড়িত। লোকের

সুখে, ক্রোধে ঘৃণায়, গিরিজায়া কখনও রসছাড়া হয় নাই। এমন কি, প্রথম দৃষ্টিতে গিরিজায়ার এই গুণটিই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে পাঠকের চক্ষে পড়ে।

যাহার আপনার কেহ নাই, হয়, সে পরের জন্য সর্ব্বদা অস্থির, পরকেই সে আপনার করিয়া লয়; নইলে, সে ঘোর স্বার্থপর, পরসুখদ্বেষী ও আত্মসুখান্বেষী হইয়া পড়ে। গিরিজায়া ভিখারিণী—তাহার কেহ ছিল না, তাই সে যেখানে যখন থাকিত, সেইখানকার লোককেই তাহার আপনার করিয়া লইত। দুই দিনে হেমচন্দ্র তাহার আপনার হইতে পারিয়াছিলেন, দুই দিনে রত্নময়ী তাহার আপনার হইয়া উঠিল। আর মৃণালিনী?—সাধ করিয়া গিরিজায়া মৃণালিনীর দাসী হইয়া পড়িল? মৃণালিনীর জন্য সে কি না করিয়াছে? এমন সুন্দর পরময় জীবন বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্য বটে, গিরিজায়ার দিগ্বিজয়-প্রেমও ইহার মধ্যে অলক্ষ্যে কিছু কার্য্য করিয়াছিল, কিন্তু তবু গিরিজায়ার মৃণালিনী-সেবা অতুলনীয়। গিরিজায়ার সমস্ত কার্য্যই প্রায় মৃণালিনীর জন্য। চিরদিনই গিরিজায়া মৃণালিনীর স্নেহময়ী ও প্রেমময়ী সহচারিণী।

অত্যাচারীর প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও বিরাগ, অত্যাচারিতের প্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি স্বাধীন সংপ্রকৃতির একটি প্রধান লক্ষণ। গিরিজায়াকেও দেখ, যখন ব্যোমকেশ মৃণালিনীকে আক্রমণ করিল, গিরিজায়া নির্ভয়ে পরিণাম-বিপদ আশঙ্কা না করিয়া তাহার কিরূপ দুর্দ্দশা করিল। রহস্যের কথা এই যে গিরিজায়া সে সময়েও রসছাড়া নহে। রসিকতা গিরিজায়ার যে বাহিরের জিনিস নহে—অন্তরের জিনিস! গিরিজায়া অন্যকে হাসাইবার জন্য জোর করিয়া রসিকতা করিত না—তাহা যেন গিরিজায়ার সঙ্গে অবিভাজ্য রূপে কে মিশাইয়া দিয়াছিল।

ব্যোমকেশ যখন মৃণালিনীকে বলিল—

"ভাল, ভাল, ধন্য হইলাম! ও চরণস্পর্শে মোক্ষপদ পাইব। সুন্দরি! তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি তোমার জয়দ্রথ।"

তখন গিরিজায়া ক্রোধে অধীর হইয়াও তাৎকালীন রসোক্তি ভুলিল না। বলিল—

"আর আমি তোমার অর্জ্জুন।"

শুদ্ধ ব্যোমকেশের প্রতিই কি তাহার এরূপ ঘৃণা দেখা গিয়াছে? তাহা নয়। ব্যোমকেশের প্রতি অতি সাধারণ লোকেরও ঘৃণা হইতে পারে। যে হেমচন্দ্রের সহিত তাহার এত সদ্ভাব, যে হেমচন্দ্রের জন্য সে একদিন বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া মৃণালিনীকে অন্বেষণ করিয়াছে, সেই হেমচন্দ্র যখন অকারণে—অন্ততঃ গিরিজায়ার বিবেচনায় অকারণে—মৃণালিনীর প্রতি অনুচিত কঠোর ব্যবহার করিলেন—গিরিজায়ার সরল ও সাধু অন্তর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। আমরা সে স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"গিরি। কিন্তু সাহস পাই ত বলি—রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল—তবে আর কার্ত্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন?"

"মৃ। গিরিজায়া—হেমচন্দ্রের সহিত এ জন্মে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম আজিও তাঁহার দাসী।"

"গিরিজায়ার বড় রাগ হইল—সে উঠিয়া বসিল। বলিল, 'কি ঠাকুরাণি! তুমি এখনও বল তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী! তুমি যদি তাহার দাসী—তবে আমি চলিলাম—আমার এখানে আর প্রয়োজন নাই'।"

"মৃ। গিরিজায়া—যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তুমি স্থানান্তরে তাঁর নিন্দা করিও। হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই—আমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব? তিনি রাজপুত্র—আমার স্বামী, তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না।"

"গিরিজায়া আরও রাগ করিল। বহুযত্নরচিত পর্ণশয্যা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। কহিল—

'পাষণ্ড বলিব না—একবার বলিব' (বলিয়াই কতকগুলি শয্যাবিন্যাসের পল্লব সদর্পে জলে ফেলিয়া দিল) 'একবার বলিব—দশবার বলিব' (আবার পল্লব বিক্ষেপ)—'শতবার বলিব' (পল্লব প্রক্ষেপ) 'শতবার বলিব' (পল্লব প্রক্ষেপ) 'শতবার বলিব—হাজারবার বলিব।' এই রূপে সকল পল্লব জলে গেল। গিরিজায়া বলিতে লাগিল 'পাষণ্ড বলিব না? কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন'?"

এই স্থলে গিরিজায়ার কোপটুকু বড় সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রকারে পল্লববিক্ষেপ গিরিজায়ার ক্রোধের একটি অতি সুন্দর প্রদর্শন। কবি অতি ক্ষুদ্র কার্য্যদ্বারা সময়ে সময়ে দুই একটি চরিত্রের অতি কষ্ট-বাচ্য ভাবও সম্যক্ পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই স্থলে তদ্রূপ কোন কষ্টপ্রকাশ্য ভাব পরিব্যক্ত না হইয়া থাকিলেও পল্লব-বিক্ষেপটি গিরিজায়ার ক্রোধ-প্রদর্শনকে যেন আমাদিগের সম্মুখে আনিয়া স্থাপিত করিয়াছে।

গিরিজায়ার এই ক্রোধ, তৎপ্রতি হেমচন্দ্রের অত্যাচারজন্য হয় নাই। উপরি উক্ত কথোপকথনের দুইটি বৃহদক্ষরে মুদ্রিত কথায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মৃণালিনীকে অত্যন্ত ভালবাসিত বলিয়াও হেমচন্দ্রের প্রতি গিরিজায়ার এ ক্রোধ হয় নাই—হেমচন্দ্রকেও সে পূর্ব্বে ভালবাসিত। তাহার ক্রোধের প্রধান কারণ হেমচন্দ্রের অবিচারে অত্যাচার। গিরিজায়ার সরল ও স্বাধীন প্রকৃতি ইহা সহিতে অসমর্থ।

আর একদিন যখন হেমচন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন—

"দূর হও, নচেৎ বেত্রাঘাত করিব।"

গিরিজায়া 'ধীরে ধীরে' বলিয়াছিল—

"বীরপুরুষ বটে। এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিন্তু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরিবদুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।"

কথাগুলি যেন লুন মাখা। নীচ কার্য্যে গিরিজায়ার স্বাভাবিকই ঘৃণা ছিল। হেমচন্দ্র তাহাকে বেত্রাঘাত করিলে, তাহার কষ্ট হইবে, এ ভাবনা তখন গিরিজায়ার মনে হয় নাই। গিরিজায়া হেমচন্দ্রের তদ্রূপ মানসিক অবনতি দেখিয়া তৎপ্রতি ঘৃণাপরায়ণ হইয়াছিল। সেই মনোভাবের সহিত তাহার বাক্পটুতা মিশ্রিত হইয়া, উপরি উক্ত শ্লেষের বিদ্রূপাত্মক মর্ম্মস্পর্শী বাক্যগুলি বহির্গত করাইয়াছিল। গিরিজায়া এখানে হেমচন্দ্রের প্রতি কোপ প্রকাশ করে নাই—ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল। তাই সে ধীরে ধীরে কথা গুলি বলিল। কবি এই ঘৃণাভাবটুকু বিশেষ পরিব্যক্ত করিবার জন্য উক্ত কথাটি বসাইয়া দিয়াছেন। এখানে ঘৃণা ক্রোধ হইতে এক স্তর উপরে।

গিরিজায়া প্রেমিকা। গিরিজায়া সবে ষোল বছরে পদার্পণ করিয়াছে, এ বয়সে সাধারণতঃ প্রেমবৃত্তিই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া পড়ে। কবি এ ভাবটিও গিরিজায়াতে বড় সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন। তাহার স্থির প্রেম-লক্ষ্য বড় একটা প্রকাশ করিয়া দেখান নাই, তাহার মুখে এ প্রেম সম্বন্ধে নিজের মনোভাব খুলিয়া বলান নাই, তাহার ভাবভঙ্গী, তাহার কথাবার্ত্তা, তাহার রসোল্লাস, তাহার হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রভৃতিতে এ বৃত্তিটি বড়ই সুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন। আমরা তাহা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

গিরিজায়া যে সাধ করিয়া মৃণালিনীর দাসী হইল, সে অনেকটা এই প্রেমবৃত্তির জন্য। বিশুদ্ধ প্রেমিকের ধর্ম্মই এই যে, সে সর্ব্বত্রই প্রেমের উপাসক হইয়া পড়িবে। গিরিজায়ার হৃদয়ে সবে প্রেমের উন্মেষ হইতেছিল। সে হেমচন্দ্রের মৃণালিনী-অন্বেষণে আগ্রহ করিয়া সহায়তা করিল। কেন না, সে এখানে সেই স্বীয় অন্তরস্থ ঈষদুন্মেষিত প্রেম-বিকাশের কার্য্য দেখিতে পাইল। সে মৃণালিনীর হেমচন্দ্র-অন্বেষণে সহচারিণী হইল, কারণ মৃণালিনী প্রেমিকশ্রেষ্ঠা। মৃণালিনীর বিকশিত প্রেম গিরিজায়া অন্তরে অন্তরে পূজা করিত।

শুদ্ধ হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর মিলন-সহায় হইয়াছিল বলিয়াই কি আমরা এইরূপ বলিলাম? তাহা নহে। আমরা আর কিরূপে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা নিম্নে বলিতেছি।

যে দিন আমরা গিরিজায়াকে প্রথম দেখি, তাহার আকৃতি ও সঙ্গীতে আমরা এই ভাবের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলাম। সে সঙ্গীতের স্রোত বহিয়া যেন এ ভাবটি প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল, সে চোক মুখের ভিতর দিয়া যেন এ ভাবটি বাহিরে ফুটিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তখন শুধু সন্দেহ হইয়াছিল। তার পরে গিরিজায়া যখন মৃণালিনীর গান শিখিতে গিয়া বলিল—"চক্ষের জলটুকু শুদ্ধ কি শিখিব।" তখন সন্দেহের মাত্রা বাড়িল। তার পরে যখন গিরিজায়া মৃণালিনীকে বলিল—

'বিশ্বাস হইবে না কেন? কিন্তু সে স্থান (যমালয়) ত আছেই, যখন ইচ্ছা তখনই যাইতে পারিবে। এখন কেন আর এক স্থানে যাও না?'

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোথা ?' গিরিজায়া তদুত্তরে বলিল, 'নবদ্বীপ'। তখন সন্দেহ প্রায় বিশ্বাসে পরিণত হইল। পরিশেষে যখন যাত্রাকালে গিরিজায়া গাহিল—

"মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে ॥

"মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভাল বাসি,
"যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে ॥"

তখন সন্দেহ রহিল না। এ গান প্রেমিক ভিন্ন অন্যে গাহিতে অসমর্থ। এ গানের প্রতি কথায়, প্রতি স্বরকম্পনে যেন বলিতেছে—'দেখ দেখ, গিরিজায়ার অন্তর দেখ—দেখ দেখ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সুন্দর প্রেমোচ্ছ্বাস দেখ!' গান শুনিয়া দিগ্বিজয়ের প্রতি গিরিজায়ার অনুরাগের কথাও এই প্রথম মনে হইল।

তার পরে আমরা অনুসন্ধিৎসু হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গিরিজায়ার কথা কার্য্য পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। বিশ্বাস প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইল। একদিন শুনি, গিরিজায়া ও মৃণালিনী নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন করিতেছে।

"গিরিজায়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিল, 'তবে কি নদীয়ায় তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না' ?"

"মৃ। না।"

"গি। তবে যাইতেছ কেন ?"

"মৃ। তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি।"

"গিরিজায়ার মুখে হাসি ধরিল না। (বৃহদক্ষরে মুদ্রিত আমরাই "করিলাম) বলিল, তবে আমি গীত গাই—

"চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন।
দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন ॥

এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,
দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন ॥"

এই যে—'গিরিজায়ার মুখে হাসি ধরিল না' ইহাতে সমস্ত গিরিজায়াকে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এই খানে প্রেমভক্ত, প্রেমিক গিরিজায়া, প্রফুল্ল গিরিজায়া, চিন্তাশূন্য গিরিজায়া, চপল গিরিজায়া, সবই দেখিতে পাই। পরে গানেই কি গিরিজায়ার অন্তর কম ব্যক্ত হইয়াছে!

গিরিজায়া প্রণয়ের কথা শুনিতে, প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিতে বড়ই কৌতূহলী। যখন মৃণালিনী তাহার পূর্ব্বপরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, গিরিজায়া বলিল—

'ঠাকুরাণি! সকল কথা বল না? আমার শুনিয়া বড় তৃপ্তি হবে।' এই কৌতূহলের সঙ্গে, রহস্যপ্রিয়তা যোগ করিয়া লইলে, হেমচন্দ্রের সহিত গিরিজায়ার প্রথমদিনকার ব্যবহার বুঝা যাইবে। গিরিজায়া মৃণালিনীর সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, হেমচন্দ্র তাহাই জানিবার জন্য প্রায় উন্মত্তবৎ—কিন্তু তবু গিরিজায়া সহসা সে সংবাদ বলিতেছে না।

হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে—গিরিজায়া? আশা কি মিটিল?"

"গি। কার আশা? আপনার না আমার?"

"হে। আমার আশা। তাহা হইলেই তোমার মিটিবে।"

"গি। আপনার আশা কি প্রকারে মিটিবে? লোকে বলে রাজা রাজড়ার আশা কিছুতেই মিটে না।"

"হে। আমার অতি সামান্য আশা।"

"গি। যদি কখন মৃণালিনীর সাক্ষাৎ পাই, তবে এ কথা তাঁহার নিকট বলিব।" ইত্যাদি ইত্যাদি *

গিরিজায়ার এইরূপ ব্যবহার ও ছলনা কেবলমাত্র রহস্যপ্রিয়তা হইতে উদ্ভূত নহে। মৃণালিনী সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের অন্তঃকরণ—প্রণয়পাত্রের জন্য প্রেমিকের উন্মত্ততা—দেখিবার অভিলাষই ইহার প্রধান কারণ। গিরিজায়া জানিতেছে যে হেমচন্দ্রের কষ্ট সে ইচ্ছামাত্রই দূর করিতে পারিবে, সুতরাং সে কষ্টের প্রতি সহানুভূতি, গিরিজায়ার রহস্যপ্রিয়তা ও প্রেমোন্মাদ দেখিবার ইচ্ছা, নিবারিত রাখিতে পারিল না।

---

* পাঠকবর্গ এই স্থানটি একবার পড়িয়া লইবেন। স্থানাভাব জন্য আমরা সমগ্র উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। আরম্ভ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

কিন্তু যেখানে আবার প্রকৃত সমবেদনা আবশ্যক, সেখানে কোন প্রকার ঘটনাই গিরিজায়াকে অন্যভাবাপন্ন করিতে পারে না।

যে দিন মৃণালিনীর লিপিখানি হেমচন্দ্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, গিরিজায়া বাটী আসিয়া গৃহের অনতিদূরে এক সোপানবিশিষ্ট পুষ্করিণীর সোপানোপরি উপবেশন করিয়া গাইতে লাগিল—

"পরাণ না গেলো।
যো দিন দেখনু সই যমুনা কি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
ওঁহি পর পিয় সই কাহে কালা নীরে,
জীবন না গেলো ?
ফিরি ঘর আয়নু, না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখিনীরে আপনা অঁাচোলি,
রোই রোই পিয় সই কাহে লো পরাণি,
তখনই না গেলো ?"—
ইত্যাদি

সে রাত্রিটি শারদীয় পূর্ণিমার রাত্রি—গিরিজায়ার মনের মত উল্লাস ও চাপল্যব্যঞ্জক। কিন্তু গিরিজায়ার ঐরূপ সঙ্গীতে যেন জ্যোৎস্নারও সে ভাব ফিরিয়া গেল। সেই পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদীও গিরিজায়ার সঙ্গীতে বশ হইয়া যেন মৃণালিনীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাকেই প্রকৃত মহানুভাবকতা বলে।

গিরিজায়ার প্রেমোন্মেষ আমরা কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলাম পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তখন আমরা গিরিজায়ার সে প্রেমের লক্ষ্য দেখিতে পাই নাই। গিরিজায়াও তখন ইহার স্থিরলক্ষ্য দেখিতে পাইয়াছিল কি না জানি না। কিছুদিন পরে জানিতে পারিলাম দিগ্বিজয়ই এই ভিখারিণীর প্রণয়-পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন একে একে সব কথা মনে হইতে লাগিল—একে একে সব কথা বুঝিতে লাগিলাম, ও কবির কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম। দিগ্বিজয়ের প্রতি গিরিজায়ার এই প্রচ্ছন্ন অনুরাগ বড়ই সুন্দর।

একজনের প্রতি অপরের ভালবাসা কেন জন্মে, তাহার সম্পূর্ণ কারণ

কিছু নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে, অবস্থাধীন দুই একটি কথা বলা যায় বটে। গিরিজায়া দিগ্বিজয়ে কেন অনুরাগিণী হইয়াছিল, আমরা তাহার একেবারে সঠিক ও সম্পূর্ণ কারণ বলিতে পারি না সত্য, কিন্তু দুই একটি কথা, বোধ হয়, বলা যায়। সে কথাগুলি এই—

দিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের পরিচারক—গিরিজায়া হেমচন্দ্রের সৌখীন (honorary) পরিচারিকা। এই এক প্রভুর কার্য্য করিতে গিয়া উভয়ের একটা তুল্য সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল। গিরিজায়ার তখন 'প্রথম বয়েস'—দিগ্বিজয়ও অবিবাহিত যুবক। তারপরে রসালাপেও দিগ্বিজয় গিরিজায়ার দুই একটি কথার উত্তর দিতে সমর্থ। এরূপ স্থলে গিরিজায়ার দিগ্বিজয়প্রতি অনুরাগ অসম্ভব নহে। গিরিজায়া এই অনুরাগের বীজ অন্তরে রোপিত করিয়া, যতই মৃণালিনীর আদর্শপ্রণয় দেখিতে লাগিল, ততই সে বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতে লাগিল। ততই সেই পূর্ব্ব-লক্ষ্য দিগ্বিজয় গিরিজায়ার প্রগাঢ় প্রণয়ের পাত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। মৃণালিনী যখন হেমচন্দ্রকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপ যাত্রা করেন, গিরিজায়াও দিগ্বিজয়কে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। মৃণালিনী সেই সময়ে যখন বলিয়াছিলেন, "তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি"—তখন যে গিরিজায়া মনের মত হাসিয়া গাহিয়া-ছিল—"চরণতলে দিনু" ইত্যাদি, তাহা এই দিগ্বজয়ের প্রতি প্রণয়টি মনেছিল বলিয়া—মনের মত কথা হইবার জন্য। ভিতরে এইরূপ কিছু না থাকিলে কি প্রেমের কথা ভাল লাগে?

সুরসিকা ভিখারিণীর এই প্রেমপ্রকাশ কবি কিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"উপবনগৃহে আর একস্থানে আর একটা কাণ্ড হইতেছিল, দিগ্বিজয় প্রভুর আজ্ঞামত রাত্রিজাগরণ করিয়া গৃহরক্ষা করিতেছিল। মৃণালিনীকে লইয়া যখন হেমচন্দ্র আইসেন, তখন সে দেখিয়া চিনিল। মৃণালিনী তাহার নিকট অপরিচিতা ছিলেন না। যে কারণে পরিচিতা ছিলেন, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। মৃণালিনীকে দেখিয়া দিগ্বিজয় কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা নাই; কি করে। ক্ষণেক পরে গিরিজায়াও আসিল দেখিয়া দিগ্বিজয় মনে ভাবিল, "বুঝিয়াছি ইহারা দুইজন গৌড় হইতে আমাদিগের

দুইজনকে দেখিতে আসিয়াছে। ঠাকুরাণী যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছেন, আর এ ছুঁড়ি আমাকে দেখিতে আসিয়াছে, সন্দেহ নাই।" এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় একবার আপনার গোঁপদাড়ি চুমরিয়া লইল, এবং ভাবিল "না হবে কেন?" আবার ভাবিল, এ ছুঁড়ি কিন্তু বড় নষ্ট—একদিনের তরে কই আমাকে যে ভাল কথা বলে নাই, কেবল আমাকে গালিই দেয়, তবে ও আমাকে দেখিতে আসিবে তাহার সম্ভাবনা কি? যাহাহউক একটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। রাত্রি ত শেষ হইল—প্রভুও ফিরিয়া আসিয়াছেন; এখন আমি পাশ কাটিয়া একটু শুই, দেখি মাগি আমাকে খুঁজিয়া লয় কি না? ইহা ভাবিয়া দিগ্বিজয় এক নিভৃত স্থানে গিয়া শয়ন করিল, গিরিজায়া তাহা দেখিল।

গিরিজায়া তখন মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি-ত মৃণালিনীর দাসী। মৃণালিনী এ গৃহের কর্ত্রী হইলেন অথবা হইবেন, তবে ত বাড়ীর গৃহকর্ম্ম করিবার অধিকার আমারই।" এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া গিরিজায়া এক-গাছা ঝাঁটা সংগ্রহ করিল এবং যে ঘরে দিগ্বিজয় শয়ন করিয়া আছে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়া আছে, পদধ্বনিতে বুঝিল যে, গিরিজায়া আসিল—মনে বড় আনন্দ হইল, তবে ত গিরিজায়া তাঁহাকে ভাল-বাসে। দেখি গিরিজায়া কি বলে? এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়াই রহিল। অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে দুম্ দাম করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল, "আঃ মলো ঘরগুলায় ময়লা জমিয়া রহিয়াছে দেখ! একি—এক মিন্সে চোর না কি? ম'লো মিন্সে, রাজার ঘরে চুরি!" এই বলিয়া আবার সম্মার্জ্জনীর আঘাতে দিগ্বিজয়ের পিট ফাটিয়া গেল।

"ও গিরিজায়া আমি! আমি!"

"আরে তুই বলিয়াই ত খাঙ্গারা দিয়া বিছাইয়া দিতেছি।"

এই বলিবার পর, আবার বিরাশীসিক্কা ওজনে ঝাঁটা পড়িতে লাগিল।

"দোহাই! দোহাই! গিরিজায়া! আমি দিগ্বিজয়!"

আবার চুরি করিতে এসে আমি দিগ্বিজয়! দিগ্বিজয় কে রে মিন্সে?" ঝাঁটার বেগ আর থামে না।

দিগ্বিজয় এবার সকাতরে কহিল—"গিরিজায়া আমাকে একেবারে ভুলিয়া গেলে?"

গিরিজায়া বলিল, "তোর আমার সঙ্গে কোন্ পুরুষে আলাপ রে মিন্সে!" দিগ্বিজয় দেখিল নিস্তার নাই, রণে ভঙ্গ দেওয়াই পরামর্শ। দিগ্বিজয় তখন অনুপায় দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে পলায়ন করিল, গিরিজায়া সম্মার্জ্জনী হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

গিরিজায়া একদিন হেমচন্দ্রের সম্বন্ধে বলিয়াছিল—'তিনি কথার বাণিজ্য' করেন—আজ গিরিজায়া, তাঁহার পরিচারিকা কথার ভার প্রভুকে দিয়া, তদ্বিপরীত ব্যবসা আরম্ভ করিল। তাহার প্রণয় কথায় প্রকাশিত না হইয়া কার্য্যে প্রকাশিত হইল। সুরসিকা পরিচারিকারই উপযোগী কার্য্যে প্রকাশিত হইল। ইহা সুন্দর নয় কি? কবি 'প্রেম নানাপ্রকার' অধ্যায়ে ইহার বৃত্তান্ত আমাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত শিরোনামাই আমাদিগের যত বক্তব্য সমস্ত বলিয়া লইয়াছে। অতিরিক্ত বলা নিষ্প্রয়োজন।

গিরিজায়া স্বভাবতই বুদ্ধিশালিনী। তার পরে, এই লুক্কায়িত প্রেমবহ্নি তাহাকে আরও খরতরা করিয়া তুলিয়াছিল। সে প্রণয়-সম্বন্ধে অতি গূঢ় কথাও বুঝিত। হেমচন্দ্র-মনোরমা-সম্বন্ধে তাহার সেই সুবিখ্যাত স্বগতোক্তি আমাদিগের একমাত্র প্রমাণ। আমরা তাহা সমগ্র উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উদ্ধৃতাংশ মধ্যে বৃহদক্ষরে মুদ্রিত স্থান পাঠক মহাশয়গণ মনে রাখিবেন। তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে।

গিরিজায়াই প্রশ্ন করিতেছে, আবার গিরিজায়াই উত্তর দিতেছে।

"প্রশ্ন। ওলো তুই বসিয়া কে লো? উত্তর—গিরিজায়া লো। (প্র) এখানে কেন লো? (উ) মৃণালিনীর জন্যে লো। (প্র) মৃণালিনী তোর কে? (উত্তর) কেউ না। (প্র) তবে তার জন্যে তোর এত মাথা ব্যথা কেন? (উ) আমার আর কাজ কি? বেড়িয়া বেড়িয়া কি করিব? (প্র) মৃণালিনীর জন্যে এখানে কেন? (উ) এখানে তার একটি শিকলীকাটা পাখী আছে। (প্র) পাখী ধরিয়ে নিয়ে যাবি নাকি? (উ) শিকলি কেটে থাকে ত ধরিয়া কি করিব? ধরিবই বা কিরূপে? (প্র) তবে বসিয়া কেন? (উ) দেখি শিকল কেটেছে কি না। (প্র) কেটেছে না কেটেছে জেনে কি হইবে? (উ) পাখীটির জন্যে মৃণালিনী প্রতিরাত্রে কত লুকিয়ে লুকিয়ে

কাঁদে—আজি নাজানি কতই কাঁদবে। যদি ভাল সম্বাদ লইয়া যাই, তবে অনেক রক্ষা হইবে। (প্র) আর যদি শিকল কেটে থাকে? (উ) মৃণালিনীকে বলিব যে, পাখী হাত-ছাড়া হয়েছে—রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিবে ত আবার বনের পাখী ধরিয়া আন। পড়া পাখীর আশা ছাড়। পিঁজরা খালি রাখিও না। (প্র) মর ছুঁড়ি ভিখারীর মেয়ে! তুই আপনার মনের মত কথা বলিলি! মৃণালিনী যদি রাগ করিয়া পিঁজরা ভাঙ্গিয়া ফেলে? (উ) ঠিক বলেছিস্ সই! তা সে পারে। বলা হবে না। (প্র) তবে এখানে বসিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া মরিস্ কেন? (উ) বড় মাথা ধরিয়াছে ভাই! এই যে ছুঁড়ি ঘরের ভিতর বসিয়া আছে—এ ছুঁড়ি বোবা—নহিলে এখনও কথা কয় না কেন? মেয়ে মানুষের মুখ এখনও বন্ধ?"

ক্ষণেক পরে হেমচন্দ্র ও মনোরমার কথা শুনিয়া গিরিজায়া পূর্ব্ববৎ প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিল—

"(প্র) কি বুঝিলে? (উ) কয়েকটি লক্ষণ মাত্র। (প্র) কি কি লক্ষণ? গিরিজায়া অঙ্গুলিতে গণিতে লাগিলেন,—এক মেয়েটি আশ্চর্য্য সুন্দরী; আগুণের কাছে ঘি কি গাঢ় থাকে? দুই—মনোরমা হেমচন্দ্রকে ভালবাসে, নহিলে এত যত্ন করিল কেন? তিন—একত্রে বাস। চারি—একত্রে রাত-বেড়ান। পাঁচ—চুপি চুপি কথা।

"(প্র) মনোরমা ভালবাসে; হেমচন্দ্রের কি? (উ) বাতাস না থাকিলে কি জলে ঢেউ হয়? আমাকে যদি কেহ ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসিব সন্দেহ নাই। (প্র) কিন্তু মৃণালিনীও ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে। তবে ত হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে ভালবাসিবেই। (উ) যথার্থ। কিন্তু মৃণালিনী অনুপস্থিত, মনোরমা উপস্থিত।"

"এই ভাবিয়া গিরিজায়া ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তথায় একটি গীত আরম্ভ করিয়া কহিলেন—

'ভিক্ষা দাও গো।'*

অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত হইল।

গিরিজায়ার এই কথোপকথন অতুলনীয় সামগ্রী। ইহাতে সমস্ত গিরিজায়ার প্রকৃতি প্রকাশিত রহিয়াছে। এ কথায় তাহার সঙ্গীত আছে, তাহার রসিকতা আছে, তাহার সহৃদয়তা আছে, তাহার প্রেমাভিজ্ঞতা আছে, তাহার চাঞ্চল্য আছে, তাহার উল্লাস আছে; নাই কি? এরূপ স্থল অতি অল্প কাব্যেই আছে।

আবার যেদিন গিরিজায়া গাহিয়াছিল 'পরাণ না গেলো'—সে দিন মৃণালিনী গিরিজায়ার পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন। গিরিজায়া তাহা দেখিল, দেখিয়া হর্ষান্বিত হইল, কারণ সে বুঝিতে পারিল, "যখন মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিয়াছে—তখন তাঁহার ক্লেশের কিছু শমতা হইয়াছে।"

ইহা সকলে বুঝে কি? প্রেমাভিজ্ঞতা না থাকিলে, হৃদয় না থাকিলে, ইহা বুঝিতে পারা যায় না।

গিরিজায়ার এবম্বিধ ব্যুৎপত্তির সহিত একদিনকার এক ঘটনার আপাতত কিছু বিরোধ দেখা যায়। যে দিন হেমচন্দ্র গিরিজায়ার মুখে মৃণালিনীর বিবাহের সম্বাদ শুনিয়া "অভিমানভরে দুর্দ্দম-ক্রোধাবেগে" গিরিজায়াকে বলিয়াছিলেন "তোমার সম্বাদ শুভ", সেদিন গিরিজায়া সে কথার অর্থ বুঝিতে পারে নাই। গিরিজায়া ভিখারিণীর মেয়ে, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ভিখারিণীর কন্যা বলিয়া গিরিজায়া প্রেমসম্বন্ধে ত কোন দিনও ভিখারিণী নহে। তবে সে এ কথা বুঝিল না কেন?

আমরা প্রথমে ইহার কোন সদুত্তর না পাইয়া, ইহা গিরিজায়া-চরিত্রের কলঙ্ক বলিয়া ব্যাখ্যা করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু শেষে দেখিতে পাইলাম, গিরিজায়ার উহাই সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে। কবি অতি আশ্চর্য্য কৌশল দ্বারা গিরিজায়ার আপাতদৃষ্ট কলঙ্কে তাহার আর একটি ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহা নিম্নে বুঝাইতেছি।

এই অধ্যায়ের পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। উহা পড়িয়া বুঝিলাম গিরিজায়া মনোরমার প্রতি হেমচন্দ্রের অনুরাগ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছে। এ সিদ্ধান্ত সত্য হউক, মিথ্যা হউক,

গিরিজায়ার অবিশোধিত প্রেমজন্যই হউক, হইয়াছিল। গিরিজায়া এ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবামাত্র, হেমচন্দ্রের প্রতি অবশ্যই বিরক্ত হইয়াছিল। কারণ, হেমচন্দ্রের প্রতি মৃণালিনীর অনুরাগ সে বিলক্ষণ জানিত। হেমচন্দ্রের এ অনুরাগ তাহার নিকট ঘোর অবিচার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এইরূপ অবিচারের প্রতি গিরিজায়ার আন্তরিক বিরক্তি জন্মিত। এই সহজ কথার অর্থ না বুঝা, এই আন্তরিক বিরক্তির লক্ষণ।

সিদ্ধান্ত করিয়া গিরিজায়া তাহার সমর্থনজন্য প্রমাণ চাহিল; তোমরা আমরা সকলেই সেইরূপ চাহিয়া থাকি। এইরূপ অবস্থায় লোকের যেরূপ ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে, এরূপ আর কোন অবস্থাতেই নহে। গিরিজায়ার বুদ্ধিবৃত্তি এখন কেবল মাত্র সেই সিদ্ধান্তের সমর্থন জন্য প্রমাণ খুঁজিতে তৎপর রহিল। হেমচন্দ্রের কথাগুলির আভ্যন্তরিক অর্থ যাহাই থাকুক না কেন, ইহার সরল বাক্যার্থ গিরিজায়ার সিদ্ধান্তের অনুকূলে। তাই গিরিজায়া সেই অর্থই বুঝিল, অন্যটি বুঝিল না। বা! কি চমৎকার কার্য্যকৌশল দেখিলাম!

গিরিজায়ার এই প্রণয়ের কথা বলিতে গিয়া কবির আর একটি চাতুর্য্য দেখিতে পাইলাম। গিরিজায়া ভিখারিণীর মেয়ে—সম্ভবতঃ ভিক্ষুক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত। মৃণালিনী, মণিমালিনী ও মনোরমার সমাজ ও তাহার সমাজে প্রভেদ বিস্তর। এরূপ অবস্থায় তাহাকে মৃণালিনী প্রভৃতির ন্যায় বিশুদ্ধ সামাজিক প্রণয়ের অধিকারিণী করা সঙ্গত নহে। তাই কবি মধ্যে মধ্যে প্রণয়সম্বন্ধে তাহার অপরিশোধিত বা অসামাজিক ভাবও আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। যেখানে আমরা এইরূপ দেখিয়াছি, সেই খানেই কবি আবার মৃণালিনীর মুখ হইতে তাহার শোধিত ভাবও গিরিজায়াকে শুনাইয়া দিয়াছেন। গিরিজায়ার চরমের প্রণয় যেন এইরূপ শিক্ষা হইতে উৎপন্ন। এ সম্বন্ধে গিরিজায়া মৃণালিনীর অজ্ঞাত শিষ্য। আমরা এই কথাটি, গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া, প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

"গিরিজায়া গাইল—

"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে॥"

"মৃণালিনী কহিল, 'যদি এত ভয়, তবে একা এলে কেন ?'

"গিরিজায়া বলিল, 'আগে কি জানি।' বলিয়া গাইতে লাগিল—

"ভাসল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জল খেলা,

"মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাবে রঙ্গে।

এখন—গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,

কূল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্কে।"

"মৃণালিনী কহিল, 'কূলে ফিরিয়া যাও না কেন ?"

"গিরিজায়া গাইতে লাগিল—

"মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরি ধীরি ধীরি,

"কূলেতে কণ্টক তরু, বেষ্টিত ভুজঙ্গে।"

"মৃণালিনী কহিলেন, 'তবে ডুবিয়া মর না কেন ?"

"গিরিজায়া কহিল, 'মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু' বলিয়া আবার গাইল—

"যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরি

সে কভু দিল না পদ, তরণীর অঙ্গে।"

"মৃণালিনী কহিলেন, 'গিরিজায়া এ কোন অপ্রেমিকের গান।"

"গি। কেন ?"

"মৃ। আমি হইলে তরি ডুবাই।"

"গি। সাধ করিয়া ?"

"মৃ। সাধ করিয়া !"

"গি। তবে তুমি জলের ভিতর রত্ন দেখিয়াছ।"

অন্যত্র—গিরিজায়া কহিতেছে—"মৃণালিনীকে বলিব যে, পাখী হাত-ছাড়া হয়েছে —রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিয়ে ত আবার বনের পাখী ধরিয়া আন। পড়া পাখীর আশা ছাড়, পিঁজরা খালি রাখিও না।" ইত্যাদি ৩৫৭ পৃষ্ঠায় দেখ।

অন্যত্র—গিরিজায়া কহিতেছে—"রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল, তবে আর কার্ত্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন ?" ইত্যাদি ৩৪৮ পৃষ্ঠায় দেখ।

তার পরে গিরিজায়া হেমচন্দ্র প্রতি মৃণালিনীর কোপসঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিল। বলিল—

ঠাকুরাণি ! আপনার কপাল টিপিয়া দেখ।"

"মৃণালিনী ললাট স্পর্শ করিলেন।"

"গি। কি দেখিলে ?"

"মৃ। বেদনা।"

"গি। কেন হইল ?"

"মৃ। মনে নাই।"

"গি। তুমি হেমচন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিয়াছিলে—তিনি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। পাতরে পড়িয়া তোমার মাথায় লাগিয়াছে।

"মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন - কিছু মনে পড়িল না। বলিলেন, 'মনে হয় না ; বোধ হয়, আমি আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব ।"

"গিরিজায়া বিস্মিতা হইল। বলিল, ঠাকুরাণি ! এ সংসারে আপনি সুখী।"

"মৃ। কেন ?"

"গি। আপনি রাগ করেন না।"

"মৃ। আমিই সুখী—কিন্তু তাহার জন্য নহে।"

"গি। তবে কিসে ?"

"মৃ। হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি .

এই সব স্থলে গিরিজায়া ও মৃণালিনীর প্রণয় সম্বন্ধে ঈষদ্ভিন্ন মতগুলি বড়ই সুন্দর। এখানে *গিরিজায়া মৃণালিনীর পরিশোধিত প্রণয় নিজের* অন্তরস্থ প্রণয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেছে। মৃণালিনী প্রেমরাজ্যে ও সম্বন্ধেও রাণী বটে।

এইরূপে এক একটি করিয়া আমরা গিরিজায়ার চরিত্রের প্রধান প্রধান বৃত্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া, তৎসমস্তই গিরিজায়ার সামাজিক, আন্তরিক ও পার্শ্বিক প্রভৃতি অবস্থা—তাহার ভিখারিণীত্ব, হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর সঙ্গে তাহার অনুক্ষণ সহবাস তাহার বুদ্ধি, বয়স, তাহার দিগ্বিজয়-প্রেম ইত্যাদি অবস্থা হইতে উৎপন্ন দেখিতে পাইলাম। এইরূপে চিত্রের স্বাভাবিকত্ব ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। চরিত্র অঙ্কন সহজ কার্য্য নহে।

প্রথম দৃষ্টিতে গিরিজায়ার সঙ্গীত, তাহার রসালাপ, তাহার মৃণালিনী- সেবা, তাহার অদ্ভুত প্রেম প্রভৃতিতেই আমাদিগের মনোহরণ করে। তার

পরে আমরা যত নিবিষ্টচিত্তে উহা পর্য্যালোচনা করি, ততই তাহার বিভিন্ন উপাদানে গঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অদ্ভুত সামঞ্জস্য—বিভিন্ন অবস্থার অধীন হওয়া প্রযুক্ত তাহার অদ্ভুত চরিত্রগুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ি।

পরিশেষে তাহার সমগ্র চরিত্রের সঙ্গে যখন মৃণালিনী ও মনোরমার চরিত্রের তুলনা করি, তখন আনন্দ আমাদিগের অন্তরে ধরে না। গিরিজায়ার চরিত্রে মনোহারিণী বৃত্তি আছে—অবস্থাধীন সেই বৃত্তিগুলির বিকাশেরও সুন্দর কারণ আছে। মৃণালিনী ও মনোরমার সঙ্গে তাহার অপূর্ব্ব সম্বন্ধও আছে। এ ভিখারিণীকে কেহ তুচ্ছ করিবেন না।

এই প্রস্তাবের উপসংহারে গিরিজায়া সম্বন্ধে একটি ঘটনা লইয়া দুইটি বিচিত্র মতের উল্লেখ করিতে হয়। আমরা উল্লেখ মাত্র করিব, কোন সিদ্ধান্ত করিব না।

১ম মত। গিরিজায়া এমন সৎপ্রকৃতির লোক, তবে কেন সে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর বিবাহ-সংবাদ না জানিয়া দূতীর ন্যায় তাহাদিগের সাহায্য করিল? এটি গিরিজায়া-চরিত্রের অসঙ্গত কলঙ্ক।

২য় মত। গিরিজায়া বৈষ্ণবের মেয়ে! তাহাদিগের সমাজ ও আমাদিগের সমাজ এক প্রকার নহে। তাহাদের মধ্যে এইরূপ প্রণয় কোন দূষণীয় ভাবের নহে। আর যদি সমাজের কথা না মান, গিরিজায়ার অসামাজিকী বুদ্ধি এই সামাজিক নিন্দা বা কলঙ্ক বুঝিতে পারিত না। ভালবাসার পাত্র ভালবাসার পাত্রকে খুঁজিবে, ইহা তাহার নিকটে অন্যায় বোধ হয় নাই। অন্যায় বোধ হইলে, সে এরূপ করিত না। বস্তুত গিরিজায়াকে ভিখারিণী করা কবির একটি অতি সুন্দর কৌশল। না হইলে তিনি তদ্দ্বারা এরূপ কার্য্য করাইতে পারিতেন না।

১ম মত। মানিলাম গিরিজায়ার নিজের সমাজে ইহা কলঙ্কের কথা নহে। কিন্তু গিরিজায়া কি ইহাতে জানিত না যে হেমচন্দ্রের সমাজে ইহা কলঙ্কের কথা? যদি তাহা জানিত, তবে মৃণালিনীপ্রতি তাহার এইরূপ শ্রদ্ধা অসঙ্গত হইয়াছে।

২য় মত। হেমচন্দ্রের সমাজে যে এইরূপ প্রণয় কলঙ্কের বিষয় ছিল, তাহার প্রমাণাভাব। আর গিরিজায়া যখন এরূপ কলঙ্ককে অন্যায় মনে করিত,

তখন, মৃণালিনীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা অসম্ভব কেন? একজন হিন্দু যদি খৃষ্টান হয়, তবে খৃষ্টানে কি তাহার প্রতি ঐরূপ ঘৃণা করে? মৃণালিনী তৎ-সমাজের উক্তবিধ কলঙ্ক অবৈধ জানিয়া যদি গিরিজায়ার সমাজের অনুযায়ী কার্য্য করে, তবে গিরিজায়া মৃণালিনীকে দোষী ভাবিবে কেন?

১ম মত। হেমচন্দ্রের সমাজে যে উক্তবিধ কার্য্য দূষণীয় বোধ হইত, আমি তাহার প্রমাণ দিতেছি। মণিমালিনী এক দিন আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছে। মণিমালিনী মৃণালিনীকে বলিয়াছে—

'এই কথাটি মনে পড়িলেও আমার বড় অসুখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?' এই কথা শুনিয়া মৃণালিনীকে এ কলঙ্কক্ষালনার্থ তাহার বিবাহবৃত্তান্ত বলিতে হইয়াছিল। তবে প্রমাণাভাব বল কেন?

২য় মত। আচ্ছা, মাধবাচার্য্যও হেমচন্দ্রের গুরু। যেমন তেমন গুরু নয়। তাহাকে কি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে শুনিয়াছ?

১ম মত। মাধবাচার্য্য নাই বা বলিল। হয় ত সে হেমচন্দ্রের পক্ষে ইহা ততদূর দোষার্হ মনে না করিয়া থাকিবে, হয় ত তাঁহার অন্যকার্য্য-ব্যাপৃত মনে উহা স্থান না পাইয়া থাকিবে, অথবা মাধবাচার্য্যের চরিত্রেও বা উহা অসঙ্গত কলঙ্ক হইয়া থাকিবে।

২য় মত। তবে আমার শেষের কথা ভাব। মৃণালিনীর এ কার্য্য গিরিজায়ার চক্ষে অন্যায় বোধ হয় না।

১ম মত। গিরিজায়াকে এ সম্বন্ধে একদিন কিছু ভাবিতেও ত দেখিলাম না।

২য় মত। তা কি করিবে।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরি।

মেস্‌মেরিস্‌ম্

মেস্‌মেরিস্‌ম্ (Mesmerism)—ইহা মেস্‌মার Mesmer নামক জনেক জর্ম্মন্ চিকিৎসক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (আনুমানিক ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) ভায়েনা নগরীতে প্রথমে জনসাধারণের গোচরে আনয়ন করেন। তৎপরে ক্লুজ (Kluge) নামক একজন জর্ম্মন্ পদার্থতত্ত্ববিৎ উহার ৬ ছয় অবস্থা থাকার বিষয় জ্ঞাত হন।

প্রথম—জাগ্রৎ অবস্থা (Waking)

দ্বিতীয়—অর্দ্ধনিদ্রা বা সুষুপ্তিবিশেষের উপক্রম (Imperfect crisis)

তৃতীয়—সুষুপ্তি বা মেস্‌মেরিক নিদ্রা (Magnetic or Mesmeric sleep)

চতুর্থ—সামান্য স্বপ্নসঞ্চরণ বা স্বাপ্নিক-প্রজ্ঞোদয় (Simple Somnambulism or perfect crisis)

পঞ্চম—উজ্জ্বল দৃষ্টি (Lucidity)

ষষ্ঠ—সর্ব্বব্যাপী অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণদর্শন (Universal Lucidity)

উল্লিখিত পঞ্চমাবস্থায় মেসমেরাইজকৃত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় পরিচালন বা বিচার ব্যতিরেকে সমস্ত জ্ঞান লাভ করে। ফ্রান্সে ঐ অবস্থাকে ক্লেয়ার-ভয়ান্স (Clairvoiance) ও জর্ম্মনিতে উহাকে হেল্‌সেম্ (Hellsem) বলে।

এম রিকেনব্যাচ্ (M. Reichanbach) নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মন রসায়নবেত্তা প্রকৃতিতে এক প্রকার নূতন 'বলপ্রয়োগ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন; তাহার নাম অড্‌ফোর্স্ বা ওডাইল (Odforce or Odyle)। ইহার দ্বারাও মানবাত্মায় নূতন রকমের জ্ঞানশক্তি আনয়ন করা যায়। এই কয়েকটি ইংরেজি কথায় ও মতের উপরে আমরা আরও কিছু বলিতে চাই। ভিত্তিটি ইংরেজকৃত বলিয়া বিশ্বাস্য; সেই কারণেই আমরা উহার উপরে সংস্কৃতবিজ্ঞান গাঁথিতে ইচ্ছুক। আজ কাল কেহ কেবল সংস্কৃত কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, কাজেই আমাদিগকে ২।৪ জন ইংরাজ ঋষির আশ্রয় লইতে হইল।

আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ঋষিরা মানবজ্ঞানের ৭টি বিস্পষ্ট অবস্থা থাকা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম——জাগ্রৎ

দ্বিতীয়——স্বাপ্ন

তৃতীয়——সৌষুপ্তি

চতুর্থ——নৈষ্ক্রান্তিক

পঞ্চম——মুগ্ধ

ষষ্ঠ——সান্ধ্যাস্থানিব

এই ছয়টি স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন যোগজ প্রজ্ঞা ও দিব্যজ্ঞান নামক অন্য প্রকার কৃত্রিম জ্ঞানাবস্থাও আছে।

প্রথমোক্ত অবস্থাত্রয় ভারতবাসিমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। অনন্তরোক্ত তিন অবস্থা শাস্ত্রজ্ঞ ভিন্ন অন্যে জানে না। এই সকল অবস্থার বিবরণ ও উদাহরণ উল্লেখ করা উচিত—তাহা আমরা প্রবন্ধ শেষে বলিব।

জ্ঞানের ঐ সকল অবস্থা অকৃত্রিম অর্থাৎ স্বাভাবিক, ইহা বেদান্ত দর্শনের তর্কাধ্যায়ে প্রমাণীকৃত হইয়াছে*।

দার্শনিক ঋষিরা আরও এক কথা বলেন। তাঁহারা বলেন প্রথমোক্ত অবস্থাত্রয়ের প্রত্যেকের তিন প্রকার অবান্তর প্রভেদ আছে, অর্থাৎ প্রত্যেকের মধ্যেই ত্রিত্ব আছে। তাহার বিবরণ এইরূপ—জাগ্রতের মধ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আছে। স্বপ্নের মধ্যেও জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এবং সুষুপ্তির মধ্যেও জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি আছে। এই বিভাগ অনুসারে প্রথমোক্ত স্থূল অবস্থাত্রয়ের নয় প্রকার সূক্ষ্ম বিভাগ থাকা নির্ণীত হয়; যথা——

১। জাগ্রৎ-জাগ্রৎ

২। জাগ্রৎ-স্বপ্ন

৩। জাগ্রৎ-সুষুপ্তি

৪। স্বাপ্ন-জাগ্রৎ

৫। স্বাপ্ন-স্বপ্ন

৬। স্বাপ্ন-সুষুপ্তি

* বেদান্তদর্শন দ্রষ্টব্য।

৭। সুষুপ্তি-জাগ্রৎ

৮। সুষুপ্তি-স্বপ্ন

৯। সুষুপ্তি-সুষুপ্তি।

উদাহরণ।—১ম, ইন্দ্রিয়গণ যখন ব্যাপার-রত থাকে, তখন আমাদের জাগ্রৎ অবস্থা। "এই অবস্থায় সত্যজ্ঞানমাত্রেই জাগ্রৎ-জাগ্রৎ।

২য়। জাগ্রৎ অবস্থায় অনেক অসত্য জ্ঞান হইতে দেখা যায়। শুক্তিতে রজত, মরু-মরীচিকায় জল, ইত্যাদি। সেই সকল অসত্য বা ভ্রম জাগ্রৎ-স্বপ্নের নিদর্শন।

৩য়। জাগ্রৎ অবস্থার মধ্যে সময়ে সময়ে ক্ষণিক স্তব্ধতাও দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ সময়ে সময়ে ভ্রমাদির দ্বারা জ্ঞানের উপরম হইতেও দেখা যায়, সেই উপরম বা স্তব্ধতা জাগ্রৎ-সুষপ্তি নামে খ্যাত।

৪র্থ। স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞান মিথ্যা বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কখন কখন সত্য জ্ঞান উদিত হইতে দেখা গিয়াছে। অনেক লোকে অনেক সময়ে স্বপ্নে মন্ত্র ও ঔষধ লাভ করিয়াছে এবং অনেকে অনেক প্রকার বস্তুযাথার্থ্য নির্ণয় করিয়াছে। স্বপ্নান্তঃপাতী তাদৃশ সত্যজ্ঞান সকল স্বাপ্ন-জাগ্রৎ নামে পরিচিত।" †

৫ম। স্বপ্নেও স্বপ্ন দেখা যায়। কখন কখন এরূপ স্বপ্নও হয় "আমি স্বপ্ন দেখিতেছি অথবা দেখিয়াছি।" "স্বপ্নে স্বপ্ন দর্শন" হইলে তাহা স্বাপ্ন-স্বপ্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

৬ষ্ঠ। প্রকৃত সুষুপ্তি হয় না, অথচ স্বপ্ন দর্শন উপরত হয় এরূপ তুর্লক্ষ্য অবস্থার নাম স্বাপ্ন-সুষুপ্তি।

৭ম। সুষুপ্তিকালে সমস্ত বিভিন্নজ্ঞান এক হইয়া যায়, বিষয়চ্যুত হইয়া আত্মাভিমুখে এক অখণ্ডাকার অবস্থা ধারণ করে। সেই সময়ে যে সুখাকারা

---

* বার্ত্তিকামৃত ও বাশিষ্ঠযোগ দেখ।

† 'স্বপ্নাবতী-সাধন' এই নামে এক প্রকার যোগবিদ্যা আছে, তাহা আয়ত্ত ও সুসিদ্ধ হইলে সাধক নিদ্রিত হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জ্ঞাতব্য সকল জানিতে পারেন। সাধকেরা নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে কি জানি কি এক প্রকার ধারণা বা অভিনিবেশ দৃঢ়সংকল্প করিয়া নিদ্রিত হয়। হইবামাত্র তদ্বলে তাহাদের স্বাপ্ন-জাগ্রৎ-জ্ঞান ও অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দর্শন অবিভূর্ত হয়। তখন তাহারা জাগ্রৎ-সঙ্কল্পিত যে কিছু সমস্তই দেখিতে পায়; পনিদ্রোত্থিত হইয়া অজ্ঞ লোকদিগকে চমৎকৃত করে।

বৃত্তি থাকে, অস্পষ্ট ঘন নিবিড় সুখজ্ঞান থাকে, সেই সুখজ্ঞান সত্য। তৎকারণে তাহা সুষুপ্তি-জাগ্রৎ।

৮ম। সুষুপ্তি অবস্থা এক-প্রকার নহে। এমন এক প্রকার সুষুপ্তি আছে তাহাতে রজোবৃত্তি অর্থাৎ দুঃখভাব লুক্কায়িত—আবদ্ধ থাকে। দুঃখরূপা রাজসী বৃত্তি বিরাজিত থাকিলে তাহা সুষুপ্তি-স্বপ্ন নামের যোগ্য; হেতু এই যে তৎকালের দুঃখসংযোগ মিথ্যা।

৯ম। কখনও কখনও মূঢ় প্রগাঢ় সুষুপ্তিও হয়। কথা কয়েকটির বিশদার্থ এই যে, তাদৃশ সুষুপ্তি সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানস্ফূর্ত্তির তিরোধাবক। তাহার কারণ এই যে, চিত্ত তখন তম অর্থাৎ অজ্ঞানমাত্র অবলম্বন করিয়া নির্ব্ব্যাপার অবস্থায় লীন থাকে। ঈদৃশী সুষুপ্তিই আমাদের সুষুপ্তি-সুষুপ্তি।

এই সকল অবস্থার মধ্যে স্বাপ্ন-জাগ্রৎ অভিধেয় অবস্থাটি বিশেষ অদ্ভুত ও অনুসন্ধানযোগ্য। কি প্রকারে উক্তবিধ সত্যপ্রজ্ঞা উদিত হয়, তাহা বোধগম্য করিতে পারিলে অবশ্যই তদ্দ্বারা উক্তবিধ জ্ঞানলাভে কোন এক কৃত্রিম উপায় আবিষ্কার করা যাইতে পারে। অনুমান হয় স্বপ্নাবতীসাধনের আবিষ্কর্ত্তা অবশ্যই স্বাপ্ন-জাগ্রতের মূল কারণ জানিতে পারিয়াছিলেন।

স্বাপ্ন-জাগ্রৎ অবস্থাটি কেমন আশ্চর্য্যজনক, তাহা একবার অনুধাবন কর। রোগী স্বপ্ন দেখিল—অমুক গ্রামের অমুক পুষ্করিণীর অমুক স্থানে এতন্নামক ও এতদাকারের একটি গাছ আছে, তাহার শিকড় খাইলে রোগ সারিবে। রোগী নিদ্রাভঙ্গের পর সেই স্থানে গেল—গিয়া দেখিল, ঠিক সেইরূপ একটি গাছ আছে। প্রশ্নচিন্তক স্বপ্ন দেখিল—এতদ্রূপ রীতিকে গুণনক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া এতদ্রূপ পদ্ধতিতে বিভাগ করিলে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর হইবে। প্রশ্নচিন্তক জাগ্রৎ দশা প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট প্রক্রিয়া করিল—করিয়া দেখিল, যে যথার্থই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর হইয়াছে। এইরূপ স্বাপ্ন-জাগ্রৎ নামক সত্যজ্ঞান কিরূপে ও কোথা হইতে আইসে, তাহা কে বলিতে পারে?

কখনও যাহা চক্ষে দেখে নাই, কানে শুনে নাই, ত্বকে স্পর্শ করে নাই, মনেও কল্পনা করে নাই, স্বপ্নকালে আজ সহসা তাহাই দেখিল, তাহাই জানিল, ইহা কি অল্প আশ্চর্য্যের বিষয়? এরূপ সত্য স্বপ্ন কেন হয়, তাহা অনেকেই অনেক সময় অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন কারণ দেখিতে পান না।

কয়েক বৎসর হইল জনৈক বিজ্ঞ ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বপ্ন সত্য হয় কেন? আমি একদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেছি—আমি যেন একদিন কোন এক অজ্ঞাত কারণে দুঃখিত হইয়া গঙ্গাতীরে বিমর্ষচিত্তে বসিয়া আছি। মন ব্যাকুল হইতেছে। কেন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, পশ্চিম গগন অগ্নিময় হইয়া উঠিল, ক্রমে দেখিলাম একটি বৃহৎ অগ্ন্যাকৃতি গোলক পশ্চিম গগন হইতে বহিরাগত হইয়া আমার বুকের উপর দিয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গেল। তাহাতে আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল ও দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। এইরূপ স্বপ্ন দেখার পর নিদ্রাভঙ্গ হইলে মনে মনে ভয় ও অনিষ্টাশঙ্কা হইতেছিল সত্য, কিন্তু অগ্রাহ্য করায় সে সকল ভয় ও আশঙ্কা তৎক্ষণাৎ বিনিবৃত্ত হইল। কিন্তু হায়! যে দিন আমি ঐ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলাম, তাহার তৃতীয় দিবসে আমার হৃদয়-রত্ন পুত্রটি আমার হৃদয় ভগ্ন ও ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। সে প্রাতঃকালে ডিনামাইট বাজী লইয়া ক্রীড়া করিতে গিয়া তাহার আঘাতে ও অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

ভারতে দাসত্ব প্রথা

মহাভারতের স্থানান্তরেও মনুষ্য বিক্রয়ের প্রথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণ পর্ব্বে কর্ণ শল্যকে লক্ষ্য করিয়া মদ্রৎ দেশের নিন্দাকীর্ত্তন করিলে পর শল্য অঙ্গদেশের "অপত্য বিক্রয়" প্রথার উল্লেখ করেন। ইহাতে বোধ হয় মহাভারতের সময় ভারতবর্ষে দেশ বিশেষে অপত্য বিক্রয় প্রথার ও প্রচলন ছিল। প্রাচীনতর গ্রন্থ রামায়ণে ও দাসত্ব প্রথার উল্লেখ দেখা যায় এবং উহা হইতেই রাজা হরিশ্চন্দ্রের আত্মবিক্রয় বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়—অপেক্ষাকৃত নব্য সাহিত্যেও ঐ প্রথায় বহুল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের একস্থানে নারদ বলিতেছেন "দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব বা মাতুঃ পিতুর্ব্বা ক্রেতুর্ব্বা বলিনোঽগ্নেঃ শুনোঽপি বা" অর্থাৎ এই দেহ অন্নদাতার কি নিষেক কর্ত্তা পিতার অথবা জননীর কিম্বা পুত্রিকাকরণ প্রযুক্ত মাতামহের কি ক্রয়কর্ত্তার, কি বলবান লোকের কি অগ্নির কি কুকুরের তাহা কিছুই নিশ্চয় করিতে পারা যায় না" পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে এককালে ভারতবর্ষে যে কোন না কোন রূপে মনুষ্যক্রয় প্রথা বর্ত্তমান ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে দাস বিক্রয়ীরা কিরূপে মনুষ্য সংগ্রহ করিত। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন এ প্রশ্ন অনাবশ্যক কারণ যখন দাস ক্রয় শাস্ত্রানুমোদিত ছিল তখন বলপূর্ব্বক মনুষ্য হরণ ও অননুমোদিত ছিল না। এস্থানে বক্তব্য এই যে ঐরূপ অনুমানের সামগ্রী থাকিলেও নিম্নলিখিত বচনের সহিত বিরোধ প্রযুক্ত উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঐ বচনটী এই—

চৌরাপহৃতবিক্রীতা যে চ দাসীকৃতা বলাৎ
রাজ্ঞা মোচয়িতব্যাস্তে দাসত্বং তেষু নেষ্যতে।

অর্থাৎ যাহারা চৌর কর্তৃক অপহৃত হইয়া বিক্রীত হয় ও অন্য যে সকল ব্যক্তি বলপূর্ব্বক দাসীকৃত হয় তাহাদিগের দাসত্ব অভিপ্রেত নহে রাজা তাহাদিগকে (দাসত্ব হইতে) মোচন করিবেন। পূর্ব্বোক্ত বচনে বলপূর্ব্বক দাসীকরণ প্রথার শাস্ত্রানুমোদিতত্ব কল্পের মূলচ্ছেদ হইল। তবেই বলিতে হইবে যে যুদ্ধে প্রাপ্তি, পণে জয়, আত্মবিক্রয়, গৃহে উৎপত্তি, পণ ও দায়সূত্রে

প্রাপ্তি—এই সকল উপায়ে প্রাপ্ত দাসেরাই তাহাদের স্বামী কর্তৃক বিক্রীত হইয়া ক্রীত দাস নামে অভিহিত হইত ও যাহারা দাস বিক্রয় করিত তাহারাও বোধ হয় এই সকল উপায়েই দাস সংগ্রহ করিত।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে দাস ১৫শে প্রকার।—ঐ সমস্ত দাসের মধ্যে সকলেরই কোন না কোন মুক্তির উপায় ছিল। কাহাকেই প্রায় চিরকাল দাসত্ব করিতে হইত না।

সাধারণতঃ যদি কোন দাস স্ব স্বামীকে যাহাতে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা এরূপ কোন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিত তাহা হইলে সে দাসত্ব হইতে মুক্তি ও পুত্রভাব লাভ করিত

যশ্চৈষাং স্বামিনং কশ্চিন্মোক্ষয়েৎ প্রাণসংশয়াৎ।
দাসত্বাৎ স বিমুচ্যেত পুত্রভাগং লভেত চ॥

এইরূপ অন্নকালভৃত (৫) অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ কালে নিজ অন্নদ্বারা রক্ষিত-প্রাণ দাস দুইটি গাভী স্বামীকে দিয়া দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিত। ঋণসূত্রে স্বীকৃত দাস্যব্যক্তি সকুসীদ ঋণশোধ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিত। কৃতকালদাস নিয়মিত কাল শেষ হইলেই দাসত্ব মুক্ত হইত। আমি তোমার এই বলিয়া উপস্থিত, যুদ্ধে প্রাপ্ত ও পণে জিত দাসেরা প্রতিশীর্ষ প্রদান দ্বারা অর্থাৎ স্বতুল্য দাসান্তর দান দ্বারা মুক্ত হইত। ভক্তদাস প্রভুদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন পরিত্যাগ করিলেই স্বাধীন হইতে পারিত। এবং দাসীকে উপভোগের নিমিত্ত স্বীকৃত দাস্য ব্যক্তি কোনরূপে নিক্রয় দানাদি দ্বারা দাসীকে মুক্ত করিতে পারিলেই স্বয়ং মুক্ত হইত। মৃচ্ছকটিক নাটকে দাসীকামুক ব্রাহ্মণকুমার শর্ব্বিলক নিষ্ক্রয় দিয়া বসন্তসেনার দাসীকে মুক্ত করিবার নিমিত্তই চৌর্য্যবৃত্তি অনুসরণ করিয়াছিল। কারণ স্বয়ং দাস হওয়া বা দাসীকে দাসত্ব হইতে মোচন করাভিন্ন দাসীকামুকের কামবৃত্তি চরিতার্থতার অন্য উপায় ছিল না।*

* পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি যে সকল প্রমাণ অবলম্বনে লিখিত তৎসমস্ত প্রদত্ত হইতেছে অন্নাকালভৃত্যো দাস্যাৎ মুচ্যতে গোযুগংদদৎ ঋণং চ সোদয়ং দত্বা ঋণী দাস্যাৎ বিমুচ্যতে কৃতকাল ব্যপগমাৎ কৃতকোঽপিবিমুচ্যতে। তবাহমিত্যুপগতো যুদ্ধে প্রাপ্তঃপণেজিতঃ প্রতিশীর্ষপ্রদানেন মুচ্যতে তুল্যকর্ম্মনা ভক্তস্যাপেক্ষণাৎ সদ্যঃ ভক্তদাসঃ প্রমুচ্যতে নিগ্রহাৎ বড়বায়াশ্চ মুচ্যতে বড়বাকৃতঃ।

এইরূপ স্বামীর ঔরসে দাসীগর্ভে পুত্রোৎপত্তি হইলে সেই দাসী সবংশে দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়।

স্বামী সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় দাসকে দাসত্ব হইতে মোচন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার মস্তক হইতে জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া ভগ্ন করিতেন এবং সাক্ষত সপুষ্প জল তাহার মস্তকে সেচন করিয়া তুমি অদাস হইলে এই কথা তিনবার বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন। এই সময় দাস পূর্ব্ব মুখ হইয়া থাকিত। দাস্য মোক্ষের পর দিবস হইতে লোকে তাহাকে স্বামির অনুগ্রহ দ্বারা পালিত এই নামে ডাকিত ও তদবধি সকলে তাহার অন্ন ভক্ষণ করিত ও সে সাধুদিগের অভিমত ও প্রতিগ্রাহ্য হইত।*

এক্ষণে আমরা কোন্ কোন্ বর্ণ দাস হইতে পারিত, দাসেরা কিরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহাদিগকে কিরূপ কর্ম্ম করিতে হইত ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ব্রাহ্মণাদিবর্ণের প্রতিলোম্যে দাসত্ব ছিলনা অর্থাৎ উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তি স্বাপেক্ষা নীচ বর্ণের ব্যক্তির দাস হইতে পারিত না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রের ; বৈশ্য শূদ্রের দাস হইতে পারিত না।

সমবর্ণ স্থলেও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের দাস হইতে পারিত না কারণ বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন উভয়েই স্পষ্টাক্ষরে ব্রাহ্মণের দাসত্ব নাই এই কথা স্বীকার করিয়াছেন "ত্রিষুবর্ণেষু বিজ্ঞেয়ং দাস্যং বিপ্রে ন বিদ্যতে" (কাত্যায়ণ) কারয়েদ্দাস কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণং ন বৃহস্পতিঃ। কোন ব্রাহ্মণ শীলাধ্যয়ন সম্পন্ন কোন ব্রাহ্মণকে কোন কর্ম্মই করাইবেন না। তাহা অপেক্ষা অল্পবিদ্য অল্পশীল ব্রাহ্মণকে কার্য্য করাইতে পারিবেন কিন্তু তাহাকে কোন মতেই বিণ্মূত্রশোধনাদি অশুভকার্য্য করাইতে পারিবেন না। এইরূপ ব্রাহ্মণ বৃত্তিকর্ষিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য (দাসকে) সদয়ভাবে ব্যবহার করিবেন ও তাহাদের স্বজাতির কর্ম্ম করাইবেন। কিন্তু শূদ্রকে সকলেই দাসত্ব করাইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণীকে বিক্রয় করিলে বা ক্রয় করিলে রাজদণ্ডভোগ

* স্বংদাস মিচ্ছেৎ যঃ কর্ত্তুমদাসং প্রীতমানসঃ স্কন্ধাদাদায় তস্যাস্য ভিন্দ্যাৎ কুম্ভং সহাম্ভসা সাক্ষতাভিঃ সপুষ্পাভির্ম্মূর্দ্ধন্যদ্ভিরবাকিরেৎ অদাস ইতি চোক্ত্বা ত্রিঃ প্রাঙ্মুখং তমথোৎ সৃজেৎ। ততঃ প্রভৃতি বক্তব্যঃ স্বাম্যনুগ্রহ পালিতঃ ভোজ্যান্নশ্চ প্রতিগ্রাহ্যো ভবত্য ভিমতঃ সতাম্।

করিতে হইত। কোন ব্যক্তি কামপ্রযুক্ত আশ্রিত কুলস্ত্রীকে দাসী করিতে বা বিক্রয় করিতে পারিতেন না, করিলে রাজদণ্ডভাগী হইতেন। সেইরূপ কেহ বিপদগ্রস্ত না হইয়া স্বভুক্ত, স্বাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া "আমাকে বিক্রয় করিও না" এইরূপ বাদিনী দাসকে বিক্রয় করিতে পারিতেন না।

এতদ্ভিন্ন সর্ব্বস্থলেই দাসত্ব দারবৎ ছিল অর্থাৎ স্বকীয় পত্নীর উপর স্বামির যেরূপ প্রভুত্ব আছে প্রভুর দাসের উপর ততদূর কর্তৃত্ব থাকিত। স্ত্রীকে ও স্বামীর যেরূপ সদয় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য প্রভুর ও দাসের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ছিল। রোমদেশীয়েরা যেরূপ ইচ্ছা করিলেই স্বদাসের প্রাণ-বধাদি দণ্ড করিতে পারিতেন ভারতবর্ষে কোন দাসস্বামীরই সেরূপ অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা ছিল না। কেহই স্বদাসের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার বা দাস যে বর্ণের তাহা হইতে ভিন্ন বর্ণের কর্ম্ম করাইতে পারিতেন না। জঘন্য কর্ম্ম অর্থাৎ বিণ্মূত্রশোধনাদি কেবল শূদ্র দাসকেই করিতে হইত। এতদ্ব্যতিরিক্ত দাসের ধনাধিকারিত্বও ছিল। তাহার আত্মবিক্রয়-লব্ধ ধনে ও প্রভু প্রসাদ লব্ধ ধনে প্রভুর কিছুমাত্র অধিকার ছিল না।

রোম ও গ্রীক দেশীয়দিগের মধ্যে দাসপ্রথা কিরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল বারান্তরে তাহার অনুসন্ধান করিবার কল্পনা রহিল।

আজ কাল কেমন আছি

আজকাল বাঙ্গালীর শারীরিক অবস্থা ভাল নয়, শরীর ভাল না থাকিলে কোন কর্ম্মই সাধিত হয় না এবং বাঙ্গালীর শারীরক উন্নতি বিধানার্থ যথোচিত চেষ্টা দেখা যাইতেছে না, এই সকল কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে সকল কারণে বঙ্গবাসীর শরীর খারাপ হইয়াছে ও হইতেছে ও দেশে দিন দিন নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব হইতেছে শিক্ষিত ও বিজ্ঞ বাঙ্গালী, দেশের রীতিনীতি আচার ব্যবহার ও পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা নির্ণয় করুন, এবং যাহাতে কোন প্রকার বিপ্লব না ঘটাইয়া সেই কারণগুলি দূরীভূত করা যায় তদ্বিষয়ে সযত্ন হউন। কার্য্যটি বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে ও চেষ্টার অসাধ্য নহে। কেবল রাজকীয় চেষ্টায় ইহা সাধিত হইবে না, রাজার ইচ্ছা থাকিলেও আবশ্যক রূপ জ্ঞান ও ক্ষমতা নাই, সুতরাং কেবল রাজকীয় চেষ্টায় ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্ট হইতে পারে। জাতীয় দৈহিক উৎকর্ষ সাধনই বাঙ্গালীর স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনির্ভরের প্রথম ও প্রধান কার্য্যক্ষেত্র হওয়া উচিত।

বাঙ্গালীর সামাজিক অবস্থার বিচার করা সহজ কার্য্য নহে—উহা সন্তোষ জনক নহে, ইহা স্থির। কিন্তু কি কি কারণে বাঙ্গালীর সামাজিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে এবং কি করিলে ঐ অবস্থার উৎকর্ষ ঘটিতে পারে এই বিষয়ে বিলক্ষণ মত ভেদ দৃষ্ট হয়। এই স্থলে এক পক্ষ অর্থাৎ প্রাচীন গোঁড়া সম্প্রদায় সমুদায় দোষ ইংরাজী শিক্ষার শিরে নিক্ষেপ করেন ও অপর পক্ষ অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষিত নব্য দল হিন্দুধর্ম্ম ও সামাজিক নিয়মাদিরই দোষ কীর্ত্তন করেন। দুই দলে বিবাদ চলিতেছে, কিন্তু সমাজ দিন দিন অধঃপতিত হইতেছে। এদেশে ইংরাজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার কিছু পর হইতেই প্রথমে খৃষ্টীয়ান পাদরীরা ও পরে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের নিয়ম ও অনুষ্ঠান প্রভৃতির ক্রমাগত দোষ কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। রাজাও স্পষ্টতঃ দোষ কীর্ত্তন না করুন, উক্ত সকল নিয়মের অনুমোদন করেন না এবং সুযোগ পাইলে উপদেশ স্থলে উহা পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা দেখাইয়া

দেন। ইংরাজী শিক্ষাও এই সকল সামাজিক নিয়মের প্রতিকুল। এই সকল কারণে এবং বিশেষতঃ ইংরাজী আইন আদালতের নিকট এদেশের সকল লোকই সমান, স্ত্রী ও পুরুষের সমান শিক্ষা ও সমান অধিকার হওয়া উচিত এই শিক্ষার ফলে এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রধান প্রধান হিন্দু জমীদার শ্রেণীর দরিদ্রতা, প্রতিপত্তি হ্রাস ও তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হিন্দু ধর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির প্রতি আন্তরিক অশ্রদ্ধা ও ইংরাজী আচার ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা ঘটাতে এবং হিন্দুশাস্ত্রাধ্যাপকদের সামাজিক ব্যবহারে বিরোধী পক্ষের দিন দিন প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইতেছে। প্রাচীন সম্প্রদায়ের অনেকেই নিতান্ত গোঁড়া, তাঁহার প্রাচীন ব্যবহার কোন অংশেও পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। নব্যদল এককালে সমাজের বহির্ভূত হইয়া থাকুক, তাহাতে সমাজ দুর্ব্বল হয় হউক তাহাও স্বীকার তথাপি আপনাদের কোট বজায় রাখিবেন। আবার নব্যেরা প্রাচীন নিয়মের কিছুই ভাল দেখিবেন না বলিয়া যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন। দুই দলে বিবাদ, বিতণ্ডা ও গালাগালী, ইংরাজের সম্মুখে আপনাদের গৃহছিদ্র প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ, হিন্দু আচার ও অনুষ্ঠানের প্রতি অকারণ অশ্রদ্ধা ও ইংরাজী সামাজিক নিয়মের প্রতি অন্যায় আদর প্রকাশ, উপস্থিত সময়ের এই ভাবটি দেখিয়া কোন সমাজহিতৈষী ব্যক্তির মনে দুঃখ না হয়? যদি কেবল দুই দলের বিবাদ ও মত ভেদ এবং এক পক্ষের নূতনে অনুরাগ ও তাহা অনুকরণ করিবার চেষ্টা ও অপর পক্ষের পুরাতনে অনুরাগ ও তাহা অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা, যদি কেবল এই প্রশ্নটিই সমাজ হিতৈষীর চিন্তার বিষয় হইত, তাহা হইলে, সমাজের বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা না করিয়া বরং প্রবীণ নবীনের, এই অভিনয়ে এ প্রকার আমোদ লাভ করিতে পারা যাইত। কিন্তু ব্যাপারটি গুরুতর। উপস্থিত সময়ের এই হিন্দু অহিন্দু; প্রাচীন নবীন ও নিশ্চল, সচল মত সংঘর্ষে সমগ্র সমাজে বিপ্লব সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে। সামাজিক নেতা নাই, প্রাচীন ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত কিন্তু তৎপ্রতি বহুসংখ্যক সামাজিকেরাই বীতশ্রদ্ধ নূতন ব্যবস্থা কি তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। নানা লোকের নানা মত, অনেকেই ইংরাজী আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী, কিন্তু স্পষ্টতঃ ও প্রকাশ্যে

তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। সমাজ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে ও দিন দিন কপটতার বৃদ্ধি হইতেছে। হিন্দু সামাজিক নিয়মাদি প্রতিপালনে অনেকেই কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এমন কি অনেক প্রাচীনও ভ্রষ্টাচার, নব্যদিগের তো কথাই নাই। "মিছেগণ্ডগোল না করিয়া নিয়ম রক্ষা করিলেই হইল। গোঁড়ামী কেন? যাহা ভাল বলিয়া বিশ্বাস আছে তাহাই ভাল, তবে সমাজে যাহা বলে প্রকাশ্যে তাহাই কর।" আজ কাল বাঙ্গালী সমাজের এই ভাব। নিতান্ত গোঁড়া না হইলে আর এখন ধরা পড়ে না। একটু হিসাব করিয়া চলিলেই এখন প্রাচীন ও নব্য উভয় দলেরই নিকট প্রিয় ও মান্য হইতে পারা যায়। অনেকে তাহাই করিতেছেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে সম্পূর্ণ দুঃখিত হইবার কারণ রহিয়াছে। ইহাতে হিন্দু-সমাজের মধ্যে কপটতার বৃদ্ধি হইয়া ঐ সমাজের নীতির অপকর্ষ হইতেছে।

যদি আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাগুলি ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে মন্দ হয়, আমাদের উপযোগী না হয়, এক সময়ে ভাল ও উপযোগী থাকিলেও এক্ষণে ভাল ও উপযোগী না হয়, তাহা হইলে কেনই বা আমরা ঐ গুলির বিবেচনা করিয়া দেখিয়া বর্ত্তমান সময়োপযোগী সংশোধন না করিব? তাহা না করিয়া ঐ ব্যবস্থা প্রভৃতি নিতান্ত অসন্তোষকর এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একেবারে ইংরাজী ব্যবস্থার গোঁড়ামী করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। খৃষ্টান পাদরীরা, ব্রাহ্মেরা ও অন্যান্য ইংরাজে আমাদের হইয়া ঐ সকল বিষয়ের বিচার করিয়াছেন বলিলে চলিবে না। এ কার্য্যটি আমাদের নিজের; প্রতিনিধির দ্বারা সম্পন্ন করিবার নহে। আমরা প্রাচীনদের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি যে তাঁহারা সমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা বিবেচনায় এই বিষয়ের বিচারের আবশ্যকতা আছে ইহা স্বীকার করিয়া ইহাতে মনোযোগী হউন এবং নব্যসম্প্রদায়ের নিকট আমাদের নিবেদন যে তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা, আচার ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রতি অযথা অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া এদেশের প্রাচীন রীতিনীতি সম্যক্‌রূপে আলোচনা করুন এবং তাহার পর আপনাদের চেষ্টার পরকীয় সাহায্য না লইয়া সমাজের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হউন। এরূপ করিতে পারিলেই তাঁহাদের ইংরাজী শিক্ষা সার্থক হইবে।

আমরা প্রাচীন শাস্ত্র সকলের আলোচনা করি না। করিলেও উহার

যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণে যত্ন করি না। আমরা নিতান্ত শ্রমকাতর, উদ্যমরহিত ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের অধঃপতন সর্ব্বরূপেই আরম্ভ হইয়াছে। সামাজিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিবে, তাহাতেও কি রাজার সাহায্য চাই? উক্ত ব্যবস্থার কিয়ৎপরিমাণে সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন আবশ্যক, প্রায় সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু কার্য্যে কিছু হইতেছে না কেন? কিছুকাল পরে একেবারে সমুদয় বিপর্য্যস্ত হইবে, অতি প্রাচীন হিন্দু সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া উৎকৃষ্ট ও পরীক্ষিত ব্যবস্থা সমূহের পরিবর্ত্তে নিকৃষ্ট, অনুপযোগী ও অপরীক্ষিত ব্যবস্থা স্রোত প্রবাহিত হইবে, ইহা চিন্তাশীল ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তির কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। গত কএক বৎসর হইতে একটু যেন এই বিষয়ে ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইতেছে। বঙ্গদেশে ইংরাজিশিক্ষিত চিন্তাশীল কএক ব্যক্তি সময়োচিত সমাজসংস্কার বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। দুই এক বৎসরে অবশ্যই কিছু হইবার নহে। লোককে বুঝাইতে হইবে ও তাহাদের মত সংগঠিত করিতে হইবে। যাঁহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা ইংরাজীভাষায় সুপণ্ডিত প্রাচীন নিয়মের পক্ষপাতী কিন্তু গোঁড়া নহেন। এইরূপ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। আমাদের এখন প্রয়োজন যে এইরূপ সকল লোকে একমত হইয়া প্রাচীন শাস্ত্র বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া ও বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসমাজে কি কি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে ও তাহা কিরূপে পুরাতন সমাজের ভিত্তি বজায় রাখিয়া ধীরভাবে বিবেচনা সহকারে প্রচলিত করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উপায় উদ্ভাবন করেন। কেবল গালি দিলে হইবে না, মাসাবাড়ী হইলে হইবে না, প্রাচীনের গোঁড়ামী করিলেও হইবে না। সমাজের মধ্যে থাকিয়া, সমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, তর্ক ও যুক্তির আশ্রয়ে কার্য্য করিতে হইবে। এবিষয়ে আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। আমাদের কার্য্য আমরা না করিলে, আমরাই কষ্ট পাইব। আবার দুঃখের উপর দুঃখ। আমাদের হিতৈষীর অভাব নাই। আমাদের সমাজ সংস্কার কার্য্যে অনেকেই ব্রতী হইতে অভিলাষী। এই সকল মহাশয়ের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার চেষ্টা করা অতীব আবশ্যক হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সিপাহিযুদ্ধে প্রধান সেনাপতির কার্য্যশিথিলতা

মে মাস যেমন অতিবাহিত হইতে লাগিল, তেমনই উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের পূর্ণভাব বিকাশ পাইতে লাগিল। ইঙ্গরেজের রাজনীতিতে যাহারা উত্তেজিত হইয়াছিল, ইঙ্গরেজের বিধিব্যবস্থায় যাহাদের মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছিল, আপাততঃ মনোহারিণী মরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া, কল্পনার নেত্রে ভবিষ্যতের দৃশ্য সম্মোহন ভাবে আঁকিয়া, যাহারা ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিত রেখা অপসারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহারা সকলেই এখন ইঙ্গরেজের শাসনের প্রতিকূলে দলবদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ডের অবতারণা করিতে লাগিল। মে মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে বুঝা গিয়াছিল যে, সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভীষণ সিপাহিযুদ্ধের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিবে। মিরাটের ইউরোপীয়েরা নির্জ্জিত, নিপীড়িত ও নিহত হইয়াছিল। দিল্লী, ইঙ্গরেজের হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ মোগল ভূপতি আকবর, শাহজহাঁ প্রভৃতির মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার কল্পিত ক্ষমতায়, আপনি তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেকস্থলে ইঙ্গরেজের প্রাধান্য ও ক্ষমতা বিচলিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে আপনাদের প্রাধান্যরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। অপরাধী-দিগের শাস্তিবিধানার্থ কঠোরতর দণ্ডবিধি প্রণীত হইতে লাগিল। ৩০এ মে গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রিসভায় একটি আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনে, যেস্থানে সিপাহিহাঙ্গামা ঘটিবে, সেই স্থানেই সাধারণের জীবন-মরণের ভার, শাসনবিভাগের যে কোন শ্রেণীর, যে কোন বয়সের বা যে কোন ক্ষমতার কর্ম্মচারীর হস্তে সমর্পিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই আইনানুসারে সাধারণ্যে ঘোষণা করিলেন, যে কোন ব্যক্তি মহারাণী বা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, অথবা যুদ্ধের জন্য চেষ্টা পাইবে, কিংবা কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবে, তাহাদের জীবনদণ্ড, নির্ব্বাসন অথবা কারারোধ হইবে। যে কোন

বিভাগে কোনরূপ হাঙ্গামা ঘটিবে, সেইস্থানেই এই আইনানুসারে কার্য্য হইবে। যে সকল ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা কিংবা নরহত্যা, অথবা চুরি ডাকাতি, বা অন্য কোনরূপ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইবে, গবর্ণমেণ্ট কমিশনদ্বারা তাহাদের বিচার করিবেন। এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনর বা কমিশনরগণ, সকল স্থানে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। উকীল বা আসেসার উপস্থিত না থাকিলেও, ইহারা, উক্তরূপ অপরাধীদিগের প্রতি প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন অথবা কারারোধের আদেশ দিতে পারিবেন। ইহাদের আদেশই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই আদালত কোন সদর আদালতের অধীন থাকিবে না। এই আইনের পাণ্ডুলিপি গবর্ণর জেনেরলের অনুমোদিত হইলে, ইহা ৮ই জুন বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক ইঙ্গরেজই এই আইনের বলে অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইহাতে কেবল বিচারবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের হস্তেই অসাধারণ ক্ষমতা সমর্পিত হইয়াছিল। এজন্য মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনেরলের আদেশানুসারে এই স্থির হয় যে, বহুদিনের, অথবা যে কোন শ্রেণীর সৈনিক কর্ম্মচারীরা, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির যে কোন সৈনিকনিবাসে, ইউরোপীয় কিংবা এতদ্দেশীয়, অথবা এতদুভয়ের পাঁচ জন লোক লইয়া একটি সাধারণ সামরিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। এই বিচারালয়েই অপরাধীদিগের দণ্ড বিহিত হইবে।

উপস্থিত সময়ে ভারতের প্রধান সেনাপতি আন্‌সন সিমলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহিদিগের উত্তেজনা হইতে যে, ভয়ঙ্কর কাণ্ডের উৎপত্তি হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ঐ বিপ্লব যে, সর্ব্বব্যাপী হইয়া ব্রিটিশ শাসনের মূলভিত্তি বিচলিত করিয়া তুলিবে, তাহাও তিনি অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। আন্‌সন ভবিষ্যতের বিষয় না ভাবিয়া, নিদাঘকালে হিমালয়ের সুখস্পর্শ সমীরণসেবনে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এই তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। ১২ই মে সহসা অম্বলা হইতে একজন তরুণবয়স্ক সংবাদবাহক উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট একখানি পত্র সমর্পণ করিল। ঐ পত্রে দিল্লীর ঘটনার বিষয় অস্পষ্টভাবে লিখিত ছিল। প্রধান সেনাপতি পত্র পাইয়া, বুঝিতে পারিলেন যে, মিরাটের

সিপাহিগণ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এক ঘণ্টা পরে তাঁহার নিকট আর একখানি পত্র পহুঁছিল। এই দ্বিতীয় পত্র যদিও অস্পষ্টভাবে লিখিত ছিল, তথাপি প্রধান সেনাপতির উহাতে বোধ হইল যে, মিরাটের সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, যে সকল অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা বিমুক্ত হইয়াছে এবং দলে দলে দিল্লীতে যাইয়া মিরাট ও দিল্লী, উভয় স্থানের ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়াছে। যখন এই সংবাদ প্রথমে প্রধান সেনাপতির নিকট পহুঁছিল, তখনও তিনি উহার গুরুত্ব সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তিনি যে কর্ত্তব্যসম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিলেন, যে দায়িত্বভার তাঁহার উপর সমর্পিত ছিল, তিনি সে কর্ত্তব্য, সে দায়িত্বের বিষয় ভাবিয়া তখনও বিচলিত হইলেন না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, এখন স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না; সিপাহিদিগের উত্তেজনার গতিনিরোধ জন্য অবশ্যই তাঁহাকে কিছু করিতে হইবে। দিল্লী এখন উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছিল; তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এখন উন্মত্ত সিপাহিদিগের উৎপীড়নে ও নিষ্পেষণে নিপীড়িত, নির্জ্জিত বা নিহত হইয়াছিল। সুতরাং এখন নিকটে যত ইউরোপীয় সৈন্যসংগ্রহ করা যাইতে পারে, তৎসমুদয় যথাস্থলে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া, প্রধান সেনাপতির বোধ হইল। প্রধান সেনাপতি ইহা ভাবিয়াই ঐ দিন (১২ই মে) মাসৌরীনামক স্থানে আপনার এক জন এডিকং পাঠাইলেন। উক্ত স্থানে ৭৫ গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদলকে আম্বালায় পাঠাইয়া দিতে ঐ এডিকংকে আদেশ দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে যে সকল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, তাহাদিগকেও নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলা হইল। প্রধান সেনাপতি সৈন্য পাঠাইবার এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং সিমলা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি লর্ড কানিঙ্গকে লিখিলেন যে, উপস্থিত বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানিতে তাঁহার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। যদি সংবাদ মন্দ হয়, তাহা হইলে তিনি অম্বালায় যাইতে প্রস্তুত আছেন। এই পত্র পাঠাইবার অব্যবহিত পরে তাড়িত বার্ত্তাবহ তাঁহার নিকট আর একটি সংবাদ উপস্থিত করিল। এইবার তিনি মিরাটের ঘটনার বিশদ বিবরণ জানিতে পারিলেন। প্রধান সেনাপতি এখনও

অবিচলিতভাবে ছিলেন, অবিচলিতভাবে থাকিয়া এখনও হিমগিরির প্রাকৃতিক শোভায় এবং তুষারসম্পাতে সমীরণের স্নিগ্ধতায় সুখানুভব করিতে ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে যে উৎকট কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে তাহা তিনি এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই, অথবা বুঝিতে পারিয়াও তদনুরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বনে সত্বর হন নাই। ক্রমে অনেক ভাবিয়া তিনি উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। দুইদল ইয়ুরোপীয় সৈনিককে অম্বালায় যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। সিমুরের গুরুখা সৈন্যদলও দেরা হইতে গিরাটে যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হইল। প্রধান সেনাপতি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, দিল্লীর প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া তিনি অন্যান্য স্থানের অস্ত্রাগার রক্ষার্থ অবিলম্বে সৈন্য পাঠাইয়া দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গবর্ণরজেনারেলকে লিখেন যে, ফিরোজপুরের দুর্গ ৩১ গণিত পদাতিকদল কর্তৃক রক্ষিত হইবে। গোবিন্দগড় ৮১ গণিত সৈন্যদল রক্ষা করিবে। জলন্ধর হইতে ৮ গণিত দুইদল সৈন্য যাইয়া ফিলোরের দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে। অধিকন্তু ফিলোরে কামান সকল সজ্জিত থাকিবে। মাসৌরীর গুরুখা সৈন্যদল এবং ৯ গণিত অশ্বারোহী, ঐ সকল কামানের রক্ষক হইয়া অম্বালায় যাইবে।

এইরূপ আদেশ দিয়া প্রধান সেনাপতি ১৪ই মে অম্বালায় যাত্রা করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি তথায় উপনীত হন। এই স্থানে তাঁহার নিকট নানারূপ গোলযোগের সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল যে, পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, অথবা অবলম্বন করিতে চেষ্টা পাইতেছে। সুতরাং ইহাদের নিকট তিনি কোনরূপ সাহায্যের আশা করেন নাই। এই সঙ্কট-কালে তাঁহাকে গুরুতর বিঘ্নবিপত্তির প্রতিকূলতা করিতে হইয়াছিল। অভি-যানের দ্রব্যাদি ও কামান সকল পাঠাইবার কোনরূপ সুবিধা ছিলনা; উপস্থিত সময়ে এই অসুবিধা তাঁহার নিকট গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কিঞ্চিদধিক একবৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহার মধ্যেই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ শত্রুর প্রতিকূলে সজ্জিত হইতে হয়। তাঁহার সহযোগীদিগের নিকট তিনি সমুচিত

উৎসাহ প্রাপ্ত হন নাই। পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের উপরেও তিনি আশাভরসা স্থাপন করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শারীরিক শক্তি ক্ষীণতর ছিল। অসুস্থতায় তিনি দুর্ব্বল, এবং আপনার অবলম্বিত কার্য্যের অনভিজ্ঞতায়, তিনি শৃঙ্খলাশূন্য ছিলেন। যখন পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈনিকদল হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির কোন আশা ছিল না, তখন প্রধান সেনাপতি এই সময়ে অম্বালার সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে পারিতেন। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর স্যার জন লরেন্স্ (পরে লর্ড লরেন্স্) ও তাঁহাকে এইরূপ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। স্যার জন লরেন্স ঐ সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করিয়া দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে প্রধান সেনাপতিকে অনুরোধ করেন; কিন্তু প্রধান সেনাপতি স্যার জন লরেন্সের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করেন নাই। যেহেতু, অম্বালার সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই কার্য্যপ্রণালীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। তাঁহারা সিপাহিদিগকে, নিরস্ত্রীকরণের অবমাননা হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এখন সকলেই এই প্রতিজ্ঞা-পালনে উদ্যত হন। প্রধান সেনাপতি ইঁহাদের অমতে কোন কার্য্য করেন নাই। তিনি অম্বালার এই সৈনিকদলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না, এবং রাখিয়া যাইতেও সমর্থ হইলেন না। এদিকে উক্ত সৈনিকদলের অফিসরেরা বলিতে লাগিলেন যে, সিপাহিদিগের নিকট যেরূপ অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ করা উচিত নয়। নিরস্ত্রীকরণে ঐ অঙ্গীকার ভঙ্গ হইবে। প্রধান সেনাপতি ঐ কথার উপর নির্ভর করিয়া অম্বালার সিপাহি-দিগকে নিরস্ত্র করিলেন না। তাহাদের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার দিকে চাহিয়া তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ অবস্থায় রাখিলেন। সুতরাং অম্বালার সিপাহিরা পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা প্রধান সেনাপতির ন্যায় সহিষ্ণুতা দেখায় নাই। সেনাপতি আন্‌সন্ আফিসর-দিগের কথায় নির্ভর করিয়া যেরূপ সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, তাহারা আবার সেইরূপ অসহিষ্ণু হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অস্ত্রই গবর্ণ-মেণ্টের শ্বেতকর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে সঞ্চালিত করে। প্রধান সেনাপতি অম্বালার সৈনিকদলের আফিসরদিগের কথাতেই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর স্যার জন লরেন্স তাঁহাকে যে

কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তিনি সে কার্য্যসম্পাদনে অগ্রসর হন নাই। এই সময়ে দুইজন রাজপুরুষ প্রধান সেনাপতির প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। অম্বালার ডেপুটি কমিশনর ফরসিত্ সাহেব এবং শতদ্রুতীরবর্ত্তী প্রদেশের কমিশনর জর্জ বার্নেস সাহেব উত্তেজিত সিপাহিদিগের আক্রমণ নিবারণ জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীর বিপ্লবের সংবাদ শুনিয়াই ফরসিত্ সাহেব বার্নেসকে আত্মরক্ষার সমুদয় বন্দোবস্ত করিতে পত্র লিখেন। বার্নেস এই সময়ে কৌশলী নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে অম্বালারক্ষার জন্য একদল শিখ পুলিশ সৈন্য প্রস্তুত করেন। ইহার পর শতদ্রুতীরবর্ত্তী প্রদেশরক্ষার জন্য বন্দোবস্ত হইতে থাকে। শতদ্রু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে অনেকগুলি শিখ ভূপতির আধিপত্য আছে। উপস্থিত সময়ে ইঁহারা ইঙ্গরেজের পক্ষসমর্থনে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। সিপাহিবিপ্লবের ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে যে, উত্তেজিত সিপাহিগণ যখনই গবর্ণমেণ্টের সঙ্কীর্ণ নীতির দোষে ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তখন তাহাদের স্বদেশীয়গণ ইঙ্গরেজের পক্ষসমর্থন জন্য তাহাদেরই বিরুদ্ধে ধাওয়ামান হয়।

জর্জ বার্নেস যে সময়ে আপনার শাসনাধীন প্রদেশ রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, সেই সময় ফরসিত্ সাহেব পাতিয়ালা ও ঝিন্দের রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাতিয়ালারাজ অবিলম্বে একদল সৈন্য থানেশ্বরে পাঠাইয়া দেন। এই সৈন্য কর্ণালে যাইবার পথে নিযুক্ত হয়। যেহেতু, অম্বালা হইতে সৈন্যদল আসিয়া, কর্ণালে সমবেত হইতেছিল। এদিকে ঝিন্দের রাজা দিল্লীর সংবাদ পাইয়াই, অম্বালার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট, উপস্থিত সময়ে কি করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করেন। পরে বার্নেস সাহেবের অনুরোধে কর্ণালরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হন। কর্ণালের নবাবও নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তিনি ইঙ্গরেজের উপকারার্থ আপনার সৈন্য, আপনার অর্থ ও আপনার অনুচর, সমস্তই দিতে প্রতিশ্রুত হন। এইরূপে বিপ্লবের প্রারম্ভেই ভারতের ভূপতিগণ ভারতে ব্রিটিশ সিংহের আধিপত্যরক্ষার জন্য, আপনাদের সম্পত্তি ও সৈন্য, উভয়ই অকাতরে উৎসর্গ করেন।

বার্ণেস ১৩ইমে অম্বলায় উপস্থিত হন। মিরাট ও দিল্লীর ঘটনায় তত্রত্য জনসাধারণের মনে যে উত্তেজনার আবির্ভাব হইয়াছিল, কমিশনরের আগমনে তাহা নিবারিত হয়। বার্ণেস যমুনার সেতু পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করেন, এবং স্থানীয় রাজা ও জায়গীরদারদিগের সৈন্য পাঠাইয়া সেই বিভাগে শান্তিরক্ষার উপায় করিয়া দেন। ইহার পর বার্ণেস ও তাঁহার সহযোগী ফরসিৎ, উভয়েই প্রধান সেনাপতির সৈন্যদলের জন্য, যান ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদির সংগ্রহে যত্নশীল হন। এই সময়ে কুঠীঅওলা, আড়ৎদার, কণ্ট্রাক্টর, কুলী প্রভৃতি সকলেই, কোম্পানির মুল্লুক নষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল। কিন্তু বার্ণেস ও ফরসিতের চেষ্টায় সৈন্যদিগের অভিযানের দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয়।

উচ্চতর সিবিল কর্ম্মচারীর যত্নে যখন প্রধান সেনাপতির এইরূপ সুবিধা হইতেছিল, তখন সহসা আর একটি গোলযোগে বিস্তর অসুবিধা ঘটে। এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে অম্বলায় সংবাদ আইসে যে, মসোরীর গুরখা সৈন্যদল সাতিশয় অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কামান লইয়া ফিলোরে যাইতে অসম্মত হইয়াছে এবং প্রধান সেনাপতির দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া সিমলা আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে। উপস্থিত সময়ে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সাবধানতার সহিত কার্য্য করা উচিত ছিল। কোন বিষয়ে কিছু অসাবধান হইলে, কাহারও কোনরূপ অভিযোগশ্রবণে অনুমাত্র অনবহিত হইলে, কাহারও কোনরূপ অসুবিধা দূর করিতে ঔদাসীন্য দেখাইলে, উহার ফল পরিণামে ভয়ঙ্কর হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বে এরূপ সতর্ক হন নাই। সম্প্রদায়বিশেষের অসন্তোষের কারণ দূর করিতেও উদ্যোগী হইয়া উঠেন নাই। যখন ভয়াবহ বিপ্লবের সূচনা হইল মিরাট ও দিল্লীতে যখন ভয়ঙ্কর কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল তাড়িতবার্ত্তাবহ যখন ঐ দুর্ঘটনার বিষয় চারিদিকে প্রচার করিয়া দিল, ইঙ্গরেজেরা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

মিরাট ও দিল্লীর ইঙ্গরেজেরা উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে যেরূপ নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিয়া ছিলেন যে, তাঁহাদিগের

গুরুখাদিগের হস্তেও ঐরূপ বিপন্ন হইতে হইবে। এই সময়ে অনেক ইউরো-পীয় স্ত্রীপুত্র লইয়া সিমলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন।

এই সংবাদে তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। যে স্থান এক দিন পূর্ব্বে সুখ ও শান্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাই আজ নৈরাশ্য, আতঙ্ক ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই প্রাণের দায়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইউরোপীয় মহিলারা শিশুসন্তানদিগকে ক্রোড়ে করিয়া আপনাদিগের সম্মুখে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি ভাবিতে লাগিলেন। গুরুখাদিগের উপস্থিতির সংবাদ জানিবার জন্য গির্জ্জার উচ্চ চূড়ায় পরিদর্শক রাখা হয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবক,যুবতী সকলেই সন্ত্রস্তভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার্থ ব্যাঙ্কে সমবেত হয়। ব্যাঙ্কের নিকট দুইটি কামান সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। এই স্থানে চারিশত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিল।

শেষে এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যে গভীর সন্ত্রাসে সিমালায় ইউরোপীয় প্রবাসিগণ অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল। গুরখারা বিশেষ কারণে অসন্তুষ্ট ও অবাধ্য হইলেও ইউরোপীয়দিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে নাই। যে যে বিষয়ে তাহাদের অভিযোগ ছিল, যখন তৎসমুদায়ের প্রতিবিধান করা হয়, তখন তাহারা পুনর্ব্বার প্রভুর অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-সাধনে অগ্রসর হইতে থাকে। যাঁহারা কিছুকাল পূর্ব্বে ভয়াতুর হইয়া আপনাদের অধ্যুসিত গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহারা এখন সলজ্জ ভাবে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

যখন ইউরোপীয় সৈন্যগণ হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে যাত্রা করিতে-ছিল, তখন প্রধান সেনাপতি আন্‌সন্ পঞ্জাবের প্রধান কমিসনর স্যারজন্ লরেন্সের সহিত যুদ্ধের প্রণালী অবধারণে ব্যাপৃত ছিলেন। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া দিল্লী অধিকারে যাত্রাকরা, প্রধান সেনাপতি অভিপ্রেত ছিলনা। তিনি আপাততঃ শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে সংগৃহীত সৈন্য সকল রাখিয়া অপরাপর সাহায্যকারী সৈন্যদলের প্রতীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি ১৭ই মে এসম্বন্ধে স্যার জন্ লরেন্সকে যাহা লিখেন

তাহার সারাংশ এই :—যে স্বল্পমাত্র ইউরোপীয় সৈন্য এখানে আছে, তাঁহাদিগকে দিল্লীর যুদ্ধে বিপদাপন্ন করা উচিত কি না, তদ্বিষয়ে আপনি বিবেচনা করিবেন। আমার বিবেচনায় উচিত নয়। আমার মতে এই সৈন্য দিল্লী অধিকার করার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। বড় বড় কামানের সাহায্যে নগরের প্রাচীর বিনষ্ট করা যাইতে পারে, অতি সামান্যরূপ বলপ্রয়োগ করিলে নগর প্রবেশের পথ উদ্ঘাটিত হইতে পারে। কিন্তু যে একটি বড় নগরে বহু সঙ্কীর্ণ পথ রহিয়াছে, বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী লোক ঐ সকল পথের অন্ধিসন্ধি সমস্তই অবগত আছে, তাহাতে এরূপ অল্পসংখ্যক লোক প্রবেশিত করা, আমার বিবেচনায় বড় বিপদজনক। যদি ছয় শত কিংবা সাত শত লোক অসমর্থ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। যদি আমাদের চতুর্দ্দিগবর্ত্তী সমগ্রপ্রদেশ বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করে; তাহা, হইলে কি আমরা উহা বশে রাখিতে পারিব ? আমার মতে এখন সাবধানতার সহিত সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা উচিত। এখন যুদ্ধের যে সকল অপকৃষ্ট দ্রব্য আছে, তৎসমুদয়ে উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। ঐ সকলের পরিবর্ত্তে ভাল দ্রব্যাদি হস্তগত হইলে আমাদের হতাশ্বাস হইবার আর কোন কারণ থাকিবে না। তখন আমরা যেখানে যাইব, সেই খানে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আমি এস্থানে মেজর জেনেরল, ব্রিগেডিয়ার জেনেরল প্রভৃতি যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহারাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন *।"

কিন্তু লর্ড লরেন্স, সেনাপতির এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এখন আর কোন বিষয়ে কালবিলম্ব করিবার সময় ছিল না। অতি অল্প মাত্র বিলম্ব অতি অল্পমাত্র অসাবধানতা ও অতি অল্পমাত্র শৈথিল্য হইলেই, বিষম বিপৎপাতের সম্ভাবনা ছিল। লর্ড কানিঙ্ কলিকাতা হইতে এবং স্যার জন্ লরেন্স পঞ্জাব হইতে প্রধান সেনাপতিকে অবিলম্বে দিল্লী অধিকার করিতে যাত্রা

* Unpublished Memoir by Colonel Bair Smith, quoted by Kaye, *Vol.* II *p.* 149, note. Comp. Bosworth Smith, Life of Lord Lawrence. *Vol.* I . 28 and Holmes, Indian Mutiny, *p.* 121.

করিবার জন্য, অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্যার জন্ লরেন্স স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি মোগল সম্রাটের রাজধানী দীর্ঘকাল সিপাহিদিগের অধিকৃত থাকে, তাহাহইলে, হয়ত, সাধারণে ভাবিবে যে, ইঙ্গরেজদিগের প্রাধান্য ও ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে। সাধারণে ইহাতে, হয়ত, উত্তেজিত সিপাহিদিগের পরিপোষক হইয়া উঠিবে। সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক, অণুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া দিল্লী পুনরধিকার করিতে চেষ্টা করা উচিত। অন্যথা ব্রিটিশ নাম ও ব্রিটিশ ক্ষমতার উপর দুরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শিবে। তিনি প্রধান সেনাপতিকে অবিলম্বে দিল্লী অধিকার করিতে যাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যে পত্র লিখেন, তাহার একস্থলে তাঁহার মনোগত ভাব এইরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছিল ;—"একবার ভারতের ইতিহাসের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন, যখন আমরা কোন কার্য্যে উঠিয়া লাগিয়া পড়িয়াছি, তখন কোথায় আমাদিগকে অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছে? সাহস ও উৎসাহশূন্য লোকের পরামর্শে যখন পরিচালিত হইয়াছি, তখন কোথায় আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি? ক্লাইব তাঁহার প্রধান প্রধান সেনানায়কদিগের অমতে ১২ শত লোকের সহিত পলাশীর ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া ৪০,০০০ লোক পরাজিত পূর্ব্বক বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন। চম্বল হইতে সেনাপতি মন্‌সনকে পশ্চাৎ হটিয়া যাইতে হয়। আগ্রহ অধিকার করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সৈন্যদল বিশৃঙ্খল ও অংশতঃ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কাবুলের দুর্ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, একাগ্রতা ও সাহসের সহিত কার্য্য হইলে এই দুর্ঘটনার আবির্ভাব হইত না। যে সকল বিদেশীয় বেতনভোগী লোক আমাদের পক্ষে আছে, তাহারা যে, আমাদের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবে, তাহা কিরূপে বোধ হইতে পারে? তাহারা যে আমাদের পক্ষে থাকে তাহার কারণ আছে। তাহারা জানে যে, আমরা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকি। আমাদের অধীনে, কার্য্য করিতে, কোন কষ্ট নাই। ইহার পর বিবেচনা করুন, প্রত্যেকেই আপনার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। পঞ্জাবের অনিয়মিত সৈন্যদল বিশেষ উৎসাহিত চিত্তে, যুদ্ধে নিয়মিত সৈন্যদল অপেক্ষা, আপনাদের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। তাহারা ইউরোপীয় সৈন্যদলের সহিত একত্র দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে

প্রস্তুত আছে। তাহারা যদি উপস্থিত হইয়া দেখে যে, ইউরোপীয়গণ যুদ্ধে বিমুখ রহিয়াছে, তাহাহইলে তাহারা ভাবিবে যে, কোম্পানির পরাজয় হইয়াছে। ইহার পর মনে করুন, যে, কয়েকদিন আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে, সে কয়েকদিনের মধ্যে হয়ত, উত্তেজিত সিপাহিদিগের চর প্রতি সৈনিক নিবাসে যাইতে পারে, এবং চিঠিপত্র দ্বারা প্রতি সৈনিক নিবাসের লোকদিগকে আমাদের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতে পারে। এখন অনেক স্থলে ভাল ফসল জন্মিয়াছে, অম্বালা ও মিরাটের মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শস্য সংগৃহীত হইবে; স্বদেশের অধিকাংশ স্থলে কৃষিকার্য্য উত্তমরূপ হইয়াছে। আমরা বিনাকষ্টে দেশের সর্ব্বত্র সৈন্য পাঠাইতেছি। পাতিয়ালা ও ঝিন্দের মহারাজ এবং সাধারণতঃ এই প্রদেশের উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। যেহেতু, তাঁহারা যে আমাদের পক্ষে আছেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সিপাহিদিগকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। * * যদি পঞ্জাবের কোন সেনানায়ককে আপনি চাহেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে আমাকে জানাইবেন। * *”

পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর এইরূপ ধীরতা অথচ এইরূপ একাগ্রতা ও কার্য্যতৎপরতার সহিত প্রধান সেনাপতিকে দিল্লীর অভিমুখে যাইতে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিপি ওজস্বিতায় অলঙ্কৃত হইলেও ঘটনার যথাযথ ভাবে পরিপূর্ণ নহে। তিনি যে পলাশী যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া আপনাদের সাহসিকতা ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে যুদ্ধ প্রকৃত মহাযুদ্ধের সম্মানিত নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নয়। ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভুদ্রোহিতায় বলসম্পন্ন না হইলে, লর্ড ক্লাইব বোধ হয়, সাহস ও একাগ্রতার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইতেন না। মীরজাফর প্রভৃতির বিশ্বাস ঘাতকতার জন্যই লর্ড ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন এবং ঐ বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই তাঁহার সাহস তাঁহার পরাক্রম ও তাঁহার কার্য্যতৎপরতা পরস্পর একীভূত হইয়া সমরে সমর-লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের আশায় পরিস্ফুট হইয়াছিল। যাহাহউক, স্যার জন লরেন্স উপস্থিত সময়ে সাহস ও দৃঢ়তার বলে কার্য্যসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অতীত ইতিহাসের নিগূঢ় সত্যের দিকে তত দৃষ্টি রাখেন নাই। বিশাল ভারতে তিনি আপনার স্বজাতীয়-

দিগের যেখানে যে কিছু কার্য্যতৎপরতার আভাস পাইয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া প্রধান সেনাপতিকে উত্তেজিত করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

প্রধান সেনাপতি অবশেষে প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। যদিও তিনি সৈনিকবিভাগে সর্ব্বপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি তাঁহার স্পষ্ট ধারণা ছিল যে, তিনি সমগ্র ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তির পরিচালকের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। যখন গবর্ণরজেনেরলের অভিমত তাঁহার গোচর হইল, তখন তিনি আর ইতস্ততঃ না করিয়া দিল্লীতে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সেনাপতি আনসন্ ২৩এ মে গবর্ণরজেনেরলকে লিখিলেন, "দিল্লীতে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আপনি তারের সংবাদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, দিল্লী শীঘ্র পুনরধিকার করা কর্ত্তব্য। পর্য্যাপ্তসংখ্যক ব্রিটিশ সেনা দ্বারা এই কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু তদনুরূপ ব্রিটিশ সৈন্য এ স্থানে নাই। আমরা যতদূর পারিয়াছি, সংগ্রহ করিয়াছি। এক ঘণ্টা কালও বৃথা ব্যয় করা হয় নাই। যে ব্রিটিশ সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আপনি দিল্লী আক্রমণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন কি না, জানিতে ইচ্ছা করি।" প্রধান সেনাপতি এই সময়ে সংগৃহীত সৈন্যের সংখ্যা ও তৎসম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ, মিরাটের সেনাপতি হিউটের নিকট লিখিয়া পাঠান।

ক্রমশঃ

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

বউ কথা কও

'বৌ কথা কয়, করে বিনয়, ভাঙছে বয়ের মান।' দীনবন্ধু প্রভাত বর্ণনায় এইরূপ লিখিয়াছেন। কথাটী কিন্তু ঠিক নয়,—বউ-কথা-কও সকল সময়েই, সকাল সন্ধ্যা সকল সময়েই, বউ কথা কও বলে—তথাপি দীনবন্ধুর কথাটী ঠিক নয়।

বঙ্গের —— জেলায় কৌশিকী নদী প্রবাহিতা। নদীটি ক্ষুদ্র। দেখিতে যেন একটীছড়া রূপার হার। নদীর দুই কূলে শস্য ক্ষেত্র, আম্রকানন, ও প্রাচীন জনপূর্ণ পল্লিগ্রাম। পল্লিবাসিনীরা নদীর জলে বাসন মাজে, স্নান করে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে আগ্রিবনিমজ্জিতা হইয়া সুখ ও সংসারের কথা কয়। নদীতে প্রচুর মৎস্য—পল্লিবাসীরা মনের সাধে মাছ খায়। কৃষকেরা নদীর জলে আপন আপন ক্ষেত্রে সোণা ফলায়। কৌশিকীধৌত জনপদে 'অকাল অজন্মা' হয় না।

কৌশিকীতীরে——গ্রাম। গ্রামখানি প্রাচীন এবং বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বাস স্থান। গ্রামের একস্থানে কৌশিকীর ধারে একটী বৃহৎ আম্রকানন। সেই আম্রকাননে ঘোষ মহাশয়দিগের বাড়ী। বৃহৎ গোষ্ঠীর বৃহৎ বাড়ী। বাড়ী সাত কি আট অংশে বিভক্ত। এক অংশের কর্ত্তা লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ। লক্ষ্মীকান্তের পাঁচ সহোদর। লক্ষ্মীকান্ত বর্ষীয়ান পুরুষ। তাঁহার পাঁচটী সহোদরেরই বিবাহ হইয়াছে। এবং তাঁহাদের সকলেরই সন্তানাদি হইয়াছে। ছেলে মেয়ে দৌহিত্র দৌহিত্রী প্রভৃতিতে লক্ষ্মীকান্তের গৃহ একটী জনপদতুল্য।

লক্ষ্মীকান্তের লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন। তাঁহার একখানি তালুক আছে। তাহার আয় নিতান্ত কম নয়। সেই আয়ে তাঁহার বাড়ীতে সদাব্রত দোল দুর্গোৎসব বার মাসে তের; পার্ব্বণ সকলই অতি সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়। তাঁহার বাড়ীতে ভিক্ষুক নিরাশ হয় না, দায়গ্রস্ত ব্যক্তি ভগ্নমনোরথ হয় না, জ্ঞাতি উপেক্ষিত হয় না, কুটুম্ব পরিচর্য্যায় মুগ্ধ হয়। তাঁহার গোলাবাড়ীতে বড় বড় শস্য পূর্ণ গোলা। তাঁহার গোয়ালবাড়ীতে বহুসংখ্যক গাভী ও হল-বাহী বৃষ। তাঁহার বাগানে আম্র কাঁটাল নারিকেল তিন্তিড়ি প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ। তাঁহার বড় বড় পুষ্করিণী—তাহার জল অমৃতের ন্যায় স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর—পুষ্করিণীতে অজস্র মৎস্য। তিনি পুণ্যবান—তাঁহার সংসার সুখের সংসার, তাঁহার ভাণ্ডার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

লক্ষ্মীকান্তের পত্নী বিদাবতী লক্ষ্মীকান্তের গৃহের গৃহিণী। বিদ্যাবতী রূপে

গুণে লক্ষ্মী। বিদ্যাবতীর অনেক গুলি দৌহিত্র দৌহিত্রী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটী পাঁচবৎসরের পুত্রসন্তান। বিদ্যাবতী এই বৃহৎ পরিবারের —এই বৃহৎ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পতি পুত্র পুত্রবধূ কন্যা দেবর দেবরপত্নী ননদিনী কুটুম্বিনী পরিচারক পরিচারিকা সরকার গোমস্তা গুরুমহাশয় পাইক চৌকিদার রাখাল কৃষাণ গাভী গোবৎস-তিনি সমান যত্নে সকলেরই সেবা ও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।—সকলেই তাঁহার স্নেহে মুগ্ধ।

আর স্বয়ং বিদ্যাবতী তাঁহার পুত্রবধূর গুণে মুগ্ধ। তাঁহার বৃহৎ সংসারের বৃহৎ যজ্ঞবৎ নিত্য সুশ্রুষায় তাঁহার পুত্রবধূই তাঁহার প্রধান সহায়—তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। পুত্রবধূর নাম সরস্বতী। সরস্বতী যেমন ঘরের মেয়ে, যেমন ঘরের বউ, তাঁহার গুণও তেমনি। বউ লইয়া শ্বাশুড়ি পাগল। বউ কাছে থাকিলে শ্বাশুড়ির চক্ষে পলক পড়ে না। শ্বাশুড়ি মনে করেন, বউ আছে তাই আমার সব আছে, বউ গেলে আমার কিছুই থাকিবে না, আমার সোণার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।

এ কথা আমরা সকলেই জানি।—আজ আর এক কথা শুনাইব।

বিদ্যাবতী প্রাতঃস্নান করিয়া রন্ধন শালায় প্রবেশ করিয়া দেখেন বউ তথায় নাই—রন্ধনের কোন আয়োজনই হয় নাই। পূর্ব্ব রাত্রিতে বউয়ের কিঞ্চিৎ পীড়া হইয়াছিল তিনি তাহা জানিতেন না। হঠাৎ তাঁহার রাগ হইল। তিনি রাগভরে বধূর নিকট গিয়া বলিলেন—বাছা, এ ত তোমার পিত্রালয় নয় যে গৃহকর্ম্মে অবহেলা করিবে। বিদ্যাবতীর যেমন রাগ হইয়াছিল তাঁহার তিরস্কার তেমন কটু হইল না বটে। কিন্তু তিরস্কার কিছু মিঠে রকম হইল বলিয়াই বধূর প্রাণে উহা কিছু বেশী বিঁধিল।

শ্বাশুড়ি রন্ধন করিতে লাগিলেন—বেলা হইতে লাগিল। তথাপি বধূ রন্ধনশালায় আসিলেন না। আরো বেলা হইল—তখন শ্বাশুড়ি বধূকে ডাকিতে লাগিলেন—তথাপি বধূ রন্ধনশালায় আসিলেন না। তখন শ্বাশুড়ি একবার বধূর ঘরে গিয়া দেখিলেন, বধূ গৃহের একটী কোনে বসিয়া আছেন, তাঁহার অবগুণ্ঠন বস্ত্র চক্ষের জলে ভিজিয়া গিয়াছে। বিদ্যাবতীর হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল—তিনি বধূর হাত ধরিয়া তাঁহাকে কতই বুঝাইলেন। কিন্তু বধূ উঠিলেন না। তখন বিদ্যাবতীর দুঃখের উপর ভয় হইল। তিনি কর্ত্তাকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া আনাইয়া তাঁহাকে কাতর স্বরে সকল কথা বলিলেন। লক্ষ্মীকান্ত পত্নীকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিয়া মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে সহোদরদিগকে, তৎপরে কন্যাগণকে, তারপর দৌহিত্র দৌহিত্রী দিগকে, তারপর ভ্রাতৃবধূদিগকে, তারপর পরিচারিকাদিগকে—এইরূপে বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলকে জড় করিয়া সকলকে বলিলেন— আজ বড় বিপদ, আজ বউমা রাগ করিয়াছেন, তোমরা সকলে যেমন করিয়া

পার বউমাকে সান্ত্বনা কর, বউ মা না উঠিলে আমি আজ আহার করিব না। তখন সকলেই কর্ত্তা মহাশয়ের ন্যায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। মেয়ে পুরুষ বালক বালিকা পরিচারিকা প্রভৃতি সকলেই বধূকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। তথাপি বধূ উঠিলেন না। বেলা তখন দ্বিপ্রহর—সূর্য্যদেব মধ্যাকাশে—তখনও লক্ষ্মীকান্তের বাড়ীর শিশুদিগের পর্য্যন্ত আহার হয় নাই। এক বধূর জন্য লক্ষ্মীকান্তের সেই সোণার সংসারে কাহারো মনে তখন সুখ নাই—সকলেই সশঙ্কিত ও সন্তপ্ত—সকলেই ভাবিতেছে, বেলা দ্বিপ্রহর হইল, বধূ এখনো মুখে হাতে জল দিলেন না, না জানি কি অমঙ্গলই ঘটিবে! দ্বিপ্রহর অতীত হইল। দুই একটা শিশু খাইবার জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্মীকান্ত আর থাকিতে পারিলেন না। তুমি কি অনর্থই ঘটাইলে, পত্নীকে এই কথা বলিয়া লক্ষ্মীকান্ত স্বয়ং বধূর কক্ষাভিমুখে গমন করিলেন। বিদ্যাবতী জড়সড় হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন। ঠিক সেই সময়ে সেই গম্ভীর আম্রকানন মধ্যে পাখী ডাকিল—

বউ কথা কও

লক্ষ্মীকান্তের পাঁচ বৎসরের পৌত্র বলিয়া উঠিল—মা, ঐ তোকে কে কথা কইতে বল্‌চে। বিদ্যাবতী বলিলেন—মা, কোথাকার বনের পাখী আসিয়া তোকে সাধিতেছে, তবুও উঠিবি না মা। লক্ষ্মীকান্ত বলিলেন—উঠ মা, তুমি আমার গৃহের লক্ষ্মী, তুমি অনাহারে থাকিলে আমার সংসারের অমঙ্গল হইবে। সরস্বতী শিশুকে কোলে লইয়া আস্তে আস্তে উঠিলেন।

বউ-কথা-কও, ডাকে সকল সময়েই—প্রভাতেও ডাকে—কিন্তু বউয়ের মান ভাঙ্গে কেবল দ্বিপ্রহরে। প্রভাতে পত্নীর মান হয়, বউয়ের মান হয় না। বউ-কথা-কও শয়নগৃহের পাখী নয়—সংসারাশ্রমীর সংসারক্ষেত্রের পাখী। হিন্দুর বধূর অসীম গৌরব আর বউ-কথা-কও পক্ষী সেই অসীম গৌরবের অনন্ত-প্রেরিত অনন্ত-বিহারী গায়ক।

হিন্দুর বধূর অসীম গৌরব। কেন'না হিন্দুর বধূ ভূত ও ভবিষ্যতের গ্রন্থি স্থল। বধূ বিনা হিন্দুর উত্তর পুরুষের অভাব হয় এবং উত্তর পুরুষের অভাব হইলেই পূর্ব্ব পুরুষেরও অভাব হয়। বধূ বিনা বংশের ধারা অবিচ্ছিন্ন থাকে না—সমস্তকুলস্মৃতি ব্যর্থ ও লুপ্ত হইয়া যায়—বর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধন-

শীল শক্তি ছারখার হইয়া ঐকান্তিক অকর্ম্মণ্যতায় পরিণত হয়। তদপেক্ষা লজ্জা, ঘৃণা, হীনতা আর নাই। সৃষ্টি ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কার্য্য। ভগবানের সর্ব্ব প্রধান কার্য্য সৃষ্টি। বিনা পুণ্যে সৃষ্টি হয় না—যেখানে পাপ সেখানে সৃষ্টি অসম্ভব। আর বিনা পুণ্যে সৃষ্টি রক্ষাও হয় না—পরিবার বল, সমাজ বল, জাতি বল, পাপ স্পর্শে সকলই লয় হইয়া যায়। অতএব পারিবারিক স্থিতি ও বংশাবলীর ধারাবাহিকতা পুণ্যরূপ মহা শক্তির ফল। এবং সেই জন্য পারিবারিক স্থিতি ও পুরুষের ধারাবাহিকতা হিন্দুদিগের মধ্যে এত প্রার্থনীয় ও এত গৌরবের জিনিস। হিন্দুর বধূ সেই পারিবারিক স্থিতি ও ধারাবাহিকতার হেতু বলিয়া তাঁহার গৌরব অসীম। এবং সেই জন্যই সেই অনন্ত-প্রেরিত অনন্ত-বিহারী বউ-কথা-কও পাখী গৌরবরূপিনী হিন্দুর বধূর উপাসনায় ও গৌরব কীর্ত্তনে নিযুক্ত।

হিন্দুত্ব বুঝিবে ত' হিন্দুর বধূ বুঝ।

প্রচার

৪র্থ খণ্ড] ১২৯৫ [১১।১২ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া, কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিয়া (কর্ম্ম কর)। (এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে।

পূর্ব্বশ্লোকে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য যে কর্ম্ম তাহাই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই রূপ কর্ম্মকরার পক্ষে, তিনটি বিধি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে।

দ্বিতীয়, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে।

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিবে।

ক্রমশঃ এই তিনটি বিধি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না, যে যাহাকে পতঞ্জলি ঠাকুর "চিত্তবৃত্তিনিরোধ" বলিয়াছেন, সেরূপ যোগের কথা হইতেছে না।

এখানে "যোগ" শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামীর মতে "পরমেশ্বরৈকপরতা।" শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, "যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্।" কিন্তু শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন, "কোসৌ যোগো যত্রস্থঃ কুর্ব্বিত্যুক্তমিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

স্থূলকথা, যোগ কি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান্ স্বয়ং বুঝাইয়াছেন, তখন আর ভিন্ন অর্থ খুঁজিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্ব-জ্ঞান তাহাই যোগ। তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহা বুঝিব। তৃতীয় বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মাত্র। সম্প্রসারণকে পুনরুক্তি বলা যায় না।

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা যাক। "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, "কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ।" আমি কর্ত্তা এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ঈশ্বরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্ত্তা, ইহা জানিয়া কর্ম্ম করিবে।

শঙ্কর বলেন, "যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্ম্মাণি, কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা," কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবে, কিন্তু ঈশ্বর তজ্জন্য আমার শুভ করুন, এরূপ কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। ফলে, ফলকামনা ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে সঙ্গ শব্দ পুনঃপুনঃ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়।

এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক। কর্ম্মসিদ্ধি, এবং কর্ম্মের অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। এই কথা, জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বুঝাইয়াছেন, আমাদের মত অজ্ঞানীদিগের সেরূপ বুঝায় বিশেষ লাভ নাই। তাঁহার মত এই যে জ্ঞানপ্রাপ্তিই কর্ম্মের সিদ্ধি। তাই তিনি বলেন, যে "সত্ত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ।" এবং "তদ্বিপর্য্যয়জা অসিদ্ধিঃ।" শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী। তিনি বলেন, "কর্ম্মফলস্য জ্ঞানস্য সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ" ইত্যাদি।

এখন জ্ঞান, কর্ম্মের ফল কি না, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপাততঃ, যে কথাটা উপস্থিত, তাহার সোজা অর্থ বুঝিতে পারিলে আমাদিগের পরমলাভ হইবে। টীকাকার

মধুসূদন সরস্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বেতি ফলসিদ্ধৌ হর্ষং ফলাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্যক্ত্বা" ইত্যাদি। ফলসিদ্ধিতে হর্ষত্যাগ, এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদ ত্যাগ, ইহাই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমত্বজ্ঞান। সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ হইবে। যে নিষ্কাম, ফলকামনা করে না, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ হইতে পারে না, এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ জন্মিতে পারে না। যতদিন সে ফলসিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, ততদিন বুঝিতে হইবে যে সে ফলকামনা করে—কেন না ফলকামনা না করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্ষলাভ করিবে কেন। কর্ম্মকারী নিষ্কাম হইলে, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ নাই, বা অসিদ্ধিতে দুঃখ নাই। তাহার পক্ষে অসিদ্ধি ও সিদ্ধি সমান। এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। তাদৃশ যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, ইহাই প্রথম বিধি।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট। বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। যাহারা সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট।

বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে কথিত হয় নাই। শ্রীধর বলেন, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মযোগই বুদ্ধিযোগ। শঙ্কর বলেন, সমত্ববুদ্ধি। সমত্বং যোগ উচ্যতে। তাহা হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এখানে কর্ম্ম শব্দে কাম্য কর্ম্ম। ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন। অতএব শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অর্থ এই যে, যে কর্ম্মযোগের কথা বলিলাম, তাহা হইতে কাম্য কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট।

শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইতেছে, যে বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর; বা বুদ্ধির অনুষ্ঠান কর। ইহাতে এখানে "বুদ্ধি" শব্দে ঐ বুদ্ধিযোগই বুঝিতে হয়। ভাষ্যকারেরা বলেন, সাংখ্যবুদ্ধি বা জ্ঞান। যদি তাই হয়, তবে প্রথমার্দ্ধেও বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝাই উচিত। তাহা হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।" ইত্যাদি বাক্যে আর কোন গোলযোগ হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী ৫০ শ্লোকে কিছু গোলযোগ বাধিবে।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং ॥ ৫০ ॥

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহজন্মে তিনি সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য, তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মে কৌশলই যোগ ॥ ৫০ ॥

"বুদ্ধিযুক্ত"—অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে যুক্ত।' যে সকল কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, তাহাই সুকৃত। আর যে সকল কর্ম্মের ফল নরকাদি, তাহাই দুষ্কৃত। যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে স্বর্গাদি বা নরকাদিপ্রাপ্তি হয়, তাদৃশ উভয়বিধ কর্ম্মই পরিত্যাগ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এমন নহে, যে তিনি কোন প্রকার সৎকর্ম্ম করেন না, অথবা ভাল মন্দ কোন কর্ম্মই করেন না। ইহার অর্থ এই যে তিনি স্বর্গাদি কামনা, বা নরকাদির ভয়ে, কোন কর্ম্ম করেন না। যাহা করেন, তাহা অনুষ্ঠেয় বলিয়া করেন।

অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মে কৌশলই যোগ। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এ কথার এই অর্থ করিয়াছেন যে, কর্ম্ম, বন্ধনজনক, কেন না কর্ম্ম করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারাধনার সাহায্যে মুক্তির উপায়ে পরিণত করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্ম্মে কৌশল বা চাতুর্য্য বলা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এরূপ বুঝিতে প্রস্তুত নহি। আমরা বুঝি, যিনি কর্ম্মে কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকল যথাবিহিত নির্ব্বাহ করেন, তিনিই যোগী। কর্ম্মে তাদৃশ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" এ কথার এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সহজ অর্থ আছে সেখানে, ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায়-দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া, আমরা সেই সহজ অর্থেরই অনুবর্ত্তী হইব।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্ম বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময়পদপ্রাপ্ত হয়েন।

"বুদ্ধিযুক্ত"—বুদ্ধিযোগাবলম্বী।

অনাময়পদ—সর্ব্বোপদ্রবশূন্য বিষ্ণুপদ। (শ্রীধর)

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২।

যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় সকলে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইবে।

এই ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাময়পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন, মোহ বা দেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা কামনাশূন্যতা জন্মে। স্বর্গাদিসুখ, বা রাজ্যাদি সম্পদ, কোন বিষয়েরই কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতে হয় না।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩॥

তোমার "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চলা (সুতরাং) অচলা হইয়া থাকিবে, তখন যোগপ্রাপ্ত হইবে। ৫৩।

"শ্রুতিবিপ্রতিপন্না"। বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত।* কিন্তু শ্রুতি কি? শ্রুতি, যাহা শুনা গিয়াছে—আর শ্রুতি, বেদকে বলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা প্রাচীন ভাষ্যকারেরা স্বীকার করিতে পারেন না; সুতরাং এখানে শ্রুতি শব্দে "যাহা শুনা গিয়াছে," তাঁহারা এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজের মত সোজা—শ্রুতি, শ্রবণ মাত্র। মধুসূদন আর একটু বেশি বলেন, "নানাবিধ ফলশ্রবণই" শ্রুতি। শঙ্করাচার্য্য তাই বলেন, তবে তাঁহার মার্জ্জিত লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশির ভাগ। তিনি বলেন "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না।" শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা একটু সাহস করিয়াছেন—তিনি বলেন, "নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না।"

ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না—বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অনেক

* *Anglice*—distracted.

সময়ে পণ্ডিত মূর্খের কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করেন না। Davis সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সাহেব প্রথমে একটু আপনায় বড়াই করিতেছেন—

"I, too, have consulted Hindu Commentators largely (কদাচিৎ) and have found them deficient in critical insight and more intent on finding or forming Vedantist doctrines in every part than in giving the true sense of the author. (শাঙ্করভাষ্য সম্বন্ধে অনেক দেশী লোকেও একথা বলিয়া থাকেন) I have examined their explanations with the freedom of inquiry that is common to western habits of thought, and thus while I have sometimes followed their guidance, I have been obliged to reject their comments as misrepresenting the doctrine of the author. I append some instances of this kind, that my readers may be able to form their own judgement."

এই বলিয়া, সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোকেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি শব্দে 'বেদ' এই অর্থ করেন। এবং উপরিলিখিত উক্তির পোষকতায় বলেন, যে—

"Here the reference is to *Sruti*, which means (1) hearing, (2) revelation. Hindu commentators say that the meaning is, what you have heard, about the means of obtaining desirable things; assuming as a certain proposition that the Vedas could not be attacked. The doctrine *of the Bhagavadgita is, however, that the devotee (yogin)*, when fixed in meditation lays aside the Vedas and Vedic ritual."

ডেবিস একজন ক্ষুদ্রপ্রাণী—তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের একজন পণ্ডিত শ্রেষ্ঠের—খোদ লাসেনের। তিনিও "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" পদের ঐরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অনুবাদকেরা তাঁহার পথে গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ডেবিসের আত্মশ্লাঘার ভিতর একটি অতি অমূল্য কথা আছে—সেই অমূল্য তত্ত্ব ভারতবর্ষে ইদানীং ছিল না, ও এখনও নাই। "FREEDOM OF ENQUIRY"—এই অমূল্য বাক্যের অনুরোধেই আমরা তাঁহার ন্যায় লেখকের আত্মশ্লাঘা উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা বুঝিয়াছি বা বুঝাইয়াছি, তাহার

সঙ্গে দেশী মতের অপেক্ষা বিলাতী মতটা বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্রীধর স্বামীকে এখানে বিলাতী দলে টানিয়া লইতে পারেন।

এই শ্লোকে "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন। যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই "সমাধি"।

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত, কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন,—

হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার কি লক্ষণ? স্থিতধীব্যক্তি কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, কিরূপ চলেন? ।৫৪।

ইতিপূর্ব্বে সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান এক্ষণে অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ বুঝাইলেন। কর্ম্মযোগের শেষ কথা এই বলিয়াছেন, যে কর্ম্মফল সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক, অন্যত্রই হউক) শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যতদিন সেরূপ থাকিবে, ততদিন তুমি কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে (পরমেশ্বরে) স্থির হইবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হইবে। যাহার এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ, বা স্থিতধী বলা যায়। অর্জ্জুন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

যখন সকলপ্রকার মনোগত কামনা বর্জ্জিত হয়, আপনাতে বা (আত্মাতে) আপনি তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ৫৫

কামনার পূরণেই মানুষের সুখ দেখিতে পাই। যে কামনা ত্যাগ করিল,

তাহার আর কি সুখ রহিল? শঙ্করাচার্য্য বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিষ্প্রয়োজন। বেদে তাদৃশ ব্যক্তিকে "আত্মারাম" বলা হইয়াছে।

আমরা আর একটা সোজা উত্তরে সন্তুষ্ট। আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই আনন্দ। তিনিই পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জগৎও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত নহে। কামনাশূন্য হইলে বহির্বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না কেন? যে কামনাশূন্য, সে কি জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না? না, জ্ঞানার্জ্জনে আনন্দ লাভ করে না? না সৎকর্ম্মসম্পাদনে প্রফুল্ল হয় না? কর্ম্মের অনুষ্ঠানই আনন্দময়—তাহার উপর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান থাকিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না। এবং এইরূপ আনন্দ আত্মাতেই; কাহারও সাপেক্ষ নহে।

যিনি এই কথাটা তলাইয়া না বুঝিবেন, তিনি গীতার এই সকল উক্তি এই শ্লোক, এবং ইহার পরবর্ত্তী কয়টি শ্লোক Ascetic Philosophy বলিয়া গণ্য করিবেন। বস্তুত ইহা Asceticism নহে। সংসারে যে কিছু সুখ আছে, তাহার নির্ব্বিঘ্ন উপভোগের এই তত্ত্বই উপযোগী। সংসারে উপভোগ্য যে কিছু সুখ আছে, তাহার উপভোগের বিঘ্ন কামনা ও ইন্দ্রিয়াদির প্রাবল্য। তাহা বশবর্ত্তী হইলে সাংসারিক সুখ সকলের উপভোগের আর কোন বিঘ্ন থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুখময় কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য মৎপ্রণীত অনুশীলনতত্ত্বে (ধর্ম্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ) আমি বিশেষ যত্ন পাইয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবর্ত্তী শ্লোক সকলে ইহা বিশেষ প্রকারে পরিস্ফুট হইবে।

দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যাঁহার, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর নাই, তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়। ৫৬।

এ সকল Asceticism নহে, এই তত্ত্ব দুঃখনাশ (সুতরাং) সুখবৃদ্ধির উপায়। দুঃখে যে কাতর হয়, সেই দুঃখী। দুঃখে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না সে দুঃখজয়ী হইয়াছে, তাহার আর দুঃখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় দুঃখী,

কেন না, সুখের স্পৃহা অনেক সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও আশানুরূপ ফল ফলে না; এই উভয় অবস্থাতেই সেই সুখস্পৃহা দুঃখে পরিণত হয়। অতএব, সুখস্পৃহা কেবল দুঃখবৃদ্ধির কারণ। ভয়, ক্রোধ দুঃখের কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অনুরাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার অনুরাগ বুঝা উচিত নহে। যথা ঈশ্বরানুরাগ—ইহা কখন নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অনুরাগ অর্থে, এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ভোগ্যাদি বস্তুতে অনুরাগই বুঝিতে হইবে। তাদৃশ বিষয় সকলে অনুরাগ যে দুঃখের কারণ, তাহা আবার বলিতে হইবে না।

বলিতে কেবল বাকি আছে, যে সুখস্পৃহা ত্যাগ করিলেই সুখত্যাগ করা হইল না। এবং সুখস্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, সুখভোগত্যাগ এখানে বিহিত হইতেছে না। যে সুখে স্পৃহাশূন্য, সে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। স্বয়ং জগদীশ্বর সর্ব্বপ্রকার স্পৃহাশূন্য, অথচ অনন্তসুখে সুখী। তবে মনুষ্য সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, মনুষ্য সুখে স্পৃহাশূন্য হইলে, সুখলাভের চেষ্টা করিবে না, সুখলাভের চেষ্টা না করিলে, মনুষ্য সুখলাভ করে না। যিনি কর্ম্মযোগ বুঝিয়াছেন, তিনি কখন এই আপত্তি করিবেন না। কর্ম্মযোগের মর্ম্ম এই যে, নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মের ফলই সুখ—যে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করে, সে তজ্জনিত সুখলাভও করে। যে কামনা, বা স্পৃহার অধীন হইয়া কর্ম্ম করে, সে সুখ লাভ করে না—কামনা ও স্পৃহা অননুষ্ঠেয় কর্ম্মের, সুতরাং পাপের ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম ও সুখে স্পৃহাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে—সুখ আপনি আসিবে। ৭০ শ্লোকে ভগবান স্বয়ং তাহাই বলিয়াছেন, পরে দেখিব।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যিনি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য, তত্তদ্বিষয়ে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্তিতে বিদ্বেষযুক্ত হন না, তিনিই, স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭।

"সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য।"—" শ্রীধর বলেন, সর্ব্বত্র কি না 'পুত্রমিত্রাদিষ্বপি।' শঙ্কর বলেন, "দেহজীবিতাদিষ্বপি।" শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। দেহ জীবনাদির শুভাশুভে যাহার কোন আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, তাহারই বুদ্ধি যে ঈশ্বরে স্থির হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝাইতে হইবে না। ৫৭।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮॥

কূর্ম্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গ সকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল সংহরণ করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন কোনপ্রকার ধর্ম্মাচরণ নাই; ইহা সকল ধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম্মমন্দিরের প্রথম সোপান। * সর্ব্বশাস্ত্রেই আগে ইন্দ্রিয়সংযমের কথা। কেবল এই কূর্ম্মের উপমার প্রতি একটু মনোযোগ আবশ্যক। কূর্ম্ম তাহার হস্তপদাদি সংহৃত করিয়া রাখে—ধ্বংস করে না, এবং আবশ্যকমতে তদ্দ্বারা জৈবনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযমই ধর্ম্ম, ধ্বংস ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মতত্ত্বে এ কথা বুঝাইয়াছি।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯॥

নিরাহার দেহীর (ইন্দ্রিয়াদির) বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ যায় না। (কেবল) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেই তাহা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। ৫৯।

"নিরাহার"—যে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত।

---

* All ethical gymnastic consists therefore singly in the subjugating the instincts and appetites of our physical system in order that we remain their masters in any and all circumstances hazardous to morality; a gymnastic exercise rendering the will hardy and robust and which by the consciousness of regained freedom makes the heart glad.—*Kant*: *Metaphysics of Ethics*—translated by Semple.

মনের একটি অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যায় না। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা অতুরাদির উদাহরণ দিয়াছেন। যে জড় বা অতুর, তাহার উপভোগের সাধ্য নাই সুতরাং উপভোগ নাই। কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় উদাহরণ আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভাণ করিয়া বা সন্ন্যাসাদি ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না। তার পর একদিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোতে সব ভাসিয়া যায়। ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির প্রভেদ বড় অল্প। এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় দুর্জ্জয়। কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দূরীকৃত হয়? "পরং দৃষ্ট্বা" এই কথার এমন তাৎপর্য্য নহে, যে ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে।

ধর্ম্মের এই বিঘ্ন এমন গুরুতর যে ভগবান্ পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে ইহা আরও পরিস্ফুট করিতেছেন।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

হে কৌন্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ন করিলেও প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়গণ বল পূর্ব্বক চিত্ত হরণ করে। ৬০।

সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মৎপর হইয়া, যিনি অবস্থান করেন, যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।৬১।

এই গেল ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা। যিনি বিবেকী, তিনিও যত্ন করিয়াও ইহাদিগের সহজে দমন করিতে পারেন না, বলপূর্ব্বক ইহারা চিত্তকে হরণ করে। আর যাহারা যত্ন করেনা, যাহারা বাহিরে উপভোগ করে না, কিন্তু মনে কেবল সেই ইন্দ্রিয় বিষয়েরই ধ্যান করে তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটে। সেই কথা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বলা হইতেছে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩।

(ইন্দ্রিয়ের) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে, তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে। ৬২।

ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধি নাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে। ৬৩।

যাহাকে মনে পুনঃপুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জন্মিবে। আসক্তি জন্মিলে তাঁহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে। না পাইলেই, প্রতি-রোধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা বা মূঢ়তা জন্মে। এরূপ মোহ হইতে কার্য্য-কারণ-পরস্পরসম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্য্যকারণসম্বন্ধ ভুলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল। বুদ্ধিনাশে বিনাশ।*

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া হইবে না। তবে কি ইন্দ্রিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যদি তাহা হয়, তবে এই গীতোক্ত ধর্ম্ম asceticism † না ত কি? তাহা হইলে জনসমাজকে সন্ন্যাসীর মঠে পরিণত করিতে হয়।

তাহা নহে; ইন্দ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে; তাহার বিশেষ বিধি পর-শ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪॥

* সীতারামের চরিত্রে বর্ত্তমান লেখক এই কথাগুলিন উদাহরণের দ্বারা পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিয়াছেন।

† আমরা যাহাকে বৈরাগ্য বা সংন্যাস বলি, Asceticism তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র জিনিস। এই জন্য ইংরেজি কথাটাই আমি উপরে ব্যবহার করিয়াছি।

যিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বশ্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন।

বিধেয়াত্মা—যাঁহার আত্মা বা অন্তঃকরণ বশবর্ত্তী।

ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিজের আজ্ঞাধীন—বলের দ্বারা তাঁহার চিত্ত হরণ করিতে পারে না। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত—ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার বশ, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ বা শান্তি * লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহার কৃত উপভোগ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ। তাই বলিতেছিলাম, যে গীতোক্ত এই ধর্ম্ম Ascetic Philosophy নহে—প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম্ম। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে।

একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয় সকলকে "রাগদ্বেষ বিমুক্ত"—অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য বলা হইয়াছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগশূন্য কেন হইবে, তাহা বুঝান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্বেষশূন্য বলিবার কারণ কি? ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখা যায় না। যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি? আর যদি উপভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বিদ্বেষ ঘটে, সেত ভালই—তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয়সুখে প্রবৃত্তি থাকিবে না। তবে এ নিষেধ কেন।

উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে। রোগীর আহারে অরুচি এবং অলসের ব্যায়ামসুখে অরুচি, উদাহরণ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। এ সকল শারীরিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে। অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই পাড়ওয়ালা ধুতি পরিবেন না, চটিজুতা নহিলে পায়ে দিবেন না। ইহাদিগের চিত্ত আজিও বিকারশূন্য হয় নাই। যে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি নহিলে পরিবে না, তাঁহাদিগের চিত্ত যেমন এখনও বিকৃত, ইহাদিগের তেমনি। যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা আর এরূপ আপত্তি করিবে না।

* "Makes the heart glad."—পূর্ব্বোদ্ধৃত কাম্তের উক্তি দেখ।

এই সকল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা ততটা ছোট কথা নহে। একটা বড় উদাহরণ দ্বারা ইহার গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি। রোমান কাথলিক ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের ইন্দ্রিয়বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেষ—কার্য্যতঃ না হউক, বিধিতঃ বটে। এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে চিরকৌমার বিহিত ছিল। ইহার ফলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্তু আর্য্য ঋষিরা যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ—কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া, যথাকালে দারপরিগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যেমন বিদ্বেষশূন্য, ইন্দ্রিয়ের প্রতি তেমনি অনুরাগশূন্য, অতএব কেবল ধর্ম্মতঃ সন্তানোৎপাদনজন্যই বিবাহ করিতেন। এবং সেই জন্য স্বভাব নির্দ্দিষ্ট সাময়িক নিয়মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন না।

Asceticism দূরে থাকুক, যাহাকে Puritanism বলে, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম তাহারও বিরোধী। কেন না Puritanism এই "বিদ্বেষ"-বুদ্ধিজাত। গীতোক্ত ধর্ম্মে কোনরূপ ভণ্ডামি চলিবার পথ নাই।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের বিনাশ জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু তাঁহার বুদ্ধি স্থিত হয়।

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে, যে আত্মবশ্য ও রাগদ্বেষ বিমুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপভোগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ত, বা শান্তি। এক্ষণে কথিত হইতেছে, সেই প্রসাদে সর্ব্বদুঃখ নষ্ট হয়, এবং সেই প্রসন্নচেতার স্থিতপ্রজ্ঞতা জন্মে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥

অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবনা নাই, তাহার শান্তি নাই; যাহার শান্তি নাই তাহার সুখ নাই ॥৬৬॥

অযুক্ত অসমাহিতান্তঃকরণ (যোগশূন্য)। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা।

যাহার অন্তঃকরণ অসমাহিত, ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত হয় নাই, তাহার শাস্ত্রাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। যাহার বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা করিতে পারে না। (ভাষ্যকারেরা বলেন, আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ নাই) যাহার চিন্তার শক্তি নাই, তাহার শান্তি নাই; শান্তি না থাকিলে সুখ নাই।

ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহা বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে। অনেক ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন। তবে সে বুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে কখন সুখী করে না। যে বদ্ধিতে সুখী করে না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

যাহার মন বিষয়েপ্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্ত্তন করে, যেমন বায়ু নৌকা জলে মগ্ন করে সেইরূপ (ইন্দ্রিয়) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ৬৭।

টীকার প্রয়োজন নাই।

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮ ॥

অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্ব প্রকারে বিমুখীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ।

টীকার প্রয়োজন নাই।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত। সর্ব্বভূত যখন জাগে, দৃষ্টি-যুক্ত মুনির তাহাই রাত্রি। ৬৯।

মহাভারতকারের অনুবাদই এই শ্লোকের প্রচুর টীকা। "অজ্ঞান তিমিরা-বৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগ্রত

থাকেন। এবং প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি।"

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০ ॥

যেমন পূর্য্যমান্ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদী সকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগ সকল যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভোগ সকলের কামনা করেন, তিনি পান না।

সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদী সকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে। তেমনি যিনি ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ সকলি আপনা হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় করে; সেই কারণে তিনিই শান্তি লাভ করেন। যিনি ইন্দ্রিয়তাড়িত সুতরাং কামনা পরবশ, তিনি সে শান্তি কদাচ লাভ করিতে পারেন না। এখন ৫৬ শ্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। কামনা পরিত্যাগই কর্ম্মফলজনিত সুখলাভের কারণ। কর্ম্মফলজনিত সুখ আসিয়া তাঁহাকে আপনি আশ্রয় করে; তাদৃশ সুখই শান্তিদায়ক। কামনাজনিত সুখে শান্তি নাই; সুতরাং সে সুখ সুখই নয়।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

যিনি সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতা শূন্য এবং নিরহঙ্কার, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

মমতাশূন্য—আত্মাভিমানশূন্য।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাহস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। কেবল অন্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭২।

তবে ব্রহ্মনিষ্ঠা, অতি অল্পকথার ভিতর আসিল। ইন্দ্রিয়সংযম এবং কামনাপরিত্যাগই ব্রহ্মনিষ্ঠা। স্মরণ রাখিতে হইবে, যে ঈশ্বরে সমাহিত-চিত্তের ইহা লক্ষণ মাত্র—ভগবদারাধনা ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা।

ইহা হইলেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ। গীতায় আর যাহা কিছু আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র—অধিকারভেদে পদ্ধতি-নির্ব্বাচন মাত্র। হিন্দুধর্ম্মে বা অপর কোন ধর্ম্মে ইহা ছাড়া যাহা কিছু আছে, তাহা ধর্ম্মের প্রয়োজনীয় অংশ নহে। তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধর্ম্ম, নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে কথা—ত্যাগ করিলেই ভাল। ইহা সকলের আয়ত্ত, ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধ্যা গায়ত্রীর আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক বা পতিত ব্যক্তি শূদ্র বা ম্লেচ্ছ, মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান, সকলেরই ইহা আয়ত্ত। ইহাই জগতে একমাত্র ধর্ম্ম—ইহাই একমাত্র Catholic religion.

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে সাংখ্যযোগোনাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যোগভাষ্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তাঃ পুনর্নিরোদ্ধব্যা বহুত্বে সতি চিত্তস্য—

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা ক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা। বৃত্তয়ঃ চিত্তস্য পরিণামবিশেষাঃ, পঞ্চতয্যঃ পঞ্চাবয়বাঃ, সংখ্যায়া অবয়বে তয়প্ ইতিসূত্রেণ পঞ্চশব্দাদবয়বার্থে তয়প্ প্রত্যয়ঃ। তাশ্চ দ্বিবিধাঃ, ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাশ্চ ; ক্লেশৈর্বক্ষ্যমাণৈরবিদ্যাদিভিরাক্রান্তাঃ ক্লিষ্টাঃ, তদ্বিপরীতা অক্লিষ্টা ইতি।

তাৎপর্য্যার্থ। সমাধি করিতে হইলে চিত্তের বৃত্তি সমস্ত নিরোধ করিতে হয়। বৃত্তি সমুদায় না জানিয়া তাহার নিরোধ করা যায় না। চিত্তের বৃত্তি অসংখ্য, তাহা এক জীবনে জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক সহস্র জীবনেও জানিয়া শেষ করা যায় না, তবে কিরূপেই বা সমাধিলাভ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বৃত্তি সমস্ত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বোধের সুগম উপায় বিধান করিতেছেন। চিত্তের বৃত্তি বহু হইলেও তাহা পঞ্চভাগে বিভক্ত।

ভাষ্যম্। ৫।

ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্মাশয়প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ, খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকারবিরোধিন্যোঽক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতা অপ্যক্লিষ্টাঃ, ক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষ্বপ্যক্লিষ্টা ভবন্তি, অক্লিষ্টচ্ছিদ্রেষু ক্লিষ্টাইতি, তথাজাতীয়কাঃ সংস্কারা বৃত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে সংস্কারৈশ্চ বৃত্তয় ইতি। এবং বৃত্তিসংস্কারচক্রমনিশমাবর্ত্ততে, তদেবম্ভূতং চিত্তমবসিতাধিকারমাত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি।

ব্যাখ্যা। অবিদ্যাদি ক্লেশ, যে সমস্ত বৃত্তির কারণ, অথবা ক্লেশ অর্থাৎ দুঃখের কারণ যে সাংসারিক চিত্তবৃত্তি, যাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মবাসনারূপ কর্ম্মাশয়ের প্রচয়ে অর্থাৎ ফলদানকালে ক্ষেত্রীভূত হয়—আলম্বন হয়—তাহাকে ক্লিষ্টবৃত্তি

বলে। যে সমস্ত বৃত্তি ক্লেশফলক নহে, উহারা খ্যাতি অর্থাৎ সত্বপুরুষ বিবেক-বিষয়ক, সুতরাং সত্বাদিগুণের কার্য্যারম্ভণরূপ অধিকারের বিরোধী হয়। বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্তই প্রকৃতির অধিকার, সুতরাং বিবেক উৎপন্ন হইলে আর সত্বাদিগুণের কার্য্য থাকে না।

এস্থলে এমত আশঙ্কা হইতে পারে, সমস্ত জীবেরই সর্ব্বদা ক্লিষ্ট বৃত্তিরই আবির্ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে আর অক্লিষ্ট বৃত্তির উদয় কিরূপে হইতে পারে? কোনরূপে উপজায়মান হইলেও তাহাদের বিবেকখ্যাতিরূপ কার্য্য-কারিতা কোনরূপেই সঙ্গত হয় না; কেন না, চতুর্দ্দিকেই তাহার বিরোধী ক্লিষ্ট বৃত্তি সমস্ত অনুক্ষণ আবির্ভূত রহিয়াছে। এরূপ ঘোর শত্রুবেষ্টিত হইয়া নিজের জীবনরক্ষাই দুষ্কর, কার্য্যনির্ব্বাহ করা ত অতি দূরের কথা। এই আশঙ্কায় উত্তর করিতেছেন, ক্লিষ্টপ্রবাহ পতিত হইলেও অক্লিষ্ট বৃত্তির স্বরূপ অন্তর্হিত হয় না; কেন না, ক্লিষ্টবৃত্তির ছিদ্রে (রন্ধ্রে) অক্লিষ্টবৃত্তির উদয় হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই ক্লিষ্টবৃত্তির ছিদ্র বলা যায়। যেমন সংসারে বিরক্ত যোগিগণের চিত্তে সর্ব্বদা অক্লিষ্ট বৃত্তির উদয় হইলেও কোন সময় ক্লিষ্ট বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। অক্লিষ্ট বা ক্লিষ্ট বৃত্তির দ্বারা স্বানুরূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়। তাদৃশ সংস্কারবিশিষ্ট চিত্তে পুনর্ব্বার অক্লিষ্ট বৃত্তি জন্মিয়া থাকে। এইরূপে বৃত্তি ও সংস্কারের চক্র সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে, এইরূপে অধিকার অর্থাৎ কার্য্যারম্ভণ তিরোহিত হইলে পর, চিত্ত আত্মকল্প অর্থাৎ আত্মার ন্যায় ধর্ম্মরহিত হইয়া থাকে, অথবা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়।

মন্তব্য। সচরাচর যাহাকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গ বলে, এই ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট বৃত্তি তাহারই নামান্তরমাত্র। আমরা ঘোর সংসারী, অথচ কখনও কখনও চিত্তে বৈরাগ্যসঞ্চার দেখা যায়, শ্মশানক্ষেত্রে অনেকেই ইহা অনুভব করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে উগ্রতপা ঋষিগণেরও সমাধিভ্রংশ শুনা যায়। তাপসশিরোমণি ভগবান বিশ্বামিত্রও মেনকার কুহকে পতিত হইয়া বিবেক-হীন হইয়াছিলেন। যখন দেখা যাইতেছে তাদৃশ জিতেন্দ্রিয় মুনিগণেরও প্রবৃত্তি-মার্গে পদন্যাস হয়, তখন তাহার বিপরীত দিকে নিরন্তর সাংসারিক বৃত্তি-প্রবাহ বহমান হইলেও কখনও যে আমরা নিবৃত্তিপথের পথিক হইতে পারিব না, এমত বলা যায় না। স্বভাবতঃই যখন দেখা যাইতেছে বৈরাগ্য-

লম্বনে মন নিবৃত্তিমার্গে বহমান হইতে পারে, তখন নিরন্তর অধ্যাত্মশাস্ত্রানুশীলন, আচার্য্যোপদেশশ্রবণ প্রভৃতি উপায় দ্বারা উহা দৃঢ়ভূমি হইলে অভীষ্ট পথে অবশ্যই অগ্রসর হইতে পারিবে। প্রথমতঃ অক্লিষ্ট বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া ক্লিষ্ট বৃত্তির নিরোধ করিবে, তৎপরে পরবৈরাগ্য অর্থাৎ পুরুষস্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা তাহারও নিরোধ করিতে পারিলে প্রাগুক্ত নিরোধ-সমাধি অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়।

তাঃ ক্লিষ্টাশ্চাক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চধা বৃত্তয়ঃ—
প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা। তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চধা পঞ্চাবয়বা বৃত্তয়ঃ প্রমাণাদয় ইত্যর্থঃ। প্রমাণানিচ, বিপর্য্যয়শ্চ, বিকল্পশ্চ, নিদ্রাচ, স্মৃতিশ্চ তা স্তথোক্তাঃ।

তাৎপর্য্যার্থ। প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের কারণ যে চিত্তবৃত্তিবিশেষ তাহাকে প্রমাণ বলে। বিপর্য্যয়াদির লক্ষণ তত্তৎ সূত্রে অভিহিত হইবে। এই সূত্রের ভাষ্য নাই।

তত্র—
প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা। প্রত্যক্ষঞ্চ, অনুমানঞ্চ, আগমশ্চ তে; প্রমাণানি প্রমীয়তে অনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রমাকরণানীত্যর্থঃ। প্রমাচ অনধিগতা বাধিতপদার্থবোধ ইতি।

তাৎপর্য্যার্থ। সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতে প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ন্যায়মতে, উপমান একটি অতিরিক্ত প্রমাণ। বেদান্ত ও মীমাংসামতে আরও দুইটি প্রমাণ আছে; যথা—অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। ইহা ভিন্ন ঐতিহ্য ও সম্ভব নামে আর দুইটি প্রমাণ আছে, উহা পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ। চার্ব্বাক্ অর্থাৎ নাস্তিকমতে কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ভাষ্যম্। ৭।

ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপরাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণং, ফলমবিশিষ্টঃ পৌরুষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ; বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষ ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যামঃ। অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধো যস্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধানা বৃত্তিরনুমানং, যথা দেশান্তরপ্রাপ্তের্গতিমচ্চন্দ্রতারকং চৈত্রবৎ; বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তিরগতিঃ, আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতোবার্থঃ পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে। শব্দাত্তদর্থবিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ; যস্যাশ্রদ্ধেয়ার্থো বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ স আগমঃ প্লবতে; মূলবক্তরিতু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্ব্বিপ্লবঃ স্যাৎ।

ব্যাখ্যা। যেমন জোয়ারের জল নদী হইতে বহির্গত হইয়া খাল বাহিয়া ক্ষেত্রে পতিত হয়, এবং ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, মণ্ডল প্রভৃতি যেরূপ ক্ষেত্রের আকার থাকে তদ্রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ চিত্তও ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালীর দ্বারা বাহ্যবস্তুসম্বন্ধ হইয়া বিষয়াকার ধারণকরে। কেহ বলেন; অর্থ কেবল সামান্যরূপ; কেহ বলেন, কেবল বিশেষরূপ; কেহ বা উভয়রূপ স্বীকার করিয়াও সামান্য বিশেষের সমবায় রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া থাকেন। স্বমতে পদার্থ উক্ত উভয় রূপই, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদ; সমবায় নহে।

এতাদৃশ সামান্যবিশেষাত্মক পদার্থবিষয়ক ইন্দ্রিয়জন্য চিত্তবৃত্তি যাহার ফল; এই ঘট, ঐ পট ইত্যাদি বিশেষরূপে ব্যবহারের কারণ প্রমা তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। যদিচ প্রত্যক্ষস্থলেও সামান্যরূপে পদার্থের ভাণ হইয়া থাকে, তথাপি ঐ সামান্য জ্ঞান, বিশেষ জ্ঞানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে বলিয়া 'বিশেষাবধারণপ্রধানা' এইরূপ বলা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রমাণের ফল যে প্রমা তাহার উপন্যাস করিতেছেন, "ফলমবিশিষ্ট ইতি।" বুদ্ধি ও পুরুষের অভিন্ন যে চিত্তবৃত্তিবোধ তাহাকে প্রমারূপ ফল বলে। চিত্ত জড়, সুতরাং তাহার পরিণামরূপ বৃত্তিও জড়; কাজেই বিষয় প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রহণানন্তর স্বয়ং চেতনায়-

মান হইয়া বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষকেই প্রমা বলে, এইটি ন্যায়শাস্ত্রানুমত ব্যবসায়জ্ঞানস্থানীয়। ঐ সময়েই পুরুষপ্রতিবিম্বাপন্ন বিষয়াকারে পরিণামরূপচিত্তবৃত্তিও পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। ইহাতে প্রতিবিম্বিত আত্মা, চিত্তবৃত্তি ও বিষয় সমস্তই প্রকাশিত হয়; যথা, ঘটমহং জানামি, ঘটজ্ঞানবানহং ইত্যাদি। ইহাকেই বিষয়সাক্ষাৎকার বলে। এইটি ন্যায়শাস্ত্রানুমত অনুব্যবসায় স্থানীয়। প্রমাতৃপ্রভৃতির বিভাগ এইরূপ—

প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব চ।
প্রমাঽর্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বিনং ॥
প্রতিবিম্বিতবৃত্তীনাং বিষয়ো মেয় উচ্যতে।
বৃত্তয়ঃ সাক্ষিভস্যঃ স্যুঃ করণস্যানপেক্ষণাৎ ॥
সাক্ষাদ্দর্শন রূপঞ্চ সাক্ষিত্বং সাংখ্যসূত্রিতম্।
অবিকারেণ দ্রষ্টৃত্বং সাক্ষিত্বং চাপরে জগুঃ ॥

চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া পুরুষ চিত্তের সহিত অভিন্ন হয়, সুতরাং চিত্তবৃত্তিকেই নিজের বলিয়া বোধ করে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "অবিশিষ্ট ইতি।" এই সমস্ত বিষয়, "বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষঃ" ইত্যাদি অগ্রিমস্থলে বিশেষরূপে অভিহিত হইবে।

প্রত্যক্ষানন্তর অনুমানের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন, "অনুমেয়স্য" ইত্যাদি। সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ অনুমেয়, বহ্ন্যাদিরূপ সাধ্যই জিজ্ঞাসিত ধর্ম্ম; যথা—'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' এই স্থলে বহ্নিরূপ সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ পর্ব্বত অনুমেয়, তৎসজাতীয় অর্থাৎ বহ্নিবিশিষ্ট চত্বর মহানসাদি সপক্ষ; তদ্বিপরীত অর্থাৎ বহ্নির অভাববিশিষ্ট জল হ্রদাদি বিপক্ষ। অনুমেয়ের পর্ব্বতরূপ পক্ষের সজাতীয় সপক্ষে অনুবৃত্ত অর্থাৎ বর্ত্তমান, এবং বিপক্ষ জলহ্রদাদিতে অবর্ত্তমান যে সম্বন্ধ অর্থাৎ পক্ষবৃত্তি, বহ্নিব্যাপ্য ধূমাদি রূপ হেতু, তদ্বিষয়ক যে চিত্তবৃত্তি যাহাতে সামান্যরূপ বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত এইরূপ জ্ঞান জন্মায়, তাহাকে অনুমান বলে। হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ জানিতে না পারিলে অনুমিতি হয় না। এই সম্বন্ধ

কেবল সামান্যের সহিতই গৃহীত হয়, যেমন বহ্নিসামান্যের সহিত ধূমসামান্যের ব্যাপ্তি; সুতরাং তজ্জনিত অনুমিতিও বিশেষরূপে না হইয়া সামান্য রূপেই হইয়া থাকে। ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধ, অন্বয় ও ব্যতিরেকরূপ দ্বিবিধ। অন্বয়-ব্যাপ্তির উদাহরণ, চন্দ্রতারকং (পক্ষ) গতিমৎ (সাধ্য) দেশান্তরপ্রাপ্তেঃ (হেতু) অর্থাৎ চন্দ্রতারকের দেশান্তর প্রাপ্তি আছে, সুতরাং গতিও আছে। যে যে বস্তু দেশান্তর প্রাপ্ত হয় তাহাতে গতিও হয়, গতি ব্যতিরেকে দেশান্তরের প্রাপ্তি হইতে পারে না; যেমন—চৈত্র ব্যক্তির দেশান্তর প্রাপ্তি আছে বলিয়া গতিও আছে। ব্যতিরেক স্থল যথা, যেখানে গতি নাই সেখানে দেশান্তর প্রাপ্তিও নাই; যেমন—বিন্ধ্যগিরির। ইহার গতি নাই বলিয়া দেশান্তর প্রাপ্তি হয় না। এই স্থলে দেশান্তরপ্রাপ্তিরূপ কার্য্যদ্বারা গতিরূপ কারণের অনুমান হইল। ব্যাপ্যের জ্ঞানে যেরূপ ব্যাপকের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ ব্যাপকের অভাবজ্ঞানেও ব্যাপ্যের অভাবজ্ঞান হইয়া থাকে; কেন না, ব্যাপকাভাব, ব্যাপ্যাভাবের ব্যাপ্য; যেমন—ধূমাদি বহ্ন্যাদির ব্যাপ্য, এবং বহ্ন্যাদির অভাব ধূমাদির অভাবের ব্যাপ্য। তৎসত্ত্বে তৎসত্তা অন্বয়ব্যাপ্তি। তৎসত্ত্বে ধূমাদি ব্যাপ্যসত্ত্বে, তৎসত্তা, বহ্ন্যাদিব্যাপকের সত্তা অর্থাৎ স্থিতি। তদসত্ত্বে তদসত্তা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি, বহ্ন্যাদিরূপ ব্যাপকের অসত্ত্বে অর্থাৎ স্থিতি না হইলে ধূমাদিরূপ ব্যাপ্যেরও অসত্তা হয় ইতি।

আগমপ্রমাণ নিরূপিত হইতেছে। ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ বঞ্চনা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতাদি দোষরহিত ব্যক্তিকে আপ্ত বলে। তাদৃশ বক্তা নিজের প্রত্যক্ষীকৃত, অনুমিত অথবা শব্দপ্রমাণদ্বারা জ্ঞাত বিষয়ে, নিজের যেমন বোধ শ্রোতারও তদ্রূপ বোধ হউক এই অভিপ্রায়ে অপর ব্যক্তির নিকট শব্দদ্বারা উপদেশ করিয়া থাকেন। শব্দ শ্রবণানন্তর শ্রোতার উক্ত বিষয়ে উপজায়মান চিত্তবৃত্তিকে আগমপ্রমাণ বলে। এতাদৃশ চিত্তবৃত্তিরূপ প্রমাণের কারণ বলিয়া শব্দকেও প্রমাণ বলা হইতেছে। যে স্থলে বক্তার জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান শ্রোতার উৎপন্ন হয়, সেস্থলে প্রমাণ বলা যায় না; যেমন—"অশ্বত্থামা হত ইতি" এই বাক্য যুধিষ্ঠির কর্তৃক উক্ত হইলে দ্রোণাচার্য্যের জ্ঞান হইল যে, তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা হত হইয়াছে। কিন্তু বক্তা যুধিষ্ঠিরের নিজের জ্ঞান ছিল আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু হয় নাই, অশ্বত্থামা

নামে গজ নিহত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে স্ববোধসংক্রান্তি অর্থাৎ নিজের জ্ঞানতুল্য জ্ঞান শ্রোতার হইল না বলিয়া এটি প্রমাণ নহে। যে শব্দের বক্তা অশ্রদ্ধেয়ার্থ অর্থাৎ যাঁহার কথায় বিশ্বাস হয় না, এবং যিনি বিষয় দর্শন বা অনুমান করেন নাই, এতাদৃশ বক্তার বচন প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না। এ স্থলে একটি বিষয় বুঝিতে হইবে। শব্দের স্বরূপতঃ প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য কিছুই নাই, একরূপ শব্দই আপ্তব্যক্তি কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়া প্রমাণ হয় এবং ভ্রান্ত কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইয়া অপ্রমাণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বক্তৃগতগুণ দোষই শব্দে সঞ্চারিত হয়, শব্দের নিজের গুণ বা দোষ কিছুই নাই। যেমন, যথার্থ রজতস্থলে প্রযুক্ত "ইদং রজতং" এবং অযথার্থ শুক্তিরজতস্থলে প্রযুক্ত "ইদং রজতং" এই উভয় স্থলে একবিধ শব্দ হইলেও প্রথমটি আপ্ত কর্ত্তৃক উচ্চারিত বলিয়া প্রমাণ, এবং দ্বিতীয়টি ভ্রান্ত কর্ত্তৃক উচ্চারিত বলিয়া অপ্রমাণ হইল।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে, তবে মনুপ্রভৃতি শাস্ত্র কিরূপে প্রমাণ হইবে। কেন না, তাঁহারা স্বয়ংদৃষ্ট বা অনুমিত বিষয় কিছুই বলেন নাই— বেদার্থের অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। এস্থলে মন্বাদিশাস্ত্রকারগণ স্বয়ংদৃষ্টানুমিতার্থ না হইলেও তাঁহাদের মূল বক্তা অর্থাৎ বেদপ্রণেতা ঈশ্বর তাদৃশ, অর্থাৎ দৃষ্টানুমিতার্থ। সুতরাং বেদার্থের অনুবাদরূপ মন্বাদিশাস্ত্র প্রমাণ হইল।

মন্তব্য। প্রত্যক্ষস্থলে, ইন্দ্রিয় সংযুক্ত বিষয়ের সহিত চিত্তের সম্যক্ সম্বন্ধ হয় বলিয়া বিষয়াকারে পরিণাম হইতে পারে; সুতরাং বিশেষরূপে বিষয় নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। অনুমানাদি স্থলে সেরূপ ঘটে না; কেন না, *বিষয় দেশে চিত্তের সঞ্চার হয় না, সুতরাং সামান্য ভাবেই পরোক্ষরূপ নিশ্চয়* হয়। এই প্রত্যক্ষ ষড়্বিধ; যথা—ঘ্রাণজ, রসনাজ, নয়নজ ত্বগিন্দ্রিয়জ, শ্রোত্রজ, ও মানসিক। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের *যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং শব্দাদিবিশিষ্ট পদার্থ সকল।* মনঃ অন্তরিন্দ্রিয়; সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বিষয় ইহার নিয়ত। আত্মারও জ্ঞানাদি বিশিষ্ট রূপে মানসিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; স্বতন্ত্র লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না, যোগজ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। উক্ত ষড়্বিধ প্রত্যক্ষ ভিন্ন ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষ আছে; যথা—সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও যোগজ। ইহার মধ্যে

শেষোক্তটি সর্ব্ববাদিসম্মত, প্রথম দুইটি সকলে স্বীকার করে না। ইহার বিস্তার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ন্যায়গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

প্রমাণান্তর্গত অনুমানখণ্ড অতি বিস্তৃত ও দুরূহ। গোতম প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রে বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিলেও এই অনুমানই তাহার ইষ্টসিদ্ধির প্রধান উপায়। সমস্ত শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য মোক্ষসিদ্ধি, তাহার উপায় আত্মজ্ঞান। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যশ্চ"। শ্রুতি বাক্যদ্বারা আত্মশ্রবণ করিয়া উপপত্তি দ্বারা মনন করিবে। এইরূপে পরোক্ষ নিশ্চয় হইলে প্রত্যক্ষের নিমিত্ত নিদিধ্যাসন অর্থাৎ সমাধি করিবে। এই শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনই আত্মজ্ঞানের সম্যক্ উপায়। "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যোমন্তব্যশ্চোপপত্তিতঃ। মত্বাচ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।" যুক্তিপ্রধান ন্যায়শাস্ত্রই মননের নামান্তর, ভগবান্ উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ন্যায়চর্চ্চেয়মীশস্য মনন-ব্যপদেশভাক্। উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরাগতা।" (কুসুমাঞ্জলি, প্রথম স্তবক, ২ শ্লোক)। অর্থাৎ শ্রবণানন্তর বিহিত ঈশ্বরের মননাত্মক উপাসনা স্বরূপ এই ন্যায়চর্চ্চা করা যাইতেছে।

এই ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব আছে;—যথা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। প্রতিজ্ঞা, পর্ব্বতো বহ্নিমান্। হেতু ধূমাৎ। উদাহরণ, "যৎ যৎ ধূমবৎ তত্তদ্বহ্নিমৎ; যথা—মহানসং।" উপনয়, বহ্নিব্যাপ্য ধূমবানয়ং। নিগমন, তথাচ বহ্নিমান্। ন্যায়শাস্ত্র প্রতিপাদিত ব্যাপ্তিপদার্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা দুরূহ ব্যাপার। তবে ঐ বিষয়ে একখানি গ্রন্থবিশেষ প্রণয়ন করিলে কথঞ্চিৎ হইতে পারে। সামান্যতঃ, নিয়ত সম্বন্ধ অর্থাৎ যে পদার্থ ব্যতিরেকে যে পদার্থ থাকিতে পারে না, তাহার ব্যাপ্তি তাহাতে আছে, এইরূপ বলা যাইতে পারে। যেমন বহ্নিকে ছাড়িয়া ধূম থাকিতে পারে না, অতএব বহ্নির ব্যাপ্তি ধূমে আছে, ধূমকে ছাড়িয়া বহ্নি অয়োগোলকাদিতে থাকে, অতএব ধূমের ব্যাপ্তি বহ্নিতে নাই, উক্ত ব্যাপ্তিবিশিষ্টকেই (পুক্তিত) হেতু বলে, উহার পক্ষে বর্ত্তমানতারূপ পরামর্শ জ্ঞানে অনুমিতি হয়। অনৈকান্তিকতা অর্থাৎ ব্যভিচারিতা, বিরুদ্ধতা, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষতা ও বাধ এই পাঁচটি হেতুর দোষকে হেত্বাভাস বলে। ইহার লক্ষণ উদাহরণ প্রভৃতি ন্যায়গ্রন্থে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতিতে লিখিত হইবে।

এইরূপ কেবল শব্দশ্রবণেই অর্থপ্রতীতি হয় না—শব্দের শক্তি অর্থাৎ সংকেতজ্ঞান আবশ্যক, এবং আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্যজ্ঞান এই চারিটি বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ।

ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইন্দ্রিয়, অনুমান, ব্যাপ্তিজ্ঞান ও আগম শব্দ। সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতে এতজ্জন্য চিত্তবৃত্তিকেই সর্ব্বত্র প্রমাণ বলে, উক্ত প্রমাণের কারণ বলিয়া ইন্দ্রিয়াদিকেও প্রমাণ বলা যায়। আর যদি চিত্ত-বৃত্তিকেই প্রমাণরূপ ফল বলিয়া অভিধান করা যায়, তবে ইন্দ্রিয়াদিও সাক্ষাৎ প্রমাণ হইতে পারে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু।

পাশ্চাত্যদর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা কেহ কেহ বলেন যে প্রতীক্ষা দুই প্রকার। এক বহির্ম্মুখী অপর অন্তর্ম্মুখী। কেহ বলেন, উভয় প্রণালীতেই ভূয়োদর্শন এবং ব্যাপ্তিগ্রহ হইতে পারে; কাহারও মতে বহির্ম্মুখী প্রতীক্ষা ব্যতীত শাস্ত্র-রচনা হইতে পারে না। অন্তর্ম্মুখী প্রতীক্ষা দ্বারা স্বকীয় অন্তর্ব্বর্ত্তী অবস্থা অনুধ্যান করা যায়। ইহাতে ভ্রম হউক না হউক, ভ্রমের স্থল থাকে, মানিতে হইবে। তান্ত্রিক মতের উপাসক অন্তর্ম্মুখী প্রতীক্ষা সহকারে বুঝিলেন ও বলিলেন, "আমি মদ্যপান করিয়া কুলদেবতার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়াছি এবং একান্ত ভক্তিসহকারে তাঁহাকে মৎস্যমাংসাদি নিবেদন করিতেছি।" কিন্তু সম্ভবতঃ এই কথা বলিবার সময়ে তিনি সুরাপানজনিত মত্ততাতে অভিভূত হইয়াছিলেন। যে কুলদেবতা, যে ভক্তি বা যে একাগ্রতার কথা মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা সমস্তই স্বপ্নবৎ; এবং মৎস্যমাংসাদি নিবেদন করিলাম মনে করিয়া যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সে কেবল উদরপরায়ণতার ফল মাত্র। ফলতঃ এইরূপ ভ্রম যে কেবল তান্ত্রিকেরই হয় তাহা নহে; জীবনযাত্রাতে পদে পদে সকলেরই মনে এরূপ ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। উহা সমস্তই অন্তর্ম্মুখী প্রতীক্ষার স্বধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে বলিতে পারা যায় যে সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপারই অন্তর্ম্মুখী প্রতীক্ষার অধীন। কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাপার কেন, ক্ষুৎপিপাসাদি ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানও উহার উপরে বহুপরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। মন, জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় নামে অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু, মনের মধ্যে যে জ্ঞান প্রবেশ করে কিম্বা তথায় যেরূপ কর্ম্মের সূচনা হয়, তাহার চেতনা, অন্তর্ম্মুখী প্রতীক্ষা ব্যতীত কিসে আয়ত্ত হইবে?

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা প্রতীক্ষা ও ভূয়োদর্শন বিষয়ে প্রাগুক্ত অন্তর্ম্মুখী ও

বহির্ম্মুখী প্রতীক্ষার বিভেদ উপেক্ষা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা তাহা করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ের সমগ্র বাদবিতণ্ডা আয়ত্ত করিবার আবশ্যকতা দেখি না। কিন্তু যাঁহারা তপস্যা, ধ্যান ও যোগ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে অন্তর্ম্মুখী প্রতীক্ষা এক মহৎ আশ্রয়স্থল। আর যাঁহারা মনুষ্যপরম্পরা মধ্যে ঐকমত্য সংস্থাপনের কামনায় ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রাগুক্ত বিষয় ঘোরতর বৈষম্যের উপাদান। যাহাকে ইতর ভাষায় মনের ঝোঁক বলে, সেই ঝোঁক থাকিলে, স্বার্থানুমান পরার্থানুমান আদি সমস্তই বিফল হইয়া থাকে। এবং কোনও প্রকার মনের ঝোঁক নাই, এ কথা কোন মনুষ্যের উপলক্ষে বলাও ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। শাস্ত্রকারেরা মোহনামক রিপুকে এই কারণে ষড়রিপুর মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন কি না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু যদি সেই অভিপ্রায় স্বীকার করা যায়, তবে বলিতে হইবে, যে অন্তর্ম্মুখী প্রতীক্ষাজাত ভ্রম বা মোহ নিবারণের জন্য তর্কশাস্ত্র কোন সদুপায় করেন নাই।

প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের মনে মোহ এবং অবিদ্যা নিবারণার্থে তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সেই তত্ত্বজ্ঞান আবার ধ্যান তপস্যা যোগ প্রভৃতি অন্তর্ম্মুখী প্রতীক্ষার ফল। কিন্তু এতাদৃশ স্থলে ভূয়োদর্শন বা ব্যাপ্তিস্থির করা দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ এই প্রণালীতে মনুষ্যপরম্পরার ঐকমত্য সংস্থাপনের কোনও সদুপায় হয় না। সনাতনধর্ম্ম পাশ্চাত্য বুদ্ধিসহকারে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

অতএব জ্ঞানলাভের নিমিত্ত এই নিয়ম করা কর্ত্তব্য, যে অন্তর্ম্মুখী ভূয়োদর্শন দ্বারা অনন্যরূপে ব্যাপ্তিগ্রহ করা যাইবে না। বহির্ম্মুখী প্রতীক্ষাজাত যে ব্যাপ্তিজ্ঞান পূর্ব্ব হইতে আয়ত্ত আছে, তদ্দ্বারা অন্তর্ম্মুখী প্রতীক্ষার কিঞ্চিৎ দমন করা আবশ্যক। যখন ব্যাপ্তিস্থির আছে যে সুরাপান দ্বারা মোহ জন্মে, আর মদ্য মাংস এবং পঞ্চম মকারটিও নিতান্ত মোহকর, তখন মুদ্রা সহযোগেই যে অপর মকার চতুষ্টয়ের মোহ নিবারিত হইবে, একথা মনে করা ন্যায়সম্মত নহে। প্রস্তাবিত একাগ্রচিত্ততা কেবল অন্তর্মুখী প্রতীক্ষা হইতেই উদয় হয়। তাদৃশ প্রতীক্ষা দ্বারা যত কেন ভূয়োদর্শন হউক না তাহাতে সুরাপানবিষয়ক

এবং বহির্ম্মুখী প্রতীক্ষাজাত যে ব্যাপ্তি স্থির আছে তাহার অন্যথা করা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল ও মোহজনক। সুতরাং ভৈরবীচক্রস্থ উপাসনাস্থলে স্বকীয় ভক্তি শ্রদ্ধার প্রতি অন্তর্ম্মুখী প্রতীক্ষা দ্বারা লক্ষ্য না করিয়া, অন্যের আচরণের প্রতি বহির্ম্মুখী প্রতীক্ষা সহকারে লক্ষ্য করাই কর্ত্তব্য ; এবং অন্যের অবস্থাও যেরূপ আপনার চিত্তগত অবস্থাও সম্ভবতঃ সেইরূপ বটে, এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করাই অপেক্ষাকৃত ন্যায়সম্মত। দ্বিতীয় নিয়ম এই যে অন্তর্ম্মুখী প্রতীক্ষাজাত জ্ঞান স্বতঃ অবলম্বন না করিয়া তাহা অগ্রে অন্যের নিকট ব্যক্ত করিও এবং এইরূপে পরস্পরের চিত্তগত অবস্থা ব্যক্ত হইলে যে বহির্ম্মুখী প্রতীক্ষার স্থল দৃষ্ট হইবে ও তাহা হইতে যে ব্যাপ্তিস্থির হইবে, সেই ব্যাপ্তির সহিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমবায় করিয়া বুদ্ধি স্থির করাই বিধেয়।

ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রয়োগের বিধান।

ব্যাপ্তিজ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য পরীক্ষা ও প্রতীক্ষারূপ দ্বিবিধ ভূয়োদর্শনের কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আলোচনা করা গিয়াছে এবং ন্যায়বাক্যের অবয়বাদিতেও পাশ্চাত্য এবং প্রাচীন বুদ্ধির ঐক্য প্রদর্শন করা গিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য স্থলে পাশ্চাত্য ও প্রাচীন বুদ্ধির মধ্যে বিভেদও ঘটিয়াছে। আবার সেই সকল বিভেদ হইয়াও এখন কোন কোন স্থলে ঐক্য সাধনের উপায় হইয়াছে। অনৈক্য সমুদায় এই প্রস্তাবে পর্য্যালোচনা করা সম্ভাবিত নহে, কেবল ঐক্যপ্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য। কেন না, এতদ্ভিন্ন সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় যুক্তি বর্ত্তমানকালে গ্রাহ্য হইবার উপায়ান্তর নাই। প্রাচীন ও পাশ্চাত্যের বুদ্ধি কোনও স্থলে সমতুল্য, কোথাও বা বিভিন্ন। বিভিন্নতাস্থলে দ্বিবিধ বুদ্ধি এবং অভিন্নতা স্থলে এক প্রকার বুদ্ধি। কিন্তু উভয় স্থলেই ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব অভ্রান্ত হউক না হউক, পাশ্চাত্যগণ যে প্রণালীতে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রাচীনশাস্ত্রের অভিন্নতা বিভিন্নতা দুইই দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ এক গুরুতর বিভেদ এই যে, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ব্যাপ্তিজ্ঞান পরমার্থনির্ণয়োদ্দেশে প্রয়োগ করিয়াছেন—পাশ্চাত্যগণ প্রধানতঃ শিল্পকর্ম্ম এবং বাণিজ্যাদিতেই ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রয়োগ করিয়াছেন। এই কারণ বশতঃ প্রাচীন অধ্যাপক মহাশয়েরা পাশ্চাত্য শাস্ত্রকে অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া তাচ্ছল্য করিয়া থাকেন। সত্য বটে অর্থকরীবিদ্যা পারমার্থিক বিষয়ে অনেক বিপত্তি ঘটায়। কিন্তু উহা হইতে একটি মঙ্গলসাধনও হইয়া থাকে। যে সকল শিল্পকার্য্য ও যন্ত্রাদির কৌশল হইতে দেশে দেশে অর্থকরী বিদ্যা ফলোপধায়ক হইয়া থাকে, সেই সকল কৌশল তত্তদ্দেশীয় লোকের মনে সহজে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করিয়া দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হয়। তন্তুবায় বস্ত্রবপনের কৌশল বুঝিতে পটু; পাশ্চাত্যগণ জলতোলা ও চাকা ঘুরাণের কৌশল লক্ষ্য করিতে তৎপর। যে প্রণালীতে হউক ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রয়োগ হইতে পারিলেই তদ্দ্বারা সংশয়ের স্থল লোপ পায়। ফলতঃ সাংসারিক কার্য্য মধ্যে পদে পদে যে তর্ক বিতর্ক করিতে হয়, তদ্দ্বারা মনুষ্যের যার-পর-নাই বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। আর কেবল গ্রন্থ ঘাঁটিতে ব্যাপৃত থাকিলে অনেক স্থলে দুর্ব্বুদ্ধিই আশ্রয় করে। অধ্যাপক মহাশয়েরা সম্ভবতঃ বলিবেন যে, সমস্ত বিষয়জ্ঞানই অবিদ্যামূলক, অতএব প্রাগুক্ত প্রণালীতে যদিও কোন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয়, তবে তাহা সংশয়াত্মিকা বুদ্ধিঅপেক্ষা বরং নিকৃষ্ট বলিতে হইবে। এই বিসম্বাদ অস্বীকার করা যায় না। যদি সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি পারমার্থিক বিষয়েও ব্যাপৃত হয়, আর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যদি তাহার বিপরীত বিষয় ব্যতীত আর কিছুতে নিবিষ্ট না হয়, তাদৃশ স্থলে শেষোক্ত বুদ্ধি অপেক্ষা প্রথমোক্ত বুদ্ধিকে শ্রেয়স্কর গণ্য করা অসঙ্গত নহে।

কিন্তু আরও একটি কথা আছে। শিল্পকর্ম্ম, বাণিজ্য এবং সমগ্র বিষয়কর্ম্মাদিতে যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সন্নিবেশিত হইতেছে, সেই বুদ্ধি যদি প্রাগুক্ত বিষয়াদির সংশ্রব সত্ত্বে পারমার্থিক বিষয়েও ব্যাপৃত হইতে পারে, তবে আর তাহার প্রতি তাদৃশ বিতৃষ্ণা থাকা উচিত হইবে না। বিষয়কর্ম্মব্যাপৃত বুদ্ধি স্বভাবতঃ পারমার্থিক ব্যাপার হইতে পৃথক্ থাকে, ইহাই তাহার মহৎ-দোষ। এমন কি, ঐ দোষ জন্যই তৎসংসৃষ্ট নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও অবজ্ঞার স্থল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির কোনও দোষ নাই।

তদ্দ্বারা যেরূপ কর্ম্মের উদয় হয়, সেই কর্ম্মদোষই বিষয়বুদ্ধিকে দূষিত করে। আর বিষয়কর্ম্মসংস্পৃষ্ট হইয়াও যদি ঐ বুদ্ধি পরমতত্ত্ব অনুধ্যানে প্রবর্ত্তিত হয়, তবে কে না তাহার সমাদর করিবে? অন্য কথা কি, এতাদৃশ বিষয়সংস্পৃষ্ট বুদ্ধি বরং সন্ন্যাস-সংস্পৃষ্ট নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইতেও আদরণীয় হইতে পারে। কেন না, কোন্ সন্ন্যাসী বলিতে পারেন যে আমি মোহান্ধ বিষয়ীর ন্যায় একাগ্রতা সহকারে পরমতত্ত্ব অনুধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছি? অতএব পাশ্চাত্য শিল্পাদি-কর্ম্মসংস্পৃষ্ট নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সহযোগে যে স্থলে পারমার্থিক বুদ্ধি অবধারিত হইয়াছে, তাদৃশ নিশ্চয় বুদ্ধির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ব্যাপ্তিগ্রহ বিষয়ে পাশ্চাত্য বুদ্ধির সহিত একতার প্রতি যেমন সমাদর করা বিধেয়; পাশ্চাত্য বিষয়কর্ম্ম ও শিল্পসংস্পৃষ্ট বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হইলে যেমন তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; সেইরূপ আবার ঐ বুদ্ধি যখন বৈষয়িক ও পারমার্থিক বিষয়ে যুগপৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা রূপ ধারণ করে, তখন তাহার প্রতি উপেক্ষা করা কোনও মতেই কর্ত্তব্য নহে।

এস্থলে একটি তথ্য ব্যক্ত করা আবশ্যক। আমি পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র হইতে যেরূপ প্রাচীন শাস্ত্রের উপকারী কথা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, অল্পাধিক চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইং ১৮৪৮ সালের অগ্রপশ্চাৎ সময়ে ডাং ব্যালান্-টাইন্ সাহেব সেইরূপ একটি চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার এত যত্নের গ্রন্থগুলি এখন প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। আমি কিছুতেই তাঁহার সমান নহি। না সংস্কৃত বিদ্যাতে, না পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে, না বুদ্ধি-মত্তাতে, না পদমর্য্যাদাতে, না উৎসাহ অধ্যবসায় আদিতে—কিছুতেই আমি তাঁহার সমান নহি। তিনি স্বীয় গ্রন্থ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন—আমার উৎসাহ সে পর্য্যন্তও পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। আমি গুরুতর কারণ বশতঃ কালহরণ করিবার মানসে এই প্রবন্ধ রচনা করিতেছি। সুতরাং যে কার্য্যে ব্যালান্টাইন সাহেব বিফলপ্রয়াস হইয়াছেন, তাহাতে আমার ফললাভের কোনও প্রত্যাশাই নাই। আমি এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিবার সময়ে ব্যালান্টাইন সাহেবের কৃত প্রাগুক্ত চেষ্টার কিছুই জানিতাম না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় প্রসারিত কামনাবিশিষ্ট হই নাই বলিয়া এখন তাঁহার দুর্গতি দেখিয়াও ক্লান্ত হই নাই। পরন্তু তাঁহার কথা ব্যক্ত করা

আবশ্যক। পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কনের আকাঙ্ক্ষী না হইলেও ব্যক্ত করিলাম, করিয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় চিত্তে নমস্কার করিলাম।

কেবল একবিষয়ে ব্যালান্টাইন অপেক্ষা আমার অধিকতর সাহস আছে। ব্যালান্টাইন্ খ্রীষ্টান ছিলেন। এবং খ্রীষ্টান ছিলেন বলিয়া দুইটি বিষয় দেখিতে পান নাই। এক, খ্রীষ্টধর্ম্মের তুলনায় সনাতন ধর্ম্মের যে যে স্থলে অধিকতর মাহাত্ম্য আছে এবং শেষোক্ত ধর্ম্মের মূলীভূত কথাতে যে গূঢ় মর্ম্ম আছে, তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। দ্বিতীয় বিষয়, তিনি পাশ্চাত্য খ্রীষ্টবিরোধী কোম্‌ৎ দর্শনের নাম করিয়াছেন অথচ তাহার মাহাত্ম্য সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করেন নাই। এতদ্বিষয়ে ব্যালান্টাইন্ সাহেব যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

(১) ব্যালান্টাইন্ সাহেব কোম্‌তের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কি পর্য্যন্ত কোম্‌তের মত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করেন নাই। বিশেষতঃ যে যে স্থলে কোম্‌ৎ অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিক অপেক্ষা বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার বিষয়ে ব্যালান্টাইন্ সাহেবের অভিপ্রায় জানিবার উপায় রহিত হইয়াছে।

(২) ব্যালান্টাইন্ সাহেবের গ্রন্থে সমগ্র পাশ্চাত্যদর্শনের সমন্বয় করিবার কল্পনা দেখা যায়। এতাদৃশ সমন্বয় কার্য্যে যে কএক জন পাশ্চাত্য দার্শনিক ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিকূল। বিশেষতঃ কোম্‌ৎ তাদৃশ সমন্বয় করণান্তে এক অভিনব ধর্ম্মসংস্থাপনেরও চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যালান্টাইন্ সাহেব কোম্‌ৎপ্রণীত সেই ধর্ম্মের কথা জনিতেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। সুতরাং তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি যে অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কিরূপে উক্ত শাস্ত্র সমূহের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

(৩) ব্যালান্টাইন্ সাহেব অনেক স্থলে প্রাচীন শাস্ত্রের সার্থকতা লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু আমার বিবেচনা এই যে কোম্‌তের মত অনুসারে তাদৃশ সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারিত।

অতএব প্রস্তাবিত অবস্থাতে দুইটি কথা স্থির হইতেছে। প্রাচীন ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রের সমন্বয় করিবার জন্য ব্যালান্টাইন্ সাহেবের কল্পনা অনুসারে সমগ্র

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য; আর সেই কল্পনাস্থলে কোম্‌তের সাহায্য গ্রহণ করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত সুবিধার স্থল।

প্রাচীন ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রের সমন্বয়করণার্থে সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক যে, কোন্ কোন্ পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের সহিত কোন্ কোন্ প্রাচীন গ্রন্থকারের ঐক্য আছে। অনৈক্যস্থল অনেক, অতএব ঐক্যের অনুসন্ধানই বিধেয়। অনন্তর প্রস্তাবিত ঐক্যস্থল ধরিয়া একদিকে সমগ্র পাশ্চাত্য, আর একদিকে সমগ্র প্রাচীনমতের মধ্যে তুলনা ও সমন্বয় করা আবশ্যক হইবে। এই কৌশল ব্যতীত এই দুই শাস্ত্রসমুদ্র সংযোজিত হইবার উপায়ান্তর নাই। এই উদ্দেশে কোম্‌তের মত প্রাচীনশাস্ত্রের পরম সহকারী।

আমি কোম্‌তের ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কোম্‌তের অযথা সপক্ষতা করিতেছি, এরূপ আশঙ্কা করিলে, আমার প্রতি অত্যাচার হইবে। কোম্‌ৎ ব্যতীত আর কোনও পাশ্চাত্য দার্শনিকের মত অনুসারে যে সনাতন ধর্ম্মের সম্যক্ সপক্ষতা করা যাইতে পারে, তাহা আমার জ্ঞানাতীত। নতুবা তাহার আলোচনা করাও সঙ্গত মনে করিতাম। বিশেষতঃ কোম্‌তের সাহায্য অবলম্বন দ্বারা যদি সনাতনধর্ম্মের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়, তবে অধ্যাপক মহাশয়দিগের নিকটে তাদৃশ ফলোপধায়িতাই উক্ত দার্শনিকের প্রশংসার স্থল বলিয়া গণ্য হইবে—ইহাতে অন্য প্রমাণের আবশ্যকতাই থাকিবে না।

প্রাগুক্ত বিধানে পাশ্চাত্যদর্শনের অনুশীলন করিতে হইলে, অগত্যা কোনও কোনও স্থলে, প্রাচীন মত পরিত্যাগও করিতে হইবে। এতৎপক্ষে দুইটি হেতু দিতেছি। প্রথমতঃ, কোনও কোনও প্রাচীন কথা পরিত্যাগ করিয়াও যদি পারমার্থিক বিষয়ে প্রাচীন মত অপেক্ষাকৃত প্রবলরূপে সপ্রমাণিত হয়, যদি এই পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করিলে সনাতন ধর্ম্মের যুক্তি সর্ব্ববাদিসম্মত করা যাইতে পারে এবং প্রাচীন ও পাশ্চাত্য মতের বিরোধ বিলুপ্ত বা খর্ব্বীকৃত হইতে পারে, তবে তাহা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, কোনও পাশ্চাত্য কথা যদি ন্যায়সম্মত হয়, যদি সত্যই তাহাতে প্রাচীন শাস্ত্রানুগত ব্যাপ্তিস্থির হইয়া থাকে, তবে তাদৃশ স্থলে, সনাতনধর্ম্মানুসারেও অভিনব পাশ্চাত্য কথা পরিত্যাগ করা অকর্ত্তব্য হইবে, এবং করিবার উপায়ও নাই।

আমি ব্যালান্‌টাইন্ সাহেবের কথা না পাইলে এত সাহসপূর্ব্বক কোম্-

তের অনুসরণ করিতে পারিতাম না। ভয় হইত যে, প্রাচীন ও পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে কোনও ঐক্য নাই—আমি কেবল কোম্‌তের পক্ষপাতী হইয়াই বৃথা ঐক্যের আড়ম্বর করিতেছি। কিন্তু ব্যালান্‌টাইন্ সাহেবের গ্রন্থ দেখিয়া জানিয়াছি যে, সত্যই ঐক্য আছে। আবার সনাতন ধর্ম্মের সহিত যেখানে ব্যালান্‌টাইন্ সাহেবের মতভেদ আছে, অথচ কোম্‌তের সাহায্যে তাঁহার পূর্ব্বপক্ষতার উত্তর দিতেও পারিয়াছি, এতাদৃশ স্থলে কোম্‌তের মাহাত্ম্য সকলেরই স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

এক স্থলে ব্যালান্‌টাইন্ সাহেব বলিয়াছেন, বারাণসী ধামের পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের তিন প্রকার বিভিন্ন মত—ইহার মধ্যে কোনও একটি সত্য হইলেও হইতে পারে—কিন্তু তোমরা তিনটিই বিশ্বাস কর কিসে? তাঁহারা উত্তর দিলেন যে, তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলে আর এ সকল ভেদজ্ঞান থাকিবে না। এই উত্তর সাহেবের মনঃপূত হয় নাই, এবং তন্নিমিত্ত তিনি হিন্দুগণের চিত্তবৈক্লব্য অবধারিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি অযথা পক্ষপাত না করিতেন, তবে সম্ভবতঃ প্রাগুক্ত মীমাংসার গুণবিশেষও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। কোম্‌ৎ বলেন যে, যে যুগে লোকের যেরূপ বুদ্ধি প্রবল হয়, সে যুগে তদনুসারেই ধর্ম্মতত্ত্ব স্থিরীকৃত হয়। এই প্রকারে যুগযুগান্তরে ধর্ম্ম বিষয়ে মতভেদ হইয়া থাকে। মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থাতে বাল্যকালের বুদ্ধি ও তদুপযোগী ধর্ম্ম থাকে, এবং পরিণত বয়সে আবার যথাযথরূপে নূতন মত প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু বাল্যকালের পরেই যৌবন এবং যৌবনের পরেই প্রৌঢ়ধর্ম্ম উদ্দীপিত হয়। উহার বিপরীতক্রম অর্থাৎ যৌবনের পরে বাল্যাবস্থা কি প্রৌঢ় নিঃশেষ হইয়া যৌবন ধর্ম্মের উদয়, এতাদৃশ বিপরীত গতি কথনই ঘটনা হয় না। বিশেষতঃ কোম্‌ৎ বলেন যে, ধর্ম্ম কেবল সমগ্র জ্ঞানের সামঞ্জস্যমূলক সর্ব্বৈকত্ব বিজ্ঞাপন করে। কোনও সময়ে মনুষ্যের বুদ্ধি যত দূর বিস্তার করে, ও এরূপে সকল বুদ্ধির সারসংগ্রহ স্বরূপ যে মূলতত্ত্ব অবলম্বন করে, সে সময়ের পক্ষে সেই মূলতত্ত্বই ধর্ম্মের উপাদান। অতএব বিভিন্ন দার্শনিকেরা স্ব স্ব বুদ্ধি বিবেচনা মতে যে স্বকীয় যুগের উপযোগী ধর্ম্মসংস্থাপনের চেষ্টা করিতে পারেন এবং তাহাতে যে যুগপরম্পরার মতভেদ

অকিঞ্চিৎকর হয়, একথা প্রাচীন ও পাশ্চাত্য উভয় প্রদেশেই প্রতীত হইয়াছে। কেবল মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা প্রত্যেকে মনে করেন আমাদের স্ব স্ব ধর্ম্ম একমাত্র সত্য, আর সকল ধর্ম্মই কাল্পনিক এবং ভ্রান্ত। মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত এক পক্ষের মতে বাইবেল, আর এক পক্ষের মতে কোরাণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই! ফলতঃ বাইবেল কোরাণের কলহঁ দ্বারাই এতাদৃশ মতের অসারতা প্রকাশ হইতেছে। আমাদিগের শাস্ত্রে বলে, "প্রত্যক্ষ্যাদি বিষয় বাহ্যবস্তুর অধীন নহে—তাহা 'করণ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিশেষের অধীন", (শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশের পত্র—হস্তলিপি)। এতদূর পর্য্যন্ত বৈদান্তিক মত স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিয়াও বলিতে পারা যায় যে, যুগধর্ম্মবিশেষ সম্বন্ধে সেই যুগের মনুষ্যগণ উল্লিখিত 'করণ' স্বরূপ বটে। মুসলমানদিগের অবস্থা অনুসারে তাহাদিগের বুদ্ধিতে কোরাণের মতই পরমতত্ত্ব বোধ হইয়াছিল। সেইরূপেই য়িহুদীরাও স্বজাতির মধ্যে মুসার মতকেই ঈশ্বরোক্তি মনে করিয়াছেন; আর খ্রীষ্টানেরাও আপনাদিগের সমকালীন বুদ্ধির অনুসরণপূর্ব্বক স্বকীয় মতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আসিতেছেন। এ কথা হিন্দুগণ অতি সহজেই বুঝিতে পারেন। সম্ভবতঃ ষড়্দর্শনের বাদবিতণ্ডা এবং বৈদান্তিক মতের প্রাদুর্ভাব হেতুই এতদ্দেশে এই সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রচার হইয়াছে। পাশ্চাত্যগণের কেহ কেহ absolute knowledge অনুসন্ধান করিতে এখনও ক্ষান্ত হন নাই; সুতরাং relativity of knowledge লইয়া অনেক অনেক বিচার চলিয়া থাকে। কোম্‌ৎ ইহার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের সংশয়মোচন করিয়াছেন; কিন্তু ব্যালান্‌টাইন্‌ নিজে খৃষ্টান বলিয়া, য়িহুদী, মুসলমানী ও হিন্দু মত বর্জ্জন করিতে কষ্ট বোধ করেন নাই। তিনি দর্শনশাস্ত্র ঘাঁটিতে বসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য ও প্রাচীন উভয় দর্শনের বিচারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তথাচ একবার ভাবনা করেন নাই যে, relativity-সংক্রান্ত নৈয়ায়িক বিধান মতে প্রত্যেক ধর্ম্মই যুগধর্ম্ম রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং দর্শনের ছয় প্রকার মতই যে স্থলবিশেষে অবলম্বিত হইতে পারে, এ কথা তাঁহার মনে কোনও মতে উদয় হইতে পারে নাই, এবং বারাণসীধামের পণ্ডিতগণকে হীনবুদ্ধি গণ্য করিতেও তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি ব্যালানটাইনের পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়, কিন্তু তাহার আলোচনা পৃথক্‌রূপে করিবার আবশ্যকতা নাই।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রয়োগার্থে সমগ্র বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক। কোম্‌ৎ এই প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক প্রথমতঃ সমাজ-বিজ্ঞানের ব্যাপ্তিগ্রহ করেন। পরে জাগতিক ও সামাজিক দ্বিবিধ বিজ্ঞানের সমন্বয় করিয়া প্রামাণিক ধর্ম্মের অবতারণা করেন। প্রাচীন শাস্ত্রে জাগতিক এবং মানবীয় বিষয় মধ্যে বিভেদ না থাকুক, উভয়ের বিচার একত্রে হইয়াছে। ব্যালানটাইন্ তাহা ভাঙ্গিয়া পাশ্চাত্য জাগতিক বিজ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক এক বিদ্যাচক্র রচনা করিয়াছিলেন। উপস্থিত কল্পে এতাদৃশ প্রসারিত বিচার নির্ব্বাহ করা অসাধ্য হইতেছে। প্রথমতঃ, আমার তাদৃশ বিদ্যাবল নাই। দ্বিতীয়তঃ, আমি, ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ লিখিতে বসি নাই। সুতরাং ব্যালানটাইন্ সাহেবের মত বিদ্যাচক্ররচনা কার্য্যে প্রবিষ্ট হইব না। সনাতন ধর্ম্মের পুনঃসংস্কার করা আবশ্যক এইরূপ ধারণা বশতঃ উহার গূঢ় যুক্তি প্রদর্শনার্থে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা করাই আমার সংকল্প। কেন না, ন্যায়শাস্ত্র দ্বারাই প্রাচীন ও পাশ্চাত্য মতের বিভেদশান্তি সম্ভাবিত হইতে পারে।

সে যাহা হউক, ব্যালানটাইন্ সাহেব একটি বিদ্যাচক্র রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে, এবং তাদৃশ বিদ্যাচক্রই কোম্‌ৎ-দর্শনেরও মূলভিত্তি। ব্যালানটাইন্ সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত দর্শনকার মহাশয়েরাও সর্ব্বপ্রকার বিদ্যাবুদ্ধির মূলীভূত কথা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের আদর্শ এবং তাঁহার বারাণসী কালেজের ছাত্রবর্গের উত্তেজনা এই দুই কারণেও ব্যালানটাইন্ সাহেব প্রাগুক্ত বিদ্যাচক্ররচনা কার্য্যে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে একটি তথ্য অভাবে কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে সংশয় থাকিয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে কয়েকজন বিদ্যাচক্ররচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে; এবং ব্যালানটাইন, কোম্‌তের সঙ্গে Whewell (হুএল) এবং Anrold (আর্ণল্‌ড) নামক দুইজন দার্শনিকের নাম করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যাচক্র সমন্বিত করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের চেষ্টা এক কোম্‌তের গ্রন্থেই

দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যে সময়ে ব্যালান্‌টাইন্‌ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, সময়ে কোম্‌তের ধর্ম্মরচনা তাঁহার নিকটে অর্থাৎ ভারতবর্ষ পর্যন্ত খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, তাহা জানিতে পারেন নাই। সুতরাং ব্যালান্‌টাইন্‌ সাহেব কোম্‌তের মত বুঝিয়া বিদ্যাচক্র রচনা ও ন্যায়-সাংখ্যাদির বিচার করিয়াছিলেন, কি স্বকীয় পাশ্চাত্য বিদ্যাজ্যোতিতে এতদ্দেশের প্রাচীন শাস্ত্র দেখিয়াই বিদ্যাচক্রের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ উভয় প্রদেশের মত অসম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াই পাশ্চাত্য বিদ্যাচক্রের নাম উল্লেখ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং এইরূপ করিয়াই প্রাচীন বিদ্যাচক্রের ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্যালান্‌টাইন্‌ বুঝুন না বুঝুন—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসা ও বেদান্ত আদি মতসংস্থাপনার্থে ঋষিগণ তাঁহাদিগের সমকালীন বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারেই যে সর্ব্বশাস্ত্র পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক তর্কশাস্ত্র স্থির করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে পরমতত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্যগণের মধ্যে কোম্‌ৎকে অথবা হুএলকে অবলম্বন না করিলে ব্যালান্‌টাইন্‌ প্রস্তাবিত বিচার নিষ্পন্ন করিতে পারিতেন না। এরূপ স্থলে সকলেই অগত্যা আপন আপন সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক তথ্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। কোম্‌ৎ যে পরমতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমসাময়িক বিজ্ঞানের অনুবর্ত্তী বটে। ব্যালান্‌টাইনের বুদ্ধির গতিও সেইরূপ ভিন্ন নহে। অতএব প্রাচীন দার্শনিকদিগের বৈজ্ঞানিক তথ্য কিরূপ থাকা সম্ভব, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, সনাতন ধর্ম্মানুগত পরমতত্ত্বও অপেক্ষাকৃত বিশদরূপে পরিজ্ঞাত হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি?

তর্কসংগ্রহকার অন্নভট্ট লিখিয়াছেন—

"২। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়াভাবসপ্তপদার্থাঃ। তত্র দ্রব্যাণি পৃথিব্যপ্‌তেজো বায়্বাকাশকালদিগাত্মমনাংসি নবৈব।" অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব—কেবল এই সাতপ্রকার পদার্থ আছে। তন্মধ্যে পৃথিবী, অপ্‌, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা এবং মন এই নয়টি দ্রব্য বলিয়া গণণীয়।

এতদ্ভিন্ন গুণ চব্বিশটি গণনা করিয়াছেন। তাহার নাম এই :—সংখ্যা,

পরিমাণ, গুরুত্ব, স্পর্শ, রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, দ্রবত্ব, স্নেহ, ইচ্ছা, বুদ্ধি, প্রযত্ন, দ্বেষ, সংস্কার, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও পৃথক্।

উল্লিখিত চব্বিশটি গুণ শাস্ত্রোক্ত ক্রম অন্যথাপূর্ব্বক লিখিলাম। ইহাতে পাশ্চাত্যদর্শনের সহিত তুলনা করা সহজ হইবে।

সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক গুণ. এই জন্য সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করিলাম। আর দিক্ ও কর্ম্ম (অর্থাৎ গতি) নামক দ্রব্য দুইটি লক্ষ্য করিলে, পরিমাণ গুণ সংখ্যার সন্নিহিত বোধ হইবে। দিক্ ও গতির সহিত যেমন পরিমাণের সমন্বয় করা গেল, গুরুত্ব রূপ ও শব্দের সহিতও সেইরূপ দিক্ ও গতির কর্ম্মের সমন্বয় হইতে পারে। আর এই প্রণালী-মতে বেগ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার এই স্থানে গণ্য করা৹ বিহিত বটে। কিন্তু তাহা করি নাই, দ্বেষ ও কয়টি গুণের পরে 'সংস্কার' লিখিলাম। কেন না, রূপরসাদি গুণ পার্থিব দ্রব্যের অন্তর্গত স্থূলবস্তু নামক বিভাগের সহিত সমন্বিত হয়। উহারা সংখ্যা অপেক্ষা অল্পদেশ-ব্যাপী গুণ এবং পঞ্চভূতের সহিত সমবায়ের উপযুক্ত। দ্রবত্ব ও স্নেহ মধ্যে যে কি বিভেদ আছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। দ্রবত্বের সহিত আবার বায়ব্যত্ব ও ঘনত্ব একত্র না করিলে উক্ত গুণের ক্রম সম্পূর্ণ হয় না, ইহা পাশ্চাত্য রসায়নে ব্যক্ত হইয়াছে। কেবল ব্যক্ত নহে, এতদ্বিষয়ে ব্যাপ্তিস্থির হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য মত অবলম্বনপূর্ব্বক দ্রবত্ব, বায়ব্যত্ব ও জড়ত্ব এই গুণত্রয় একত্র করিলে, তাহা পরমাণুসংসৃষ্ট প্রতিপন্ন হইবে, অর্থাৎ ঐ গুণত্রয়কে নয় প্রকার পার্থিব দ্রব্যের সহিত সংযোজনা করা দুষ্কর হইবে। পক্ষান্তরে দ্রবত্বের সঙ্গে জড়ত্ব গুণ গণনা করিলে, অগত্যা তাহার বিপরীত জীবত্ব গুণের প্রতিও লক্ষ্য করিতে হইবে। আর জড়ত্ব ও জীবত্ব গুণ সম্বন্ধে অগত্যা বলিতে হইবে যে, হয় উহা প্রাচীন শাস্ত্রে পরিগণিত হয় নাই, নয় জীবত্ব গুণকে আত্মা নামক দ্রব্যের সহিত একত্রিত করিতে হইবে। অর্থাৎ উদ্ভিদ দ্রব্যের আত্মা ও প্রাণীরূপ দ্রব্যের আত্মা ও মন আছে, এই গুরুতর কথা সহসা স্বীকারপূর্ব্বক বলিতে হইবে যে, জীবত্বই, আত্মা ও মন নামক দ্রব্যের অঙ্গ। যাহাতে জীবত্ব নাই, তাহাই পার্থিব বা জড়দ্রব্য। ইচ্ছা, বুদ্ধি ও প্রযত্ন এ তিনটি আধ্যাত্মিক গুণ। দ্বেষ, ইচ্ছাবিশেষ বলিয়াই মনে হয়; এবং

ভাবনা-সংস্কার, ইচ্ছা বুদ্ধি প্রযত্নেরই অঙ্গ বলিতে হইবে। এই সকল কারণে শাস্ত্রকারের নামকরণ অবলম্বন করিয়া কেবল ক্রমান্বয় পরিবর্ত্তন করিলাম। সুখ ও দুঃখ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম,-এই দুইটি যুগল গুণ পরস্পর সমবায়ের যোগ্য। বিশেষতঃ উহা কেবল নররূপ জীবেরই সংস্পৃষ্ট। অপর কি, উহা পরমতত্ত্বের অঙ্গ কি না, তাহাতে মতভেদ হইতে পারে। মনুষ্য, ভিন্ন জীবের সুখ দুঃখ কি ধর্ম্মাধর্ম্ম অতীব দুজ্ঞেয়। সংযোগ ও বিভাগ, পরত্ব অপরত্ব ও পৃথক্ এগুলি কেবল সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের অঙ্গ স্বরূপ—ভিন্ন নহে। আর সামান্য, বিশেষ ও সমবায় কেবল প্রমাণ প্রমেয় আদি নির্ণয়ার্থে মনুষ্য কর্ত্তৃক লক্ষিত হয়; উহা মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরিশেষে বক্তব্য যে, গুণ ও কর্ম্ম মধ্যে একমাত্র স্থিতি ও গতি বিষয়ক বিভেদ ধার্য্য করা যাইতে পারে; আর দিক্, কাল, স্থিতি ও গতি এগুলি সমবায়ী আকারে দ্রব্য ও কর্ম্মের সহিত সমন্বিত হইতে পারে।

উল্লিখিত প্রণালীতে গুণসমগ্রের ক্রম লক্ষ্য করিলে অর্থাৎ এতদ্বিষয়ে অত্যল্প মাত্র পাশ্চাত্যদর্শন অবলম্বন করিলেও দ্রব্য ও কর্ম্ম, বিষয় ও বিষয়ী এই দুইটি যুগল বা দ্বৈত পদার্থ নির্দ্ধারিত হইতে পারে। বিষয়ী, ধর্ম্ম এবং সুখ এই দুই বিভিন্ন পদার্থের আশায় আকৃষ্ট হয়েন, এবং আকৃষ্ট হইলে মোহ-হেতু কখনও অধর্ম্ম, কখনও বা অসুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়কে দ্রব্য ও কর্ম্মরূপে লক্ষ্য করিলে, সপ্তপদার্থের স্থলে দ্রব্য, কর্ম্ম ও বিষয়ী—এই তিনটি মাত্র পদার্থ গণ্য করা যাইতে পারে। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, বিষয়ী দ্রব্য ও কর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত আছেন ও এইরূপে "সোঽহং" জ্ঞান দ্বারা ধর্ম্ম ও সুখের সমবায় সমাধান করিতে সক্ষম হন। ইহাই পাশ্চাত্য দর্শনের সার কথা। অভাব বা বৈপরীত্য পরমাত্মার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র বিচরণ করে। কিন্তু সংকল্প করিয়া বৈপরীত্য বা অভাবের অনুসরণ করিলে নিশ্চয়ই বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হয়। সত্তা বিষয়ে ভাবনা ব্যতীত অভাব কি শূন্যতা বিমোচনের উপায়ান্তর নাই।

ব্যালান্টাইন্ সাহেব অন্নভট্টের তর্কসংগ্রহ ইংরাজী টীকা ও অনুবাদ সমেত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে উপরিলিখিত বিচারের কোন সূচনা দৃষ্ট হয় না। কেবল নৈয়ায়িকের "পদার্থ" এবং আরিস্ততলের "category"

ইত্যাদির সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার অভিপ্রায় এই যে, ব্যাল্যান্টাইন্ সাহেব ইহার পরিবর্ত্তে যদি সাংখ্য ও বেদান্ত মতের সহিত সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে, মতত্রয় উপলব্ধি করিবার সুগম হইত, এবং সাহেবের বাদানুবাদ শুনিয়া আমাদিগের, এমন কি এতদ্দেশীয় অধ্যাপক সম্প্রদায়ের, মতিস্থির করিবার অভিনব উপায় হইত।

নৈয়ায়িকেরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে পঞ্চগুণ বলিয়াছেন। সাংখ্য সেই গুলিকে পঞ্চতন্মাত্র বলেন। সাংখ্য পঞ্চতন্মাত্র লক্ষ্য করিয়া সেই সঙ্গে পঞ্চভূত ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় গণনা করিয়াছেন। মনে কর, "রূপ" শব্দ দ্বারা যে বিষয় ব্যক্ত করা যায়, তাহার যেন একটি পৃথক্ অস্তিত্ব আছে। রূপ চক্ষু দ্বারা জানা যায় এবং যে বাহ্যবস্তুর রূপ দেখি, সেই বস্তু পঞ্চভূতের মধ্যেও একটি বটে। রূপের আধার যে ভূত, আর রূপের পরিচায়ক যে চক্ষুরিন্দ্রিয়, এতদ্দ্বয় হইতে বিভিন্ন এবং তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যদি কোন বিষয় থাকে, তাহাকে সাংখ্য রূপ-তন্মাত্র বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু নৈয়ায়িক পঞ্চভূতকে দ্রব্যের মধ্যেই স্থাপন করিয়াছেন, এবং চক্ষু কর্ণ নাসা রসনা ও ত্বক্ এই ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্য এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। উল্লিখিত তর্কশৃঙ্খলা তুলনা করিলে ইহাও মনে হয় যে, নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরকে আত্মার সহিত সমন্বিত করিয়াছেন; সাংখ্য মতাবলম্বীরা ঈশ্বরকে অসিদ্ধ করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই মাত্র তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন; এবং বৈদান্তিকেরা এক অদ্বৈত পরমাত্মা স্বীকারপূর্ব্বক আর সমস্তই অবিদ্যা রূপ অভাবের অন্তর্গত বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। কেবল তাহা নহে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধেরা আবার বিপরীত পথ অনুসরণপূর্ব্বক সত্ত্বার পরিবর্ত্তে অভাব এবং পরমাত্মার পরিবর্ত্তে শূন্যতাকে প্রকৃষ্ট পদে "তত্ত্ব" বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। আর কর্ম্ম স্থলেও মুক্তির বিকল্পে নির্ব্বাণ পদকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

এই সকল তত্ত্বনির্ণয়ের সহিত বিদ্যাচক্রের গূঢ় সম্বন্ধ আছে। কেন না, সমগ্র বিদ্যাচক্র পর্য্যটন করিয়া যে বুদ্ধিস্থির করিতে পারা যায়, প্রথম সূত্রে শিক্ষকের নিকট হইতে সেই বুদ্ধি অবলম্বন করিলে, সেই বুদ্ধি অনুসারে আবার সমগ্র বিদ্যাচক্র পর্য্যালোচনা করাও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, এবং তাদৃশ

মূলীভূত বুদ্ধি অপূর্ব্ব স্থায়িত্ব লাভ করে। এমন কি যে তৎসহকারে মনুষ্যের মতি গতি বিচলিত হইবার সম্ভাবনাও যার-পর-নাই খর্ব্ব হইয়া যায়। কোম্‌ৎ যে বিদ্যাচক্র পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনিও এই প্রকার একটি পরমতত্ত্ব অবধারিত করিয়াছেন। কোম্‌ৎ-কৃত উক্ত পরমতত্ত্বের সহিত কোন তুলনা করা এক্ষণকার অভিপ্রেত নহে। কেবল সাংখ্য বৈদান্তিকদের অভীষ্ট বুঝিবার জন্যই তাহার উল্লেখ করিলাম। স্থূল কথা এই যে, ব্যালান্‌টাইন্ সাহেব যদি কোম্‌তের তত্ত্ব-নির্ণয়-কৌশল ও সাংখ্য নৈয়ায়িক আদির তত্ত্ব-বিবেক মধ্যে যথাযোগ্য তুলনা করিতেন, তবে বুঝিতে পারিতেন যে, বিদ্যাচক্র যেরূপে গঠিত হউক, তাহার সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের গূঢ় সম্বন্ধ আছে। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মূলীভূত দোষ বশতঃ পাশ্চাত্যগণমধ্যে অনেক স্থলেই তাদৃশ নিগূঢ় সম্বন্ধ উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং খ্রীষ্টীয় মত অনুসারে ঈশ্বরতত্ত্ব ও বস্তুতত্ত্বমধ্যে নৈয়ায়িক বিচারের কোনও স্থল নাই! ফলতঃ এই সকল দোষের অপনয়নের চেষ্টা বশতই কোম্‌ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা আবার অভিনব মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ব্যালান্‌টাইন্ সাহেব জলকে দ্রব্য নামক পদার্থ মধ্যে পরিগণিত দেখিয়াই পাশ্চাত্য রাসায়ন শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, জল দুই প্রকার বায়ুর রাসায়নিক সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি এই তথ্যসংস্পৃষ্ট অন্যান্য গুরুতর কথাগুলি কিছুমাত্রও লক্ষ্য করেন নাই। অন্নভট্টের ন্যায়বচনমতে সংযোগ এক প্রকার গুণ। কিন্তু রাসায়নিক সংযোগ এবং নৈয়ায়িক সংযোগ মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই কি? আর রাসায়ন শাস্ত্র এবং পদার্থবিজ্ঞান (Physics) মধ্যেই বা কেন বিভেদ করা যায়? অথচ পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে রাসায়ন শাস্ত্রের বহিঃস্থ যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা যায়, তাহাদের মধ্যে কোন সমবায় নির্ণয় হইতে পারে কি না? জল নামক দ্রব্য এবং দ্রবত্ব গুণ পরস্পর সংস্পৃষ্ট কি না? জলীয় দ্রব্য ও দ্রবত্ব মধ্যে যে নৈয়ায়িক সংযোগ আছে, আর জলের অন্তর্গত দ্বিবিধ বায়ুর যে রাসায়নিক সংযোগ আছে, এই দ্বিবিধ সংযোগের তুলনা না করিলে কোনও মতেই প্রাচীন শাস্ত্র বোধগম্য হইতে পারে না। ব্যালান্‌টাইন্ সাহেব এসকল কথার প্রতি কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করেন নাই।

আর কোম্‌ৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ বিচার করিয়াছেন। তাহাতেই আমি এইকথা বলিতেছি যে, অধ্যাপক মহাশয়েরাও প্রস্তাবিত তুলনা করিলে ভাল হয়।

ব্যালান্‌টাইন্ সাহেবকৃত বিচার হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত কোম্‌তের মত ও প্রাচীন দার্শনিক মতের তুলনা করিলে ভাল হয়। এ বিষয়ে যাহা বলিলাম, তাহা বুঝিবার জন্য কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা করিতে হইতেছে। কেন না, স্থানান্তরে পর্য্যালোচনার সুবিধা হইবে না। কোম্‌ৎ বলেন যে, রাসায়ন শাস্ত্র দ্বারা দ্রব্যের দ্রবত্ব, ঘনত্ব ও বায়বত্ব রূপ ত্রিবিধ অবস্থা প্রকাশ হয়, এবং প্রতি অবস্থাতেই পরমাণু-গত সংযোগ বা তদনুরূপ কোন সূক্ষ্ম সংযোগই ঐ রাসায়নিক সংযোগ বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ রাসায়ন শাস্ত্রে কেবল সেই সংযোগ বিভাগেরই আলোচনা করা যায়। তিনি পরমাণুর বিষয়ে অনেক সূক্ষ্ম তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহার প্রতি সম্যক্ লক্ষ্য না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, প্রাগুক্ত রাসায়নিক সংযোগ বিভাগ কেবল দ্রব্যের পরমাণুগত সম্বন্ধ মাত্র। কিন্তু দ্রব্যের রাশীকৃত অবস্থাতে আর কতকগুলি গুণের আলোচনা হইয়া থাকে, তাহা (Physics) পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত বটে এবং রসায়ন শাস্ত্রের বহিঃস্থিত। রাশীকৃত পদার্থের ধর্ম্মগুলি নানা প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে এবং তাহার সুশৃঙ্খলা করা সহজ নহে। কোম্‌তের বিচার মতে আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারাই পদার্থের রাশীকৃত অবস্থা উপলব্ধ হয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় অনুসারেই পদার্থবিজ্ঞানের অবান্তরবিভাগ নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অবস্থানুসারে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়েও কোনও কোনও নূতন মতের অবতারণা করেন। এই প্রণালীতে গুরুত্ববিজ্ঞান, তাপ অর্থাৎ স্পর্শগুণসংসৃষ্ট বিজ্ঞান, দৃষ্টি বা রূপবিজ্ঞান, শ্রোত্র বা শব্দবিজ্ঞান * এবং তাড়িত বিজ্ঞান—এগুলি

* পাঠক সম্ভবতঃ রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়সংসৃষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ে সংশয়ারূঢ় হইবেন। এতদ্বিষয়ে কোম্‌তের মত এই যে, পদার্থবিজ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে রসনা ও নাসিকালব্ধ জ্ঞানও সুশৃঙ্খলিত হইবে। এই বিচার মতে সাতটি অবান্তর শাস্ত্রের তালিকা এইরূপ হইবে। ১ গুরুত্ববিজ্ঞান, ২ রসনাবিজ্ঞান, ৩ তাপবিজ্ঞান, ৪ ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, ৫ দৃষ্টিবিজ্ঞান, ৬ শ্রোত্রবিজ্ঞান, ৭ তাড়িতবিজ্ঞান। প্রাচীন শাস্ত্রে তেজ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে তাড়িতের আলোচনা নাই। কিন্তু তাড়িতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না; তজ্জন্য এই ঘটিয়াছে যে স্পর্শস্থলে, গুরুত্ববোধক ইন্দ্রিয়, শীতোষ্ণ বা তাপবোধক ইন্দ্রিয় এবং তাড়িত-বোধক ইন্দ্রিয় বলিয়া তিনটি অভিনব বা অবান্তর ইন্দ্রিয়ের গণনা করিতে হইয়াছে।

সমস্তই পদার্থবিজ্ঞানের অবান্তরবিভাগ হইয়াছে; অথচ এই শ্রেণীবিভাগ কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়ভেদের অনুরোধে নিষ্পন্ন হইতেছে। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়-নিচয়ের আলোচনা আবার আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয় অঙ্গেই জীব-বিজ্ঞানের অন্তর্গত শারীরবিজ্ঞানের বিচার্য্য বিষয় হইতেছে। অর্থাৎ প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা যেখানে নব দ্রব্যের মধ্যে পঞ্চভূতরূপ পাঁচটি দ্রব্য ও চতুর্ব্বিংশ গুণের মধ্যে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ গুরুত্ব দ্রবত্ব ও স্নেহত্ব রূপ আটটি গুণ অবধারিত করিয়াছেন, কোম্‌ৎ তাহারই পরিবর্ত্তে এক অংশে গুরুত্ব আদি সাত প্রকার ইন্দ্রিয়, সাত প্রকার ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান এবং পদার্থ-রাশিসংক্রান্ত সাত প্রকার অবান্তর বিজ্ঞান অবধারিত করিয়াছেন।

পরন্তু এইরূপ বিভাগের এক গূঢ় সার্থকতা এই যে, এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চব্বিশটি গুণের মধ্যে একদিকে সংখ্যা ও পরিমাণের সমন্বয়, অন্যত্র বুদ্ধি ও সংস্কার অথবা প্রযত্ন ও সংস্কারের সমন্বয়, ইচ্ছা ও দ্বেষের সমন্বয়, ইচ্ছা বুদ্ধি ও প্রযত্নের সমন্বয়, আবার কোথাও বা সংযোগ বিভাগ, পৃথকত্ব পরত্ব ও অপরত্বের এবং সামান্য বিশেষ ও সমকালের সমন্বয়; কোথাও স্থিতি গতি ও দিকের সমন্বয়, কোথাও সত্বা ও কালক্রমের সমন্বয় এবং কোথাও বা সুখদুঃখ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হইয়াছে। পরিশেষে বিদ্যাচক্র ও বুদ্ধি-বৃত্তির সমন্বয়; মনোবিজ্ঞান ও বহির্জগতের সমন্বয় এবং জগৎ ও মানবের সমন্বয় সমাধান হইয়াছে। এবং এরূপ সমন্বয় দ্বারা পরম তত্ত্বের বিচার বিদ্যাচক্রে, এমন কি, সংশয়বিহীন গণিতশাস্ত্রের উপরে সংস্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

এই নিমিত্ত বলিয়াছি যে, কোম্‌তের মত অনুসারেই প্রাচীন দার্শনিক-দিগের অভিসন্ধি ইদানীন্তন বিষয়ী লোকদিগের বুদ্ধিগোচর হইবে। আর ব্যালান্‌টাইন্‌ সাহেব এইরূপ বিচারের কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে না পরুন, তিনিই যে ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং তিনি সেই জন্যই চিরকাল প্রাচীন মতাবলম্বী অধ্যাপকবর্গের নমস্য হইবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ

"অন্যৎ শ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি, হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়োবৃণীতে ॥'

হীরক যে অত স্বচ্ছ, তবু তাহা কিছু না কিছু আলোক সংরুদ্ধ করে। এই যে আমাদের দেশে ইংরাজিবিদ্যার বিমলজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছে, ইহাতে আমাদের প্রেয়ঃপথ পরিষ্কৃত হইলেও শ্রেয়ঃপথ যে অল্পে অল্পে রুদ্ধ হইতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বপ্নেও মনে করা উচিত নহে যে, ইংরাজি শিক্ষার দ্বারা আমাদের কিছু না কিছু অপকার সাধিত হইতেছে না। অল্প অভিনিবেশ সহকারে অন্তর্দৃষ্টি পরিচালন করিলেই দেখিতে পাইবেন, ইংরাজি শিক্ষার প্রাদুর্ভাব হওয়া অবধি এদেশে গার্হস্থ্যপদ্ধতির হীনতা, স্বাস্থ্যহানির প্রাবল্য, শৌচাচারের বিলোপ, জাতীয় গৌরবের হ্রাস ও পরানু-করণপ্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃদ্ধির শেষ সীমায় যে কি ফল ফলিবে, তাহা বিচক্ষণ ও ধীরপ্রকৃতি ব্যতীত অন্যের অনমুমেয়।

গার্হস্থ্য পদ্ধতির হানি অর্থাৎ বিশৃঙ্খলতা আজ্ কাল প্রায় প্রত্যেক পরি-বারে প্রবেশ করিয়াছে। কোনও পরিবারকে সম্পূর্ণ একতায় কালযাপন করিতে দেখা যায় না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সকলেই স্বসুখান্বেষী। (স্বসুখান্বেষী শব্দের পরিবর্ত্তে আত্মম্ভরি শব্দের প্রয়োগ করিলেও দোষ হয় না)। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, আজ কাল কেহ কাহাকে সুখের অংশীদার করিতে ইচ্ছুক নহেন। পুত্র হাইকোর্টের উকীল ও ধনী; কিন্তু পিতা—নান্নং ন বস্ত্রং ন চ বারিপাত্রম্। যিনি পাঁচ টাকা বেতনে বিদেশে চাকুরী করেন, তিনিও বলেন, "দেশে গিয়া কি হইবে? দেশ বড় খারাপ।" এ সকল ভাল কি মন্দ, সে বিচার পরে হইবে; ফল, যাহা বা যে বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে, তাহারই দুই একটা উদাহরণ কথা বলিলাম।

স্বাস্থ্যহানির প্রাবল্য, উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই। ইচ্ছা করিলে, সকলেই নিজ নিজ দেহে গেহে ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখিতে

পাইবেন। এত অকালমরণ এত অকালবার্দ্ধক্য, এত রকমের রোগ, এদেশে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে ছিল না। কে কবে দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে, দশবৎসরের বালকে চোক্ে চশমা দেয়? * * * সংবাদপত্রে ঔষধের বিজ্ঞাপন ও ডাক্তারগণের আয় এ দেশের স্বাস্থ্যাবনতির সাক্ষ্য দিতে সমর্থ। এ দশা কেন ঘটিতেছে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর, 'প্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ' প্রস্তাবের অঙ্গ নহে। যে জলবায়ু শত শত বৎসরেও খারাপ হয় নাই—আজ তাহা সহসা খারাপ হইল—ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! আমরা নাচ্‌তে জানি না, না উঠন্ খারাপ, তাহা আজিও বুঝিতে পারি নাই। সময়ে সময়ে মনে হয়, জলবায়ু যা তাই আছে, আমরাই খারাপ হইয়াছি।

শৌচাচার-পরিত্যাগ হইতেছে কি না, তাহা নিজ নিজ আচার পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইংরাজ এমনই সংক্রামক বায়ু যে, তাঁহাদের একজন একবার যে দেশ গিয়াছেন, সে দেশ তাঁহাদের বাতাসে স্বকীয় আচারচ্যুত হইয়া ইংরাজ আচারে আক্রান্ত হইয়াছে। যিনি ইংরাজী পড়েন নাই, ইংরাজী শিক্ষা পান নাই, হাওয়ার গুণে তাঁহারও শৌচাচার ত্যাগে রুচি, শৌচাচারে অরুচি।

ধন্য য়িহুদী জাতি! তোমাদের দশা আমাদের অপেক্ষাও হীন, তথাপি তোমরা ধন্য! আমরা ত এখনও পর্য্যন্ত নিজের দেশে আছি, এখনও আমরা 'আমাদের নিজের জাতি' বলিয়া অভিমান করিতে পারিতেছি, কিন্তু তোমাদের নিজের দেশও নাই, নিজের জাতিও নাই। তোমরা পৃথিবীর সর্ব্বদেশে নানাজাতীয়দিগের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া আছ। অথচ এত দুরবস্থাতেও তোমরা তোমাদের চিরন্তনী আচারপ্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছ! তোমরা যে দেশেই থাক না কেন, প্রোক্ত গুণেই অর্থাৎ আচারসংরক্ষণগুণেই তোমরা তদ্দেশবাসীদিগের অপেক্ষা সুস্থকায় থাক, এবং আচারসংরক্ষণগুণেই তোমরা দীর্ঘায়ু ও ধনী হইতে পারিতেছ।

আচারপদ্ধতি লইয়া অনেক সময়ে অনেক প্রকার তর্ক হইতে শুনা যায়, এবং ইংরাজ পণ্ডিতের অভিমতি অনুসারে তাহার সিদ্ধান্ত করাও হয়। সিদ্ধান্ত করিতে গেলে দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয়, সে প্রয়োজনও ইংরাজানুষ্ঠিত

আচারের দ্বারা সিদ্ধ করা হয়। ইংরাজদিগের আচারপদ্ধতি যে তাঁহাদের ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত হইয়া নাই, আমাদের আচারপদ্ধতি যে আমাদের ধর্ম্মের সহিত দৃঢ়সংযুক্ত; আমাদের দেশের ভৌতিক-প্রকৃতি ও শারীর-প্রকৃতি যে ইংরাজদিগের দেশের ভৌতিক-প্রকৃতি ও শারীর-প্রকৃতি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, সিদ্ধান্তকালে সে সকলের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করা হয় না। বিদ্যমান কালের একজন কৃতবিদ্য মহামান্য বহুদর্শী বিচক্ষণ ও খ্যাতনামা পুরুষ এই বিষয়ে একটি কথোপকথন প্রকাশ করিয়াছেন; তাহা এইরূপ—

ক। "আমরা ধর্ম্মের বড় বড় কথা লইয়া বাদানুবাদ করি, কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট যে আচার-পদ্ধতি—তাহার গুণাগুণ লক্ষ্য করি না। এটি আমাদের দোষ।

খ। আচার-পদ্ধতির আবার বিচার কি? ও সকল কেবল যাজক সম্প্রদায়ের মনঃকল্পিত।

ক। আচার-শাস্ত্র যাজক সম্প্রদায়ের মনঃকল্পিত বস্তু, তাহা আমার বোধ হয় না। প্রকৃতির সম্যক্ পর্য্যালোচনার দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়মজ্ঞানিবর্গের বোধগম্য হয়, আচার-শাস্ত্রে তাহাই নিবদ্ধ হইয়াছে। আচার-পদ্ধতি সাক্ষাৎ প্রকৃতির আদেশ।

খ। প্রকৃতির আদেশ জানিবার জন্য কি কোন শাস্ত্রপদ্ধতির প্রয়োজন আছে? প্রকৃতির আদেশ প্রকৃতির সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান। পশুরা অর্থাৎ গো মহিষ প্রভৃতি কোথায় আচার-শাস্ত্র পায়?

ক। সেই জন্যই পশুপক্ষ্যাদির মধ্যে বিধ্বংসের প্রাকৃতিক নিয়মটি অতি বলবদ্রূপে কার্য্যকরী। এ পর্য্যন্ত কত প্রকার পশুপক্ষ্যাদি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। আর মানুষ সেই আদিকালে প্রাদুর্ভূত হইবার পর ক্রমশঃই সংখ্যায়, বলবত্তায় ও বুদ্ধিমত্তায় বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়াছে! পশুপক্ষ্যাদি পৃথিবীর দেশবিশেষে ও কালবিশেষে অবস্থিতি করিতে পারে, কিন্তু মানুষ সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বসময়ে থাকিতে সমর্থ। ইহার কারণ, মানুষ দেশভেদে ও কালভেদে আপনার আচর্ত্তব্য বিষয় ভিন্ন ও উপযুক্ত করিয়া লইতে পারে—পশুপক্ষ্যাদি তাহা পারে না।

খ। তবে কি মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম যথেষ্ট নয়?

ক। মানুষের পক্ষে মনুষ্যপ্রকৃতির যে নিয়ম—তাহাই যথেষ্ট; পশুপ্রকৃতির নিয়ম মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

খ। মনুষ্যপ্রকৃতি কি অশনবসনাদি ব্যাপারে পশুপ্রকৃতি হইতে ভিন্ন?

ক। ভিন্ন বৈ কি? মনুষ্যের প্রকৃতিতে পরিণামদর্শিতার নিয়ম অত্যন্ত প্রবল। মনুষ্যের প্রকৃতিতে ভাবি-সুখেচ্ছা অতীব বলবতী। মানুষের প্রকৃতিতে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের জ্ঞান অতি দূরসীমা অতিক্রম করিয়া চলে। বাক্‌শক্তি ও তৎপ্রভব ভাষাবিশেষ থাকাতেও তাহাদের একজন আর একজনকে নিজ অভিজ্ঞতা দান করিতে সমর্থ। এই সকল কারণে মানবপ্রকৃতি পাশব-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তুমিও প্রকৃতির অনুসরণ করিতে বল, আমিও তাহাই বলি; তবে মনুষ্যের পক্ষে বলিতে গেলে, মনুষ্যকে মনুষ্যপ্রকৃতিরই অনুসরণ করিতে বলিতে হইবে। প্রজ্ঞাবান্ শাস্ত্রকারেরাও বোধ হয় সেই জন্য অর্থাৎ মনুষ্যকে পরিণামদর্শিনী মনুষ্যপ্রকৃতির অনুগামী করাইবার জন্য, আচারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যপ্রকৃতির অনুসরণ করিতে গেলেই পরিণামদর্শিতার ও অভিজ্ঞতার আদর করিতে হইবে। যখন যেটি ভাল লাগিবে তখনই সেইটি করিবে, এরূপ করিতে গেলে চলিবে না। তাহাতে অনেকটা প্রাকৃতিক আদেশ উল্লঙ্ঘিত হইবে। সে উল্লঙ্ঘনের ফল নিকটে না থাকিলেও দূরে থাকিতে পারে।

আমাদিগের দেশের জলবায়ু বা ভৌতিক-প্রকৃতি এরূপ যে, এখানে এমন কতকগুলি রোগ হয়, যাহা ইয়ুরোপে হয় না—ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে সে সকলের নাম পর্য্যন্তও নাই। আবার এখানে এমন কএকটি আচারের ও ব্রতের বিধান আছে—যাহার অনুষ্ঠানে সেই সকল রোগের দোষ বৃদ্ধি হইতে পারে না। সেগুলি আমাদিগেরই শাস্ত্রকারগণের নির্দ্দিষ্ট। সে গুলি পালন করা কি অবশ্যকর্ত্তব্য নহে? ব্রত করিতে গেলেই উপবাসাদির ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। সেরূপ ক্লেশস্বীকার অবশ্যই পশুপ্রকৃতির বিরুদ্ধ।* ফল কথা

* পশুরা যাহা করে, তাহা করিতে গেলেও অনেক বিষয়ে আমাদিগের ইচ্ছাকে সঙ্কোচ করিতে হয়। অনেক পশু ঋতু ব্যতীত স্ত্রীপুংধর্ম্মে সংসক্ত হয় না। উপরে যে উপবাসের কথা বলিলাম, তাহাও কোনও কোনও পশু তিথিবিশেষে করিয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া

এই যে, প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ সমফলপ্রদ নহে। চিরকালই ঐ দুএর প্রভেদ (শ্রেয়ের ও প্রেয়ের) নির্দ্দিষ্ট আছে।”

“অন্যৎ শ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি, হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥”

[কঠোপনিষৎ]

শ্রেয় এক জিনিস, প্রেয় অন্য জিনিস। যাহা আপাতমধুর, যাহাতে কোনও কষ্ট নাই অথচ সুখসম্বন্ধ আছে, তাহা প্রেয়ো নামে খ্যাত। ক্লেশসংস্রব থাকুক বা না থাকুক, যাহা পরিণাম-হিত, তাহা শ্রেয়ো নামের অভিধেয়। ঐ দুই পদার্থ, পুরুষকে সর্ব্বদাই বিভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছে। তন্মধ্যে যে পুরুষ শ্রেয়ের বিষয় গ্রহণ করে, পরিণামে তাহারই মঙ্গল হয়। আর যে ব্যক্তি আপাতরমণীয় প্রেয়ঃপথের পথিক হয়, যথাকালে সে নিশ্চয়ই অর্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। (অর্থ=সুখ বা মঙ্গল)। অতএব, প্রেয়ের ও শ্রেয়ের মধ্যে যে চিরন্তন ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে, আমাদের বিবেচনায়, আচার-শাস্ত্র সেই ভেদ অবগত হইয়া যাহা প্রেয়ঃ না হইলেও শ্রেয়ঃ, তাহা বিধিবাক্যে দেখাইয়া দেয়।

মতবাদ লইয়া বিবাদ করায় বুদ্ধির প্রাখর্য্য বাড়িতে পারে, কিন্তু দেশের প্রকৃত্যনুযায়ী শৌচাচার পালন করিলে শরীর অরোগ, দৃঢ় এবং মন সবল ও পবিত্র থাকিতে পারে। জাতীয় গৌরব বা স্বজাত্যভিমান কি পর্য্যন্ত হ্রস্ব হইয়াছে ও অনুকারপ্রবৃত্তি কতদূর প্রবৃদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। সকলেই নিজ নিজ স্বজনের প্রতি লক্ষ্য করিলে ঐ দুই ঘটনার জাজ্বল্যমান উদাহরণ দেখিতে পাইবেন। ঐ দুই ঘটনায় দিন দিন লোকের মনে এই ভাব আবদ্ধ হইতেছে যে, ইংরাজ ভাল, তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ভাল, বিদ্যা ভাল, সব ভাল—আমাদের কিছুই ভাল নয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ অসভ্য ও মূর্খ ছিল। এইরূপ আত্মমর্য্যাদাপরিত্যাগে ও পূর্ব্ব-পুরুষের অবমাননায় আমরা দিন দিন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছি।

যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণদিগের কার্য্যকর্ম্ম, আচারব্যবহার, বেশ-

---

দেখা হয় নাই, কিন্তু শাস্ত্রের একস্থানে লিখিত আছে, শৃগালেরা একাদশী দিবসে আহার করে না বা করিতে পারে না। সে দিন তাহাদের বুভুক্ষা থাকে না, অথবা কম থাকে।

ভূষা, ভাল ভাবিতেন এবং নিজেও ব্রাহ্মণাচার করিতেন। ব্রাহ্মণসঙ্গে কাল-যাপন করিতেই তিনি ভাল বাসিতেন। সেই জন্য তাঁহার ক্ষাত্রতেজ অপহৃত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির একদিন মহামতি ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতামহ! কর্ণ যদি এতই বীর ছিল, তবে সে কি জন্য বার বার সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত?" ভীষ্ম প্রত্যুত্তর করিলেন, "কর্ণ সূতকুলে পালিত হওয়ায় আপনাকে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ছোট বলিয়া জানিত। সেই অযথা জ্ঞান তাহার ক্ষাত্রতেজের অপকর্ষক হইয়াছিল, তাই তোমাদের রক্ষা!" জাতীয় ভাবের অভাব, আত্মমর্য্যাদা ত্যাগ, পূর্ব্বপুরুষগণের অসম্মান ও পরানুকরণ, এ সকল গুলিই স্ববলধ্বংসের কারণ। পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যাঁহাদের নাম করিয়া আপনার পরিচয় দাও, তাঁহাদিগকে বড় ভাবাই উচিত। পূর্ব্বপুরুষদিগকে বড় ভাবিতে পারিলেই আপনারা বড় হওয়া যায়। যে পুরুষের হৃদয়ে পূর্ব্বপুরুষগণ প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইয়া বিরাজ করেন, সেই পুরুষেরই আন্তরিক তেজ থাকিলে বাড়ে, না থাকিলে জন্মে। অন্যের নিকট যিনি যেমন হউন, নিজ বংশধরের নিকট তিনি মন্দ নহেন। একটি গল্প বলি—

অনধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জব্বলপুর অঞ্চলের কোন এক বিদ্যালয়ে একটি ঠগ-শিশু অধ্যয়ন করিত। ঠগ-শিশুর পিতা বিখ্যাত ঠগ ছিল। সে মরিলে, তাহার পুত্র বিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় সংবাদ পাইল এবং পিতৃমরণসংবাদে সে শোকে নিতান্ত অস্থির হইল। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্যই হউক, আর অন্য কারণেই বা হউক, শিশুকে বলিলেন, "তোমার পিতা ঠগ ছিল—সে অনেক নরহত্যা করিয়াছে, অনেক দেশ লুটপাট করিয়াছে—তাহার জন্য এত শোক কেন?" শিশু উত্তর করিল, "আমার পিতা ঠগ ছিলেন ও নরহত্যা করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি তাহা মন্দ কর্ম্ম বলিয়া জানিতেন না বলিয়াই, করিয়াছিলেন। তিনি দেবীর আদেশ পালনার্থ যে বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইংলিস্ গবর্ণমেণ্টের তাহা চিরকাল স্মরণ রাখিতে হইবে। কি আশ্চর্য্য! কি সুখের সংবাদ! ঠগও মরিয়া তাহার পুত্রের হৃদয়ে দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। যে মরে, সেই স্বর্গীয় হয়! যাঁহারা প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে পূর্ব্বপুরুষগণের স্মরণ

করেন, দেবতাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাঁহাদিগের মন দেবতেজে তেজীয়ান্ হয় ও সর্ব্বদা পবিত্র থাকে। তাই বলিতেছিলাম, ইংরাজিশিক্ষার প্রাদুর্ভাব হওয়া অবধি এদেশে গার্হস্থ্যপদ্ধতির বিশৃঙ্খলতা, স্বাস্থ্যহানির প্রাবল্য, শৌচাচারের বিলোপ ও জাতীয় গৌরবের হ্রাস সংঘটিত হওয়ায় এবং সকলে আত্মমর্য্যাদা বা জাতীয় মর্য্যাদা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরানুকরণে রত হওয়ায় আমাদের প্রেয়ঃপথ প্রসারিত হইলেও শ্রেয়ঃপথে কণ্টকপাত হইতেছে। অলমধিকেনেতি।

"বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ স্মরদূষিতাঃ।
অবোধোপহতাশ্চান্যে জীর্ণমঙ্গে সুভাষিতম্॥"

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

বাল্যাবস্থায় শিক্ষাপ্রণালী *

(শিষ্য ও আচার্য্য মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে বিরচিত।)

শিষ্য। ভগবন্! আপনার কথা আমি মোটামুটি বুঝিলাম বটে ; কিন্তু সবিশেষ বুঝিতে পারি নাই।

মানুষ আপন মনে প্রধানতঃ স্বচ্ছন্দের জন্যই ঘুরে। তাহাকে প্রকৃত মানুষ করিবার মর্ম্ম এই যে, সে যেন স্বার্থ ছাড়িয়া পরের জন্য জীবন যাপন করে, এবং মনে মনে যেন এই সংকল্প ধরে যে, আমি অন্যেরই আদরণীয় সামগ্রী হইব ; পতি, পত্নী, পুত্র, পৌত্র, স্বজাতি, অন্য জাতি, ইত্যাদি অপর ব্যক্তি আমার প্রকৃতিকে মনের পুতুল করিয়া রাখিবে ; এমন কি, মানবহৃদয়ে পুরুষপরম্পরাগত প্রবাহক্রমেও যেন আমার সেই প্রতিকৃতি স্বতঃ বিদ্যমান থাকে। ঘোরতর স্বার্থপর মানবপ্রকৃতিকে এতাদৃশ আকারে পরিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত দ্বিবিধ শিক্ষকের সহকারিতা আবশ্যক ; স্ত্রী জাতীয় এবং ধর্ম্মোপদেশক। মাতা এবং শিক্ষাগুরুর যত্ন অনন্যরূপে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্যসাধনে প্রবর্ত্তিত হইবে। একজন সন্তানের চিত্তবৃত্তি সুশিক্ষিত করিতে, আর একজন তাহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত করিতে সচেষ্ট থাকিবেন ; আর উভয়ে উভয়ের যত্নের প্রতি অনুকূলচিত্ত হইবেন। তাহা ব্যতীত মানুষকে মানুষ করা কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

এইটুকু স্থূলকথা আমি বুঝিয়াছি। এখন সন্তানের মাতা এবং ধর্ম্মাচার্য্য বা শিক্ষাগুরু মধ্যে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য বিষয়গুলি আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বুঝিতে চাহি।

আচার্য্য। আচ্ছা! তুমি জান যে ২১ বৎসর বয়সে মানুষ পূর্ণবয়স্ক ও পরে স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম, বলিয়া গণ্য হয়। এই দেখ, শিক্ষাকালের একটি স্পষ্ট সীমা অবধারিত রহিয়াছে। অনন্তর একভাগে ১৪

* মূল, কঙ্গ্রিভ কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত কোম্‌তের প্রামাণিক ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তরমালা ২য় সংস্করণ ১৯৬-১৯৮ পৃঃ।

এবং আর একভাগে ৭ বৎসর ধরিয়া প্রাগুক্ত শিক্ষাকালকে দ্বিখণ্ডিত কর। করিলে জানিবে যে একভাগে মাতার শিক্ষকতা, আর একভাগে শিক্ষাগুরুর কর্তৃত্ব অপেক্ষাকৃত প্রধান। এই প্রাধান্য যথাযথ রক্ষা করিয়াই তাঁহারা পরস্পরের সহকারিতা করিবেন। প্রথম ১৪ বৎসরের শিক্ষকতাকার্য্য মাতা কর্তৃক এলো মেলো রকমেই নির্ব্বাহিত হইবে। পরিশেষে শিক্ষাগুরু নিয়মিত প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তির চালনার্থে অধ্যাপনা করিবেন। ১৪ হইতে ২১ বৎসর কাল পর্য্যন্ত শিক্ষাগুরু কর্তৃক শাস্ত্রোপ-দেশ প্রদানের সময়, তখন তিনিই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষকতা-পদে ভারার্পিত হন। তাহার পূর্ব্বে মাতাই অপেক্ষাকৃত গুরুভারবিশিষ্ট শিক্ষক থাকেন।

অনন্তর প্রাগুক্ত ১৪ বৎসর কালকে আবার দ্বিভাগ করিয়া মাতৃশিক্ষকতার বিশেষ বিধান বুঝিতে হইবে। যেমন ১৪ বৎসরের পরে বালক বালিকা যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করে, সেইরূপ উহার প্রথমার্দ্ধের সময়েও একটি শারীরিক পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যায়। ৭ বৎসর বয়সে দুধে দাঁত পড়িয়া গিয়া আবার দাঁত উঠে। প্রাগুক্ত সীমা অর্থাৎ ৭ বৎসরকাল যাবৎ মাতা সন্তানের পক্ষে নিতান্তই অনন্যগতি; এমন কি, তৎকালে তাঁহার শিক্ষকতা-কার্য্যে অন্যের কোনও প্রকার সহকারিতা করাও দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ, শরীরচালনার কথা বল, কিম্বা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কথাই বল, প্রাগুক্ত বয়সে ইহার কোন বিষয়েই তাহার উপরে নিয়ম নির্দ্দেশ করা যায় না। তাহার শরীর-পোষণই এইক্ষণকার শিক্ষাকার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু শরীরসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের মনোবৃত্তিগুলিও এসময়ে প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্যাদি চিত্তবৃত্তিগুলি স্থলবিশেষে এমন প্রবলতা লাভ করে যে, এই সময়ে আশ্রিত সংস্কারকে যাবজ্জীবন প্রভুত্ব করিতেও দেখা যায়। অতএব এ সময়েও ধর্ম্মশিক্ষার স্থল আছে। কিন্তু লালনমিশ্রিত গার্হস্থ্য-স্নেহই সেই শিক্ষার একমাত্র উপাদান। সন্তান মাতা ভিন্ন অন্য কোন পরমেশ্বরী বুঝিতে পারে না। মাতাও সন্তানের পক্ষে নিতান্তই পরমেশ্বরীর প্রতিনিধিস্বরূপ। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই এ বয়সে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। অপর, চিত্তবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিরও কিছু কিছু চালনা এই সময়েই আরম্ভ হয়। সন্তান

এই বয়স হইতে ভাষা শিখিতে থাকে, এবং মাতার নিকট হইতেই সন্তানের মাতৃভাষার পরিচয় জন্মে। আমাদিগের নারীরূপা পরমেশ্বরী, বসুন্ধরা হইতে বিভিন্না, অথচ অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যোমবেষ্টিতা এবং ভূপৃষ্ঠে সমাসীনা। কিন্তু তিনিই অদ্বিতীয়রূপে ভাষার প্রণেত্রী; বসুমতী এবং ব্যোমব্যাপ্তির সহিত ভাষার কোনও সংশ্রব নাই। সুতরাং ভাষাশিক্ষাকার্য্যে মাতা নিতান্তই সন্তানের নিকট ভাষা-প্রণেত্রী-মানবদেবীর (Humanity) প্রতিনিধি হয়েন। কিন্তু প্রাগুক্ত বয়সে কেবল ভাষা-পরিচয় দ্বারা যে সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তি সঞ্চালিত হইতে থাকে, তাহা নহে। নানা প্রকার অভিজ্ঞতা হইতেও তৎকালে সন্তানের মনে সকল বিষয়েরই কিছু কিছু সংস্কার জন্মিতে থাকে। পরিণামে বুদ্ধিচালনা বিষয়ে তাহার মনের যেরূপ প্রকৃতি দাঁড়াইবে, এক্ষণকার বুদ্ধিবৃত্তি-সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাহারই উপকরণ হইতে থাকে। প্রাগুক্ত অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানার্জ্জনের উপকরণ, ইন্দ্রিয় এবং মাংসপেশীর চালনা দ্বারাই সংগৃহীত হয়। সুতরাং ঐ সকল শারীরিক কার্য্য বা চালনা বিষয়েও গাঢ় বুদ্ধি সহকারে ব্যবস্থা করা বিধেয়; এবং এই ব্যবস্থাও শিক্ষাকার্য্যের অঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। শরীরচালনা স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য বটে, কিন্তু তাহাও কৌশল দ্বারা শৃঙ্খলিত হওয়া আবশ্যক। যেন সন্তানের কার্য্যসমষ্টিতে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির ব্যতিক্রম না ঘটে, অথচ বিশেষ স্থলে তাহার কোমল প্রকৃতি কখন কুপথেও যেন ধাবিত না হয়; যেন তাহার শক্তির বৃদ্ধি নিবারিত না হয়, অথচ যে পথে তাহা প্রসারিত হইবে, তাহা যেন শিক্ষকের কৌশল দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। সন্তানের জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি উভয়ের চালনাই এই বয়সে আরম্ভ হয়। কিন্তু ঐ দ্বিবিধ শক্তি যাহাতে স্নেহময় চিত্তবৃত্তি অথবা মঙ্গলময় ইচ্ছাশক্তির অধীনভাবে সঞ্চালিত হয়, তাহার জন্য শিক্ষক কর্ত্তৃক ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এই শিক্ষকতা কেবল মাতাই সম্পাদন করিতে পারেন। আর কেহ ইহাতে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতে পান না। কেন না, এতদর্থে এমন নিয়ম হইতে পারে না যে, মাতা তাহা পালন করিলেই স্বীয় শিক্ষকতাকার্য্যের ভার উদ্ধার হইবে। পদে পদে সন্তানের ভাব গতি লক্ষ্য ও শিক্ষকতার উদ্দেশ্য পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইবে। মাতা ভিন্ন আর কেহ তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না।

এস্থলে ভদ্রশ্রেণীর বিষয়ে একটি বিশেষ কথা আছে। যেখানে সন্তানকে শ্রমজীবী করিবার কোনও কল্পনা নাই, সেখানে একটি অভিজ্ঞতা এই বয়সেই সন্তানের আয়ত্ত করিয়া দিতে হইবে। যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত ধনসম্পত্তি অথবা মানসিক পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করিয়া দিন-যাপন করেন, আর যাহারা কায়িক শ্রম দ্বারা জীবিকালাভ এবং অর্থোপার্জ্জন করে, এতদুভয় শ্রেণী মধ্যে সম্যক্ সহানুভূতি থাকা উচিত। মনে মনে যে গড়া-ভাঙ্গা ঘটে, তাহার অসম্পূর্ণতা-দোষ নিবারণ করা দুঃসাধ্য; কিন্তু শ্রমজীবিগণ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহা সুসিদ্ধ না করিলে অব্যাহতি পায় না। খাটাখাটুনির স্থলে স্বভাবতই কার্য্যের পূর্ণাবস্থা লক্ষিত হয়। সুতরাং সকল কার্য্যেরই অগ্রপশ্চাৎ ভাবনা বিষয়ে তাহারা কৃতসংস্কার হইয়া উঠে। ইহাই এই শ্রেণীর একটি প্রধান অভিজ্ঞতা। ঐ অভিজ্ঞতা অথবা কথিত সংস্কার কিয়ৎ পরিমাণে ভদ্রসন্তানের মনেও জন্মান আবশ্যক। এবং এই উদ্দেশে মাতা সন্তানের দ্বারা এক একটি শ্রমসাধ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত করিবেন। মাতৃস্নেহ এবং বাল্যকালের তরল বুদ্ধি হেতু এতাদৃশ অভ্যাস দ্বারা সন্তানের আভ্যন্তরিক কোমলতা বিনষ্ট হইতে পারিবে না; অথচ শ্রমসাধ্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যে বুদ্ধিকৌশল এবং পরিণামদর্শিতার আবশ্যক, সন্তান তাহাতে সংস্কারলাভ করিতে পারিবে। শ্রমজীবিগণ নিকৃষ্টশ্রেণীস্থ লোক বলিয়া তাহাদিগের শ্রমসাধ্য কার্য্য কখনই তুচ্ছ নহে। এবং প্রাগুক্ত সংস্কার দ্বারা নিকৃষ্টশ্রেণীর প্রতি অবিনয় বা দাম্ভিকতাও সন্তানের মনে আশ্রয় করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, প্রস্তাবিত অভিজ্ঞতা হইতে বরং নিকৃষ্টশ্রেণীর সহিত সহানুভূতি এবং সার্ব্বজনিক প্রেম উৎপন্ন হইবে।

সাত বৎসরের পরে, দন্তোদ্ভেদ হইতে যৌবনারম্ভ পর্য্যন্ত কাল উপস্থিত হয়। এখন মাতা সন্তানকে কতক পরিমাণে নিয়মপালন করাইতে সক্ষম হন। সুতরাং তাঁহার শিক্ষকতাও এখন অপেক্ষাকৃত প্রণালীবিশিষ্ট হইবে। সন্তান এখনও মা-ছাড়া হয় না; কিন্তু এখন মাতার অধীন থাকিয়া নিয়মিতরূপে তাহার পাঠ করা আবশ্যক। অধ্যাপকের নিকট যে কিছু সাহায্য প্রয়োজন হয়, তাহা অন্তরালে মাতৃকর্তৃত্বাধীনে আয়োজন করাই বিধেয়। বিশেষতঃ তিনি সুশিক্ষিতা হইলে এক বিষয়ে অবশ্যই স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইতে পারেন।

আর কিছুতে না হউক কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রলেখাদি সুরুচি-সন্দীপন বিদ্যা (æsthetic studies) আলোচনাস্থলে এই বয়সের শিক্ষকতা মাতৃকর্তৃত্বাধীন থাকাই বাঞ্ছনীয়। এ বয়সের পূর্ব্বে নিয়মিতরূপে বর্ণপরিচয়-রূপ লেখাপড়াও অপরিহার্য্য নহে। সন্তান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যতটুকু শিখে, তাহাতে তাহার মনের স্ফূর্ত্তি এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধি ক্ষয় পায় না। কিন্তু নিয়মিত লেখা পড়া আরম্ভের সময় ৭ বৎসর বয়ঃক্রমের পরে উপস্থিত হয়। এখনকার প্রধান শিক্ষিতব্য বিষয়, ভাষা। ইতিপূর্ব্বে চিত্তবৃত্তিগুলি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু এখন হইতে সন্তানের মনে বুদ্ধিবৃত্তির স্পষ্ট চালনা উদয় হয়, এবং বাল্যকালের দ্বিতীয় বিভাগে ভাষাপ্রয়োগ বিষয়ে সুচারু অনুশীলনই সেই চালনার নিমিত্তে বিশিষ্টরূপে উপযোগী। যে যে শক্তিদ্বারা মনুষ্যের মনোগত ভাব অন্যের নিকট ব্যক্ত হইতে পারে, সেইরূপ শক্তিমাত্রই বিধিমতে পরিবর্দ্ধিত করা আবশ্যক। সুতরাং সেই সকল শক্তির বৈধচালনা যাহাতে বালকের অভ্যাসগত হইয়া যায়, এতাদৃশ ব্যবস্থা করা এখনকার পক্ষে কর্ত্তব্য কার্য্য। এইরূপ বিদ্যানুশীলনেও সন্তানের উপরে নিয়মাদেশ করা সাধ্যমতে সঙ্কুচিত রাখা ভাল। কেন না, এই কথার বিচার করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, প্রাগুক্ত সুরুচি-সন্দীপন বিদ্যা অনুশীলন ব্যতীত আর কিছুতেই বালক বালিকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় না। নিয়মাদেশ দ্বারা এতদ্বিষয়ে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আবার ঐরূপ চর্চ্চা করণার্থে কাব্যপাঠের সহিত গীতি এবং রৈখিক চিত্রবিদ্যাও অতি সুকৌশলে সম্মিলিত হইতে পারে। ফলতঃ এইরূপ চর্চ্চার স্থলে বালকের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি যদি অবরুদ্ধ না হয়, তবে যথাযথ ভাষাপ্রয়োগদ্বারা মনের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা সহজেই উৎপন্ন হয়, এবং সেই উপায়ে বুদ্ধিবৃত্তিরও সম্যক্ চালনা হয়। এ সময়ে ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে বালকের উন্নতি আপনা আপনি অচেষ্টিতভাবেই হইতে থাকে বটে, কিন্তু তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠানকার্য্য বিধিমতেই পরিবর্দ্ধিত হওয়া উচিত। ভাষার উপরে তাহার যত অধিকার বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই সে নব নব বিধানে বাক্যবিন্যাস দ্বারা উপাস্য বস্তুর উদ্দেশে আপনার আভ্যন্তরিক উচ্ছ্বাস নিবেদন করিতে সক্ষম হয়। মাতাই এখন তাহার পক্ষে পরমেশ্বরীর প্রতিনিধি। অতএব এই বয়সে গীতি এবং চিত্রবিদ্যাচর্চ্চার তিলকস্বরূপ

মাতার একটি প্রতিকৃতি এবং মাতৃ-উদ্দেশে একটি গীত রচনাই সন্তানের পক্ষে পরম উপযোগী। পক্ষান্তরে, প্রাগুক্ত প্রণালীতে বিদ্যানুশীলন দ্বারা আর একটি অভীষ্ট সুসিদ্ধ হয়। শাস্ত্রমধ্যে যে সকল অপূর্ব্ব রচনা দ্বারা দেবীর মূর্ত্তি রঞ্জিত এবং তাঁহার প্রকৃতি ব্যক্ত হইয়া আছে, সন্তানগণ সেই সকল রচনার পরিচয়লাভস্থলে দেবীর গূঢ়মর্ম্ম বিষয়েও অনেক জ্ঞানলাভ করিয়া উঠে। কিন্তু এই উপলক্ষে মাতার একান্ত সতর্ক থাকা আবশ্যক যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা ব্যতীত, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কোনও কাব্যাদির দ্বারা যেন সন্তানের সুরুচি ও ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে কোনও প্রকার ব্যাঘাত না জন্মে।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

পুত্র

বোধ হয় পৃথিবীতে হিন্দুর ন্যায় পুত্রপ্রয়াসী আর কেহ নাই। পুত্রসন্তান না থাকিলে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও হিন্দু অসুখী। হিন্দু যদি সকল সুখের অধিকারী হইয়া একমাত্র পুত্রসন্তানে বঞ্চিত হয়, তবে তাহার সুখই অধিকতর অসুখের কারণ হয়। প্রকৃতিপুঞ্জপূজিত কমলার বরাভরণভূষিত অসীমপ্রভাবশালী রাজাধিরাজ রাজ্যেশ্বর পুত্র বিনা সদাই অসুখী, সদাই ম্রিয়মাণ, সদাই শোকসন্তপ্ত—পুরাণাদিতে এমন অনেক গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্রলাভার্থ কত রাজা কত যাগযজ্ঞ করিতেন, কত দেবার্চ্চনা করিতেন, কত তীর্থদর্শন করিতেন, কত ঋষি তপস্বীর সেবা শুশ্রূষা করিতেন। রাজারাও করিতেন, রাজাদের প্রজারাও করিত। এখনও রাজা প্রজা সকলেই করে। করে না কেবল ইংরাজিশিক্ষিতেরা। বোধ হয় যে আমাদের ন্যায় পুত্র-পাগ্‌লা জাতি পৃথিবীতে আর নাই, কখনও ছিল না, কখনও হইবে না। এ পুত্র-প্রয়াসের অর্থ কি ?

এক অর্থ পিতৃ-ঋণ-পরিশোধ। শাস্ত্রানুসারে সকলেই তিনটি ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য—দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ। পিতৃ-ঋণের অর্থ পিতৃলোকের নিকট ঋণ। এই পিতৃঋণ পরিশোধ করিবার অর্থ পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ পিতৃশ্রাদ্ধ বা পিতৃলোককে জলপিণ্ডাদিদানের উপায় করা। এই পিতৃশ্রাদ্ধের দুইটি অর্থ আছে। হিন্দুর বিশ্বাস শ্রাদ্ধে পারলৌকিক মঙ্গল হয়। অতএব শ্রাদ্ধের এক অর্থ, পিতৃলোকের পারলৌকিক মঙ্গলসাধন। শ্রাদ্ধের আর একটি অর্থ শ্রাদ্ধের মন্ত্রাদি পাঠ না করিলে বুঝা যায় না। সকলকেই তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাঠ করিলে এক অপূর্ব্ব জিনিস দেখিতে পাইবে। পিতা বল, মাতা বল, পিতামহ বল, পিতামহী বল, সমস্ত পিতৃলোকের প্রতি এক অপূর্ব্ব স্নেহের, অপূর্ব্ব প্রীতির, অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার, অপূর্ব্ব ভক্তির, অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতার এক অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস দেখিতে পাইবে।

অতএব শ্রাদ্ধের দ্বিতীয় অর্থ—প্রীতিপূর্ব্বক, ভক্তিভাবে, শ্রদ্ধাসহকারে, সকৃতজ্ঞচিত্তে পিতৃলোককে স্মরণ ও অর্চ্চনা করা।

এখন কে বলিবে যে পিতৃলোকের পারলৌকিক মঙ্গলসাধন করা ও প্রীতিপূর্ব্বক, ভক্তিভাবে, শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তঃকরণে, সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদিগকে স্মরণ ও অর্চ্চনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়? কিন্তু শুধু আমি সে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে ত সে কর্ত্তব্য কর্ম্মের সমাপ্তি হয় না। আমি মরিলেও যাহাতে আমার পিতৃলোকের পারলৌকিক মঙ্গলকার্য্যের ও পূজার্চ্চনার ব্যাঘাত না হয়, তাহার উপায় না করিলে আমার সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় কেমন করিয়া? কর্ত্তব্য কর্ম্ম পুত্রপৌত্রাদি সম্বন্ধেও যেমন, পিতা পিতামহাদি সম্বন্ধেও ত তেমনি। যতদিন বাঁচিয়া আছি শুধু ততদিন পুত্রপৌত্রাদিকে প্রতিপালন করিলেই ত তাহাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের সমাপ্তি হয় না। আমার মৃত্যু হইলে পরও যাহাতে তাহাদের প্রতিপালনের ব্যাঘাত না হয়, তাহার উপায় বিধান না করিয়া মরিলে তাহাদের সম্বন্ধে আমার যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহার পরিসমাপ্তি হয় কেমন করিয়া? সন্তানাদির প্রতিপালন বিষয়ে আমার যে দায়িত্ব আছে, তাহা যেমন আমার জীবিত কালের সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে, পিতা পিতামহ প্রভৃতি পিতৃলোকের অর্চ্চনা সম্বন্ধে আমার উপর যে গভীর কৃতজ্ঞতাধর্ম্ম পালনের ভার আছে তাহাও তেমনি আমার জীবিত কালের সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে। কৃতজ্ঞতার এত গভীরতা ও এত প্রসার আর কোন শাস্ত্রে আছে বলিয়া বোধ হয় না; হিন্দু শাস্ত্রে আছে। তাই হিন্দুশাস্ত্রে সন্তানাদিকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিবার ও তাহাদের জন্য সম্পত্তি সৃজন করিবার যেমন বিধি আছে, পিতৃলোকের পারলৌকিক কার্য্য ও পূজার্চ্চনাদি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিবারও তেমনি বিধি আছে। পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য হিন্দুর পুত্রকামনা এত প্রবল। হিন্দুর পুত্র-প্রয়াসের এই এক অর্থ *।

* হিন্দুরা পুত্রকন্যার মধ্যে যে ইতরবিশেষ করিয়া থাকে, তাহারও প্রকৃত অর্থ এই। সাহেবেরা ও সাহেবশিক্ষিত বাঙ্গালিরা বলেন, স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণাই তাহার অর্থ এবং সেই জন্যই পুত্রসন্তান হইলে হিন্দুর যত আনন্দ হয়, কন্যাসন্তান হইলে তত হয় না। এটি খাঁকা সাহেবী ভুল।

হিন্দুর পুত্র-প্রয়াসের আর এক অর্থ বংশের গৌরব-কামনা। পুংলক্ষণ-সম্পন্ন জীব বলিয়াই যে হিন্দুর নিকট পুত্রের এত আদর ও মর্য্যাদা তা নয়। এখন অনেক স্থলে তাহাই হইয়াছে বটে। কিন্তু সে কেবল পুত্রত্বের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধির অভাবে হইয়াছে। পুত্রের প্রকৃত অর্থ—গুণবান্ পুত্র, কৃতী পুত্র, বংশোজ্জ্বলকারী পুত্র।

কো ধন্যো বহুভিঃ পুত্রৈঃ কুশূলাপূরণাঢ়কৈঃ।
বরমেককুলালম্বী যত্র বিশ্রূয়তে পিতা॥

গোলাঘরে সারি সারি শূন্য আড়িপ্রায়,
গুণশূন্য শত পুত্রে কেবা ধন্য হয়?
থাকে যদি এক পুত্র সেও বরং ভাল,
নিজগুণে পিতৃনাম করে সে উজ্জ্বল।

(তারাকুমার কবিরত্নের হিতোপদেশ, ৪র্থ পৃষ্ঠা।)

চাণক্যশ্লোকে আছে—

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥

যেরূপ সুগন্ধি-পুষ্প-পরিপূর্ণ একটিমাত্র সুবৃক্ষের গুণে সমস্ত বন গন্ধ-পূর্ণ হয়, সেইরূপ একটি সৎপুত্রের গুণে সমস্ত বংশ গৌরবপূর্ণ হয়।

হিতোপদেশে আছে—

স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্।

সার্থক জনম তাঁর, যাঁহার জনম
বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে অনুপম।

(তারাকুমার, ৩য় পৃষ্ঠা।)

গুণহীন পুত্র পুত্রই নয়—কিছুই নয়, কেবল কষ্টের কারণ। হিতোপদেশেই আছে—

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্ম্মিকঃ।
কাণেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃপীড়ৈব কেবলম্॥

বিদ্যাহীন ধর্ম্মহীন সে পুত্রে কি ফল?
কাণা চক্ষু থাকা সে ত কষ্টই কেবল।

দানে তপসি শৌর্য্যে চ যস্ত ন প্রথিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থলাভে চ মাতুরুচ্চার এব সঃ॥

দানে তপে শৌর্য্যে যার নাহি ঘুষে মান,
সে পুত্র মাতার মলমূত্রের সমান।

(তারাকুমার, ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠা।)

চাণক্যশ্লোকে আছে—

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা।

যেরূপ অগ্নিযুক্ত একটি মাত্র কুবৃক্ষের দ্বারা সমস্ত বন দগ্ধীভূত হয়, সেইরূপ একটি কুপুত্রের দোষে সমস্ত বংশ কলুষিত হয়।

এমন অসংখ্য শ্লোক আছে। চাণক্য হইতে আর একটিমাত্র দিব—

শর্ব্বরীদীপকশ্চন্দ্রো রবির্দ্দিবসদীপকঃ।
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্ম্মঃ সুপুত্রঃ কুলদীপকঃ॥

যেরূপ চন্দ্র রজনীর দীপ স্বরূপ, রবি দিবসের দীপস্বরূপ, ধর্ম্ম ত্রিভুবনের দীপস্বরূপ, সেইরূপ সুপুত্র বংশের দীপস্বরূপ।

এই যে সুপুত্র ও কুপুত্রের প্রভেদ, এ কেবল হিন্দুশাস্ত্রেই আছে, হিন্দুদিগের মধ্যেই আছে; আর কোন শাস্ত্রে নাই, আর কোন জাতির মধ্যে নাই। তাহার কারণ, হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুজাতি যাহাকে পুত্রত্ব বলে, তাহা আর কোথাও নাই। সে-ই হিন্দুর প্রকৃত পুত্র লোকে যাহাকে ধার্ম্মিক ও গুণবান্ বলিয়া ভক্তি করে; যে দানশীল ও পরোপকারী, যে পিতৃপুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ, দেবসেবা, অতিথিসেবা, সদাব্রত প্রভৃতি সযত্নে রক্ষা করিয়া এবং স্বয়ং নূতন নূতন হিতকর অনুষ্ঠান করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করে। হিন্দুর পুত্রত্ব পিতা বা মাতা বা অপর কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, হিন্দুর পুত্রত্ব সমস্ত বংশের জন্য। এই জন্যই বোধ হয় যে, পৃথিবীতে হিন্দু যত বংশাভিমানী ও বংশানুরাগী, আর কেহ তত নয়। এত বংশাভিমানী ও বংশানুরাগী বলিয়া হিন্দুর আত্মাভিমান বা স্বার্থভাব একরকম নাই বলিলেই হয়। হিন্দুর আমিত্ব বংশত্বে বিলীন ও বিলুপ্ত; হিন্দুর আত্মাভিমান বংশাভিমানে পরিণত; এবং বংশাভিমান বা বংশানুরাগরূপ প্রবল ও নিত্য-পবিত্র উত্তেজনায় হিন্দু

মধ্যে শ্রেণী বর্ণ ও অবস্থানির্ব্বিশেষে যতলোকে যত সৎকর্ম্ম করিয়াছে ও করে, বোধ হয়, যে আর কোথাও অপর কোন উত্তেজনায় তত লোকে তত সৎকর্ম্ম করে নাই ও করে না। স্বদেশানুরাগ বা লোকানুরাগ অনেক সৎ-কর্ম্মের হেতু হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু প্রকৃত স্বদেশানুরাগ ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশেও অতি বিরল। স্বদেশানুরাগ বা লোকানুরাগ অনেক স্থলেই অপ্রকৃত, আত্মানুরাগের আবরণ মাত্র, সৎকর্ম্মের কলুষিত উৎস। এবং প্রকৃত হইলেও তদ্দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সৎকর্ম্ম করা অতি অল্পলোকের পক্ষেই সম্ভব। পুত্র ধার্ম্মিক ও গুণবান্ হইয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিবে ও পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তি রক্ষা করিবে, হিন্দুর এই বাসনা বড়ই প্রবল। এবং ইহাই হিন্দুর পুত্র-প্রয়াসের দ্বিতীয় অর্থ।

হিন্দুর পুত্র-প্রয়াসের তৃতীয় অর্থ বংশরক্ষা। পাছে বংশের নাম ও গৌরব বিলুপ্ত হয়, এই জন্য হিন্দু বংশরক্ষার এত পক্ষপাতী। কিন্তু হিন্দুর বংশের নাম ও গৌরব রক্ষা করিবার ইচ্ছাই বা এত বলবতী কেন? ইহার একটি গূঢ় কারণ আছে। হিন্দুশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে যে সকল তথ্য লাভ করা যায় তন্মধ্যে একটি প্রধান তথ্য এই যে, হিন্দু নিত্যত্বের একান্ত পক্ষপাতী। যাহা অনিত্য, হিন্দুর চক্ষে তাহা অতি হেয়, অতি অকিঞ্চিৎকর, অস্তিত্বহীন বলিলেই হয়। হিন্দুর চক্ষে নিত্য অস্তিত্বই অস্তিত্ব, অনিত্য অস্তিত্ব অস্তিত্বই নয়। নিত্যত্বের এত পক্ষপাতী বলিয়া যাহা অনিত্য হিন্দু তাহাকেও নিত্যের অনুরূপ করিতে যত্নবান্। এ কথার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হিন্দুজাতির অলৌকিক অস্তিত্বে দেখিতে পাইবে——

পৃথিবীতে যত সভ্যজাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে হিন্দুজাতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হিন্দুজাতির অভ্যুদয়ের পর আরও অনেক সভ্যজাতির অভ্যুদয় হইয়াছে। মিশর, আসীরিয়, পারস্য, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি সকলেই হিন্দুজাতির পরবর্ত্তী। কিন্তু কতকাল হইল তাহারা সকলেই কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মে, আচারে, সংস্কারে, সামাজিকভাবে এখনকার গ্রীক, রোমক, মিশরবাসী প্রভৃতি তখনকার গ্রীক, রোমক, মিশরবাসী প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, গ্রীক রোমক প্রভৃতির অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে যে হিন্দুর আবির্ভাব হইয়াছিল, ধর্ম্মে, আচারে, সংস্কারে, সামাজিক

ভাবে এখনও সে হিন্দু সেই হিন্দু রহিয়াছে—কত ধর্ম্মবিপ্লব, কত রাজনৈতিক বিপ্লব, কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন সত্ত্বেও সেই হিন্দু রহিয়াছে। সে হিন্দুর অনেক গিয়াছে সত্য; রাজশক্তি গিয়াছে, ধর্ম্মবল কমিয়াছে, প্রতিভা হীনপ্রভা হইয়াছে। কিন্তু এই ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে যত হিন্দু আছে, সকলের প্রতি চাহিয়া বল দেখি, এত দিন পরপদানত থাকিয়াও হিন্দুর যে ধর্ম্মবল, যে বুদ্ধিবল, যে বাহুবল, যে মনুষ্যত্ব আছে, ইউরোপের মধ্যেও কয়টা জাতির সে ধর্ম্মবল, সে বুদ্ধিবল, সে বাহুবল, সে মনুষ্যত্ব আছে? রোম কর্ত্তৃক গ্রীস, বিজয়ের পর তিন দিনের মধ্যে তেমন যে গ্রীক জাতি কোথায় উড়িয়া গেল। বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক রোম-বিজয়ের পর তিন দিনের মধ্যে তেমন যে রোমক জাতি কোথায় উড়িয়া গেল। আর এই যে আজিকার ইংরাজ জাতি, যাহারা সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া সাম্রাজ্য বসাইয়াছে, নিশ্চয় জানিও, কাল যদি ইহাদের রাজশক্তি যায়, ইহারা পররাজ্যভুক্ত হয়, ইহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপহৃত হয়, তাহা হইলে পরশ্ব ইহাদের আর চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। ইহাদের সমাজ-প্রণালীতে এমন কিছুই নাই যাহা দেখিয়া বলিতে পারি যে, ইহাদের এতটুকু ধুলিগুঁড়ি থাকিবে। কিন্তু এই যে এতকালের হিন্দুজাতি, যাহারা এতদিন পরপদানত হইয়া রহিয়াছে, বল দেখি, ইহাদের এখনও যে রকম সমাজশক্তি, ধর্ম্মবল, বুদ্ধিবল ও বাহুবল আছে, আজিকার কয়টা সভ্য ও স্বাধীন জাতির সে রকম আছে? এতবড় যে ইংরাজ রাজা ইহাকেও এই হিন্দুর ধর্ম্মবলের কাছে হারি মানিতে হইয়াছে, বুদ্ধিবল দেখিয়া ভীত হইতে হইয়াছে, বাহুবল লইয়া রাজ্যরক্ষা করিতে হইতেছে। বল দেখি, এক হিন্দুজাতি ছাড়া আর কোন্ জাতির মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্ধানেও রামানুজ, রামানন্দ, নানক, চৈতন্যের ন্যায় ধর্ম্মসংস্কারক জন্মিয়াছে? জয়দেব বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, তুলসীদাস, মুকুন্দরামের ন্যায় কবি জন্মিয়াছে? গঙ্গেশ, গদাধর, রঘুনাথের ন্যায় নৈয়ায়িক জন্মিয়াছে? তোড়ল মল্ল, মাধব রাও, দিনকর রাওয়ের ন্যায় রাজপুরুষ জন্মিয়াছে? ফল কথা, হিন্দু আপন সমাজপ্রণালীর গুণে যেন নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা নিত্যত্বের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া এমনি করিয়া সমাজপ্রণালী বাঁধিয়া

গিয়াছেন যেন সে বন্ধন আর কস্মিন্ কালে খুলিবে না এবং সে সমাজও কস্মিন কালে নষ্ট হইবে না। তাঁহারা যে এরূপ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা মানবজীবন ও সমাজ উভয়কেই ধর্ম্মরূপ ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। মানবজীবন ও সমাজের নানাবিধ ভিত্তি হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। ধনতৃষ্ণা, বাণিজ্যানুরাগ, প্রভুত্বপ্রিয়তা, সমরস্পৃহা প্রভৃতি মানবজীবনও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু ধনতৃষ্ণা বল, বাণিজ্যানুরাগ বল, সকলই পার্থিব ও অনিত্য; একমাত্র ধর্ম্মই নিত্য। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা সেই ধর্ম্মরূপ নিত্যভিত্তির উপর সমাজস্থাপন করিয়া সমাজকে নিত্যত্বপ্রদান করিয়া গিয়াছেন। ধনতৃষ্ণা প্রভুত্বপ্রিয়তা, সমরস্পৃহা সকলই শক্তি, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সে সকলই হয় রাজসিক, নয় তামসিক শক্তি। রাজসিক বা তামসিক শক্তি দেখিতে অতিশয় উগ্র, অতিশয় সতেজ বটে, কারণ পার্থিব মোহকর বস্তুই উহার লক্ষ্য। মোহকর বস্তুর অনুধাবনাতেই মানুষ বেশি চঞ্চল, বেশি ব্যস্ত, বেশি ব্যগ্র, বেশি উগ্র হইয়া থাকে। কিন্তু উগ্র ও সতেজ বলিয়াই রাজসিক ও মানসিক শক্তির শীঘ্র লয় হইয়া থাকে। যে জ্বরে শরীরের উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রীর অধিক হয়, সে জ্বর অধিকক্ষণ থাকে না এবং রোগীকেও অধিকক্ষণ রাখে না। কিন্তু ধর্ম্ম সাত্বিক শক্তি। সাত্বিক শক্তির উগ্রতাও নাই, ক্ষয় লয়ও নাই। নিত্যত্বানুরাগী হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুসমাজকে নিত্যত্ব দিবেন বলিয়া প্রত্যেক হিন্দুর জীবনকে ধর্ম্মমুখী করিয়া গিয়াছেন। এবং সেই জন্যই নিত্যত্বপ্রিয় হিন্দুর স্মৃতিসংহিতাদিতে মনুষ্যের ক্ষণভঙ্গুর দেহ ও ক্ষণস্থায়ী সংসার প্রভৃতি নিতান্ত অনিত্য বস্তুর সংরক্ষণ ও মঙ্গল-বিধান পক্ষে যত বিধি ব্যবস্থা দেখিতে পাই, অনিত্য-পার্থিবতাপ্রিয় কোন জাতির শাস্ত্রেই তত দেখিতে পাই না! নিত্যত্বপ্রিয় হিন্দুশাস্ত্রকারের অনিত্যত্বের এই অপরূপ আদর কেহ লক্ষ্য করিয়াছ কি? ইহার অর্থ আর কিছুই নয়—ইহার অর্থ, মনুষ্যের অনিত্য দেহ ও অনিত্য সংসার প্রভৃতিকে ধর্ম্মমুখী বা সাত্বিক ভাবাপন্ন করিয়া, উহার ক্ষয়লয়শীলতা হ্রাস করিয়া, তদ্দ্বারা সমাজের নিত্যত্বপ্রাপ্তির বিধান বা সহায়তা করা। এই সকল কথার একটি গুরুতর তাৎপর্য্য এই যে, যে ধর্ম্মরূপ সাত্বিক শক্তির

সাহায্যে হিন্দুজাতি এক রকম নিত্যজীবন লাভ করিতে পারিয়াছে, সেই শক্তিই অপর সকল শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যে fittest বা যোগ্যতমের survival এর কথা বলেন, বোধ হয় সেই সাত্ত্বিক শক্তি-সম্পন্ন জাতিই সেই যোগ্যতম জাতি। আমাদের পৈতৃক সাত্ত্বিকতা পরিত্যাগ করাও উচিত নয় এবং সামাজিক নিত্যত্ব ছাড়িয়া সামাজিক পরিবর্ত্তনশীলতার পক্ষপাতী হওয়াও উচিত নয়। আমাদের বহুল সংস্কারের প্রয়োজন, কিন্তু নিত্য পরিবর্ত্তন বা বিপ্লবের দিকেও যাওয়া উচিত নয়। আমাদের জীবনের ও সমাজের যেমন পাকা ভিত্তি আছে, আর কাহারও জীবনের বা সমাজের তেমন পাকা ভিত্তি নাই। আমাদের যাহা কিছু করিতে হইবে ভিত্তি ঠিক রাখিয়া করিতে হইবে। নচেৎ ঠকিতে হইবে। আমাদের যেন সর্ব্বদাই এই কথাটি মনে থাকে যে, পৃথিবীতে এক হিন্দু সমাজ ভিন্ন এপর্য্যন্ত অন্য কোনও সমাজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই ও উত্তীর্ণ হইতে পারিবার লক্ষণ প্রদর্শন করে নাই।

হিন্দুর নিত্যত্বপ্রিয়তার প্রধান প্রমাণ দিলাম। আরও অনেক প্রমাণ আছে, যথা—হিন্দুর স্থপতি ও ভাস্কর কার্য্য। উভয়ই কিছু মোটা, দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক; যেন কতকাল রহিয়াছে, আরো কত কাল থাকিবে। হিন্দুর সূক্ষ্ম শিল্পও আছে। হিন্দুর শাল রুমাল অলঙ্কারপত্র সূক্ষ্ম শিল্পের আদর্শ স্বরূপ; কিন্তু এমনই উপকরণে ও প্রণালীতে প্রস্তুত যে যুগান্তেও যেন উহার ক্ষয় লয় হয় না। হিন্দুর গৃহসামগ্রী—ঘটি, বাটি প্রভৃতি—কাচ বা মৃত্তিকানির্ম্মিত নয়; ধাতুনির্ম্মিত, পুরুষানুক্রমে চলিবে। আমাদের পিতা পিতামহাদির আমলের ঘড়া গাড়ু বাটা বাটি ডাবর প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় তাঁহারা বুঝি চারিযুগ ঘরকন্না করিবার নিমিত্ত বিধাতাপুরুষের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া মর্ত্তলোকে আগমন করিতেন। হিন্দুর সকল জিনিসই টেকসই; হিন্দু 'ফঙ্গ' জিনিস দেখিতে পারে না। ইউরোপ 'ফঙ্গ' জিনিসেরই পক্ষপাতী। এমন কি হিন্দুর ঔষধের ফলও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, ইংরাজের ঔষধের ফলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়। ভাবিয়া দেখিলে আরও অনেক প্রমাণ পাইবে। এবং হিন্দুর বংশরক্ষার ইচ্ছাও যে সেই নিত্যত্ব প্রিয়তার প্রমাণ, তাহাও বুঝিতে পারিবে। এবং সাত্ত্বিক শক্তি ভিন্ন যদি নিত্য বা চিরস্থিতি অসম্ভব হয়, তাহা

হইলেও কি বলিবে যে হিন্দুর এই বংশরক্ষার ইচ্ছা সাধু ও মহতী ইচ্ছা নয়? বংশের সাত্ত্বিক শক্তি বা পুণ্যের সাহায্যে বংশের স্থিতি বা নিত্যত্বের বিধান করিবার ইচ্ছা হিন্দুর মনে বড়ই প্রবল। এবং ইহাই হিন্দুর পুত্রপ্রয়াসের তৃতীয় কারণ।

যে মানুষ হয়, সেই হিন্দুর স্থায় পুত্র-প্রয়াসী হয়। কারণ সে প্রয়াসও যেমন মহৎ, তাহা সিদ্ধ হওয়াও তেমনি পুণ্যসাপেক্ষ। যে পুত্র পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে, বংশ আলোকিত ও গৌরবান্বিত করিতে পারিবে ও বংশের ধারা রক্ষা করিয়া প্রকৃত বংশধর হইতে পারিবে, অনেক পুণ্যবল, অনেক ভাগ্যবল থাকিলে তবে সে পুত্রের পিতা হইতে পারা যায়। অভিমন্যুর পিতা হইতে পারে, তত বীরপুরুষ, তত মহাপুরুষের মধ্যে এক অর্জ্জুন ভিন্ন এমন আর কেহ ছিল না। সুপুত্রের পিতা হইতে হইলে দেহ বলিষ্ঠ ও রোগশূন্য হওয়া চাই, মন বিশাল ও বলশালী হওয়া চাই, হৃদয় উদার হওয়া চাই, ইন্দ্রিয়াদি সংযত হওয়া চাই, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক হওয়া চাই, পত্নী লক্ষণাক্রান্তা, পতিব্রতা, পুণ্যবতী হওয়া চাই। সকল স্ত্রীই যে সুপুত্রের জননী হইতে পারেন, তা নয়। গালব যখন আপন কন্যা মাধবীকে রাজা হর্য্যশ্বের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন, তখন রাজা হর্য্যশ্ব এইরূপ কহিয়াছিলেন ;—"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকললোকদর্শনীয়া বালার করপৃষ্ঠ, পাদপৃষ্ঠ, পয়োধর, নিতম্ব, গণ্ড ও নয়নের উন্নতি; কেশ, দশন, করপদের অঙ্গুলি ও কটিদেশের সূক্ষ্মতা; স্বর, নাভি ও স্বভাবের গম্ভীরতা এবং পাণিতল, অপাঙ্গ, তালু, জিহ্বা ও ওষ্ঠাধরের রক্তিমা প্রভৃতি বহুলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ইনি চক্রবর্ত্তিলক্ষণোপেত পুত্র প্রসবসমর্থা বলিয়া বোধ হইতেছে— (কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, ১১৬ অধ্যায়)। মন্বাদি শাস্ত্রকারেরাও এইরূপ অনেক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ লক্ষণযুক্তা স্ত্রী লাভ করা সম্পূর্ণরূপে নিজের সাধ্যায়ত্ত নয়। তাই বলিতেছি যে অনেক পুণ্যবলে ও ভাগ্যবলে সুপুত্রের পিতা হইতে পারা যায়। প্রভূত শক্তির অধিকারী হইলে, তবে তত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারা যায়। দেহ, মন, হৃদয়, সব নিষ্কলঙ্ক রাখা কি সামান্য শিক্ষা, সামান্য সাধনার কাজ? কোন লোককে কোন গর্হিত কর্ম্ম করিতে দেখিলে এ দেশের লোকে বলিয়া থাকে যে,

উহার বংশ রক্ষা হইবে না। কথাটি বড় সত্য। পিতার পাপ পুত্র পৌত্রাদিতে সঞ্চারিত হইয়া বংশ নষ্ট করে। পিতার বুদ্ধি-শক্তির অভাব হইলে, পুত্রপৌত্রাদি উপার্জ্জনাদি করিতে অক্ষম হইয়া শীঘ্রই বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। যে মানুষ কোপনস্বভাব বা হিংসাপরায়ণ, সে স্বল্পায়ু হয় এবং তাহার সন্তানাদিও শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয় বা লোকের অপ্রিয় বা অনিষ্টকারী হইয়া যার-পর-নাই হেয় হইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে কত শক্তিশালী, কত সংযমী, কত পুণ্যবান্ হইলে তবে সুপুত্রের পিতা, প্রকৃত বংশধরের জনয়িতা হইতে পারা যায়। পিতার প্রকৃত পরীক্ষা পুত্রে। অর্জ্জুন মহাবীর ও মহাপুরুষ, কিন্তু অভিমন্যুর পিতা না হইলে তাঁহাকে তত বীর ও তত মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হইত না। আর যে ভাগ্যলক্ষ্মী গৃহলক্ষ্মীর গর্ভে বংশধরের জন্ম হয়, তিনিও ধন্যা। তাই 'হিন্দুর বধূর অসীম গৌরব'*।

এ সকল কথা আমরা এখন প্রায় ভুলিয়া গিয়া বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। এ সকল কথা আবার স্মরণ না করিলে, আমাদের মঙ্গল নাই। শুদ্ধ এই কথাগুলি স্মরণ ও অনুসরণ করিতে পারিলে, আমাদের অনেক দোষ কাটিয়া যায়।

---

* পৌষ ও মাঘ মাসের প্রচারে 'বউ কথা কও' দেখ।

তাঁতিয়া ভীল ও ফুলাসিংহ

তাঁতিয়া ভীল এখন পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহে। পনর বৎসর সমস্ত মধ্যভারতে ইহার প্রতাপ, ইহার প্রাধান্য, ইহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁতিয়া নির্ভীকচিত্তে ধনীর ধনাপহরণ করিয়াছে, অলোকসাধারণ কার্য্যপটুতা দেখাইয়া শান্তিরক্ষকদিগের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছে এবং আপনার ক্ষমতায় ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগকেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছে। ইঙ্গরেজেরা আপনাদের বিখ্যাত রবিন্ হুডের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন। ইঙ্গরেজের সংবাদপত্রে এই ভারতীয় রবিন্ হুডের অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় সময় সময় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁতিয়া দস্যু; এই সুদীর্ঘকাল দলবল সহকারে অবিচ্ছেদে, দস্যুবৃত্তি করিয়া ধনীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমরা তাহাকে দস্যু বলিয়া চিরকাল কাতর নয়নে চাহিয়া দেখিব। কিন্তু এই দস্যু-প্রধান সময় সময় যেরূপ উদারতা ও পরোপকারিতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার প্রশংসাবাদে কেহই বিমুখ হইবেন না। তাঁতিয়ার সুরম্য প্রাসাদ ছিল না, সুদৃশ্য পরিচ্ছদ ছিল না, আহারপানে কিছুমাত্রও সৌখীনতা ছিল না। সে আপনার ভোগবিলাসের জন্য অপরের সম্পত্তি হরণ করিত না। সঙ্কীর্ণ গিরি-কন্দর তাহার আশ্রয়স্থান, নিবিড় অরণ্য তাহার বিহারভূমি ও সামান্য পর্ণকুটীর তাহার বিশ্রামস্থান ছিল। সে তিন দিন অন্তর সামান্য রুটি খাইয়া উদরপূর্ত্তি করিত। অনেক সময়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও প্রশস্ত প্রান্তরে পড়িয়া থাকিত। তাঁতিয়া নিজেই স্বীকার করিয়াছে যে, সে কেবল নিরন্ন দরিদ্র-দিগের উপকারের জন্যই, এত কষ্ট সহিয়াও ধনীর ধনাপহরণ করিত। যখন কোনও নিঃসম্বল ব্যক্তি তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে, সে তখনই তাহাকে প্রার্থনানুরূপ অর্থ দিয়াছে। দরিদ্র কৃষকেরা যখন চাষের জন্য বলদ ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়াছে, তাঁতিয়া তখনই তাহাদিগকে যথোচিত অর্থ দিয়া বলদ ক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। তাঁতিয়া একদিনে পবিত্র নর্ম্মদার তীরে ব্রাহ্মণ ও সাধুদিগকে ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা দান করিয়াছে। এইরূপে অনেক অসহায় দরিদ্র লোক তাহার সাহায্যে প্রতিপালিত হইত। সম্প্রতি এই

বিখ্যাত দস্যু ধৃত হইয়াছে। তাঁতিয়া যাহাকে বন্ধু ভাবিয়া সময় সময় বহু অর্থ দিয়াছিল, এখন সেই ভণ্ড বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় শান্তিরক্ষকগণ তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে। তাঁতিয়া বিচারকের সমক্ষে আত্মকাহিনীর বর্ণনপ্রসঙ্গে নির্ভীকচিত্তে বলিয়াছে—"এখন আমার ৪৬ বৎসর বয়স হইয়াছে; বয়সের আধিক্যে দৃষ্টির জড়তা জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে আমি এক দমে ৬০ মাইল যাইতে পারিতাম, এখন ২০ মাইলের অধিক যাইতে পারি না। বয়োধর্ম্মে শারীরিক তেজস্বিতার হ্রাস ও অরণ্যে পরিভ্রমণ সাতিশয় বিরক্তিজনক হওয়াতে আমি জীবনের অবশিষ্ট সময় শান্তিসুখে অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা করিয়া অনেককে বলিয়াছি যে, তাহারা যেন সরকার বাহাদুরের নিকট আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আমি এজন্য তাহাদিগকে বহু অর্থ দিতেও ত্রুটি করি নাই। যে বন্ধুর জন্য আমার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাঁহাকেও আমি এ বিষয় বারংবার বলিয়াছি। বন্ধুবর আমার নিকট হইতে বহু অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সাহায্য প্রার্থনা করা দূরে থাকুক, তাঁহারই বিশ্বাসঘাতকতায় এখন আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শান্তিরক্ষকবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়াছি।" তাঁতিয়া এইরূপে আপনার সমস্ত সুকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্মের কাহিনী বিচারকের সমক্ষে যথাবৎ বিবৃত করিয়াছে। এজন্য কোনও রূপ আশঙ্কায় সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই। তাহার এইরূপ স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতা উপেক্ষার বিষয় নহে।

বর্ত্তমান সময়ের আশী বৎসর পূর্ব্বে মেটকাফ্ (পরে লর্ড মেট্‌কাফ্) সাহেব মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধিবন্ধন জন্য কতিপয় সৈন্যসহ পঞ্জাবে উপস্থিত হন। এই সময় একটি তেজস্বী যুবক কয়েক জন অনুচর লইয়া তাঁহার শিবির আক্রমণ করে। কিন্তু ইঙ্গরেজ সৈন্যগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। যুবক তাড়িত হইয়া নিষ্কোষিত তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া কহে,—"মহারাজ! আমরা বিদেশী ইঙ্গরেজের শিবির আক্রমণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইঙ্গরেজেরা আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে; আপনি যদি ইহার প্রতিবিধান না করেন, তাহা হইলে, এই তরবারির আঘাতে আপনার সহিত আপনার বংশের সমুদায় লোকের প্রাণসংহার করিব।" রণজিৎসিংহ অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে যুবকের মুখে এই কঠোর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। শনৈঃ শনৈঃ যুবকের দিকে চাহিয়া

দেখিলেন, যুবক নির্ভয়ে তরবারি আস্ফালন করিতেছে, নির্ভয়ে বিস্ফারিত চক্ষে আপনার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। অসময়ে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাবে পঞ্চনদের অধীশ্বর বিচলিত হইলেন না, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিয়া চপলতার পরিচয় দিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"যুবক! তোমার সাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু ইঙ্গরেজের সহিত আমি বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ, বন্ধুর কোনও অপকার করিতে পারিব না। আমি মাথা বাড়াইয়া দিতেছি, আমার মস্তকেই তরবারির আঘাত কর।" পঞ্জাব-কেশরীর এই স্নেহমাখা কথায় যুবক উন্নত মস্তক অবনত করিল। তাহার উত্তেজনা ও উদ্ধতভাব তিরোহিত হইল। মহারাজ রণজিৎ সিংহ সন্তোষের সহিত তাহাকে এক জোড়া স্বর্ণ বলয় ও তদীয় অনুচরদিগকে যথাযোগ্য দ্রব্য পারিতোষিক দিলেন। যুবক সন্তোষের সহিত মহারাজপ্রদত্ত মহাপ্রসাদ লইয়া চলিয়া গেল।

এই তেজস্বী যুবকের নাম ফুলাসিংহ। শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ অকালী নামে যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, ফুলাসিংহ সেই সম্প্রদায়ের লোক। উপস্থিত সময়ে ফুলাসিংহ অকালীদিগের অধিনায়ক ছিলেন। অকালীরা এই তেজস্বী যুবকের অধীনে পরিচালিত হইয়া অনেক দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইত। গুরুগোবিন্দের সময়ে অকালীরা সাহসে অটল, বিক্রমে অজেয় ও কর্ত্তব্যপালনে অনলস ছিল। শত্রুব্যূহভেদে, শত্রুর দুর্গ অধিকারে ইহাদের কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ পাইত, ইহাদের কিরূপ ক্ষমতায় বিপক্ষের বিজয়িনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তাহা ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত বর্ণনা করিয়া থাকেন। গুরুগোবিন্দ সিংহ এই সম্প্রদায়ের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের অত্যাচার নিবারণে উদ্যত হইয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহের সময়ে অকালীদিগের এইরূপ পরাক্রম তিরোহিত হয় নাই। ফুলাসিংহের অধীনে ক্রমে অকালীদিগের দল পুষ্ট হয়। ক্রমে চারিশত অকালী এই দলে সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বদা আপনাদের অধিনায়কের আদেশপালনে প্রস্তুত থাকে।

ফুলাসিংহ এই সকল অনুচরে পরিবৃত হইয়া নানাস্থান হইতে অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিল। নিরাশ্রয় দুঃখীদিগের রক্ষা করা তাহার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ফুলাসিংহ সকল সময়ে সর্ব্বান্তঃকরণে ঐ কর্ত্তব্য-

পালনে তৎপর হইল। ধনীর সম্পত্তিহরণে তাহার কিছুমাত্রও সঙ্কোচ হইত না। যেখানে নির্ধন নিরাশ্রয় ও নিপীড়িত ব্যক্তি দুঃসহ যাতনায় নিরন্তর দগ্ধ হইত, সেই খানেই রক্ষাকর্ত্তা ফুলাসিংহের আবির্ভাব হইতে লাগিল। যেখানে ক্ষমতাশালী ধনী বিলাসের তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে নিরন্তর আপনার ধনবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিত এবং অপরকে নিপীড়িত করিয়া তাহার অর্থে আপনাকে সমৃদ্ধ করিবার উপায় উদ্ভাবনে তৎপর থাকিত, সেইখানেই ফুলাসিংহ তাহার ধনহরণ ও ক্ষমতা নষ্ট করিতে হাত বাড়াইতে লাগিল। যেখানে নিঃস্ব নিঃসম্বল নিঃসহায় অনাথা পবিত্র শোকের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ নীরবে নির্জ্জন পর্ণকুটীরে বসিয়া থাকিত এবং আপনার হৃদয়ের প্রচণ্ড হুতাশন নিভাইবার জন্য যেন নিরন্তর নয়ন-সলিলে বক্ষস্থল প্লাবিত করিত, সেই খানেই ফুলাসিংহের দয়া তাহাকে শান্তির অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ফুলাসিংহের এই সমস্ত কার্য্যের বিবরণ ক্রমে মহারাজ রণজিৎ সিংহের কর্ণগোচর হইল। রণজিৎ সিংহ তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহের সহিত তাহাকে অপরের সম্পত্তিহরণে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ফুলাসিংহ সে সময়ে তাঁহার অনুরোধপালনে সম্মত হইল না। রণজিৎ সিংহ তাহাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিলেন, বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া তাহার নিকট শান্তিময় জীবনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার অঙ্গীকৃত পুরস্কার, তাঁহার বাক্‌চাতুরী, তাঁহার স্নেহ ও প্রীতি সমস্তই তেজস্বী যুবকের নিকট পরাভব স্বীকার করিল। ফুলাসিংহ পঞ্জাবকেশরীর বশীভূত হইল না, সে অটল পর্ব্বতের ন্যায় আপনার সাধনায় অটল থাকিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বিপন্নের বিপদ উদ্ধারে, দরিদ্রের দারিদ্র্যমোচনে, উদ্ধত ধনীর ধনহরণে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে ফুলাসিংহের দলে চারি পাঁচ হাজার লোক ছিল। ইহারা সকলেই আপনাদের দলপতির যে কোন আদেশপালনে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। ফুলাসিংহ এই দলবল লইয়া ধনীর ধনহরণপূর্ব্বক সেই অপহৃত অর্থ দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিল। তাহার পরাক্রম ক্রমে সমস্ত পঞ্জাবে পরিব্যাপ্ত হইল। ধনিগণ যেমন তাহাকে পরস্বাপহারক ঘোরতর পাষণ্ড দস্যু বলিয়া বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, নিঃসহায় দরিদ্রগণ তেমনই তাহাকে আপনাদের অদ্বিতীয় উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া সন্তোষ

প্রকাশ করিতে লাগিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই দস্যুবরের বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভয় দেখাইলে কোনও ফল হইবে না; ধীরভাবে স্নেহের সহিত মিষ্টকথা বলিলে, ফুলাসিংহকে বশে রাখা যাইতে পারিবে। ফুলাসিংহের ক্ষমতা ও তেজস্বিতা পূর্ব্বেই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই ক্ষমতাশালী তেজস্বী যুবক বশীভূত হইলে, ক্রমে তাহার দ্বারা অনেক দুঃসাধ্য কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইহা ভাবিয়া ভয়প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে শান্ত-ভাব দেখাইতে লাগিলেন। এই উপায়ে শেষে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। ফুলাসিংহ পঞ্জাবকেশরীর অনুগত ও ক্রমে তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

এই সময় হইতে মহারাজ রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত হয়। অনেক স্থলে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। তিনি অনেক যুদ্ধে ফুলা-সিংহ ও তাহার সাহসী দলের বীরত্বে বিজয়লক্ষ্মী অধিকার করেন। অকালী দিগের একটি বীরপুরুষের সাহসে মুলতান অধিকৃত হয়। ফুলাসিংহ স্বয়ং বিশিষ্ট পরাক্রম দেখাইয়া ভারতের নন্দনকানন কাশ্মীর অধিকার করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ যখন সিন্ধুনদ পার হইয়া আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন, বহুযুগের পর পঞ্চনদের হিন্দুভূপতির অধীনে হিন্দুসৈন্য নৌসেরা নামক স্থানে আফগানদিগের সম্মুখীন হয়, তখন ফুলাসিংহ যেরূপ অলোকসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া বিজয়লক্ষ্মীর সম্বর্দ্ধনা করে এবং যেরূপ অলোকসাধারণ সাহসের সহিত বিপক্ষদিগকে নির্জ্জিত করিতে করিতে নৌসেরার সমরস্থলে—সেই পবিত্রতাময় পরম তীর্থে—অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়, তাহা ইতিহাসের পত্রে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। এই মহাযুদ্ধে প্রথমে শিখদিগের পরাক্রম বিচলিত হইয়াছিল, পাঠানেরা জয়ী হইবে বলিয়া প্রথমে আশা করিয়াছিল, রণজিৎ সিংহের ইউরোপীয় সেনাপতি বৈন্টুরা ও এলার্ড ও প্রথমে পাঠান দিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এই সঙ্কটকালে পঞ্জাবকেশরী বিপক্ষের গতিরোধ জন্য আপনার সৈন্যদিগকে একত্র করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন, বৃথা ঈশ্বরের ও আপনাদের গুরুর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বৃথা

অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে হইতে ভৈরবরবে, সৈন্যদিগকে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বিক্রমে, অপূর্ব্ব দৃঢ়তায় ও অপূর্ব্ব সাহসে কোনও ফল হয় নাই। পঞ্জাবকেশরী অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িলেন। সৈন্যদিগকে যুদ্ধে প্রায় বিমুখ দেখিয়া ক্ষোভে ও রোষে একাকীই তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে শত্রুর ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে "ওয়া গুরুজি কি ফতে" (জয়শ্রী গুরুকে শোভিত করুক) এই আশ্বাসপ্রদ বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল। এই বাক্য দূরাগত বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গভীর রবে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে একেবারে আশা, ভরসা, আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন, ফুলাসিংহ নীলবর্ণের পতাকা উড়াইয়া পাঁচশতমাত্র অকালীসৈন্যের সহিত ঘোররবে "ওয়া গুরুজি কি ফতে" শব্দ করিতে করিতে সেই গণনাতীত পাঠানসৈন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। তিনি একবার ফুলাসিংহকে বিপক্ষের গুলির আঘাতে অশ্ব হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়াছিলেন। ঐ আঘাতে ফুলাসিংহের হাঁটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। লোকে তাহাকে ধরিয়া যে স্থানান্তরিত করিয়াছিল, তাহাও রণজিৎ সিংহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এবার তিনি দেখিলেন, ফুলাসিংহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া আপনার ক্ষুদ্র সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছে। গুলির আঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, প্রশস্ত ললাটে ভীতিব্যঞ্জক চিহ্নের আবির্ভাব নাই, বিস্তৃত লোচনদ্বয়ে দুশ্চিন্তা বা নিরাশাসূচক কালিমার আবেশ নাই। ফুলাসিংহ হস্তীর উপর হইতে নির্ভয়ে জলদগম্ভীর স্বরে কহিতেছে,—"ওয়া গুরুজি কি ফতে।" তাহার সৈন্যগণ গুরুগোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপূত ঐ প্রাতঃস্মরণীয় বাক্যে উৎসাহিত হইয়া পাঠানসৈন্য নির্ম্মূল করিতে অগ্রসর হইতেছে। ফুলাসিংহের এইরূপ তেজস্বিতা দেখিয়া পঞ্চনদের অধীশ্বর প্রীত, বিস্মিত ও আশ্বাসিত হইলেন। তিনি ফুলাসিংহকে পাঠানের ব্যূহভেদে অগ্রসর দেখিয়া মহাবিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এবার ফুলাসিংহের পরাক্রম পাঠানেরা সহিতে পারিল না। তাহাদের অনেকে নিহত হইল, অকালীরা বিপুলবিক্রমে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহাদের বলক্ষয় করিতে

লাগিল। ক্রমে মহারাজ রণজিৎ সিংহের অপরাপর সৈন্ত আসিয়া অকালী-দিগের সহিত সম্মিলিত হইল। ফুলাসিংহ যে হস্তীতে ছিল, তাহার মাহুতের শরীরে একে একে তিনটি গুলি প্রবেশ করিয়াছিল। ফুলাসিংহ নিজেও একটি গুলিতে আহত হইয়াছিল, তথাপি দৃঢ়তার সহিত শত্রুর মধ্যে হাতী চালাইতে মাহুতকে আদেশ দিল। আহত মাহুত এবার আদেশপালনে অসম্মত হইল। ফুলাসিংহের পুনঃ পুনঃ আদেশেও হস্তিচালক যখন অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না, তখন ফুলাসিংহ সক্রোধে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল। মাহুত সেই মুহূর্ত্তে গতাসু ও হস্তী হইতে ভূপতিত হইল। ফুলাসিংহ তখন হস্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা হস্তিচালনা করিয়া শত্রুর মধ্যে উপস্থিত হইয়া আপনার সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। এই সময়ে সহসা শত্রুপক্ষের একটি গুলি আসিয়া তাহার ললাটে প্রবিষ্ট হইল। বীরকেশরী এ আঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইল না। তাহার প্রাণ-শূন্য দেহ হাওদার মধ্যে পড়িয়া গেল। কিন্তু অধিনায়কের মৃত্যুতেও অকালী-গণ ছত্রভঙ্গ হইল না। তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সাহস সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল। আফগানেরা এই আক্রমণ নিরস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়ন সময়ে তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্রও শৃঙ্খলা রহিল না। তাহারা ভয়ে ও গোলযোগে উদ্ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। রণস্থলের নিকটে একটি জলাভূমি দীর্ঘ ঘাসে আচ্ছাদিত ছিল। অনেকে সেই ঘাসের মধ্যে যাইয়া লুক্কায়িত হইল। কিন্তু ইহাতেও হতভাগ্যদিগের পরিত্রাণ হইল না। শিখেরা তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। আফগানিস্তানের সমরক্ষেত্রে ফুলাসিংহের লোকাতীত পরাক্রমে বিজয়লক্ষ্মী পঞ্জাবকেশরীর অঙ্কশায়িনী হইল। যে জাতি এক সময়ে চতুরীমাত্র অবলম্বন করিয়া দৃশদ্বতীর তীরে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়াছিল, বহু দিনের পর, সম্মুখ সমরে ফুলাসিংহের অসাধারণ বীরত্বে তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল।

পাঠানেরা পরাজিত হইলেও বীরত্বের অবমাননা করে নাই। তাহারা প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায়, তাহাদের প্রতিদ্বন্দী ফুলাসিংহের অলোকসাধারণ

বীরত্বের যার-পর-নাই প্রশংসা করিয়াছিল। যে স্থলে ফুলাসিংহের মৃত্যু হয়, সেস্থলে একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই পবিত্র স্থান হিন্দু ও মুসলমান-দিগের নিকট একটি পবিত্র তীর্থের মধ্যে পরিগণিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানেরা ঐ পবিত্র তীর্থে সমাগত হইতেন। উভয় সম্প্রদায়ই এই তীর্থে ভক্তিরসার্দ্র হইয়া ফুলাসিংহের উদ্দেশে স্তুতিগান করিতেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিজীত পাঠানেরা বিজেতার বিজয়িনীশক্তির এইরূপ সংবর্দ্ধনা করিয়াছিল, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট বিজেতার দেবভাবের কোনও ব্যত্যয় হয় নাই। যত দিন একচক্ষু বৃদ্ধ শিখ-ভূপতি জীবিত ছিলেন, তত দিন নৌসেরার যুদ্ধের প্রসঙ্গে যখন ফুলাসিংহের কথা উঠিত, তখনই তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুটি উজ্জ্বলতর হইত এবং তাহা হইতে অবিরলধারায় মুক্তাফল বাহির হইয়া গণ্ডদেশে পড়িত। বীরভক্ত বীরকেশরী এইরূপ পবিত্র শোকাশ্রুতে ফুলাসিংহের পরলোকগত আত্মার সন্তর্পণ করিতেন।

ফুলাসিংহের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের সহিত যেরূপ তদীয় উন্নত হৃদয়ের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ পঞ্জাবকেশরীর লোকচরিত্রজ্ঞান ও লোকবশীকরণ শক্তিও বুঝা যাইতেছে। ফুলাসিংহ পরস্বাপহারক দস্যুভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। শেষে এই কার্য্যক্ষেত্রেই তাহার দস্যুতার অপগম হয়, সে দেবভাবে সাধারণের বরণীয় হইয়া উঠে। পঞ্জাবকেশরী এই দস্যুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যাবজ্জীবন কারাগারে রাখিলে, হয় ত তাহার অলোকসাধারণ গুণের বিকাশ দেখা যাইত না। সে দস্যু বলিয়াই চিরদিন সাধারণের অবজ্ঞার পাত্র হইয়া থাকিত। তাহার আবির্ভাবে ইতিহাস আহ্লাদপ্রকাশ করিত না, তাহার তিরোভাবেও ইতিহাস তদীয় কীর্ত্তিকলাপের প্রচারে উন্মুখ হইত না। পঞ্চনদের অদ্বিতীয় বীরপুরুষ সাহস ও ক্ষমতার সম্মানরক্ষা করিতে জানিতেন; তিনি শান্তভাবে ফুলাসিংহকে শান্তিময় পথে আনিয়া যেরূপ সুবিচারক্ষমতা ও সুকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, লোকসমাজে তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। তাঁতিয়া ভীলও একজন দস্যু। কিন্তু ইদানীন্তন সমাজের লোকচরিত্রজ্ঞানের অভাবে এই দস্যুর অন্তর্নিহিত গুণগ্রামের পূর্ণবিকাশের সুবিধা ঘটে নাই। এখন কেহই তাঁতিয়ার ক্ষমতা ও সাহসের বিষয় অস্বীকার করিবেন না।

যে ব্যক্তি মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম না করিয়া একদিনে ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে, তাহার শারীরিক তেজস্বিতা অল্প নহে, এবং যে ব্যক্তি পনর বৎসরকাল প্রখর আতপতাপে, প্রবল বৃষ্টি, নিদারুণ হিমসম্পাতের মধ্যে, পর্ব্বতে অরণ্যে অরণ্যে বেড়াইয়া, সতর্ক শান্তিরক্ষকদিগের দলবলের মধ্যেও নানা বেশে নানা ভাবে আপনার কার্য্যসাধন করিয়াছে, তাহার কৌশল ও ক্ষমতা কিছু সাধারণ নহে। যে জাতি হইতে তাঁতিয়ার উদ্ভব হইয়াছে, ভারতের ইতিহাসে সে জাতি অপরিচিত নহে। ভীলগণ এক সময়ে মিবারের বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুতদিগের প্রধান পরিপোষক ছিল। ভীলপ্রধান মণ্ডলিক না থাকিলে, বোধ হয়, হিন্দুকুলসূর্য্য বীরপ্রবর বাপ্পারাওর বীরত্বকীর্ত্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইত না, এবং চিতোরের গৌরব কাহিনীও রাজপুতনার ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিত না। চিরস্মরণীয় হলদি ঘাটের যুদ্ধাবসানে ভীলেরাই প্রতাপসিংহকে আশ্রয় দিয়া দেবীড়ের যুদ্ধের সূচনা করিয়া দেয়। এই যুদ্ধেই প্রতাপ সিংহ আবার মোগলদিগের সম্মুখে আত্মপ্রাধান্য স্থাপিত করেন। সাহসে ও বীরত্বে ইহারা এক সময়ে চিতোরের বীরেন্দ্রসমাজেও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়াছে; অনার্য্য বলিয়া ইহারা উপেক্ষিত হয় নাই। ভারতের পরবর্ত্তী ইতিহাসেও অনার্য্যদিগের সাহস ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। লর্ড ক্লাইব ইহাদের সাহায্যে দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের ক্ষমতা বিনষ্ট করেন। শেষে পলাশীতে ইহারাই তাঁহার প্রধান সহায় হয়। তাঁতিয়া অনার্য্য ও অনক্ষর হইলেও, তাহার সাহস, ক্ষমতা ও কার্য্যপটুতা আর্য্যদিগেরও অনুকরণীয়। ইদানীন্তন আর্য্যগণ যদি পঞ্জাবকেশরীর ন্যায় ভবিষ্যদ্দর্শী হইতেন, তাহা হইলে, এসময়েও যে, দ্বিতীয় ফুলাসিংহের আবির্ভাব হইত না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

বন্দে মাতর্গঙ্গে

হরিপদ-সংস্থিতা ত্রিলোক-বিরাজিতা ধীর সমুন্নত বিবিধ তরঙ্গে,
ব্রহ্মকমণ্ডলু- জঠরবিঘাতিনি শূন্যবিহারিণি সহস্র ভঙ্গে
চন্দ্রশেখরশির- মৌলিবিলাসিনি কেলিকুতূহলা সুরবালা সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে !

বহুবলধারণ সুরেন্দ্রবারণ দর্পবিনাশন তব ভ্রূভঙ্গে,
শৈলনিবাসিনি বহুভাষভাষিণি তুষারচর্চ্চিত হিমাচলশৃঙ্গে,
নির্ম্মলসলিলে ত্রিভুবন-অখিলে পিতৃতর্পণ মা গো তব উৎসঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে !

স্বচ্ছতটশালিনি সু-অটবিমালিনি স্বর্গস্রোতস্বতি ক্ষিতিতল-অঙ্গে,
শশাঙ্ককরহারা শীতল শ্বেতধারা সাগরগামিনি বহুবিধ রঙ্গে,
সুরনর-অর্চ্চিতা অবনি-আবির্ভূতা ভারতভূষণ ভগবতি গঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে !

ধরণি মনোহরা ফলশস্যে ভরা নীরধারা তব যেস্থানে, জননি,
বনরাজিমণ্ডিত উভকূলশোভিত গভীর অক্ষয় প্রবাহধারিণি,
জয় জয় অন্নদে শুভদে মোক্ষদে ভারতজনগণ- ক্ষুধাসংহারিণি।

বন্দে মাতর্গঙ্গে !

বেদে প্রকট নাম পুরাণে গুণগ্রাম কত যুগ মা গো আরাধ্যা জগতে,
ঋক্-সামন্-ঋষি হর্ষপীযূষে ভাসি স্তোত্র গাঁথিলা তব ছন্দস্ গীতে,
বাল্মীকি ব্যাস পরে ঐ পদ ধ্যান করে কি মধুর গুঞ্জিত পদ-তরঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে !

তুই মা জাহ্নবি আর্য্যমহিমাচ্ছবি উজ্জ্বল উন্নত যত ইহ ভুবনে
তোমারি নীরধারে যুগ যুগান্তরে হৈল প্রকাশিত ভারত-জীবনে,
রাজ্য বাণিজ্য দেশ দুর্গ পুরি অশেষ অস্ত উদয় কত হেরিলে অপাঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে !

ধন্য ভাগীরথি পাতকিজনগতি দুষ্কৃতিবারিণি তীর তরঙ্গে,
কিবা নিরুপমা তব ধৃতি ক্ষমা সমূহ ভারত- পাপ ধর অঙ্গে,
আর্য্যভুবনবাসী অন্তিমে তটে আসি অস্থি নিমজ্জয় তব উৎসঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

ধীরাজ মহীপাল ধনাঢ্য কি রাখাল পশ্বাদিপ্রাণিগণ অভেদ ও নীরে,
কি ঋষি ব্রাহ্মণ চৌর দস্যুজন নাহি নিবারণ একই প্রাণীরে,
সর্ব্ব পাতকিদেহ অঙ্কে তুলিয়া লহ দেহ মুক্তিদান কীটপতঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।

মাতর্জাহ্নবি ঐ তব পদ সেবি পূর্ব্ব পিতৃ যত গত কালে কালে,
বংশাবলী কত এখন হবে গত অব কোলে মাতঃ পূত সলিলে,
ভবজনতারণ পাপবিমোচন সমাধিস্থান হেন কোথা মহী-অঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

গঙ্গে অঙ্কে তব অন্তে কি স্থান পাব দেহ মিলাব মা গো তব পুণ্য তোয়ে,
ভ্রান্ত নিতান্ত মা দিও পদছায়া তাপতপ্ত কায়া ষড়রিপুরঙ্গে,
সর্ব্বপাতকহরা গঙ্গে রুদ্রশেখরা স্বর্গসরিদ্বরা লৈও মা সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি ও কাব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কবি ও কাব্য বিষয়ক গতপূর্ব্ব-প্রবন্ধে আমরা অলৌকিক কবিসৃষ্টির দুই একটি উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধ উপসংহার করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধে আমরা জড়জগতের সহিত তুলনায় কবিসৃষ্টির উপাদেয়তা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং ঐ উপাদেয়তার কারণরূপে অনন্যপরতন্ত্রতা, নিয়তিকৃতনিয়মরাহিত্য, হ্লাদৈকময়ত্বাদি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছিলাম। অদ্যকার প্রবন্ধে আমরা ঐ অলৌকিক কবিসৃষ্টির প্রয়োজনের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। দার্শনিকেরা বলেন,—"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে" অর্থাৎ মন্দ (মূঢ়) ব্যক্তিও প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। প্রাণিভেদে, ঐ প্রয়োজন ভিন্ন হইলেও, উহা সাধারণতঃ সুখ বা দুঃখাভাব হইতে অনতিরিক্ত। আপাততঃ দুঃখাভাবকে পরিত্যাগ করিয়া সুখকেই প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতেছে। প্রবৃত্তি শব্দ এস্থলে নৈয়ায়িকদিগের অভিপ্রেত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া কেবল চেষ্টা অর্থে ব্যবহৃত হইল। অতএব ইহা স্থির হইল যে, সচেতনমাত্রেই সুখ লাভার্থই প্রবৃত্ত, এবং সুখবিরোধিতা প্রযুক্ত দুঃখ সকলেরই জিহাসিত। কিন্তু সেই সর্ব্বজনপ্রার্থিত সুখ অতি দুর্লভ ও অন্যান্য সমস্ত পার্থিব পদার্থের ন্যায় পরিচ্ছেদ, অসম্পূর্ণতা, অবিশুদ্ধি ইত্যাদি দোষাক্রান্ত। হিন্দু-দার্শনিকদিগের মতে সুখ অত্যন্ত প্রবিরল বিষয়। এমন কি মুক্তিবাদ গ্রন্থে নৈয়ায়িকপ্রবর গদাধর ভট্টাচার্য্য সুখ ও দুঃখকে, যথাক্রমে দুর্দ্দিন ও খদ্যোতিকালোকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। "অস্মিন্ সংসারকান্তারে কিয়ন্তি দুঃখদুর্দ্দিনানি কিয়তী বা সুখখদ্যোতিকা" অর্থাৎ দুঃখদুর্দ্দিনই বা কত অধিক ও সুখ খদ্যোতিকাই বা কত অল্প। এই সুখ আবার ক্ষয়ী ও দুঃখসম্ভিন্ন—একে অল্প, তাহাতে আবার ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখসম্ভিন্ন। "কাকমাংসং শুনোচ্ছিষ্টং স্বল্পং তদপি দুর্লভং" (একে ত কাকের মাংস তাহাতে আবার কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট তাহাও আবার স্বল্প ও দুর্লভ।) এই নিমিত্ত সাংখ্যাদি শাস্ত্রকারেরা দুঃখনিবৃত্তিকেই সুখ বলিয়া

গিয়াছেন ও নৈয়ায়িকেরা সুখ ও দুঃখবিহীন অবস্থা বিশেষকে মুক্তিরূপে কীর্ত্তন করিয়া চার্ব্বাক কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়াছেন*। ফল কথা এই যে, দুঃখসম্ভিন্ন সুখের হেয়োপাদেয়তা বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও, সুখ যে দুঃখসম্ভিন্ন ও অচিরস্থায়ী ও সমস্ত পার্থিব পদার্থই যে কোনও না কোনওরূপ দোষকর্ত্তৃক আক্রান্ত, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। মহাকবি কালিদাস কর্ণিকার পুষ্পবর্ণনচ্ছলে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন;—

"বর্ণপ্রকর্ষে সতি কর্ণিকারং দুনোতি নির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ॥"

অর্থাৎ কর্ণিকার পুষ্প (বর্ণগত উৎকর্ষ) সৌন্দর্য্য থাকিলেও নির্গন্ধতা-প্রযুক্ত (দর্শকের) অন্তঃকরণে ক্লেশপ্রদান করিয়াছিল; বিধাতার প্রবৃত্তি প্রায়ই গুণের সামগ্র্যবিধিতে (একাধারে সমস্ত গুণসন্নিবেশে) পরাঙ্মুখী। অর্থাৎ বিধাতা প্রায়ঃ কোন বস্তুকেই সর্ব্বগুণান্বিত করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। কেবল কালিদাস কেন, কবিমাত্রই, সচেতামাত্রই, জড়জগতের এই অসম্পূর্ণতা ও দুঃখবাহুল্য নিবন্ধন দুঃখিত। এবং আমরা সকলেই সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে অহরহঃ ঐ অসম্পূর্ণতা ও দুঃখবাহুল্যের নিরাকরণে যত্নবান্ আছি। বিজ্ঞানশাস্ত্র ও বৈহারিক শিল্প (fine arts) ঐ যত্নের ফল। বৈজ্ঞানিক, চার্ব্বাক বিশেষ। তাঁহার মতে পার্থিব সুখ, দুঃখসম্ভিন্ন হইলেও উহা সুখ, উহার যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকু ভাল, সুতরাং কি উপায়ে ঐ সুখ অল্পতর আয়াস ও দুঃখে, অধিক-

* চার্ব্বাক বলেন :—

"ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং। দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্। কো নাম ভো তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী॥"

অর্থাৎ বিষয়সংসর্গজন্য সুখ দুঃখোপসৃষ্ট, অতএব উহা পরিত্যাজ্য, ইহা মূর্খের কথা। কারণ কোন্ হিতার্থী (নিজ হিতেচ্ছু) ব্যক্তি শুভ্রবর্ণ উত্তম তণ্ডুলাঢ্য ব্রীহি (ধান্য) তুষকণোপহিত বলিয়া পরিত্যাগ করে?

"মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ॥"

যে মহামুনি শিলাত্ব (প্রস্তরত্ব) রূপ মুক্তির জন্য [মুক্ত পুরুষের সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না, সুতরাং তিনি অচেতন প্রস্তরস্বরূপ ইহা চার্ব্বাকাভিপ্রায়] শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া যে নাম দিয়াছ, তিনি নিশ্চয়ই সেই নামের উপযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা মুনির নাম গোতম বা গৌতম। চার্ব্বাকের মতে তিনি যথার্থই গোতম অর্থাৎ গো-শ্রেষ্ঠ]।

তর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই উপায় উদ্ভাবনেই তিনি নিরন্তর চেষ্টিত। বৈহারিক শিল্পিশ্রেষ্ঠ কবিও সুখপ্রার্থী ও তবে তিনি বৈজ্ঞানিকের ন্যায় পার্থিব (বিষয়সংসর্গজন্য) সুখের তত পক্ষপাতী নহেন। পার্থিব পদার্থের অসম্পূর্ণতা, পার্থিব সুখের অনুপাদেয়তা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক। তিনি পার্থিব উপাদানে অপার্থিব জগৎ রচনা করিয়া অপার্থিব, অলৌকিক, বিমল সুখের অবতার করেন। তিনি বৈজ্ঞানিকের ন্যায় বাস্তব জগৎ অসম্পূর্ণ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না; পরন্তু উহা কিরূপে সম্পূর্ণ হইতে পারে, তাহাও প্রদর্শন করেন। তিনি দুই প্রকার চিত্র অঙ্কিত করেন। একপ্রকার বাস্তব জগতের, আর একপ্রকার অবাস্তব কাল্পনিক জগতের। অনেক সময় বাস্তব ও অবাস্তব যুগপৎ চিত্রিত হইয়া পরস্পরের অবভাসক হয়, যেমন ;——

"পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদিস্যাৎ মুক্তাফলং বা স্ফুটবিদ্রুমস্থম্।
ততোঽনুকুর্য্যাৎ বিশদস্য তস্যাঃ স্তাম্রৌষ্ঠ পর্য্যস্তরুচঃ স্মিতস্য ॥"

অর্থাৎ পুষ্প যদি বালপল্লবের উপর স্থাপিত হয়, মুক্তাফল যদি নির্ম্মল বিদ্রুমের উপর অধিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে, পার্ব্বতীর তাম্রবর্ণ ওষ্ঠোপরি প্রসৃত (বিস্তারিত) হাস্যের তুলনা হইতে পারে। এস্থলে পুষ্প, প্রবাল, স্ফটিক, হাস্য ইত্যাদি সমস্তই বাস্তব, কিন্তু তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অবাস্তব। কেবল-বাস্তব চিত্র কবিদিগের গ্রন্থে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল-অবাস্তব যেমন—কালিদাসের যক্ষপুরবর্ণন ও সেক্সপিয়ারের Midsummer Night's Dream। পাঠক এক্ষণে দেখিলেন; সচেতামাত্রই যে অভাব অনুভব করেন ও যে অভাবপূরণের নিমিত্ত যত্নবান্, কবিও সেই অভাবপূরণে প্রবৃত্ত। যাহার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক শক্তির অভিভব করেন, দার্শনিক মুক্তিমার্গ দেখাইয়া দেন, ধর্ম্মশাস্ত্রকার স্বর্গাপূর্ব্বাদি কল্পনা করেন, তাঁহার জন্যই কবির অমৃতময়ী লেখনী শব্দরচনা করিয়া থাকেন। প্রতিভা কল্পনাশক্তি লোকাচারপরিজ্ঞান ইত্যাদি যাহা কিছু কবিদিগের অসাধারণ গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত তৎসমুদয় শব্দরচনাকে দ্বার করিয়াই কাব্যগত চারুত্বের আধায়ক হয়। শব্দসকল মনুষ্যহৃদয়ের রসভাবাদির ব্যঞ্জক ও মনুষ্যহৃদয় মধ্যে প্রসুপ্ত সংস্কারভাবাপন্ন তত্তৎ রসভাবাদির উদ্বোধক। এই সমস্ত সংস্কারভাবাপন্ন রসভাবাদিকে নিঃশব্দ বীণাদির তন্ত্রীগত ঝঙ্কারশক্তির সহিত

তুলনা করা যাইতে পারে এবং যেমন অঙ্গুল্যাদির আঘাত দ্বারা ঐ শক্তির বিকাশ হয় ও তন্ত্রী হইতে শ্রুতিমধুর শব্দ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কবিবাক্য হৃদয়মধ্যস্থ প্রসুপ্ত রসভাবাদিকে উদ্বোধিত করে। সেই উদ্বোধিত রসভাবাদির আস্বাদন, কাব্যাস্বাদন। উদ্বোধকের তারতম্যে আস্বাদনেরও তারতম্য এবং তাহার সহিত সুতরাংই কাব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে। কবিদিগের ভাষা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং বালকাদির ভাষার সদৃশ। রামায়ণে শীতঋতুবর্ণনস্থলে নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়:— "নিশ্বাসান্ধইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে" অর্থাৎ নিঃশ্বাসবায়ুসংসর্গে অন্ধীভূত (লুপ্তবিম্বগ্রহণশক্তি) আদর্শের ন্যায় চন্দ্রমা প্রকাশিত হইতেছেন না। অর্থাৎ যেমন কোন দর্পণের উপর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে উহার উপর এক-প্রকার শুভ্রবর্ণ আবরণ পড়ে ও উহার ভিতর দিয়া আদর্শবিম্ব দেখা যায় না, সেইরূপ শীতকালে চন্দ্রবিম্ব বাষ্পাবৃতবৎ প্রতীয়মান হওয়ায়, ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। এস্থলে যদি বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞানের জন্য কবির ঐ অভিপ্রায় (প্রকাশ) করিতে হইত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ঐস্থলে শব্দান্তরপ্রয়োগ করিতেন। কিন্তু সাধারণলোকে হয়ত এস্থলে 'অন্ধ' বা তৎসদৃশ শব্দান্তর প্রয়োগ করিত। এইরূপ সহস্র সহস্র স্থলে সাধারণ লোক ও কবির ভাষাগত ঐক্য ও ঐ ভাষার সহিত বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের ভাষার পার্থক্য উপলব্ধি হয়। ইহার কারণ কি? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বৈজ্ঞানিক জড় জগতের বাস্তব (real) সম্বন্ধনির্ণয় লইয়াই ব্যস্ত, সুতরাং কোন স্থলেই তাঁহার একের সম্বন্ধ অপরের উপর আরোপ করিলে চলিবে না। কিন্তু কবির বাস্তব অবাস্তব দুই লইয়াই কথা। বরং অনেক স্থলে অবাস্তবই তাঁহার সম্বন্ধে বাস্তবস্থানীয়। সুতরাং সম্বন্ধবিপর্য্যয়কে তিনি বড় ভয় করেন না, বিশেষতঃ যদি ঐরূপ বিপর্য্যয় দ্বারা কোনও অলৌকিক সত্য আবিষ্কৃত বা কোন অদ্ভুত রসভাবাদির উল্লেখ হয়। লোকব্যবহারস্থলে বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্মতার আবশ্যক হয় না, সুতরাং যে কোনও রূপে হউক ধর্ম্মদ্বয়ের সাদৃশ্য থাকিলেই পরম্পরাবভাসকরূপে পরস্পরে পরস্পরের আরোপ চলিতে পারে। ইত্যলংপল্লবিতেন।

৺পূজার কাপড়ের ফর্দ্দ

কামিনীদাস বাবু কেরানীগিরি করেন। তা হোক্, তিনি বড়বাবু এবং মাহিনা পান দুই শত টাকা। তাঁহার গৃহিণী পরমা সুন্দরী, গৃহদক্ষা এবং বুদ্ধিমতী—নাম শ্রীমতী শ্রীমতী। কামিনীদাস বাবুর পরিবারের মধ্যে একটি পুত্র, একটি কন্যা, একটি জামাতা, দুইটি শ্যালক, একটি শ্যালীপুত্র। ইহাকে ত আর বহুপরিবার বলা যায় না। সুতরাং দুই শত টাকা মাহিনাতেই কামিনী বাবু যথারীতি মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চালাইয়া আসিতেছেন। খানসামা বেহারা, ঝি, রাঁধুনি, মাষ্টার সবই আছে। এবং শ্রীমতীর সমকক্ষ ব্যক্তিদের সহিত আহার ব্যবহার লোক লৌকিকতা সমস্ত যথানিয়ম রক্ষা করা হইয়া থাকে। কেবল খরচে কুলায় না এবং ধারে বাটী কিনিতে পাওয়া যায় না বলিয়া শ্রীমতী মাসে মাসে ভাড়া গুনিয়া লক্ষ্মীছাড়া বাটীতে বাস করেন।

সুখের পর দুঃখ নাকি এক চক্রে ঘুরিতেছে, তাই সকল সুখেই একটু আধটু দুঃখের ছিটা লাগিয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জলা সুখটুকু কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না—শ্রীমতীরও ঘটে নাই। কামিনীদাসের পৈত্রিক নিবাস গঙ্গাতীরবর্ত্তী শান্তিপুর গ্রামে। সেখানে তাঁহার পৈত্রিক ভবনে তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয় প্রভৃতি বহুপরিবার একত্রে বাস করেন। বৃদ্ধ বহুদিন কোন ধর্ম্মজ্ঞানবিমুগ্ধ সাহেব সওদাগরের নিকট চাকুরি করিয়াছিলেন। তিনি সত্যভাষী, সৎস্বভাব কর্ম্মঠ এবং প্রভুর নিতান্ত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন বলিয়া, বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্মে অক্ষম হইলেও, অনুগতবৎসল সাহেবরা তাঁহাকে কিছু কিছু মাসহারা দিতেন। সেই কয়টি টাকা এবং দুই চারি বিঘা ব্রহ্মোত্তরের উপস্বত্বের উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মণ কায়-ক্লেশে এই বহুপরিবার প্রতিপালন করিতেন। তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেন, ঠাকুর দেবতা মানিতেন ইত্যাদি অনেক সেকেলে দোষে দুষ্ট ছিলেন। তা ছাড়া 'আমার স্বোপার্জ্জিত অর্থ আমি যাহা খুসি করিব, শয্যার্দ্ধভাগিনী ভিন্ন অন্য কাহারও তাহাতে দাবি দাওয়া নাই'..এই সহজ সত্যটা ব্রাহ্মণের বিকৃত মস্তিষ্কে কোনক্রমেই প্রবেশলাভ করিত না।

এদিকে কামিনীদাসের শ্যালীপুত্র এবং শ্যালকেরা প্রফুল্লমল্লিকাসন্নিভ

সুশুভ্র সরু বাঁকতুলসি তণ্ডুলের অন্ন চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ঘৃত-দধি-দুগ্ধ-মিষ্টান্ন সংযোগে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিতেছেন, ওদিকে কামিনীর বৃদ্ধ পিতা সপরিবারে বহুকষ্টাহৃত কদন্নে "সছন্দবনজাতেন শাকেনাপি" সহযোগে দগ্ধ উদর পূর্ণ করিতেছেন। এদিকে উৎকৃষ্ট ফরেসডাঙ্গার, শান্তিপুরে, ফিতে-পেড়ে, রেসম-পেড়ে, বাবুধাক্কা প্রভৃতি নয়নতৃপ্তিকর নূতন নূতন ফ্যাসানের নানাবিধ বস্ত্র এবং বডি, জ্যাকেট, সেমিজ, কামিজ সপ্তাহ-রজক-গৃহ-ধৌতাগত হইয়া সর্ব্বদা শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গের শ্রীসম্পাদন করিতেছে; ওদিকে কামিনী বাবুর বৃদ্ধা মাতা, ভগিনী প্রভৃতি শতগ্রন্থিবিশিষ্ট মলিন কদর্য্য বিলাতি বস্ত্রে কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিতেছেন। মা বোনের কড়খাড় কখন ঘুচিল না, সোনা রূপার আঁচড় কখন তাহাদের গায়ে লাগিল না, কিন্তু শ্রীমতীর সাদা শুট সম্পূর্ণ, জড়োয়াও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। বুদ্ধিমতী শ্রীমতী ঠাকুরাণী স্থূলবুদ্ধি কামিনীদাসকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, যে তাঁহার অলঙ্কারের অধিকাংশই তিনি নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়াছেন। নিজ ব্যয়ে—কি না পিত্রালয় হইতে তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী গোপনে তাঁহাকে যে প্রভূত অর্থ প্রেরণ করিয়া থাকেন, সেই অর্থে। সেই জন্য সেক্‌রার হিসাব তিনি স্বয়ং রাখেন। তা ছাড়া পঞ্চমী, অষ্টমী, অনন্ত, সাবিত্রী প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য ব্রত সমূহ যাহা শ্রীমতী যথা-নিয়মে গ্রহণ এবং উদ্‌যাপন করিয়া আসিতেছেন সে সমস্তই সেই পিতৃগৃহাগত অর্থবলে। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে শ্রীমতীর পিতৃগৃহে যদি এতই অর্থের প্রাচুর্য্য, তবে তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় এবং ভগিনীপুত্র গরিব কামিনী-দাসের অন্নধ্বংস করেন কেন? এবং অন্যূন বার বৎসরের ভিতর শ্রীমতীর পিত্রালয়ে গমনের কথা কেহ শুনে নাই কেন? ইহার সন্তোষজনক উত্তর আমরা দিতে পারিলাম না—শ্রীমতীও দিতে বাধ্য নহেন।

শ্রীমতীর অলঙ্কার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকুক এবং তিনি 'জন্ম-এয়োস্ত্রী' হইয়া উহা সম্ভোগ করুন—শশুর শাশুড়ী নিত্য এই আশীর্ব্বাদ করেন। তবে তাঁহারা বলেন, কামিনী বাবু শালা শালীপোর উপর ষোল আনা মনোযোগ না দিয়া উহার দুইচারি আনা রকম যদি বাটিতে দেন, তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা হয়। কিন্তু আমরা সে কথা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। কামিনীদাস নিজ-বিদ্যাবলে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। সে অর্থের ভাগ তিনি শ্রীমতী

এবং শ্রীমতীর সম্পর্কীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও দিবেন কেন। বিশেষ যে বিদ্যাবলে উপার্জ্জন, সে বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য কামিনী পিতার নিকট ঋণী নহেন। শ্রীমতীর পিতাই বাটীতে রাখিয়া গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া অর্থব্যয় করিয়া জামাতাকে দ্বিতীয়শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। সেই দ্বিতীয়-শ্রেণী-পরিমিত বিদ্যা Official experienceএ সম্মার্জ্জিত করিয়া, সাহেব-বশীকরণ মন্ত্রের সাহায্যে, কামিনীদাস বড়বাবুর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অতএব সহানুভাবী পাঠক এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন, যে কামিনীর স্বোপার্জ্জিত অর্থে তাঁহার পিতার বা পিতৃসম্পর্কীয়দিগের কোনও দাবী দাওয়া চলিতে পারে না। তা ছাড়া, হাল আইন মতে সকল রকম আত্মীয়তায় শ্রীমতী মধ্যবর্ত্তিনী। শ্যালক আত্মীয়, কেন না তিনি শ্রীমতীর ভ্রাতা; শ্যালীপুত্র—শ্রীমতীর বোন-পো, পুত্র—শ্রীমতীর পুত্র, কন্যা—শ্রীমতীর কন্যা। স্বয়ং কামিনীদাস শ্রীমতীর স্বামী বলিয়া আপনার নিকট আত্মীয়, নহিলে তিনি কে? অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিপন্ন, যে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির সহিত যখন শ্রীমতীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তখন তাঁহারা আত্মীয়পদবাচ্য হইতে পারেন না। পুত্রকে এই সুবিমল পবিত্র আত্মপরতত্ত্বের পশ্চিমমীমাংসায় সম্যক্ অধীত জানিয়া এবং সে অঞ্চলে শ্রীমতীর প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড এবং অপ্রতিহত বুঝিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ইদানীং কলিকাতার আশা এককালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

কিন্তু দেশের পুত্রটির বিবাহ উপস্থিত, বিবাহে ব্যয় আছে। ব্রাহ্মণ আশার বিরুদ্ধে আশা করিয়া সে কথা কামিনীকে জানাইলেন। তখন শ্রীমতীর আজ্ঞা এবং কথত মত সেবকশ্রীকামিনীদাস শর্ম্মা কোটি কোটি প্রণামের পর পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে নিবেদন করিলেন,—"কুড়ি বছরের কচিছেলের বিবাহের বয়স হইয়াছে, আপনি কেমন করিয়া এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, বুঝিতে পারি না! বিশেষ কিরূপ অবস্থার লোকের বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয়, সে বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। যে ব্যক্তি অনায়াসে স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করিতে সক্ষম এবং সন্তানদিগের জন্য ভবিষ্যতে কিছু বিষয় আশয় রাখিয়া যাইতে পারিবে এমন ভরসা রাখে, সেই বিবাহের প্রশস্ত পাত্র। ভায়া যখন সেরূপ অবস্থায়

উপনীত হইবেন, তখন তিনি অন্যের সাহায্য বিনা বিবাহ করিতে পারিবেন। আর যদিই তখন কিছু সাহায্য করিতে হয়, আমি আহ্লাদের সহিত করিব।" বিবাহসম্বন্ধে এই অযাচিত এবং অভাবনীয় দীর্ঘ বক্তৃতা পাঠে ব্রাহ্মণ নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখন পুত্রকে কোনও অভাব জানাইবেন না। উপস্থিত বিবাহ ধারকর্জ্জ করিয়া সারিতে হইল—ব্রাহ্মণ কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন—গ্রাসাচ্ছাদন কষ্টে সম্পন্ন হইতে লাগিল। এখন আবার বিপদের উপর বিপদ—পূজা উপস্থিত!

আনন্দময়ীর আগমনে দেশ আনন্দময়—নিরানন্দ কেবল অর্থহীনের। যার চিরদিন অপ্রতুল, সে এ বিষাদের তারতম্য বড় বুঝিতে পারে না। কিন্তু মহামায়ার দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থির মেয়েটি সে দিন যাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করিয়াছেন, হাসিতে হাসিতে আজ যদি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আজ আনন্দময়ীর আগমনেও তাহার ঘরে নিরানন্দ। অর্থ সকল অনর্থের মূল—কথাটা শুনিয়াছি। কিন্তু এ ছাই নহিলেও ত একদণ্ড চলে না দেখিতেছি। যখন দেখিবে সুশিক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক উন্নতচেতা, সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ উপদেষ্টা অর্থের অনর্থ বুঝাইবার জন্য, কদাচাররত মূর্খ ধনশালীর অজস্র নিন্দা এবং গুনবান্ বিদ্বান্ নির্ধনের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন, তখন তাঁহার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিও না। উনি মুখে যাহাই বলুন, হীরকমণিমণ্ডিত অলঙ্কারশ্রেণীর এবং প্রজাপীড়নলব্ধ রৌপ্যচক্রসমূহের ভ্রমরগুঞ্জনবৎ সুমধুর ঝঙ্কারের মোহ অতিক্রম করিবার সামর্থ্য উঁহার নাই। কার্য্যকালে উনি সংসারের পাপস্রোতবৃদ্ধিকারী মূর্খ দুর্ব্বিনীত ধনবানের সকল দোষের প্রতি এবং সংস্বভাবসম্পন্ন বিদ্বান্ বিনয়ী নির্ধনের সকল গুণের প্রতি সমান অন্ধ হইয়া, দেখিতে পাইবেন কেবল— একজনের দারিদ্র্য এবং অপরের ঐশ্বর্য্য। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। মুখে যিনি যাহাই বলুন, সময়ে সকলেই রূপার চাক্তির মোহে মুগ্ধ। যদি বন্ধু মধ্যে বাস করিতে চাও, ধনহীন জীবন চলিবে না, অর্থ চাই। "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ" এই মহাজন বাক্যে 'অর্থের' পূর্ব্বে বিদ্যা শব্দের প্রয়োগ ভাল হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রচলিত উদার নীতিশাস্ত্রের বিশুদ্ধ মতে উহা আর একটু পরিষ্কৃত করিয়া অর্থবিদ্যাঞ্চ করিয়া

লওয়া হউক। প্রথমেই অর্থচিন্তা কর, তারপর সময় থাকে বিদ্যাচি করিও। তবে যে বিদ্যা অর্থকরী, কেবল সেই বিদ্যাই চিন্তনীয়া। ত উপার্জ্জনের অনুরোধে বিদ্যা উপার্জ্জন, এ সার কথা ভুলিও না।

তা যাক্ যে কথা বলিতেছিলাম—ঋণ-ভারে পীড়িত দরিদ্র ব্রাহ্মণ আ আনন্দময় শারদীয় উৎসব সমাগমেও নিরানন্দ—স্ত্রী পুত্র পরিবার নূতন বস পরিয়া মহামায়ীর শ্রীমুখদরশন করিতে পাইবে না। ব্রাহ্মণকে নিতা ম্রিয়মাণ দেখিয়া ব্রাহ্মণী অনেক ভাবনা চিন্তার পর একজন অনুগত প্রতি বাসিনীকে কিছু মিষ্টান্ন সহ কলিকাতায় বধূমাতাঠাকুরাণীর নিকট প্রের করিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, এবার নূতন বৌটিকে আর ছোট ছো ছেলেমেয়ে দুটিকে তাঁহার একটু একটু নূতন কাপড় কিনিয়া দিতে হইবে নহিলে বাছারা পূজা দেখিতে পায় না। প্রথমেই পাড়াগেঁয়ে লক্ষীছাড়া ত দেখিয়াই ত শ্রীমতীর মুখশ্রী শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গেল, তারপর যখন কাপড়ে কথা শুনিলেন, তখন যাহা ঘটিল তাহা কেবল অনুমেয়, বর্ণনীয় নহে শ্রীমতী ঠাকুরাণী মুখে মিষ্টকথা কহিতে জানিতেন না এমত নহে, কি শান্তিপুরবাসিনীর প্রতি ব্যবহারে, বাক্যে, আকারে, ইঙ্গিতে যতটকু বিদ্বে এবং বিরক্তি প্রকাশ করা যাইতে পারে, ততটুক দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না।

সন্ধ্যার পর যথাসময়ে কামিনীবাবু আপিষ হইতে হাঁটিয়া—টাকা ভাঙ্গা না থাকিলে শ্রীমতী কামিনীর ট্রামভাড়া দিতেন না—শুষ্কমুখে বাটী আসি লেন এবং যথাসময়ে আপিসের তীব্র খাটুনির পারিতোষিকস্বরূপ শ্রীমতী লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন সুতরাং Economy-পরিচালিত-সংসারে প্রস্তুত, অতএব ঘৃত সম্পর্কশূন্য, অর্দ্ধপক্ক খানকতক ফুলকো রুটি সামান্য ব্যঞ্জন এবং সার্দ্ধচতুর্থাংশ-সেরপরিমিত দুগ্ধের সাহায্যে—খাটুনির অনুরোধে অহিফেন সেবন, অহিফেনের অনুরোধে দুগ্ধ সেবনের বেয়াদুবি,—কোনরূপে গলাধঃকরণ করিয়া সর্ব্বদুঃখহারিণী নিদ্রাদেবীর প্রসাদে শ্রীমতীর প্রেমবৈচিত্র্যের ক্ষণিক বিস্মৃতিসুখ অনুভব করিবার আশায় অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া তুষ্টিভাব অবলম্বন করিলেন। তখন শ্রীমতী ঠাকুরাণী শশুর শাশুড়ীর উদ্দেশে প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা এবং প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের কাপড় চাহিয়া পাঠা-

ইবার অধিকারের সম্যক্ সমালোচন আরম্ভ করিলেন। বেগতিক দেখিয়া কেরাণীজীবন কামিনীদাস বেচারা নিতান্ত ভীতচিত্তে উত্তর করিল,—"বার বার তুমি কোথা হইতে সাতগোষ্ঠীর কাপড় যোগাইবে? ঈশ্বরেচ্ছায় এখন খরচ পত্র বাড়িয়াছে, আপনাদেরই কুলায় না।" শুনিয়া শ্রীমতী দেবী নিতান্ত প্রীত হইয়া, সেই সুন্দর অপাঙ্গে একটু মৃদুমধুর-হাস্যরেখা প্রকটিত করিয়া, প্রশান্ত কমনীয় ললাটে একটু শান্তির ছটা প্রকাশ করিয়া এবং সেই মন্মথের ফুলধনুর ঔপমেয় ভ্রূলতার মধ্যবর্ত্তী প্রশান্ত চঞ্চল স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল আকর্ণবিস্তৃত নয়নে একবারমাত্র সেই বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষের প্রয়োগ দেখাইয়া, স্বামীর সংসারের শুভকামনায়, আপনার নীরবে স্বার্থত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা আপনিই বার বার করিলেন, এবং স্বীয় জীবনচরিতের বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছেদ হইতে এবিষয়ে অনেক উদাহরণ উদ্ধার করিয়া আপনাকে আপনি সমর্থন করিলেন। তারপর যিনি তাঁহার স্বামীকে পুত্রকন্যাকে ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, এবং সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের শুভ-কামনা করাই যাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, সেই শাশুড়ী ঠাকুরাণীর উপর সহসা কৃপাপরবশ হইয়া স্বামীকে অনুমতি করিলেন, এবারকার কাপড়ের ফর্দ্দে উহাদের নামেও এক একখান বিলাতিকাপড় লিখিয়া লও। তারপর শ্রীমতীর পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভাগিনেয় রাধুনী ঝি খানসামা যাহার যেমন অভিরুচি সেইরূপ ফর্দ্দ ধরা হইল। সাঁচ্চাপোষাক, টুপি, বোম্বে শাটী, বডি, জ্যাকেট, ধুতি, চাদর, জুতা, মোজা, রুমাল, আতর, গোলাপ সমস্ত দ্রব্যের মূল্য একুন করিয়া ২৪৩৷৵১৫ মাত্র হইল। তার উপর শান্তিপুরবাসীদের জন্য বাজে খরচ খাতে মোটের উপর আরও ৫৲ টাকা ধরিয়া লইতে হইল!!!

আমরা কেবল কামিনীদাসের কাপড়ের ফর্দ্দ দেখাইলাম। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে অনেক দাসেরই ফর্দ্দ এইরূপ—পার্থক্য কেবল টাকায়। কামিনীদাসের ২৪৩ টাকার স্থলে রমণীমোহনের ২০৪৩৲ হইতে পারে, কিন্তু সেখানেও ঐ বাজে বিলাতি কাপড়ের খরচ ৫৲ টাকার অধিক নহে।

শেষ

গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবন।
(আর) গাহে না পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি-গুঞ্জরণ।
দুলাতে মৃদু লতিকা বনে, খেলিতে নব কলিকা সনে,
মধুরতর নাহি সে আর সমীর ধীর সঞ্চরণ॥
কাননে ঢালি জোছনা রাশি, ভাসে না চাঁদ গোকুলে আসি,
নাহি সে হাসি প্রমোদরাশি নাহি সে সুখ-সম্মিলন।
জলদে শশী-মাধুরী ঢাকা, বিষাদ যেন সকলে মাখা;
শ্রীহীন তরু, শ্রীহীন লতা, শ্রীহীন চারু পুষ্পবন॥
অমিয় স্বর-লহরে মাখি স্তবধ করি পশু পাখী,
মধুরভাষী আর সে বাঁশী গাহে না গীত সম্মোহন।
যমুনা পানে চাহিলে ফিরে, কপোল ভাসে নয়ন-নীরে,
পরাণে শুধু উছলি উঠে সুনীল জলে সন্তরণ॥
নিবিড় বনে তমাল-ছায় কোকিল-বধূ গীত না গায়,
সারিকা-শুক বিরস-মুখ বিগত প্রেমসম্ভাষণ।
অধীর ব্রজ-বালক-দল, না খায় ধেনু তৃণ কি জল,
সজল আঁখি ঊরধ মুখে করিছে কি যে অন্বেষণ॥
প্রেমিক কে সে মধুরভাষী বধিয়ে গেল গোকুলবাসী,
ব্রজে কি আর বাঁশরী তার গাবে না গীত সঞ্জীবন।
অধীর প্রাণে বিষম ক্লেশ, কেমনে করি এ দুখ শেষ,
বিনে শ্রীহরি কেমনে করি নয়ন-বারি সম্বরণ॥

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।